উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল



শ্রী কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী

Written strictly in accordance with the Approved Syllabus of the Board of Secondary Education, West Bengal, as a Text-Book for classes IX, X & XI for Higher Secondary and Multipurpose Schools of West Bengal.
[Vide Circular No. HS/1/58 dated 7th March, 1958]

উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূগোলশাস্ত্রের ভূতপূর্ব শিক্ষক ও
আশুতোষ কলেজের ভূগোলশাস্ত্রের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক
ও
লণ্ডন রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ভূতপূর্ব সদস্য

শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ.
প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
১৯৬৩

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ (১৯৫৯)—y^2
দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬১)—x^3
তৃতীয় সংস্করণ (১৯৬৩)—z^5

মূল্য : ৮ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬ নং, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

Syllabus for Higher Secondary Examination In

ECONOMIC & COMMERCIAL GEOGRAPHY

[Map Work—Candidates may be required to draw outline maps of (a) the world and (b) India, and locate therein climatic regions, production centres, trade routes and trade centres.]

দ্রষ্টব্য— এই সিলেবাসে উক্ত বিষয়গুলির পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অঙ্কগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে-পৃষ্ঠায় ঐ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার সংখ্যাজ্ঞাপক।

Classes IX & X

1. (A) **Man and his Environment.** (পৃষ্ঠা ১-৩৩)

Principal factors of environment :—

(a) *Physical* : geographical location, mountains, rivers, coast-lines ; climate, soil, animals, vegetation, minerals etc. (পৃ. ৫-২৭)

(b) *Non-physical :* population, political and social organisation, religion, etc. Adaptation of man to his environmnet ; effects of environment on the economic life of man. Examples from Indian conditions. (পৃ. ২৯-৩০)

Examples from Indian conditions.

(B) **The Importance of Economic Geography** (পৃ. ৩১-৩৪)

2. **Climatic Regions of the World**—Polar, Temperate (Cool and Warm), Tropical and Equatorial—their influence on vegetation, animal life, distribution of population, transport, economic development etc. (পৃ. ৩৫-৯১)

Natural divisions in India. (পৃ. ৯১-১০০)

3. **Principal resources of the world and their utilisation** (To be studied with special reference to Indian conditions). (পৃ. ১০১-২২৪)

(a) *Agriculture and Rural Industries* :

Agriculture (পৃ. ১০১-১৮৬)—its main features, intensive and extensive cultivation ; types of farming (পৃ. ১০১-১০৫) ; importance

of soil (পৃ. ১০৬-১১১) and irrigation (পৃ. ১১১-১১৬); Principal agricultural products—(i) Food crops : Rice (পৃ. ১১৭), Wheat (পৃ. ১২৩), Tea (পৃ. ১৩১), Coffee (পৃ. ১৩৬), Sugar-cane (পৃ. ১৪১), and Sugar-beet (পৃ. ১৪৮); (ii) Commercial crops; Cotton (পৃ. ১৫১), Jute (পৃ. ১৫৯), Hemp (পৃ. ১৬৪), Silk (পৃ. ১৬৬), Rubber (পৃ. ১৭০) and Oilseeds (পৃ. ১৭৫). Their uses and principal growing areas, important markets.

(b) *Forests* : (পৃ. ১৮৭-২০৭)

(i) Different classes of forests (পৃ. ১৮৭-১৯০)—distribution of forest areas—products of the forests—other advantages. The Lumber industry and the paper-pulp industry, (ii) Indian forests and their utilisation (পৃ. ১৯০-২০৭);

(c) *Pastoral Industries* (পৃ. ২০৭-২২৬) :

(i) Live-stock—its importance—food (পৃ. ২০৯), transport and power (পৃ. ২০৮-৯), raw materials, clothing, Principal products and their uses (পৃ. ২০৮-২১৬), Production of raw wool (পৃ. ২১৬) hides and skins (পৃ. ২১৭), frozen meat (পৃ. ২১৯), Important areas devoted to commercial rearing of Cattle and Sheep (পৃ. ২০৯).

(ii) India's live-stook problems (পৃ. ২২১-২২৬)—trade in Hides and Skins (পৃ. ২২৩).

4. **Minerals and Power resources :** (পৃ. ২২৭-৩১৪)

(a) Mining : its features (পৃ. ২২৭), Principal Minerals and their uses—

(i) *Metals* : Iron (পৃ. ২২৮), Copper (পৃ. ২৩৪), Lead (পৃ. ২৩৯), Tin (পৃ. ২৩৯), Aluminium (পৃ. ২৩৬);

(ii) *Non-metallic* : Coal (পৃ. ২৪২), Petroleum (পৃ. ২৫৩), Salt (পৃ. ২৬০), Mica (পৃ. ২৬১), Building materials (পৃ. ২৬৩), Principal fields of the world and their reserves; important mining industries.

(b) Hydro-electricity—importance (পৃ. ২৬৭).

(c) Principal minerals in India and their problems. (পৃ. ২৭৭-৩০৭)

Multipurpose Schemes in India in relation to power and irrigation (পৃ. ৩০৮—৩১৯).

5. **Fishing :** (পৃ. ৩১৯-৩৩৪)

(a) Sources—inland, coastal and deep sea. Physical characteristics of fishing grounds—principal fiishing grounds. Problems of the fishing industry (পৃ. ৩১৯-৩২৬).

(b) The fishing industry in India (পৃ.৩২৭-৩৩৪).

6. Transport, **Trade-routes and Trade-centres :** (পৃ. ৩৩৫-৪৩২).

(a) Importance of transport (পৃ. ৩৩৫)—different modes of modern transport—roads (পৃ. ৩৩৬), inland water-ways (পৃ. ৩৪২), railways (পৃ. ৩৩৫), shipping (পৃ. ৩৬১), airways (পৃ. ৩৭১). A descriptive study with special reference to India (পৃ. ৩৪০, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৬৪, ৩৭২).

(b) Trade-routes (পৃ. ৩৭৯): Land Routes (road and rail পৃ. ৩৭৯), Water Routes (ocean, canal and river) (পৃ. ৩৮৩) and Air-routes (পৃ. ৩৯২). Examples of Important routes.

The Suez Canal (পৃ. ৩৮৭) and the Panama canal (পৃ. ৩৮৫).

(c) Trade Centres (পৃ. ৩৯৭) :

(i) Ports and Harbours (পৃ. ৩৯৮); their functions, relation with the hinterland ; required conditions for development. Some important ports of international standing. India's principal ports.

(ii) Towns and cities (পৃ. ৪২৩) : Conditions favouring growth (পৃ. ৪২৩)—some important trade centres of the world (পৃ. ৪২৫).

Class XI

7. **Manufacturing Industries** (পৃ. ৪৪৩) :

(a) *Essential factors for development* (পৃ. ৪৪৪-৪৪৭)—raw materials, power resources, climate, transport, labour, and

markets. Important industries—Iron and Steel (পৃ. ৪৪৭), Textile [cotton (পৃ. ৪৫৩), woollen (পৃ. ৪৬০), silk (পৃ. ৪৬৩) and artificial silk (পৃ. ৪৬৫)], Jute (পৃ. ৪৬৭), Paper (পৃ. ৪৬৮) and Chemical (পৃ. ৪৭১) —Chief world centres.

(b) Principal manufacturing industries in India—Cotton (পৃ. ৪৭৬), Iron and Steel (পৃ. ৪৮৪), Jute (পৃ. ৪৯৪), Paper (পৃ. ৫০০), Sugar (পৃ. ৫০৩), Chemical (পৃ. ৫০৯) and Engineering (পৃ. ৫১৩)

8. **Foreign Trade of India** (পৃ. ৫১৭-৫২২)—direction—(পৃ. ৫২৩) and composition (পৃ. ৫১৯).

9. **Population** (পৃ. ৫২৫-৫৩৬)—regional distribution—density of population—factors of density.

10. **West Bengal** (পৃ. ৫৩৭-৫৫৬)—principal agricultural (পৃ. ৫৪৩) and mineral resources (পৃ. ৫৪৪)—Large-scale industries (পৃ. ৫৪৫) and industrial regions (পৃ. ৫৪৫)—Tea industry (পৃ. ৫৪৯)—Importance of Calcutta Port (পৃ. ৫৫৪).

কৈফিয়ৎ

এই পুস্তক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত হইল। কিন্তু সিলেবাসে লিখিত বিষয়গুলির বিবৃতির কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই,—তাহা টানিলে নানাভাবেই বিস্তৃত করা যায়;—এবং সেই বিস্তৃত অংশ অনেক সময় মূল বিষয় বুঝিতে বিশেষ সহায়ক হয়। আবার, ঐ বিস্তৃত অংশ হইতে পরীক্ষক প্রশ্ন নির্বাচন করিলেও তিনি কোন দোষে দোষী হইয়াছেন বলা যায় না। সেজন্য অনেক স্থলে সিলেবাসে উক্ত বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছে।

আমার ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল (ভারত ও পাকিস্তান) একশ্রেণীর শিক্ষক ও ছাত্র সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশা করি আমার এই পুস্তকখানিও তাঁহাদের আশা ভঙ্গ করিবে না।

বহুসংখ্যক চিত্র ও তথ্যজ্ঞাপক সাংখ্যিক তালিকা দ্বারা এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি যথাসাধ্য বোধগম্য করা হইয়াছে। তালিকাগুলিও যথাসম্ভব ইদানীন্তন করিয়াছি।

১লা আগষ্ট
১৯৫৯

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোলের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এই সংস্করণে যতদূর সম্ভব তালিকাগুলি ইদানীন্তন করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যিক বিবরণের পুস্তকাদি আবশ্যকমত সংগ্রহ করা সুসাধ্য নহে। পৃথিবীর সাংখ্যিক বিবরণের হিসাব যতদূর পর্যন্ত বাহির হইয়াছে, হয়ত ভারতবর্ষের ততদূর বাহির হয় নাই ;—আবার ভারতবর্ষেরই কৃষি-বিবরণ যতদূর পাওয়া যায়, হয়ত খনিজদ্রব্যের সাংখ্যিক বিবরণ ততদূর পাওয়া যায় না। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও সকলস্থলে সাংখ্যিক বিবরণ একেবারে ইদানীন্তন করা যায় নাই। সেজন্য অনুগ্রাহকবর্গ এই অনিচ্ছাকৃত দোষ মার্জনা করিবেন। ইতি—

৮ই এপ্রিল
১৯৬৩

গ্রন্থকার

সূচীপত্র
প্রথম খণ্ড
(নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড

(একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী)

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

 পৃষ্ঠা

উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল

প্রথম খণ্ড

[নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য]

উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল

প্রথম পরিচ্ছেদ

(১)

মানুষ ও তাহার আবেষ্টন

ভূগোল ঃ—গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভূগোল-শাস্ত্রের সংজ্ঞার যেরূপ মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয় আর কোন শাস্ত্রেরই হয় নাই। পূর্বে পৃথিবীর উপরিস্থ সাগর, উপসাগর, নদী-হ্রদ-পর্বতাদি, দেশ ও মহাদেশ,—এবং তাহার অধিবাসিবর্গ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ যে-শাস্ত্রে লিখিত হইত, তাহাকেই বলা হইত ভূগোল-শাস্ত্র। কিন্তু ভূগোলের এই সংজ্ঞা কোন ভৌগোলিকই এখন আর স্বীকার করেন না। এক্ষণে, মানুষের বাস হিসাবে পৃথিবীর যে-উপযোগিতা,—এবং মানুষের জীবনযাত্রার উপরে তাহার চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে-প্রভাব,—তাহার বিবরণ যে-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাকেই বলে ভূগোল-শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের সহিত তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশের (Physical environment) যে নিকট সম্বন্ধ,—তাহার বর্ণনা,—এবং তাহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের যে-প্রভাব,—তাহার বিবরণ,—যে-শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাকেই বলে ভূগোল-শাস্ত্র। এই জন্য ভূগোল-শাস্ত্রকে বলা হয় কারণ-নির্ভর (causal) শাস্ত্র, অর্থাৎ এই শাস্ত্র শিখিলে বুঝিতে পারা যায়, কোন্ কারণ বা আবেষ্টনের প্রভাবে মানুষের জীবন কিরূপভাবে গঠিত হইতেছে।

কিন্তু মানুষের জীবনধারা তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে গঠিত হইলেও তাহার মধ্যে সময়ে-সময়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, প্রকৃতি মানুষের সম্মুখে নানা সম্ভাবনাযুক্ত পরিবেশ তুলিয়া ধরে, মানুষ উহা হইতে তাহার নিজের শক্তি অনুসারে তাহার পক্ষে যে-পরিবেশ অনুসরণীয় তাহাই মাত্র গ্রহণ করে। সেইজন্য একই পরিবেশে বিভিন্ন জীবনধারাও সম্ভব।

আমরা জানি শীতপ্রধান ইউরোপের, এবং গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার ও ভারতের মানুষের অশন, বসন, ভূষণ ও জীবনযাপনের মধ্যে কত পার্থক্য! হিমালয়-অঞ্চলের পার্বত্য জাতির দৈহিক গঠন, ও আর্থনীতিক জীবনের সহিত ভারতের সমতল প্রদেশের লোকের দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রার সাদৃশ্যের কি বিপুল অভাব! বঙ্গদেশের লোক যে-পরিবেশে বাস করে সেখানে ধান্য প্রধান কৃষিদ্রব্য। সেজন্য বাঙ্গালী চাউল-ভোজী। কিন্তু পশ্চিম-ভারতের পরিবেশে গম প্রধান কৃষিদ্রব্য। তাই, সেখানকার লোক গম-ভোজী। তুন্দ্রাভূমিতে কৃষিকার্য অসম্ভব। সেজন্য, সেখানকার লোকগুলিকে জীবন-ধারণের জন্য স্থানীয় জীবজন্তুর উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং প্রধানতঃ তাহারা শিকারী। নিরক্ষীয় বনপ্রদেশে মানুষ প্রধানতঃ শিকারী, কিন্তু ক্রমশঃ নিজ শক্তি প্রভাবে সে কখনও হয় কৃষিজীবী, আবার কখনও হয় শিল্পী। উত্তর-আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে প্রেইরি অঞ্চলের পশ্চিমে রকি পর্বতের পূর্বদিকের সানুদেশে যে "উচ্চ সমতলভূমি" (The Great Plateau) নামে মালভূমি আছে, সেস্থানে কৃষিকার্য সম্ভব নহে—সেজন্য উহা প্রধানতঃ পশুচারণভূমি (ranching ground)। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ অংশের জলবায়ুতে ও মাটিতে কৃষিকার্য সম্ভব নহে, পশুপালনও সম্ভব নহে, তাই সেখানকার "ইণ্ডিয়ান" জাতি প্রধানতঃ শিকারী—পার্শ্ববর্তী সমুদ্র হইতে মৎস্য, ও বন হইতে পশু শিকার করে,—মৎস্য, পশু ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে, গাছের ছাল বা পশুচর্ম পরিধান করে, গাছের ছালে নৌকা প্রস্তুত করে, গাছের কাঠ দিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু কলিকাতার মত সহরে যে-আবেষ্টন, তাহাতে মানুষের জীবন-ধারণের বহু দ্বার উন্মুক্ত। এখানে জীবন-গঠনের নানা উপাদান বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। তাই এখানে কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা শিল্পী, কেহ স্বর্ণকার, কেহ তন্তুবায়, কেহ চর্মকার, কেহ বা কুম্ভকার;—এখানে মানুষের শক্তি অনুসারে সে নানা-প্রকার অর্থপ্রসূ বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। এইস্থানে বলা আবশ্যক,—ভূগোল শাস্ত্রে শিল্পসৃষ্টি, খনিতত্ত্ব, কৃষি, আরণ্যবিদ্যা, পশুপালন, মৎস্য-ব্যবসায়, পরিবহন, এবং দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ-সংস্পৃষ্ট বৃত্তিমাত্র আলোচনীয়;—ডাক্তারি, শিক্ষকতা, কেরাণীগিরি ও তদনুরূপ বৃত্তির আর্থনীতিক ভূগোলে কোন স্থান নাই।

উপরে লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল,—ভূগোল-শাস্ত্র দুইটি প্রধান বিষয় অবলম্বনে রচিত। উহাদের একটি—**মানুষ**, এবং অপরটি—**আবেষ্টন**। আরও একটি বিষয় জানা গেল, মানুষের জীবনযাত্রা **সাধারণতঃ** তাহার আবেষ্টনের প্রভাবে

গঠিত হয়। তবে কি যে-আবেষ্টনে যে-মানুষের জন্ম তাহার জীবনযাত্রা চিরজীবন সেই আবেষ্টনের উপযোগী একই রূপ থাকিবে? এবং কোন এক আবেষ্টনের যুগযুগান্তের মানুষ একই জীবন-পথে চলিবে? না, তাহা নহে। নিম্নে ইহার আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষ পরিবর্তনশীল জীব। তাহাদের আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি, ও আর্থনীতিক প্রচেষ্টার নিত্যই পরিবর্তন ঘটিতেছে;—তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে নিত্যই নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, ও তাহা দূরীকরণের জন্য নিত্য-নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং মানবজাতি গতিশীল ও উন্নতিশীল জীব। বর্তমানকালে তাহাদের উন্নতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে।

আবেষ্টন হিসাবে,—তৃণভূমি, বনভূমি, পর্বত, হ্রদ, সমুদ্র, উপকূল, সমতলভূমি—এই সকলই আবেষ্টনের অন্তর্ভূত। প্রকৃতপক্ষে, আবেষ্টন বলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু আজ যেখানে তৃণভূমি বা বনভূমি, কাল ত সেখানে কৃষিভূমি দেখিতে পাওয়া যায়,—তখন তৃণভূমি ও বনভূমির স্বাভাবিক জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পর্বত বা পাহাড় কালক্রমে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হয়। কোথাও আগ্নেয় পর্বত থাকিলে তাহার উৎপাতে লাভা, ভস্ম প্রভৃতি নির্গত হইয়া সন্নিহিত ভূমির উর্বরতা সাধন করে। কোথাও হ্রদ থাকিলে হয় তাহা মজিয়া যাইতেছে, কোথাও তাহার আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। সমুদ্রগর্ভে স্থানে-স্থানে দ্বীপাবলির সৃষ্টি হইয়া উহা মনুষ্য-বাসের উপযোগী হইতেছে। সমুদ্রোপকূলে কোন-কোন অংশ কোথাও বসিয়া যাইতেছে। আবার আজ যাহা উর্বরা সমতলভূমি, কাল তাহা বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিনিয়তই এইরূপ পরিবর্তন চলিতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের বাসস্থান যে এই পৃথিবী—সেখানে নূতন-নূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহা হইলে **মানুষের আবেষ্টনও পরিবর্তনশীল।**

যদি আবেষ্টনের প্রভাবে মানুষের জীবনধারা গড়িয়া উঠে, এবং মানুষ ও আবেষ্টন—দুইই পরিবর্তনশীল হয়, তবে মানুষ ও আবেষ্টনের মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ তাহাতেও পরিবর্তন ঘটে। এই জন্য যে-বিজ্ঞানে এই গতিশীল মানুষ ও আবেষ্টনের বিষয় বর্ণিত আছে, সেই ভূগোল-বিজ্ঞানকে বলা হয় **গতিশীল** বা **উন্নতিশীল** (dynamic) **বিজ্ঞান।**

আবেষ্টনের উপর মানুষের প্রভাবঃ—আবেষ্টন যেমন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, মানুষও তেমনি আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ

পৃথিবীপৃষ্ঠে কেবল স্থাণু দর্শকমাত্র নহে। তাহার প্রচুর শারীরিক শক্তি আছে, তাহার উর্বর মস্তিষ্ক আছে, তাহার সৃষ্টিশক্তিও সুপ্রচুর। সুতরাং সে যে-পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সহজেই তাহার উপযোগী করিয়া লয় এবং সেখানকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করিয়া সুযোগগুলির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে। কেবল তাহাই নহে, সম্ভব হইলে সে আবেষ্টনকেই পরিবর্তন করিয়া নিজের সুবিধার জন্য নূতন আবেষ্টনের সৃষ্টি করে। এই নূতন আবেষ্টনই শেষে পুরাতন আবেষ্টনের অংশীভূত হইয়া যায় এবং মানুষও এই নবগঠিত পরিবেশ-মত নিজের জীবনধারা গঠিত করিয়া লয়। মনুষ্যকৃত এই আবেষ্টনও ধীরে-ধীরে, হয়ত মানুষের অজ্ঞাতসারেই, পরিবর্তিত হইতেছে ও মানুষের সৃষ্টিশক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম-পাঞ্জাব এককালে মরুবৎ ছিল, মানুষ এখানকার নদীগুলি বাঁধিয়া, উহা হইতে খাল কাটিয়া বহুদূর লইয়া গিয়া ঐ মরুবৎ স্থল শস্যশ্যামল করিয়াছে। লায়ালপুর এককালে এই অঞ্চলে একটি গ্রামমাত্র ছিল। এক্ষণে ইহা একটি বাণিজ্যবহুল জনাকীর্ণ স্থান। দামোদর নদের ও তাহার উপনদীগুলির উপর বাঁধ বাঁধিয়া জলাশয় নির্মাণ করিয়া বন্যাভয় বিদূরিত করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ছোটনাগপুরের এই নদীর অববাহিকাস্থিত জমিতে জলসেচন করিয়া শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এবং বিদ্যুৎশক্তি প্রজনন দ্বারা নূতন-নূতন শিল্পসৃষ্টি সম্ভব করা হইয়াছে। সুতরাং এই নূতন আবেষ্টনে মানুষের জীবনধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে।)

আবেষ্টন কি ভৌগোলিক নিয়ন্তা (Geographical Control), কিংবা ভৌগোলিক প্রেরণা?—(কেহ-কেহ বলেন আবেষ্টন স্বাধীনভাবেই মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করে। তাই, তাঁহারা আবেষ্টনকে বলেন **ভৌগোলিক নিয়ন্তা**।) (কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (আবেষ্টন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে, কিন্তু মানুষ নিজ শক্তিবলে তাহা হইতে অসুবিধাগুলি পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাগুলি গ্রহণ করে, এবং আবশ্যক হইলে আবেষ্টনকেই পরিবর্তিত করিয়া নূতন আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লয়, অর্থাৎ সে নিজের আবেষ্টনের মধ্যে যে-প্রেরণা লাভ করে, তাহা হইতে নিজের কর্মধারা গঠিত করে। এই জন্য কেহ-কেহ বলেন, আবেষ্টন মানুষের জীবনধারার নিয়ন্তা নহে, তাহার **ভৌগোলিক প্রেরণা**।)

এক্ষণে সংক্ষেপে আবেষ্টনের অঙ্গগুলির আলোচনা করা যাইতেছে :—

প্রাকৃতিক আবেষ্টনের অঙ্গ

৬. (ক) **আবেষ্টন** :—আবেষ্টন বলিতে প্রধানতঃ প্রাকৃতিক আবেষ্টনের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু মনুষ্য-বসতি (Population), ধর্ম (Religion), রাষ্ট্ররূপ (Political

Organisation) প্রভৃতি অ-প্রাকৃতিক ও অ-ভৌগোলিক কয়েকটি আবেষ্টনও মানুষের জীবনধারা, তাহার রীতি-নীতি, ও কর্মপ্রবাহ-নিরূপণে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে ইহাদের উল্লেখ করা ও বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(ক) **প্রাকৃতিক আবেষ্টন :**—(১) অবস্থিতি (Location), (২) পর্বত (Mountains), (৩) নদী (River), (৪) তটরেখা (Coast-line), (৫) জলবায়ু (Climate), (৬) মৃত্তিকা (Soil), (৭) জীবজন্তু (Animals), (৮) উদ্ভিজ্জ (Vegetation), (৯) খনিজ দ্রব্য (Minerals).

(খ) **অ-প্রাকৃতিক আবেষ্টন :**—(১) লোক-বসতি (Population), (২) রাষ্ট্ররূপ (Political Organisation), (৩) সমাজশাসন (Social Organisation), (৪) ধর্ম (Religion) ।

(ক) প্রাকৃতিক আবেষ্টন

১। **অবস্থিতি** (Location, Situation or Position) :—কোন-কোন ভৌগোলিক বলেন, আবেষ্টনের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে "অবস্থিতি" সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, একে ত প্রায় অন্যান্য সমস্ত অঙ্গই ইহার সহিত কোন-না-কোনরূপে জড়িত, অন্যতঃ প্রত্যেক মানুষেরই সমগ্র জীবন, এমন কি তাহার দৈনিক জীবন, এবং প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক স্থানের উন্নতি ও অবনতি, প্রধানতঃ এই অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মনে কর, কাহারও কর্মস্থল তাহার বাসস্থান হইতে বহুদূরে,—প্রত্যহ পাঁচ মাইল হাঁটিয়া তাহাকে কর্মস্থলে পৌছিতে হয়, অথবা কিছু দূর হাঁটিয়া রেলগাড়ী ধরিয়া তৎপরে কিছু দূর রেলগাড়ীতে যাইলে তবে তাহার কর্মস্থল পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে তাহাকে প্রত্যহ অপেক্ষাকৃত সকাল-সকাল কর্মস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তাহার বাসস্থানের অবস্থিতির জন্যই তাহার দৈনিক জীবন এইরূপ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। আবার, সহর হইতে দূরে অবস্থান করার জন্যই তাহার জীবন-যাপন প্রণালীও সহরবাসীর জীবন অপেক্ষা অন্যরূপ হইয়া পড়ে। সহরে লোক ও গ্রামের লোক—তাহাদের স্থানীয় আবেষ্টনের প্রভাবে পৃথক্ শ্রেণীর লোক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অবস্থান-জনিত সুবিধা ও অসুবিধা :—যে-কোন দেশের বা যে-কোন স্থানের আর্থনীতিক সুবিধা ও অসুবিধা বহুল অংশে তাহার অবস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেমন—

(১) মহাদেশীয় দেশগুলি (Continental Countries) সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া সমুদ্রের সহিত তাহাদের সংযোগ থাকে না। সেজন্য তাহাদের বাণিজ্য-বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। সুইজর্লণ্ড ইউরোপ মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। এজন্য স্বভাবতঃ সুইজর্লণ্ডের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন অংশ ছিল না। এক্ষণে মনুষ্য-শক্তির প্রভাবে চারিদিকে রাজপথ ও রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার জন্য ইহার দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে,—তাহার খাদ্যাদি ও শিল্প-প্রয়োজনীয় কাঁচা দ্রব্যের আমদানি ও শিল্প-দ্রব্যের রপ্তানি, এমন কি তাহার নিজের উন্নতি, অবনতি, অস্তিত্ব, সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে,—তাহার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির তাহার উপর সহৃদয়, ও অনুগ্রহপূর্ণ নির্লিপ্ত ব্যবহারের উপর। অন্যথা, তাহার বহির্গমন-দ্বারগুলি রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কানপুর এখন একটি শিল্পসমৃদ্ধ স্থান। কিন্তু ইহার পূর্বের অবস্থা এরূপ ছিল না। পূর্বে ইহা প্রধানতঃ এই অঞ্চলের চর্ম-সংগ্রহের স্থান ছিল। বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য-বন্দরগুলির সহিত ইহার সাক্ষাৎ-ভাবে ও সহজভাবে কোন সংযোগ ছিল না। সেজন্য তখন ইহার বাণিজ্য-বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু যেই মাত্র রেলপথযোগে একদিকে ইহা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের সহিত, অন্যদিকে ঝাঁসি রেলপথ দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের সহিত যুক্ত হইল, অমনি ইহার আবেষ্টন বদলাইয়া গেল, এবং নূতন আবেষ্টনে কানপুর একটি বড় শিল্প-সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধ স্থানে পরিণত হইল।

(২) সমুদ্রতটবর্তী (Littoral) **স্থানগুলি**-তে বাণিজ্যের সুবিধা স্বভাবতঃ থাকেই। আবার, সেগুলি যদি আন্তর্জাতিক প্রধান বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত হয়, তবে তাহাদের বাণিজ্যে সবিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বোম্বাই, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির এইজন্য উন্নতি হইয়াছে।

(৩) দ্বীপ্য দেশগুলি অর্থাৎ দ্বীপের মত যাহাদের চারিদিকে জল, তাহাদের জলবায়ুর তীব্রতাও যেমন কম থাকে, বাণিজ্যে উন্নতি করাও তাহাদের পক্ষে সেইরূপ সহজসাধ্য হয়। আবার, সাধারণতঃ সেখানকার লোকেরা মৎস্য-শিল্পে, ও নৌ-বাহন কার্যে দক্ষতা লাভ করে। ইহা ছাড়াও অবস্থিতির জন্য কোন-কোন দেশ আরও অনেক সুবিধা লাভ করে। গ্রেট্ বৃটেন ও জাপান ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(ক) গ্রেট্ বৃটেন স্থল-গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। সেজন্য ইহা পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং বাণিজ্যসূত্রে সহজেই পৃথিবীর শিল্পপ্রধান ও লোকবহুল দেশগুলির সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছে। সেজন্য ইহার প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তিও বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ইহা নানাবিষয়ে

সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। (খ) ইহা চারিদিকে জলবেষ্টিত বলিয়া বহিঃশত্রু হইতে ইহার আক্রমণের আশঙ্কা অত্যন্ত কম। সেজন্য এখানকার অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত-মনে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি করিতে পারে। (গ) ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, এবং সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া ইহার জলবায়ুর শীতাতপের তীব্রতা কখন বেশী হইতে পারে না। সেজন্য এখানকার লোকের শরীর শীঘ্র পরিশ্রান্ত হয় না ও কর্মক্ষমতা বেশী হইয়াছে। এজন্য কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প-কারখানায় ইহারা নিয়মিত কাজ করিতে পারে। গ্রেট্ বৃটেনের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, নির্ধারিত কার্য নিয়মিত সময়ে সম্পাদন করাই তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব। দেশের অবস্থিতি-জনিত জলবায়ুই ইহার কারণ। (ঘ) মহীসোপানের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার চারিদিকে জল অগভীর। এজন্য মৎস্য-শিল্পে ইহা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। (ঙ) গ্রেট্ বৃটেন প্রাচীনকালে ইউরোপের স্থলভূমিরই অংশ ছিল। কালক্রমে ইহার কতকাংশ সমুদ্রমধ্যে বসিয়া গিয়াছে, এবং গ্রেট্ বৃটেন বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বসিয়া যাওয়ার ফলে গ্রেট্ বৃটেনের উপকূলরেখা বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে, এবং সেখানে বহুসংখ্যক বন্দরের সৃষ্টি হইয়াছে। (চ) এইরূপ দ্বীপ্য অবস্থিতি ও বন্দরের জন্য ইহার অধিবাসিগণ নৌ-বিদ্যায় ও জলযুদ্ধে সুদক্ষ হইয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাবিক-জাতিতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে।

জাপানও গ্রেট্ বৃটেনের মত একটি দ্বীপ। সেজন্য ইহাও গ্রেট্ বৃটেনের মত পৃথিবীর অন্যতম শিল্প-বাণিজ্য-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ নাবিক-জাতি।

(৪) এইরূপ কোন দেশ যদি **পর্বত ও নদী-বেষ্টিত** থাকে, তবে তাহারও বহিঃশত্রু হইতে আক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে, এবং অন্তঃশত্রুরাও বহিঃশত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে পারে না। ইহাতে নিশ্চিন্তভাবে দেশের উন্নতি করা সম্ভব হয়। আবার, কখনও যুদ্ধাদি হইলে যুদ্ধান্তে দেশের সীমা-পরিবর্তনের আশঙ্কা কম থাকে। ইহাতে দেশের আর্থনীতিক পরিবর্তন খুব বেশী হইতে পারে না, এবং কিছু হইলেও শীঘ্র তাহার সমাধান সম্ভব হয়। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক সীমার অভাব। সেজন্য এই দুই দেশেই সীমান্তবর্তী লোকেরা সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে বাস করে এবং নিজেদের আর্থনীতিক উন্নতির কোন চেষ্টাই করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মদেশ একটি প্রধানতঃ পর্বত-বেষ্টিত দেশ। সেজন্য ইহার আর্থনীতিক ব্যাপারে অন্য দেশের প্রভাব কম।

অবস্থিতির সুবিধার পরিবর্তন:—আবেষ্টন হিসাবে অবস্থিতি-জনিত যে-সকল সুবিধা থাকে আবেষ্টনের পরিবর্তনে অবস্থিতির ঐসকল সুবিধারও পরিবর্তন

ঘটে। মধ্যযুগে,—যখন পশ্চিম-গোলার্ধের আমেরিকা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় নাই,—যখন ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এশিয়ার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত স্থানই সমগ্র পৃথিবী বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল,—তখন এশিয়ার উপর এশিয়া মাইনর পর্যন্ত স্থানে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে স্থলবাণিজ্যই প্রধান ছিল, এবং সাধারণতঃ উষ্ট্রই ইহার বাহন ছিল। এই সুবৃহৎ অঞ্চলের মধ্যে ভেনিস ও জেনোয়া এরূপভাবে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল যে, ইহারা ইউরোপ ও এশিয়ার দুই অংশের বাণিজ্যের সংযোগ সাধন করিত। তাই মধ্যযুগে ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু যখন ভাস্কো-ডা-গামা ও কলম্বস জলপথ আবিষ্কার করিল, আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন সমুদ্র-বাণিজ্যই প্রবল হইল, স্থলবাণিজ্য লুপ্তপ্রায় হইল, এবং সেইজন্য ভেনিস ও জেনোয়ার অবনতি ঘটিল।

অবস্থিতি ও জলবায়ু:—কোন দেশের জলবায়ু প্রধানতঃ তাহার অবস্থিতির উপর নির্ভর করে, এবং তদনুসারেই সেখানকার লোকের কর্মশক্তি নিরূপিত হয়,—

(১) **হিমমণ্ডল** (Cold Zone)—মেরুপ্রদেশ (৯০° উ. ও দ.) হইতে ৬৬½° উ. ও:দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত হিমমণ্ডল। পৃথিবীর এই অঞ্চল তাহার অবস্থিতির জন্য বরফাচ্ছন্ন। উত্তর হিমমণ্ডলের মধ্যে **তুন্দ্রাভূমি** অবস্থিত। এখানে বারমাসই শীত, বরফের জন্য গাছপালা জন্মে না, এবং কৃষিকার্যও হয় না। তাই এখানকার লোকে শিকারের উপর নির্ভর করে, এবং নিজেদের জীবন এই অঞ্চলের অবস্থিতি অনুসারে গঠিত করিয়া লয়।

দক্ষিণ মেরুবিন্দুর চতুর্দিকে বরফাবৃত পার্বত্য প্রদেশ। ইহা মনুষ্যবর্জিত।

(২) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (Temperate Zone)—৬৬½° উ. ও দ. অক্ষরেখা হইতে ৩০° উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত। অবশ্য সূক্ষ্মবিচারে ৬৬½° উ. ও দ. অক্ষরেখা হইতে ৪৫° উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত অংশকে শৈত্যের অপেক্ষাকৃত আধিক্যহেতু হিমশীতোষ্ণ, এবং ৪৫° উ. ও দ. অক্ষরেখা হইতে ৩০° উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত অংশকে উত্তাপের অপেক্ষাকৃত আধিক্য ও শৈত্যের অপেক্ষাকৃত ন্যূনতাহেতু উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল বলে। কিন্তু এস্থলে সাধারণভাবে **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** নামে ইহাদের একত্র বিচার করা যাইতেছে। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া এখানকার লোক পরিশ্রমী, নিরলস ও কর্মপটু। প্রধানতঃ পৃথিবীর এই অংশে অবস্থিত অঞ্চলেই শিল্প-বাণিজ্য বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এই অঞ্চলই পৃথিবীর শিক্ষা-বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত অঞ্চল। প্রাচীনকালে যখন মানুষের জীবনযাপন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং

এখনকার অপেক্ষা অকৃত্রিম ছিল, তখন এই অংশেই পৃথিবীর প্রাচীনতম বাবিলনীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা জাগিয়া উঠিয়াছিল (১৫ পৃ. দেখ)।

উদ্ভিজ্জ হিসাবে এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মেরুপ্রদেশের দিকের হিমশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতের প্রভাব বেশী, উত্তাপ কম। সেজন্য সেখানকার বৃক্ষের শীতকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে না। কিন্তু বিষুবরেখার দিকের উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে যেখানে শীতের প্রকোপ কম ও উত্তাপ বেশী, সেখানে প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে।

এই অঞ্চলের মেরুপ্রদেশের দিকে শীত বেশী বলিয়া সেখানে আরমাইন, সেব্‌ল্, খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি যে-সকল জন্তু বাস করে, তাহাদের গাত্র লোমশ,—ইহাদের মধ্যে অনেক জন্তুর লোম শীতকালে অধিকতর ঘন ও লোমশ হয়।

(৩) **ক্রান্তীয় মণ্ডল** (Hot Zone) বা **বিষুবরৈখিক অঞ্চল** (Equatorial Region) বিষুবরেখার উভয় দিকে ৩০° উ. ও দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত অংশে অবস্থিত। এই অঞ্চলে গরমও বেশী, বৃষ্টিপাতও বেশী। সেজন্য এ-অঞ্চলে চিরশ্যামল গভীরতম বনের সৃষ্টি হইয়াছে। একারণে এখানকার লোক স্বভাবতঃ প্রথমে ছিল বনবাসী শিকারী। ক্রমে-ক্রমে বনের কাঠ লইয়া ব্যবসা করে। বন আরও পরিষ্কৃত হইলে তাহারা কৃষিকার্য ও শিল্পকার্য করিতে থাকে। এই বনে হিংস্র জন্তু বাস করে। এই মণ্ডলের মধ্যভাগে বৃষ্টির অভাববশতঃ তৃণ জন্মে ও সেই সকল স্থানে তৃণভোজী পশু বাস করে।

সুতরাং পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জ এবং জীবজন্তুর উপর তাহার প্রভাব সেইস্থানের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে।

অবস্থিতি ও শিল্পবাণিজ্য—(১) কোন স্থানে **লোকবসতি** থাকিলে, বিশেষতঃ লোকবসতি বেশী হইলে, সেখানে শিল্পসৃষ্টি হইবেই। কারণ মানুষের জীবনযাপনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দরকার। ইহা শিল্পসাপেক্ষ।

(২) কোন স্থানে বা কোন স্থানের সন্নিকটে **বিক্রয়-স্থল** (market) থাকিলে সেখানে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়। চারিদিকের সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত কোন 'মহাদেশীয় স্থানে' শিল্প-সৃষ্টি আশা করা যায় না। কিন্তু, এরূপ স্থলে যদি কোন ভাল বিক্রয়-স্থল থাকে, অথবা, শিল্পদ্রব্যগুলি বাহিরের বিক্রয়-স্থলে লইবার পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে, তবে সেখানেও শিল্প-উৎপাদন সম্ভব হয়।

(৩) কোন স্থান যদি এরূপভাবে অবস্থিত হয় যে, তাহার চারিদিকে পরিবহনের জন্য উপযুক্ত জলপথ, বা রাজপথ, বা রেলপথ, বা আকাশপথ থাকে, তবে সেস্থানে শিল্পসৃষ্টি হইয়া থাকে। এখানে যদি সকল রকম পরিবহন-ব্যবস্থা থাকে, তবে শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে।

(৪) কোন স্থানে যদি সুলভ কর্মদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়, তবে সেখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

(৫) কোন স্থানে যদি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে সেখানে শিল্প গড়িয়া উঠে। এই কারণে দক্ষিণ-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশ শিল্পসমৃদ্ধ স্থান।

(৬) কোন স্থানে বা কোন স্থানের সন্নিকটে যদি কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি শিল্পশক্তি উত্তোলিত হয়, বা জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের সুবিধা থাকে, তবে সে-সকল স্থান শিল্প-প্রধান হইয়া পড়ে। জামসেদপুর, বার্ণপুর প্রভৃতি স্থানের অদূরেই কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া সে-সকল স্থানে খুব বড়-বড় শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। দামোদর উপত্যকায় এক্ষণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে ও উহা শিল্পকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সুইজর্লণ্ডে কয়লার অভাব। সেখানে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করিয়া শিল্প-সৃষ্টি হইয়াছে।

(৭) কোন স্থানে শিল্পসৃষ্টির উপযোগী **"কাঁচা মাল"** সহজপ্রাপ্য হইলে সেখানে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

(৮) কোন স্থান বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত হইলে সহজেই বাণিজ্যস্থান হইয়া পড়ে। গ্রেট্ বৃটেন, বেলজিয়ম, সিংহল এইজন্য বাণিজ্যস্থান হইয়াছে। শিল্পোন্নতির কোন কারণ না থাকিলেও কেবল বাণিজ্য-পথের উপর অবস্থিত বলিয়া শিল্পমুখী স্থান হইয়াছে, এরূপ স্থানেরও অভাব নাই। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে পিট্‌স্‌বার্গ একটি শ্রেষ্ঠ লৌহশিল্পপ্রধান স্থান। কিন্তু ইহার লৌহ হ্রদ-অঞ্চল হইতে জলপথে ক্লীভল্যাণ্ড পর্যন্ত আসিয়া স্থলপথে পিট্‌স্‌বার্গে আসে। লৌহের এই যাত্রাপথে ক্লীভল্যাণ্ডে পরিবহন-ব্যবস্থা বদলাইতে হয়। সেজন্য ক্লীভল্যাণ্ড ক্রমশঃ একটি লৌহশিল্পের প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

(৯) শিল্পপ্রধান বিখ্যাত স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত স্থানও ক্রমশঃ শিল্পমুখী হইয়া উঠে। জার্মানি ও ফ্রান্সের নিকটে অবস্থিত ইতালী এই কারণে শিল্প-উৎপাদন-স্থান হইয়াছে। জার্মানির আবহাওয়ায় সুইজর্লণ্ড শিল্পে উন্নত।

কি-কি কারণে কোন্ স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহা উপরে বলা হইল। কিন্তু কোন স্থান যদি এরূপ স্থানে অবস্থিত হয় যে, সেখানে উপরি-উক্ত অনেক-গুলির সমাবেশ হইয়াছে, তাহা হইলে সে-স্থান অবিলম্বে ও অনায়াসে বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে পরিণত হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই-সকল সুবিধা বহুলাংশে বর্তমান। তাই ঐ দুই স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান স্থান। আফগানিস্তানে শিল্পসহায়ক কারণের বিশেষ অভাব। সেজন্য সেখানকার শিল্পকার্য নগণ্য।

অবস্থিতিজনিত অসুবিধাঃ—অবস্থিতিজনিত কারণে কোন স্থানের যেমন সুবিধা হয়, তেমনি অসুবিধাও হইয়া থাকে। কোন দেশের সীমান্ত প্রদেশ যদি সুরক্ষিত না হয়, যদি কোথাও শিল্পবাণিজ্যের কোন সুবিধা না থাকে, যদি কোন স্থান উন্নত সভ্যস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে সেরূপ স্থানের উন্নতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিব্বতের অবস্থিতি,—পর্বত-সমাবেশে তাহার চারিদিকের সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছেদ,—তাহার উন্নতির অন্তরায়,—এই অবস্থিতির জন্যই সে শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারিতেছে না।

আদর্শ অবস্থিতি—উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বলা যায়, কোন দেশ যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত থাকে, সেখানকার জলবায়ু যদি পরিশ্রমের অনুকূল হয়, সেখানে যদি প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করা যায়, শিল্পউৎপাদনের কাঁচামাল ও শিল্পশক্তির যদি অপ্রতুলতা না হয়, যদি উহা বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত হয়, দেশের অভ্যন্তরে চলিবার ও বাহিরে যাইবার পরিবহন-ব্যবস্থা যদি সুপ্রচুর হয়, যদি ঐ স্থান সমুদ্রতট হইতে দূরবর্তী না হয়, তবে সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অবস্থিতির নানামুখী প্রভাবঃ—মানুষের চরিত্র, তাহার জীবযাত্রার রীতি, প্রকৃতি ও মান, এবং দেশের উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের উপর, "অবস্থিতির" প্রভাব এত বেশী যে, এক দেশের লোক যদি অন্য জলবায়ুর দেশে বাস করে, তবে তাহার রীতি ও প্রকৃতি এমন কি আকৃতিও পরিবর্তিত হইয়া যায়। এইরূপ একদেশের গাছপালা অন্য দেশে জন্মে না, জন্মিলেও তাহার পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্গালা দেশে কমলালেবু, আখরোট, আঙ্গুর প্রভৃতি জন্মে না,—বিহারে, উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে নারিকেল গাছ জন্মে না। অবস্থিতি-মাহাত্ম্যেই ইহা সম্ভব।

২। **পর্বত** (Mountains)—পার্বত্য আবেষ্টন স্বভাবতঃ মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে। কারণ, পর্বতের উপর বাসোপযোগী সমতলভূমি বিরল, কৃষির উপযুক্ত জমিও দুর্লভ, অল্প জমি কোন অংশে পাওয়া গেলেও তাহাও সাধারণতঃ কঙ্করময় ও অনুর্বর। পার্বত্য অঞ্চলে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নহে। যদি কোন প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিদেশে চালান দেওয়াও কষ্টকর। এরূপ স্থলে রেলপথ ও রাজপথ নির্মাণ করারও বহু প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য এ-অঞ্চলে লোক বাস করিলেও অতি অল্প সংখ্যায় বাস করে, এবং উপত্যকাভূমিতেই বাসস্থান নির্মাণ করে। কাশ্মীর পার্বত্য প্রদেশ বলিয়া সেখানে পর্বতের উপত্যকাতেই মানুষ বাস করে। আবার ভাষা, লোকবসতি, শিক্ষা এবং আচার-ব্যবহার বিস্তারের যত রকম প্রতিবন্ধক আছে, পর্বত তাহাদের অন্যতম। হিমালয় পর্বতের উভয় পার্শ্বে যে-সকল দেশ অবস্থিত, সে-সকল দেশে এইগুলির পার্থক্য

অত্যন্ত বেশী। এইরূপ দুই দেশের লোকের জীবনযাপন-প্রণালীর মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বতের উপরিস্থ নদীগুলি খরস্রোতা হয়। সেজন্য সেগুলি নাব্য হয় না এবং তাহাদের দ্বারা সাধারণতঃ পরিবহনের বিশেষ সুবিধা হয় না।

কিন্তু তথাপি পার্বত্য প্রদেশে মানুষ বহুকাল বাস করিতেছে. এবং সমতলক্ষেত্রে যত লোকবৃদ্ধি ঘটিতেছে, ততই মানুষ পর্বতের উপরও বাসের স্থান নির্মাণ করিতেছে। কখনও-কখনও স্বাস্থ্যলাভের আশায়ও মানুষ পর্বতে বাস করিয়া থাকে।

উচ্চ পর্বতের উপরিভাগ উচ্চতার জন্যই শীতল। গ্রীষ্মে আরাম পাইবার জন্য উষ্ণ ও উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের পর্বতের উপর মানুষ অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে। আবার পর্বতের উপরে অনেক স্থান স্বাস্থ্যকর। সেজন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতাল, প্রভৃতি স্থানে লোকে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য গ্রীষ্মকালে যায়। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্মচারিগণের গ্রীষ্মে বাস করিবার জন্যও এইসকল স্থানে বাসগৃহ আছে। এইরূপে এইসকল স্থান ক্রমশঃ সহরে পরিণত হয়।

বিষুবরৈখিক অঞ্চলের সমতলভূমিতে গ্রীষ্মের কঠোরতা বেশী বলিয়া, কখনও-কখনও সেরূপ স্থলে পর্বত পাইলে মানুষ পর্বতের উপর চিরস্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর দেশ বিষুবরেখার উপর অবস্থিত বলিয়া অত্যন্ত গরম হওয়া উচিত। কিন্তু পর্বতের উপর জলবায়ু ঠাণ্ডা,—যেন চিরবসন্ত বিরাজিত। তাই এদেশের লোকসংখ্যার প্রায় $\frac{3}{4}$ ভাগ পর্বতের উপরেই বাস করে।

কোন স্থানে উচ্চ পর্বত অবস্থিত হইলে জলসংপৃক্ত বায়ু তাহাতে প্রতিহত হইয়া উর্ধ্বগামী হয়। সেজন্য পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে (windward side) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে অবস্থিত দেশে উত্তম কৃষিকার্য হইতে পারে ও লোক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বঙ্গোপসাগর হইতে জলকণাবাহী বাতাস হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত বেশী এবং ইহা একটি ধনধান্যশালী দেশ।

মানুষ যখন পর্বতের উপর বাস করে, তখন সেখানে আধুনিক যন্ত্রে কৃষিকার্য সম্ভব না হইলেও প্রতিবাত পার্শ্বে পর্বতগাত্রে থাক (terrace) কাটিয়া শস্য রোপণ করে। মধ্য ইউরোপের পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে ওক, বীচ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এইসকল বৃক্ষের ফল শূকরের খাদ্য। সেইজন্য এই স্থানে **শূকরচারণ** হয়, এবং শূকরের মাংস বিদেশে চালান যায়। আবার কোথাও-কোথাও পর্বতের উপরের তৃণক্ষেত্রে **গোচারণ** হয়। সুইজলণ্ডের উপত্যকাভূমিতে লোক বাস করে। কিন্তু নিম্নভূমিতে স্থানাভাব বলিয়া পর্বতের উচ্চ অংশে তৃণভূমিতে পশুচারণ হয়, এবং এই উচ্চ স্থানেই এত পশুদুগ্ধজাত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় যে, তাহার দ্বারা দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পর্বতের উপর স্রোতস্বিনী নদী থাকিলে এক্ষণে তাহা অবলম্বন করিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে, এবং তাহাতে পর্বতোপরিই কোন-না-কোন স্থানে নানারূপ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। দার্জিলিং ও শিলং সহরে এইরূপ জলবিদ্যুৎ সাহায্যে শিল্পদ্রব্য-উৎপাদন হইতেছে।

বহু পর্বতের উপর খনিজ দ্রব্য বাহির হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেও আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাষ্ট্রে পর্বতের উপর খনি পাওয়া গিয়াছে। এইসকল খনি-অঞ্চলে কতক স্থায়িভাবে কতক অস্থায়িভাবে লোক বাস করিতেছে, খনিজদ্রব্য অবলম্বনে শিল্প সৃষ্টি করিতেছে ও নানা ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জন করিতেছে।

পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলিয়া সেখানে বনের সৃষ্টি হয়। এই বনের বৃক্ষ কাটিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে কাষ্ঠ-ব্যবসায় চলিতেছে। আবার পর্বতাঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য, কিংবা বরফাচ্ছন্ন উচ্চ পর্বতশীর্ষ হইতে বরফ গলিয়া পড়ে বলিয়া, স্থানে-স্থানে নদী জন্মে। এইসকল নদী শস্য-উৎপাদনে ও স্থানে-স্থানে শিল্পদ্রব্য-পরিবহনে সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং পাহাড়-পর্বত মানুষের উপনিবেশ-সংস্থাপনে ও অর্থপ্রসূ কর্মতৎপরতায় পরোক্ষভাবেও বিশেষ সাহায্য করে।

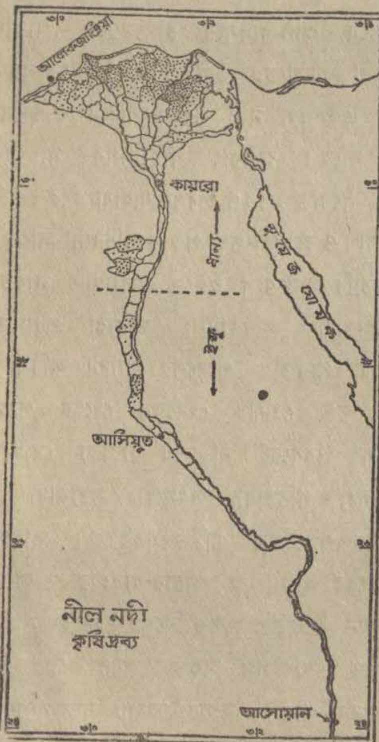
পর্বতের অধিবাসী।—পর্বতে স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই প্রকার অধিবাসী আছে। যাঁহারা স্বাস্থ্য লাভের জন্য বা গ্রীষ্মের অত্যধিক উত্তাপ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে যান, তাঁহারা অস্থায়ী অধিবাসী। তাঁহারা প্রধানতঃ সমতল প্রদেশে বাস করেন। কিন্তু যাহারা পার্বতীয় প্রদেশের আদিম অধিবাসী তাহারা উপত্যকাতেই বাস করে। এই দুই শ্রেণীর লোকের দেহের গঠন, রীতিপ্রকৃতি, আহার-বিহার প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই সবিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ীরা স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী, উৎসাহী, সত্যবাদী ও কর্মঠ। পার্বতীয় আবেষ্টনেই তাহাদের দেহ ও চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাহারা যেন বর্তমান জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন,—তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, তাহাদের ভাষা, ও তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী বর্তমান সভ্যতার যুগেও বিশেষ উন্নত হয় নাই। তাহারা ক্ষুদ্র বায়ুচলাচলহীন গৃহে বাস করে, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ভ্রমণ করে, এবং আদিম কালের অনুন্নত প্রথায় শস্য উৎপাদন করে। ইহারা ক্রমশঃ সভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া উন্নতি করিতেছে।

৩। নদী (Rivers)।—উপনিবেশ-সংস্থাপনে ও আর্থনীতিক উন্নতি-সাধনে নদীর উপকারিতা কোন অংশেই ন্যূন নহে। যে-দেশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, নদী মাতার মত সেই দেশের হিতসাধন করে। সেইজন্য নদীমাতৃক দেশ চিরদিনই সম্পৎশালী ও মনুষ্যবাসের উপযোগী।

দেশের উর্বরতা-সাধন, জলসেচন ও পরিবহন নদীর প্রধান কার্য।

নদীমাতৃক দেশ শস্যশ্যামল ও লোকবহুল হয়। কোন দেশের কোন অংশের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে উহা **পলিমাটির দ্বারা সে-স্থানের ভূমির উর্বরতা সাধন করে,** এবং সেখানকার মাটি আর্দ্র করে। সেইজন্য সে-স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গঙ্গা-ও ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা এই দুইটি নদীর জন্য উর্বর, শস্যশ্যামল ও লোকবহুল।

বৃষ্টিবিরল স্থানের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে সেখানে জলসেচন দ্বারা শস্য উৎপাদন করা সহজ হয়। নীল নদের বার্ষিক জলপ্লাবনে সাহারা মরুর এক অংশে পলি পড়িয়া তাহা উর্বর, শস্যশ্যামল ও লোকবহুল হইয়াছিল। এক্ষণে নীল নদ হইতে জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়া নীল-অববাহিকার আরও বহুদূর পর্যন্ত সাহারার অংশ শস্যপূর্ণ হইতেছে। পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাবের পঞ্চনদ-প্রবাহিত অংশ বৃষ্টির অভাবে মরুবৎ ছিল। পঞ্চনদ হইতে খাল কাটিয়া জলসেচন দ্বারা পশ্চিম-পাঞ্জাব এখন উদ্বৃত্ত শস্যের দেশ হইয়াছে।



১নং চিত্র।—নীলনদের উপত্যকায় সাহারার এক অংশে কৃষিকার্য।

পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে নদী খরস্রোতা হয়, সেখানে বাঁধ বাঁধিয়া **জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা** ও তদ্দ্বারা শিল্প সৃষ্টি করা যায়।

নদী-বাহিত দেশে পরিবহনের ব্যবস্থা সহজ হইতে পারে। নদীপথে সহজে, উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে প্রেরণ করা, এবং বিদেশ হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। এজন্য এসব দেশে শিল্প-বাণিজ্য সহজে গড়িয়া উঠে। অতি প্রাচীনকালে নদীই বাণিজ্যবিস্তারের প্রধান অবলম্বন ছিল। এক্ষণে বাণিজ্যকার্যে যত প্রকার পরিবহন-ব্যবস্থা আছে, জলপথে পরিবহনই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলভ।

নদী বা সমুদ্রতীর অবস্থিত কোন দেশের যদি নদী-বন্দরের উপযুক্ত স্থান থাকে, তবে সেই দেশের বাণিজ্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই ও কলিকাতা দুইটি বড় বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সমগ্র দেশের বাণিজ্যও ইহাদের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। তবে সব নদীই বাণিজ্য-বহনের উপযোগী নহে। যে-সমস্ত নদী বৎসরের কোন সময়ই জমিয়া যায় না, বা পলিমাটিতে মজিয়া যায় না,—যাহাতে সারা বৎসরই জাহাজ চলিবার উপযোগী জল থাকে,—যাহা স্রোতস্বতী এবং যাহার উপর কোথাও জলপ্রপাত নাই, সেইসকল নদীই বাণিজ্যবহনের উপযোগী। আফ্রিকার নদীর গতিপথে জলপ্রপাত আছে। এরূপ স্থলে নৌকা বা জাহাজ উচ্চ হইতে নিম্নে পড়িলে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে।

নদীতীরস্থ দেশ কৃষি ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া ধনশালী হইয়া উঠে, এবং তাহাতে দেশের অন্নচিন্তা বিদূরিত হয়। সেজন্য দেশের লোক **নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা** করিতে পারে। অতি প্রাচীনকালে যে-সকল স্থান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল, সেগুলি নদীতীরে অবস্থিত ছিল। বাবিলনীয় সভ্যতা তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর উপত্যকায়, মিশরীয় সভাতা নীল নদের তীরে, ভারতীয় (মহেঞ্জোদারো ও হারপ্পা) সভ্যতা সিন্ধুর উপত্যকায় ও চৈনিক সভ্যতা হোয়াং উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।



২নং চিত্র।—প্রাচীন সভ্যতার কতিপয় কেন্দ্র।

দেশ যদি নদীহীন হয়, অথবা দেশের নদী যদি নাব্য না হয়, তবে দেশের অধিবাসিগণ বিদেশের উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিতে পারে না। সেজন্য তাহারা অনুন্নত ও অসভ্য থাকিয়াই যায়। আফ্রিকার নদীগুলি জলপ্রপাত-প্রপীড়িত বলিয়া নাব্য নহে। তাই সে-দেশের লোক বহুকাল সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই। তাই তাহাদিগকে অসভ্য ও বর্বর এবং সে-দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হইত। কিন্তু এক্ষণে রেলপথ ও আকাশপথ ইত্যাদির

সৃষ্টি হওয়াতে দেশে নাব্য নদী না থাকিলেও সভ্য জগতের সহিত তাহাদের বহুদিন একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভবপর নহে।

৪। **তটরেখা** (Coastline)—পূর্বেই বলিয়াছি, সমুদ্রতটে অবস্থিত স্থানের বাণিজ্যবৃদ্ধি হয়। কিন্তু সমুদ্রতটে অবস্থিত হইলেই সকল স্থানের বাণিজ্যবৃদ্ধি বা আর্থনীতিক উন্নতি হয় না। সমুদ্রতীরস্থ স্থানের উন্নতি প্রধানতঃ স্থানীয় তটরেখার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

তটরেখা ভগ্ন ও অভগ্ন, এবং উচ্চ ও নিম্ন—এই দুইরূপে বিভক্ত করা যায়। যদি কোন দেশে বহুসংখ্যক উপদ্বীপ, সাগর ও উপসাগর থাকে, তবে সেই দেশের তটরেখাকে **ভগ্ন তটরেখা** বলা হয়। ভগ্ন তটরেখা দেশের উন্নতি-বিধানে বিশেষ উপযোগী। যদি তটরেখা ভগ্ন ও নীচু হয়, এবং ভগ্নস্থানগুলি গভীর, সুবিস্তৃত ও তরঙ্গক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত হয়, তবে সেইসকল স্থানে বন্দরের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাতে দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কোন ভগ্নস্থান দেশের মধ্যে বহুদূর প্রবেশ করে, তবে সেই পথে দেশের অভ্যন্তর হইতে সহজেই উৎপন্ন দ্রব্যাদি বন্দরে আনা যায়। যে-দেশে তটরেখা ভগ্ন, সে-দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং জলবায়ু ও কৃষিরও উন্নতি হয়। নিম্নে মহাদেশগুলির তটরেখার দৈর্ঘ্য এবং সুবিধা ও অসুবিধার বিচার করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, যে-দেশের তটরেখা যত ভগ্ন, সেই দেশের তটরেখা তত দীর্ঘ।

মহাদেশ	আয়তন (লক্ষ বর্গ মাইল)	তটরেখা (সহস্র মাইল)	তটরেখার মাইল প্রতি আয়তন
১। ইউরোপ	৩৭	২৬	১৪৩
২। উত্তর-আমেরিকা	৭৬	৩০	২৮৩
৩। অস্ট্রেলিয়া	৩০	৯	৩৩৩
৪। দক্ষিণ-আমেরিকা	৩৮	১৬	৪০৬
৫। এশিয়া	১৬৪	৩৬	৪৭২
৬। আফ্রিকা	১১১	১২	৯২০

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের ১৪৩ বর্গমাইল স্থানের লোক এক মাইল তটরেখা ব্যবহার করে। কিন্তু এশিয়ার ১ মাইল তটরেখা ব্যবহার করে ৪৭২ মাইলের অধিবাসীরা। সুতরাং ১ মাইল তটরেখা, এশিয়া অপেক্ষা ইউরোপে কম লোকে ব্যবহার করে। যে-দেশে অল্প আয়তনের মধ্যে কমসংখ্যক অধিবাসী তটরেখা ব্যবহার করিতে পারে, নিশ্চয়ই সে-দেশের

ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সহজসাধ্য হয়। এইজন্য ইউরোপের এরূপ উন্নতি হইয়াছে। ইহার তটরেখা ভাঙ্গিয়া-ভাঙ্গিয়া বহু স্থানে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য ইহার পূর্বভাগে রুশিয়ার পূর্বদিকের কিয়দংশ ব্যতীত কোন স্থানই সমুদ্রতীর হইতে ৫০০ মাইলের বেশী নহে।

তটরেখা হিসাবে ইউরোপের পরেই ক্রম স্থবিধাজনক মহাদেশ উত্তর-আমেরিকা। তার পরে ক্রমশঃ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা, এশিয়া ও সর্বশেষে আফ্রিকা। এজন্য বাণিজ্যে আফ্রিকার বহুদিন উন্নতি হয় নাই। এখন অন্য কারণে ক্রমশঃ হইতেছে।

ভগ্নতটরেখাযুক্ত দেশের যে কতদূর উন্নতি সম্ভব, গ্রেট্ বৃটেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রেট্ বৃটেনের তটরেখা এরূপ ভগ্ন, এবং সাগর, উপসাগর ইহার অভ্যন্তরে এতদূরে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহার কোন বড় সহরই সমুদ্রতীর হইতে ৭০ মাইলের বেশী দূরবর্তী নহে,—এখানে মাত্র ২০ বর্গমাইল আয়তনের অধিবাসী ১ মাইল তটের স্থবিধা ভোগ করে। স্থতরাং তটরেখা-হিসাবে গ্রেট্ বৃটেনের মূল ইউরোপ অপেক্ষা ১০ গুণ স্থবিধা। একারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে গ্রেট্ বৃটেন এত উন্নত। তাহার শিল্পদ্রব্য অনায়াসে ও স্থলভে অভ্যন্তরস্থ বহু দূরের সহর হইতে বিদেশগামী জাহাজে বোঝাই করা যায়। আবার এই ভগ্ন তটরেখার জন্য গ্রেট্ বৃটেনের বাণিজ্য-জাহাজ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করে, এদেশবাসীরা নৌ-চালনে পৃথিবীর অন্যতম সর্বাপেক্ষা দক্ষ নাবিক এবং গ্রেট্ বৃটেনের পক্ষে পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ-সংস্থাপন ও বাণিজ্য-বিস্তার সহজ হইয়াছে।

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকের তটরেখা ভগ্ন। সেজন্য সেখানে বড়-বড় বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের তটরেখা বিশেষ ভগ্ন নহে,—ইহার পশ্চিম তটভূমি উচ্চ,—এবং পূর্ব তটভূমি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। সেজন্য পশ্চিম পার্শ্বে বোম্বাই এবং পূর্ব পার্শ্বে মান্দ্রাজ, ও বিশাখাপত্তনম্ মাত্র উল্লেখযোগ্য বন্দর। ভগ্ন তটের অভাবে এত দীর্ঘ সমুদ্রতটেও বেশী বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। পূর্ব দিকের মান্দ্রাজকে তরঙ্গ হইতে রক্ষার জন্য প্রাচীর দিতে হইয়াছে।

কিন্তু তটরেখা ভগ্ন হইলেই তাহা বন্দরের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে। নরওয়ের তটরেখা অত্যন্ত ভগ্ন। ইহাকে "ফিয়র্ড" বলে। এই সকল ফিয়র্ডের দুই পার্শ্বে উচ্চ পার্বত্যভূমি,—এত উচ্চ যে, এখানে পোতাশ্রয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু বাণিজ্য-বন্দর হওয়া সম্ভব নহে। পার্শ্বের পার্বত্য অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যেরও অভাব, এবং দেশের অভ্যন্তর হইতে এখানে যাতায়াতেরও স্থবিধা কম। সেজন্য এখানে বন্দরও নাই, বাণিজ্যও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। উত্তর স্কটলণ্ডের অবস্থাও এইরূপ।

৩। **জলবায়ু** (Climate)।—(১) পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের উপর,—(২) জীবজন্তুর বসতি-বন্টনের উপর,—(৩) মানুষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, খাদ্য, (৪) পরিধেয় ও (৫) বাসস্থানের উপর,—(৬) শিল্পসৃষ্টির উপর,—(৭) পৃথিবীতে, মানুষের বসতি-বন্টনের উপর,—(৮) মানুষের দেহ, মন ও স্বাস্থ্যের উপর এবং (৯) মানুষের চরিত্রগঠন ও (১০) কর্মতৎপরতার উপর জলবায়ুর প্রভাবের আর সীমা নাই। ইহাদের কোন-কোনটি মানুষ জলবায়ুর প্রভাবে প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং কোন-কোনটি প্রকৃতিদত্ত জিনিষ হইতে শিল্পরূপে সৃষ্টি করিয়া লয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে কোন-না কোনরূপে জলবায়ুর উপর নির্ভর করিতে হয়।

অক্ষাংশ, সমুদ্রসমতল হইতে উচ্চতা, বায়ুপ্রবাহের দিক্‌, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, পর্বত-শ্রেণীর অবস্থান এবং সমুদ্রস্রোত প্রভৃতির উপর কোন স্থানের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ভর করে। পৃথিবীর উপর যে (১) **স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ** জন্মিয়া থাকে, তাহা বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন। শীতপ্রধান মেরুপ্রদেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান বিষুবরৈখিক প্রদেশ পর্যন্ত, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জলবায়ুর প্রভাবে শৈবাল হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর হইতে-হইতে দীর্ঘতম বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ সমাবেশে মানুষের জীবনোপায় ও রীতিপ্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের কথা পরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে।

পৃথিবীর উত্তর ভাগের তুন্দ্রাঞ্চলে, বা সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে, বা বিষুবরৈখিক প্রদেশের বনাঞ্চলে, অথবা বৃষ্টিহীন প্রদেশের তৃণাঞ্চলে (২) **জীবজন্তু** বিভিন্ন হইয়া থাকে। আবার, জলবায়ুই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে **পশুপালন ও পশুব্যবসায়** নিয়ন্ত্রিত করে।

মানুষের (৩) **খাদ্যশস্য** ও **অন্যান্য** কৃষিদ্রব্যও জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন হয়। সেই জন্য দেখা যায়, কোন দেশ ধান্য, কোন দেশ গম, কোন দেশ ইক্ষু, উৎপাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন স্থান অল্পমাত্র উপযোগী। কোন দেশে হয়ত কোন কৃষিশস্যই জন্মে না। মানুষও যে-দেশে বাস করে. সেই দেশের উৎপন্ন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়। সেইজন্য এশিয়ার প্রধান খাদ্য চাউল, ইউরোপের প্রধান খাদ্য গম।

মানুষের (৪) **পরিধেয়**-ও জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন। শীতপ্রধান দেশের লোকে বারমাসই গরম কাপড় ব্যবহার করে,—তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও খুব আঁটসাট। কিন্তু গ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে মানুষ পাতলা ও ঢিলা পরিচ্ছদ ব্যবহার করে,—যেন বাতাস কাপড়ের ভিতর দিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধ করিতে পারে। অত্যধিক গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে মানুষ গাত্র প্রায় উন্মুক্তই রাখে।

মানুষের (৫) **বাসগৃহ** জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন হয়। অত্যধিক শীতের দেশের বাসগৃহের ছাদ প্রধানতঃ দুই দিকে ঢালু,—যেন বরফ পড়িলে তাহা সরিয়া পড়ে।

অত্যধিক গ্রীষ্মের দেশের বাসগৃহের ছাদ সমতল হয়, যেন রাত্রে ছাদে শুইতে পারা যায়। বৃষ্টিবিরল দেশের ছাদ চারিদিক হইতে ঢালু হইয়া মধ্য ভাগের দিকে যায়, এবং সেখানে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। (আবার জাপানে ঘন-ঘন ভূমিকম্প হয়। সেজন্য সেখানকার বাড়ী খুবই হাল্কা জিনিষে তৈয়ারী করা হয়। বাঁশই সেখানে গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ। সেখানে ভূমিকম্পের ভয়ে দোতলা বাড়ী প্রায়ই থাকে না।)

(৬) **শিল্পসৃষ্টি**-ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। যে-দেশে যেরূপ জলবায়ুর প্রভাবে যে-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ সেইরূপ দ্রব্য অবলম্বন করিয়াই সেখানকার শিল্প গড়িয়া উঠে। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। সেজন্য পাটশিল্প বঙ্গদেশেই গড়িয়া উঠিয়াছে। (গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তূলা জন্মে। সেজন্য অধিকাংশ কার্পাস-শিল্পের কল গুজরাট প্রদেশে ও সন্নিহিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশে ও বিহার প্রদেশে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। সেইজন্য এই অঞ্চলে চিনিও প্রচুর উৎপন্ন হয়।)

আবার, জলবায়ু অনুসারে মানুষের যেরূপ দ্রব্যের দরকার, বা দেশে যেরূপ শিল্প সম্ভব, তদনুসারেই শিল্পসৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক পাতলা কাপড় ব্যবহার করে। সেজন্য ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্প ও রেশমশিল্পই প্রধান বস্ত্র-শিল্প। শীতপ্রধান ইউরোপে গরম কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। সুইজর্লণ্ড পর্বত-সঙ্কুল ও শীতপ্রধান,—বৎসরের অধিকাংশ সময় সেখানে বরফ পড়ে বলিয়া ঘরের বাহিরে সকল সময়ে কাজ করা সুবিধাজনক নহে। সেজন্য সেখানে প্রধানতঃ জলবায়ুর কারণেই কুটীরশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

শিল্পযন্ত্রের পরিচালনের জন্যও বিশেষ-বিশেষ জলবায়ুর দরকার হয়। কার্পাস-বস্ত্র তৈরী করিতে আর্দ্র বায়ুর দরকার। শুষ্ক বায়ুতে সূতা ছিঁড়িয়া যায়। সেজন্য ইংলণ্ডের পশ্চিমভাগে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহিত অঞ্চলে কার্পাসশিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রশালার ভিতরেই বায়ু আর্দ্র করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেজন্য এক্ষণে কার্পাস-বয়নযন্ত্র যে-কোন স্থানে স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। (শুষ্ক বায়ুর দেশে গম পিষিলে ঝরঝরে ময়দা পাওয়া যায়। সেইজন্য পাকিস্তানের পশ্চিম-পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-প্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি স্থানে ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে।) আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস, ও পাকিস্তানের করাচী প্রসিদ্ধ ময়দা প্রস্তুত করার স্থান।

পণ্যদ্রব্যের **আমদানি ও রপ্তানি**ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। যে-সমস্ত দেশে শীতকালে বরফ পড়ে,—রাস্তাঘাট, নদীনালা, ও সমুদ্র বরফে ঢাকিয়া যায়, সেসব দেশে শীতকালে শিল্পদ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। উত্তর-আমেরিকার পঞ্চহ্রদের উপর দিয়া প্রবাহিত সেণ্ট লরেন্স নদী একটি প্রধান বাণিজ্যবাহী নদী। শীতকালে এই নদী জমিয়া যায় বলিয়া কানাডার গম এই পথে চালান দেওয়া যায় না,—পশ্চিমভাগের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর দিয়া বা রেলপথে চালান দিতে হয়। বাল্টিক সমুদ্রের ওডর নদীর মুখ শীতকালে মাসাবধি জমিয়া থাকে। কিন্তু যতই এই সমুদ্রের উত্তরের দিকে যাওয়া যায়, ততই বেশী দিনের জন্য এই সমুদ্র জমিয়া থাকে। লেনিনগ্রাদের নিকট এই সমুদ্র পাঁচমাস জমিয়া থাকে। সুতরাং বাল্টিক-অঞ্চলে শীতকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা হয়। পাকিস্তানের কোয়েতা-অঞ্চলের রেলপথ ও পার্বত্যপথ শীতে বরফাচ্ছন্ন হয়। তখন সে-অঞ্চলে আর সহজে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে না। তিব্বতের পথ যখন বরফে ঢাকিয়া যায় তখন সেখান হইতে ভারতে পশম-আমদানি বন্ধ হয়। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যও কতকাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

যে-সকল স্থান জলবায়ুর আনুকূল্যে সম্পৎশালী, এবং যেখানে খাদ্যদ্রব্য সুলভ ও সহজলভ্য, সে-সকল স্থানে (৭) **লোকবসতি** ঘন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শস্যশালী মৌসুমী-অঞ্চলে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে। ইহা পৃথিবীর ঘনতম বসতির স্থান।

(৮) মানুষের **দেহ, মন** এবং **স্বাস্থ্য**ও জলবায়ুর প্রভাবে বিভিন্ন হইয়া থাকে। হিমালয়ের পাহাড়ীদের দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য সমতল প্রদেশের লোকদিগের দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদিগের রীতিপ্রকৃতি, দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি, কোন-এক জলবায়ুর দেশের লোককে অন্য এক জলবায়ুর দেশে লইয়া গেলে, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বংশের লোকের আকার, গঠন, স্বাস্থ্য ও রীতিপ্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটে। বিহারে ও উড়িষ্যায় যে-সকল বাঙ্গালী কয়েক পুরুষ বাস করিয়াছে, তাহাদের দেখিলে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

(৯) মানুষের **চরিত্রের গঠন** ও **জীবন-যাপন-প্রণালী**ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। (১০) মানুষের কর্মতৎপরতার হ্রাসবৃদ্ধিও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে কয়েকটি উদাহরণ লইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

পৃথিবীর উত্তরে যে-**হিমমণ্ডল** আছে তাহা বারমাসই বরফাচ্ছন্ন থাকে।

সেখানে কৃষিকার্য হইতে পারে না। সেজন্য জীবিকা-অর্জনহেতু উত্তর-আমেরিকার **এস্কিমোদের** জীবজন্তু ও মৎস্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মৎস্য-শিকার কম বিপজ্জনক নহে। বরফাচ্ছন্ন সমুদ্রের উপর দাঁড়াইয়া মৎস্যের সন্ধান করিতে হয়,—ইহাতে যে-কোন মুহূর্তে বরফ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। এই অঞ্চলে জীবজন্তু, বিশেষতঃ সীল মৎস্য, মারিয়া তাহার চামড়া দিয়া তাহাদের পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়, এবং বরফের গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে হয়। এইরূপ জীবন-যাপন করিতে-করিতে তাহারা **সাহসী**, দারুণ **কষ্টসহিষ্ণু** ও **আত্মনির্ভরশীল** হয়। বিপদ ইহাদের পদে-পদে,—তাই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য ইহারা **আগ্রহান্বিত** থাকে এবং এইজন্য তাহারা **অতিথিবৎসল** হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সভ্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে। এ-জগতের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য,—এ-সকলের জ্ঞান হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে।

নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) **মণ্ডলে** মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎসাহ অত্যন্ত বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে এখানে খাদ্যশস্যাদি প্রচুর জন্মে। কিন্তু ইহার কোন-কোন অংশে দুর্দান্ত শীতে সমস্ত উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইয়া যায়। তাই গ্রীষ্মে দারুণ পরিশ্রম করিয়া শীতের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য অধিক উৎপন্ন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে লোকে উচ্চাভিলাষী হয় ও জ্ঞানচর্চার অবসর পায়। এ-সকল কারণে এ-অঞ্চলের লোক অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎসাহী, বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎদর্শী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়। প্রাচীনকালে, গ্রীসীয়, রোমীয়, মেসোপোটেমিয়ার বাবিলোনীয়, এশিয়া মাইনরের ফোনেশীয়, ভারতের সিন্ধুদেশীয় এবং চীনদেশীয় সভ্যতা এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানকালে পৃথিবীতে সভ্যতায় উন্নত, এবং জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শৌর্যে ও বীর্যে, অর্থে ও সামর্থ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এই অঞ্চলেই বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের লোকদিগের উপর প্রকৃতির অপার করুণা। তাই এই অঞ্চলের লোকই এখন জগৎ শাসন করিতেছে।

বিষুবরৈখিক অঞ্চলের (tropics) মানবগণের জীবন-ধারণের জন্য প্রকৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন। এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিকাংশ স্থানে নিয়মিত ও প্রচুর এবং উত্তাপও উদ্ভিদ্ জন্মিবার পক্ষে অত্যধিক। সেজন্য এত অল্পায়াসে এখানে আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় এবং অত্যধিক উত্তাপে এখানে এত শারীরিক দুর্বলতা আসে যে, এ-অঞ্চলের লোক সাধারণতঃ পরিশ্রমবিমুখ ও অলস হয়। এ-অঞ্চলে বস্ত্রাদির বেশী দরকার হয় না, বৃক্ষপত্রাদি

লইয়া ও বৃক্ষের শাখাদি কাটিয়া অনায়াসে একটা আশ্রয়স্থল রচনা করা যায়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চলে গভীর বন জন্মে। এই বনে সুস্বাদু ফল, অনায়াসলভ্য জ্বালানি কাঠ ও শিকারোপযোগী পশু পাওয়া যায়। সুতরাং জীবন-যাপন আয়াসের অপেক্ষা রাখে না এবং মানুষের সঞ্চয়ের ও ব্যবসায়েরও বিশেষ দরকার হয় না। আবার এখানকার জলবায়ুর জন্য এখানকার লোক শক্তিহীন ও নিবীর্য হইয়া উঠে। তাই এ-অঞ্চলে আদিমকালে সভ্যতার বিকাশ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার ইণ্ডিয়ান, মধ্য-আফ্রিকার নিগ্রো, অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসী প্রভৃতি অসভ্যগণের বাস এই বিষুবরৈখিক মণ্ডলে। ইহারা এই অঞ্চলের উপযুক্ত অধিবাসী—অলস, বর্বর ও নির্বোধ।

কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যেই—জলবায়ুর কিছু পরিবর্তন ঘটিলেই—যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাহারও উদাহরণ এই অঞ্চলেই আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে যেখানে-যেখানে উচ্চ মালভূমি আছে, সেখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও শক্তিবর্ধক। তাই সেই সকল অঞ্চলে, অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মতই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। এই বিষুবরৈখিক অঞ্চলেই মেক্সিকোর আজটেক, পেরুর ইন্‌কা ও আবিসিনীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মরুভূমি-অঞ্চল—বালুকাময়, সেখানে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, বৃষ্টিপাতও বিশেষ হয় না,—তাই এখানে শস্যোৎপাদন সম্ভব হয় না। সেজন্য এখানে যাহারা বাস করে তাহারা যাযাবর, এবং আহার ও পরিধেয়ের জন্য পশুর উপরই নির্ভর করে। মরুভূমির লোকেরা দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতি বলকর দ্রব্য খায়,—তাই তাহারা বলিষ্ঠ; ছায়াহীন উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া তাহাদের ভ্রমণ করিতে হয়, তাই তাহারা **সাহসী** ও **পরিশ্রমী** হয়। চিহ্নহীন অনন্ত বালুকাসমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাহাদের পদে-পদে,—তাই তাহারা খ-বিদ্যায় পারদর্শী,—নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌নির্ণয় করিতে পারে। ইহাদের অভাব কখনও ঘুচে না, সেজন্য তাহারা দস্যুতা বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে। একারণ মরুবাসী বলিলেই লোকে দস্যুতাজীবী জানিয়াই ভীত হয়। যে-আবেষ্টনে তাহারা বাস করে, তাহাই তাহাদের দস্যুবৃত্তি-গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে।

সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ যে বিভিন্নভাবে জীবনযাপন করে, জলবায়ুই তাহার অন্যতম কারণ।

৬। **মৃত্তিকা** (Soil):—ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের যে-অংশে বৃক্ষলতাদি জন্মে ও কৃষিকার্য হইতে পারে তাহাকেই বলে **মৃত্তিকা**। **মনুষ্যের জীবন-ধারণের জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী।** মানুষের জীবন-যাপনের

জন্ত তিনটি জিনিষের প্রধানতঃ দরকার,—খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থান। সাক্ষাৎ-ভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক এ-তিনটি জিনিষই মৃত্তিকা হইতে পাওয়া যায়। কারণ, মৃত্তিকা চাষ করিয়াই তাহা হইতে খাদ্যশস্য, ও পরিধেয়ের উপাদান কার্পাস প্রভৃতি পাওয়া যায়, এবং গৃহনির্মাণের আবশ্যক দ্রব্য কাষ্ঠ প্রভৃতিও মৃত্তিকা-জাত বৃক্ষাদি হইতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারেই তাহাতে উৎপন্ন স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের পার্থক্য হয়। মেরুবৃত্ত হইতে বিষুবরেখা পর্যন্ত উদ্ভিজ্জের আকার ও উপযোগিতা মৃত্তিকা অনুসারে বিভিন্ন। এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে-বনজঙ্গল আছে, তাহাদের রীতিপ্রকৃতিও জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন।

মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। সকল স্থানেই যে-কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যায় না। একমাত্র বঙ্গদেশে ও তাহার আশে-পাশেই পাট জন্মে। কার্পাস ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের অনেক স্থানে জন্মে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মে পশ্চিম-পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে। আপেল ও আঙুর পশ্চিম-পাকিস্তানে ও কাশ্মীরে জন্মে,—বঙ্গদেশে জন্মে না। আবার যে-অঞ্চলের মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য নাই, সে-অঞ্চলের মৃত্তিকায় কৃষিকার্য সফল হয় না। এক্ষণে সার দিয়া ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া কোন-কোন স্থানে নূতন দ্রব্য উৎপাদন করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারও একটি সীমা আছে। সার দেওয়াই হউক আর বৈজ্ঞানিক চাষই হউক, কৃষিকার্যে মাটিই প্রধান।

মৃত্তিকাকে গুণাগুণ অনুসারে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মৃত্তিকার সহিত পাথর, কাঁকর, বালুকণা, কর্দম, পলিমাটি প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এই সকলের অনুপাত অনুসারেই মৃত্তিকার একপ্রকার শ্রেণীভেদ করা যায়। যেমন,—

পাথুরে মাটি।—যে-মাটিতে কাঁকর ও পাথর বেশী থাকে, তাহাকে পাথুরে বা মোটা মাটি বলে।

কাদামাটি।—পাথর ও কাঁকর অত্যন্ত কম থাকিলে এবং পলিমাটি ও কাদা বেশী থাকিলে তাহার নাম কাদামাটি বা সূক্ষ্মমাটি। কাদামাটিতে থাকে ৪৫ ভাগ কাদা, ৪৫ ভাগ পলি ও ১০ ভাগ বালি। এই কাদামাটির বা পাঁক মাটির ভিতর দিয়া জল শুষিয়া যায় না,—জল ইহার উপরে থাকে। সেজন্য যে-স্থানে বৃষ্টিপাত কম, সে-স্থানে এই মাটির উপযোগিতা বেশী।

হাল্‌কা দো-আঁশ মাটি।—যে-মাটিতে ৭৫ ভাগ বালি, ১৪ ভাগ পলি ও ১১ ভাগ কাদা থাকে, তাহাকে বলে হাল্‌কা দো-আঁশ মাটি (sandy loom)। বালির অংশ আরও বেশী হইলে তাহাকে বলে বেলেমাটি (sandy soil)। বেলেমাটি চূর্ণ মাটির মত প্রবেশ্য মাটি। জল ইহার উপর পড়িলে শুষিয়া যায়। তাই ইহার উপর ছোট-ছোট ঘাস ভিন্ন কিছু হয় না।

পলিমাটি।— যাহাতে ৮২ ভাগ পলি, ১৩ ভাগ কাদা ও ৫ ভাগ মাত্র বালি থাকে, তাহার নাম পলিমাটি। পলিমাটি সর্বোৎকৃষ্ট মাটি। বঙ্গদেশ ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমি পলিমাটি দিয়া গঠিত। তাই এ-অঞ্চল এত উর্বর।

দো-আঁশ মাটি।—৪৫ ভাগ পলি, ৩১ ভাগ বালি ও ২৩ ভাগ কাদার মিশ্রণে উৎপন্ন মাটিকে দো-আঁশ মাটি (loom) বলে। এই মাটির সঙ্গে বৃক্ষলতাদি-পচা সার মাটি মিশ্রিত থাকে। ইহাও উর্বরা মাটি। যাহাতে ৩৪ ভাগ বালি, ২৭ ভাগ মাটি ও ৩৯ ভাগ পলি থাকে, তাহাকে কাদা দো-আঁশ মাটি (clay loom) বলে। বৃক্ষলতাদি অন্যান্য দ্রব্য পচিয়া যে-সার-পদার্থ (humus) হয়, তাহার দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ইহার সংযোগে মাটির বর্ণ কাল বা গাঢ় বাদামি (dark brown) বর্ণের হয়। এই রং-এর মাটি খুব উর্বরা।

রাঙা মাটিতে প্রধানতঃ লৌহদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ইহার উর্বরতা অপেক্ষাকৃত কম।

নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে মাটির বর্ণ পীতাভ, শ্বেতাভ ও ধূম্রাভ হয়। এগুলি মোটামুটি চাষের উপযোগী নয়।

মানুষের প্রকৃতির উপরেও মৃত্তিকার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিষুবরৈখিক অঞ্চলে জঙ্গল ঘনসন্নিবিষ্ট ও বহুবিস্তৃত। এই বনে যাহারা বাস করে তাহারা চিরদিনই জংলী স্বভাবের হয়। তাহাদের রীতি-প্রকৃতি ও জীবনযাপন-প্রণালী সাক্ষাৎভাবে জঙ্গল দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আবার, মানুষ প্রথম জীবনে থাকে শিকারী ও যাযাবর। কিন্তু যেখানে মৃত্তিকা হইতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে শিখে, সেই স্থানেই সে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া স্থির হইয়া বসে, এবং ক্রমশঃ তাহার শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। মৃত্তিকা যেখানে যত উর্বরা, সেখানে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতাও তত বেশী। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেখানেই কৃষিকার্যের উপযোগী উর্বরা মাটি পাইয়াছে, সেখানেই স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মোন্নতি করিয়াছে। প্রাচীনকালে মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন দেশের নদীর উপত্যকার জমি উর্বরা ছিল বলিয়া সেখানে লোকে কৃষিকার্য করিয়া প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিতে ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারিত। সেজন্য অতি প্রাচীনকালেও ঐ সকল স্থানে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

৭। **জীবজন্তু** (Animals)—জীবজন্তুর সহিতও মানুষের জীবন-প্রণালীরও একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। যেখানে স্বভাবতঃ যেরূপ পশু বাস করে, সেখানে মানুষের জীবনধারাও অনেকটা তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর উত্তরের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে লোমশ জন্তু বাস করে। সেখানকার মানুষ এই সকল পশুর চর্ম বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। গভীর বনে পশুশিকার মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের একটি উপায়। তৃণভূমিতে যে-সকল তৃণভোজী পশু থাকে,

মানুষ সেইসকল পশুর দুগ্ধ ও মাংস খাইয়া, চর্ম পরিধান করিয়া, এবং মাংস ও চর্ম বিক্রয় করিয়া জীবন-যাপন করে। আবার পশু-অবলম্বনে মানুষ নানারূপ শিল্পও সৃষ্টি করে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, পাকিস্তান ও রুশিয়ায় পশুলোম অবলম্বন করিয়া পশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে মাংস একটি বাণিজ্য-পণ্য।

এইরূপে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যাপারে ও মানুষের বসতিবিস্তারে জীবজন্তুর প্রভাবও কোন অংশে ন্যূন নহে।

৮। **উদ্ভিজ্জ** (Vegetation)—মানুষের জীবনযাত্রার উপর উদ্ভিজ্জের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বেই কিছু-কিছু আলোচনা করিয়াছি। উদ্ভিজ্জের উৎপাদন সাধারণতঃ জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষের উপর উদ্ভিজ্জের প্রভাব, তাহার উপর জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাবের পরোক্ষ ফল। তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষের জীবনযাত্রার উপায় উদ্ভিজ্জ কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

এক্ষণে উদ্ভিজ্জ মানুষের জীবনধারণের উপায়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) শৈবালভূমি।—পূর্বেই বলিয়াছি (২১ পৃ.) **হিমমণ্ডলে** কৃষিকার্য হয় না। এখানকার উদ্ভিজ্জ শৈবাল। কেবল গ্রীষ্মকালে কিছু বরফ গলিলে সেখানে ছোট-ছোট পুষ্পশোভিত চারা গাছ জন্মে। এখানকার কোন উদ্ভিজ্জই মানুষের বিশেষ কাজে আসে না। তুন্দ্রা-অঞ্চলে মানুষ বল্গাহরিণ প্রতিপালন করে এবং তাহার দুগ্ধ ও মাংস খায়, চর্ম পরিধান করে, ও হাড়ে অস্ত্র প্রস্তুত করে। সুতরাং তাহারা জীবনধারণের জন্য এই বল্গাহরিণ ও সামুদ্রিক জীবজন্তুর উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখানকার উদ্ভিজ্জ শৈবাল বল্গাহরিণের খাদ্য। একস্থানের শৈবাল নিঃশেষিত হইলে তাহারা বল্গাহরিণ লইয়া অন্যত্র যায়। এজন্য এখানকার মানুষ যাযাবর। আবার, গ্রীনলণ্ডের এস্কিমোগণ এই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের সমুদ্র-স্রোতে যে-সকল কাঠ ভাসিয়া আসে, তাহাই ধরিয়া নানাভাবে ব্যবহার করে। ইহাতে তাহাদের জীবন-যাপনের সাহায্য হয়। সেইজন্য গ্রীনলণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগেই তাহারা বাস করে।

(খ) বনভূমি—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উত্তাপ-প্রধান অঞ্চলে আছে পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন, শৈত্যপ্রধান স্থানে আছে চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন, বিষুবরৈখিক অঞ্চলে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যভাগে আছে গভীর, ঘন ও বিশাল দীর্ঘ বৃক্ষের বন। এই বনগুলির প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু

এখানকার মানুষগুলির জীবনযাত্রার মূলসূত্র একই। এই সকল বনেই মানুষ প্রথমে থাকে শিকারী। ইহার গভীর অংশে স্থায়িভাবে বাস করা সম্ভব নহে,—তাই মানুষ প্রথমে থাকে যাযাবর। পরে কালক্রমে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী হয়। প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বনে ওক, বার্চ, মেপ্‌ল প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে। সেজন্য সেখানে কাষ্ঠ-ব্যবসায় ভালই চলে, এবং বন কিছু পরিষ্কৃত হইলে মানুষ সেখানে কৃষিকার্য করে ও স্থায়িভাবে বাস করে।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে অনেক লোমশ জন্তুর বাস। সেজন্য সেখানে লোমশ চর্ম বিক্রয় একটি বড় ব্যবসায়। এ-অঞ্চলের কাঠও বিদেশে চালান যাইতেছে।

বিষুবরৈখিক বন এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তাহার মধ্যে বাস করা যায় না। সেখানকার লোকও যাযাবর শিকারী। এই বনে অনেক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে গাছকাটা ও কৃষিকার্য করা সুবিধাজনক নহে। এক্ষণে মেহগনি প্রভৃতি কিছু-কিছু উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ব্যবসায় চলিতেছে। তাছাড়া দক্ষিণ-আমেরিকার বন হইতে রবার চালান দেওয়া হইতেছে।

এসকল বনের মধ্যে মানুষ বাস করিতে পারে না বটে ; কিন্তু ইহার প্রান্তভাগে যেখানে বন খুব পাতলা হইয়া গিয়াছে সেখানে মানুষ কৃষিকার্য করে ও গাছপালা দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে বাস করে।

(গ) **তৃণভূমি**—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে-মধ্যে বৃক্ষহীন স্তেপজাতীয় তৃণভূমি এবং বিষুবরৈখিক মণ্ডলের মধ্যে বনভূমির পার্শ্বেই "স্যাভানা" নামে অল্পবৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি আছে। তৃণভূমি-মাত্রেই মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী একই রূপ হয়। তৃণভূমিতে তৃণভোজী পশু বাস করে। সেইজন্য পশুপালনই এখানকার লোকের প্রধান জীবিকা। পশুচারণকালে একস্থানে পশুখাদ্য ফুরাইলে তাহাদের অন্যত্র যাইতে হয়। সেজন্য তুন্দ্রা-অঞ্চলের লোকেদের ন্যায় তাহারা প্রথমে থাকে যাযাবর। পরে ক্রমশঃ তৃণ পরিষ্কার করিয়া তাহারা কৃষিকার্য আরম্ভ করে ও কৃষিক্ষেত্রে স্থায়িভাবে বাস করে।

(ঘ) **মরুভূমি**—মরুভূমিতে কোন গাছপালা নাই, কৃষিকার্যও হয় না। সেজন্য এখানকার লোক ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতি লইয়া যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করে। অভাবের তাড়নায় ইহারা দস্যুতা করে। যে-পরিস্থিতিতে তাহারা বাস করে, তাহাতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্টে জীবিকা অর্জন করিতে হয়। সেজন্য তাহারা অত্যন্ত সাহসী ও চতুর হয়। মরুভূমির মধ্যে যেখানে-যেখানে মরুদ্যান থাকে, সেখানে-সেখানে কৃষিকার্য হয়। সেখানে খাদ্য ও জল দুই-ই থাকে। তাই সেখানকার লোক সেখানে স্থায়িভাবে বাস করে।

(ঙ) **পার্বত্য উদ্ভিজ্জ**—মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরৈখিক প্রদেশের দিকে আসিতে হইলে ক্রমশঃ যেরূপ উদ্ভিজ্জ-সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়, পর্বতের পাদদেশ হইতে উপরে উঠিতে হইলে সেইরূপ উদ্ভিজ্জ-সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অংশের উদ্ভিজ্জ অনুসারেই মানুষ আপনার জীবনোপায় ঠিক করিয়া লয়। সুইজর্লণ্ডের পর্বতের উপরে তৃণভূমিতে পশুচারণ হয়, এবং দুগ্ধ হইতে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই সকল দুগ্ধদ্রব্য বিদেশে বিক্রয়ার্থ চালান যায়। পর্বতের উপরের কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্য পার্বত্য জাতিরা সাহসী ও শক্তিমান হয়।

৯। **খনিজদ্রব্য** (Minerals)—যে-স্থানে খনিজদ্রব্য বিশেষতঃ কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়, সেই স্থানে স্বভাবতঃ লোকবসতি কম হইলেও ক্রমশঃ ঘনবসতি হয় ও সহর গড়িয়া উঠে। ধানবাদ, আসানসোল, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি সহরের নিকট কয়লার খনি ছিল বলিয়াই, এই সকল সহরের সৃষ্টি ও উন্নতি হইয়াছে। ইংলণ্ড যখন কৃষিপ্রধান দেশ ছিল, তখন ইহার দক্ষিণ ভাগই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও ঘনবসতিপূর্ণ স্থান ছিল। কিন্তু যেইমাত্র উত্তরাংশে বহুসংখ্যক খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, অমনি দক্ষিণ-ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা কমিতে লাগিল এবং খনি-অঞ্চলেই লোকবসতি বাড়িতে লাগিল। কয়লা ও তৈল-খনির নিকটে প্রধানতঃ নানাপ্রকার শিল্প-কারখানার সৃষ্টি হয়। কারণ, যান্ত্রিক শিল্প—কয়লা ও খনিজ তৈল—এই দুই খনিজ শক্তির বলেই পরিচালিত হয়। এমন কি, কয়লা বা লৌহ-খনির নিকটে যদি তুলা, পশম প্রভৃতি বা অন্য কোনও কাঁচা-মালও না পাওয়া যায়, তথাপি দূর হইতে কাঁচামাল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া যন্ত্রশক্তির সুবিধার জন্য কয়লা খনির নিকট শিল্পকারখানার সৃষ্টি হয়। টাটা কোম্পানির লৌহ কারখানা, এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টিল কোম্পানির লৌহ কারখানা যথাক্রমে বিহার ও বাঙ্গালার লৌহ ও কয়লা-খনি অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লৌহ, কয়লা ও খনিজ তৈল যন্ত্রশিল্পের মূলভিত্তি। যে-কোন খনিজদ্রব্য থাকিলেই দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, বিদেশের সহিত ব্যবসায়-সূত্র স্থাপিত হয়, এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়-সূত্রে অন্য ব্যবসায়েরও সৃষ্টি হয়।

(খ) অ-প্রাকৃতিক আবেষ্টন

১। **লোকবসতি** (Population)—আর্থনীতিক উন্নতির জন্য মানুষের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীতে যে অফুরন্ত সম্পদ্ আছে, তাহা মানুষ ও অন্য

জীবজন্তুর উন্নতিকল্পেই ব্যবহৃত হয় বটে,—কিন্তু মানুষ না থাকিলে পৃথিবীর সকল সম্পদ্ই অব্যবহৃত থাকিত। সেজন্য অর্থনীতিক্ষেত্রে জনসংখ্যার মূল্য অতুলনীয়।

মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীতে যে-পরিমাণ কার্যের দরকার হয়, তাহার অধিকাংশ মানুষই করে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের পূর্বে পৃথিবীর সকল কার্য অন্য-অন্য জীবজন্তুর সাহায্যে মানুষই করিত। এখনও পৃথিবীর বহু অনুন্নত অংশে মানুষই সকল কার্য সম্পাদন করে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ কৃষিকার্য এখনও মানুষে যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত প্রাচীন প্রথায় সম্পাদন করে। এমন কি, মানুষের সাহায্য ব্যতীত শিল্পযন্ত্রও চলিতে পারে না। সুতরাং কোন দেশের বসতি ঘন হইলে সে-দেশের আর্থনীতিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। যেমন,

(১) কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ অধিক হইলে তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য জনবল দরকার।

(২) যে-দেশে খাদ্যদ্রব্য সুলভ, সে-দেশে লোকবসতি বেশী হয়, এবং লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইলে সেখানকার লোকের শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাতে দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বাড়ে এবং আর্থনীতিক কর্মতৎপরতাও বাড়ে। যেমন, ভারতবর্ষে ও অন্য-অন্য মৌসুমী-বায়ুর দেশে কৃষিকার্য সহজসাধ্য ও খাদ্যদ্রব্য সহজপ্রাপ্য ছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে যেমন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্যের উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে, সেইরূপ শিল্পবাণিজ্য দ্বারা দেশের আর্থনীতিক উন্নতিরও চেষ্টা হইতেছে। আবার, অস্ট্রেলিয়ার লোকবসতি বিশেষ ঘন নহে বলিয়া সেখানে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতে পারিতেছে না,—পশুচারণই এখন প্রধান বৃত্তি। কিন্তু গ্রেট্ বৃটেন জনবহুল দেশ বলিয়া সেখানে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু কোন দেশ জনবহুল হইলেই তাহার আর্থনীতিক উন্নতি হয় না। চীন অপেক্ষা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা কম। কিন্তু আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র চীন অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত।

(৩) কোন দেশের লোকসংখ্যা বেশী হইলে, সেখানে শ্রমিক ও ধনিক—দুই-ই পাওয়া সম্ভব। এই দুইটিই শিল্পসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন।

(৪) কোন দেশ জনবহুল হইলে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই আবশ্যকমত মিলিতে পারে। শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

২। **রাষ্ট্ররূপ** (Political Organisation)—কোন দেশের আর্থনীতিক উন্নতির পক্ষে সেই দেশের শাসনতন্ত্র নানাভাবে সাহায্য করে। কোন দেশের শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল ও শক্তিশালী হইলে সে-দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। শক্তিশালী বলিয়া সোভিয়েট রুশিয়া এত শীঘ্র উন্নতি করিতে পারিয়াছে। চীন আকারে, লোকসংখ্যায় ও প্রাকৃতিক সম্পদে একটি বড় দেশ। কিন্তু কু-শাসনের জন্য পুরাতন চীনের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। অন্ততঃ, নূতন চীন সু-শাসনের জন্য অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। আবার শাসনতন্ত্র যদি প্রাচীনপন্থী হয়, এবং কালের সহিত সমতালে পদক্ষেপ করিতে না পারে, তবে তাহার অবনতি ঘটে। আফগানিস্তান ও তিব্বতে এইজন্যই শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই।

৩। **সমাজ-শাসন** (Social Organisation)।—রাষ্ট্রতন্ত্র কতকাংশে স্থানীয় সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে কর্মানুসারে জাতিভেদ আছে। কুম্ভকার পুরুষানুক্রমেই কুম্ভকার। ইহাতে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু তাহার কার্যের জন্য সে সহজে তাহার কার্যের উপযোগী শ্রমিক অন্যত্র সংগ্রহ করিতে পারে না। ইহাতে কোন শিল্প যেমন এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, দেশের উৎপাদনও তেমনি কমিয়া যায়। আফ্রিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে যেরূপ বর্বরতা দেখা যায়, সেরূপ আর কোথাও নাই। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি সুসভ্য দেশ। কিন্তু তাহাদের সামাজিক বিধির সহিত ঐ দেশের প্রাচীন অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের কোন-কোন বিষয়ে সামাজিক বিরোধ আছে। সেজন্য শক্তিশালী আমেরিকানগণ ইণ্ডিয়ানগণকে কখনও-কখনও আইনের বিচারের অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই প্রাণদণ্ড করে। ইহা সভ্যতার বিরোধী ও দেশের সম্মানের ও উন্নতির পক্ষে অনিষ্টকর।

৪। **ধর্ম** (Religion)।—কোন দেশের শাসনতন্ত্র-অনুমোদিত ধর্মের প্রভাবে সে-দেশের মানুষের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে। ভারতে যখন বৌদ্ধ-রাজা দেশ শাসন করিতেন তখন 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলিয়া রাজনির্দিষ্ট বিধি ছিল। তখন হিংসা মহাপাপ বলিয়া গণ্য ছিল। সেজন্য সে সময় কেহ জীবহত্যা করিত না। সুতরাং মাংস-বিক্রয়ের ব্যবসায় ছিল না। কিন্তু একথা সত্য নহে যে, যে-দেশের রাজা বৌদ্ধ বা দেশের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম সেই দেশেই জীবহত্যা নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ জাপানে ও চীনে মাছ ও মাংস ভক্ষণে বা তাহার ব্যবসায়ে কোন বাধা নাই। কারণ সেখানে তাহার বিরুদ্ধে কোন রাজবিধি নাই। মুসলমানের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ। সেজন্য ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হইলেও, তাহা

হইতে মদ্য প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। মুসলমান ধর্মে টাকা সুদে খাটান নিষিদ্ধ। সেকারণে অনেক মুসলমান দেশে ব্যাঙ্কের কারবার গড়িয়া উঠে নাই। কালধর্মে বর্তমান যুগে রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে ব্যাঙ্ক দেশ-বিদেশের সহিত অর্থ আদান-প্রদানের প্রধান অঙ্গ। সেজন্য সকল দেশেই এখন ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুধর্মে গোবধ নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য হিন্দু-রাজত্বকালে গোবধ ছিল না। কাজেই চর্মব্যবসায়ও ছিল না। আবার ভারতবর্ষ যখন মুসলমান সম্রাটের অধীন হইল, তখন রাজবিধি অনুসারে গোবধ নিষিদ্ধ রহিল না। কিন্তু এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়াছে, মানুষ অনেকটা আত্মতান্ত্রিক হইয়াছে, এবং শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে মানুষ আর ধর্মের বিধিনিষেধ দৃঢ়ভাবে মানিয়া চলে না। সেইজন্য বৌদ্ধ চীনা ও জাপানীরা আর অশোকের অনুশাসন মানে না, লোকক্ষয়কর যুদ্ধ করে। ভারতে কাবুলীরা ঋণ দিয়া সুদ গ্রহণ করে।

---

(২)

আর্থনীতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ সাধারণভাবে ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা হইল। এইবার আর্থনীতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

আর্থনীতিক ভূগোল।—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের যে-কর্মতৎপরতা এবং প্রাকৃতিক আবেষ্টন ও মানুষের অর্থপ্রসূ বৃত্তির মধ্যে যে পারস্পরিক প্রভাব,—তাহার বিষয় যে-পুস্তকে লিখিত আছে, তাহারই নাম **আর্থনীতিক ভূগোল**।

প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার, বনতত্ত্ব, খনিতত্ত্ব, পশুপালন, পশুশিকার ও বাণিজ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত যে-সকল অর্থপ্রসূ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানুষ জীবন-যাপন করে, কেবল তাহার সহিত তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের যে-সম্বন্ধ তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হয়। সুতরাং যে-বৃত্তিগুলি প্রাকৃতিক আবেষ্টন অবলম্বনে গৃহীত হয়, তাহাদেরই সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক আছে,—কেরাণীগিরি, ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা ও তদনুরূপ আবেষ্টনের সহিত সম্পর্কযুক্ত বৃত্তি এই পুস্তকের আলোচ্য নহে।

আর পারস্পরিক প্রভাব বলিতে এই বুঝায় যে, আবেষ্টন যেমন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, মানুষও তেমনি আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়;—ইহাদের খাদ্য ও পরিধেয়, বাসস্থান ও জীবনযাপন-প্রণালী, আচার ও ব্যবহার,—এ-সকলের ভিতর যে কত পার্থক্য তাহা সকলেই অবগত আছে।—বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিপালিত বলিয়াই যে তাহাদের মধ্যে এই পার্থক্য,—ইহাও সকলেই বুঝিতে পারে। ইহাই মানুষের উপর আবেষ্টনের প্রভাবের উদাহরণ। আবার পশ্চিম-পাঞ্জাব এককালে মরুবৎ ছিল। মানুষ এই অঞ্চলের নদীগুলি বাঁধিয়া, উহা হইতে খাল কাটিয়া বহুদূর লইয়া গিয়া এই মরুবৎ স্থান শস্যশ্যামল করিয়াছে। লায়ালপুর এই অঞ্চলের একটি গ্রাম ছিল। এখন উহা বাণিজ্যবহুল জনাকীর্ণ স্থান। আবেষ্টনের উপর মানুষের প্রভাবের জন্য এইরূপ ঘটিয়াছে।

আর্থনীতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা।—মানুষের জীবন-ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, আবাসস্থল, কাষ্ঠাদি অগ্নি-উৎপাদক দ্রব্য প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শিল্প-উৎপাদনের জন্য তাহার নানা উপাদানের প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সর্বত্র পাওয়া যায় না। মানুষ কোথাও কৃষিকার্য, কোথাও পশুপালন, কোথাও শিকার, কোথাও শিল্পকার্য, কোথাও বা বাণিজ্য অবলম্বনে জীবন-ধারণ করিতেছে।

কোন্ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ কিরূপ, কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্যের আধিক্য,—কোন্ দেশেই বা তাহার অভাব,—কোন্ আবেষ্টনের প্রভাবেই বা পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অংশে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়,—কি উপায়েই বা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান দ্বারা বিভিন্ন দেশের অভাব-অভিযোগ পরিপূরণ সম্ভব,—কি কারণেই বা মানুষের জীবনধারণ-প্রণালী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন,—আর্থনীতিক ভূগোল পাঠে সে-সকলই শিক্ষা করা যায়।

আবার কোন্ দেশের রাজাশাসন-প্রণালী কিরূপ, কোন্ দেশের সহিত কিরূপ দ্রব্যের আদান-প্রদান সম্ভব,—কোন্ দেশে কি কারণে সহজে মজুর ও মূলধন সংগ্রহ করা যায়,—কোন্ দেশের রাজনীতিক সমস্যা কিরূপ, কিরূপে কোন্ দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়,—এ-সকল শিখিবার জন্যও আর্থনীতিক ভূগোলের প্রয়োজন।

আর্থনীতিক ভূগোল ও সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য শাস্ত্র।—আর্থনীতিক ভূগোল ভূগোলশাস্ত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু ভূগোলের অন্যান্য শাখার সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। আর্থনীতিক ভূগোলের জ্ঞান লাভ করিতে ভূগোলের এই সকল শাখার জ্ঞান অপরিহার্য। যেমন, কোন্ দ্রব্য কোন্ দেশে উৎপন্ন হয়, এবং কেন উৎপন্ন হয়, ইহা জানিবার জন্য জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। এজন্য **আবহবিদ্যা** (Meteorology) শিক্ষা করা দরকার। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য **উদ্ভিদ্‌বিদ্যা** (Botany)-র জ্ঞান দরকার। পৃথিবীর গঠন ও খনিজ পদার্থের অবস্থিতি-স্থান জানিবার জন্য **ভূ-বিজ্ঞান** (Geology) পড়া দরকার। জোয়ার ভাটা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আর্থনীতিক ভূগোলের জন্য দরকার। এজন্য **গাণিতিক ভূগোল** (Mathematical Geography) শিক্ষা করা উচিত। এইরূপ প্রাণিবিদ্যা (Zoology), রাজনীতিক ভূগোল (Political Geography), সমাজ-তত্ত্ব (Sociology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), ও ধনবিজ্ঞান (Economics) প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিতও আর্থনীতিক ভূগোল ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। রসায়ন-বিদ্যা (Chemistry), পদার্থবিদ্যা (Physics) প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ জ্ঞানও আর্থনীতিক শাস্ত্র অধিগত করিতে দরকার হয়।

ব্যাপারিক ভূগোল।—যে-ভূগোল শাস্ত্র পড়িলে ব্যাপারিগণ জানিতে পারে তাহাদের ব্যবসায়-দ্রব্য কোন্ দেশে ও কোন্ পরিবেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়;—কোন্ দেশ তাহার প্রয়োজনাধিক দ্রব্য সুলভে বিক্রয় করে;—কোন্ দেশের দ্রব্য উৎকৃষ্ট, কোন্ দেশেরই বা অপকৃষ্ট;—কোন্ দেশে কি উপায়ে ব্যবসায় দ্রব্য রপ্তানি করা

সুবিধাজনক ;—কোন্ দেশ হইতে ব্যবসায়-দ্রব্য আমদানি করা লাভজনক ;—কোন্ দেশের শাসন-বিধি আমদানি বা রপ্তানির অনুকূল বা প্রতিকূল,—তাহাকেই বলে **ব্যাপারিক ভূগোল**। সুতরাং প্রাকৃতিক আবেষ্টনে পণ্যদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন, এবং মানুষের কর্মজীবন-গঠন প্রভৃতি—আর্থনীতিক ভূগোলের সাক্ষাৎভাবে আলোচ্য বিষয়,—আর ঐ সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশবিদেশে আদান-প্রদান ও তৎসংক্রান্ত নানা বিবরণ ব্যাপারিক ভূগোলের বর্ণিতব্য বিষয়।

QUESTIONS

1. Define Geography. How does the modern geography differ from the old geography ?

2. Geography is a dynamic science.—Explain this and illustrate it with reference to man and environment.

3. "Man is not merely resident of this earth, he is a builder and an earth-changer."—Explain this.

4. "Man is influenced by environmental factors, but not controlled by them."—Discuss this.

5. How do you distinguish between geographical control and geographical influence ? Which of the two is more logical conception with regard to environment ?

6. What is meant by an environment ? What are the geographical factors that make up the natural environment ? Shew the influence of the geographical factors on man and man's reciprocal influence on them.

7. Write a short essay on geographical location to show how it influences the life of a man.

8. "The nature of coast-line of a country affects the commercial and industrial development to a great extent."—Discuss this statements with at least two examples. (Cal. Inter. 1926)

9. Write a short essay on the effect of climate, both direct and indirect, on the industries of a country. Illustrate your answer with some conspicuous examples. (Cal. Inter. 1926, 1942).

+ * 10. "No factor of the environment exercises a wider influence on man and his economy than climate."—How is the remark true? Give precise illustration. (Indian Institute of Bankers, 1940)

11. Write a short note on the effect of soils and climate on the agriculture of country. Illustrate your answer by examples.

12. To what extent the non-physical environment controls human activities.

13. "The race, Government and religion influence the commerce of a country to a certain extent."—Support the statement by illustration (Cal. B.Com. 1923)

14. Discuss the facilities enjoyed by people living in plains, and state the drawbacks of a mountainous region.

15. "The human habit is influenced largely, if not wholly, by the soil and the climate in which man lives."—Illustrate the statement with reference to examples. (Dacca Int. 1941)

16. Analyse the advantages and disadvantages of your place of residence by listing site and position factors.

17. What do you mean by Economic Geography? Discuss its scope.

18. Establish a relation between Economic Geography and other allied subjects,

19. How does Economic Geography differ from Commercial Geography? Explain your answer by particular examples.

20. Give the history of Japan to illustrate the dynamic nature of Economic Geography.

21. Discus the factors which affect the density of population in particular area or country.

22. Discuss man's relation to minerals and rivers.

23. "Civilized man is found mostly in the low land regions of the temperate Zone."—Explain this. (I. P. S. 1932)

24. "Man's character and occupation have been decided by the geographical conditions under which he lives." Illustrate this remark with reference to Japan and India. (I. I. B. 1939)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

পৃথিবীর জলবায়ু-মণ্ডল

(Climatic Regions)

জলবায়ু-অঞ্চল।—পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্য-ভাগে উত্তাপ সর্বাপেক্ষা বেশী। এই মধ্য-ভাগ হইতে যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ কমিতে থাকে। শেষে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে উত্তাপ সর্বাপেক্ষা কম হয়। এখানে চিরদিনই বরফ জমিয়া থাকে।

উত্তাপ ও শীতলতা অনুসারে বিষুবরেখা হইতে মেরুবিন্দু পর্যন্ত, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে,—সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠকে চারিটি প্রধান জলবায়ু-মণ্ডলে বিভক্ত করা যায়; যথা (১) **হিমমণ্ডল** (৯০° উ. হইতে ৬৬½° উ. এবং ৯০° দ. হইতে ৬৬½° দ.), (২) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (৬৬½° উ. হইতে ৩০° উ. এবং ৬৬½° দ. হইতে ৩০° দ.), (৩) **উষ্ণমণ্ডল** (৩০° উ. হইতে ৫° উ. এবং ৩০° দ. হইতে ৫° দ.), (৪) **নিরক্ষীয় মণ্ডল** (৫° উ. হইতে ৫° দ.)। কিন্তু জলবায়ু কোন মণ্ডলেই সর্বত্র একরূপ নহে। প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্যে বৃষ্টিপাত, প্রবাহিত বায়ু ও উত্তাপ উহার প্রত্যেক অংশে জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে। কোন মহাদেশের পূর্ব পার্শ্বে যদি সমুদ্র থাকে, এবং সেই সমুদ্র হইতে মহাদেশের দিকে যদি বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে সেই বায়ু সমুদ্র হইতে জলকণা বহন করিয়া আনে। তাহাতে ঐ মহাদেশের পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বায়ু যতই পশ্চিমের দিকে যায়, ততই বৃষ্টিপাত কম হয়। শেষে একেবারে পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ইহাতে পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টির জন্য উত্তাপ কম, মধ্যভাগে উত্তাপ কিছু বেশী, এবং পশ্চিম পার্শ্বে উত্তাপ আরও বেশী হয়। কোন মহাদেশের পশ্চিম পার্শ্বের সমুদ্র হইতে বায়ু-প্রবাহ যদি জলকণা বহন করিয়া ঐ মহাদেশের পূর্বের দিকে যায়, তবে উহার পশ্চিম পার্শ্বেই বৃষ্টিপাত বেশী হয়, এবং পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম হয়। এক্ষেত্রে পশ্চিম পার্শ্বে উত্তাপ কম, মধ্য-ভাগে উত্তাপ কিছু বেশী, এবং পূর্ব পার্শ্বে উত্তাপ আরও বেশী হয়। উদ্ভিজ্জ প্রধানতঃ উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর

করে। সেজন্য প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্য-ভাগে যদি অন্য কোন কারণে উত্তাপ কম বা বেশী না হয়, তবে সেখানে তৃণভূমি হয়। যেখানে বৃষ্টি খুব বেশী হয়, সেখানে বনভূমি হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক মণ্ডলকে পূর্ব-পশ্চিমে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

আবার, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—উষ্ণমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং এই মণ্ডলের যে-অংশ উষ্ণমণ্ডলের দিকে অবস্থিত, সেই অংশে উষ্ণতা বেশী। সেজন্য সেই অংশকে উষ্ণশীতোষ্ণমণ্ডল, এবং যে-অংশ উষ্ণমণ্ডলের বিপরীত দিকে,—হিমমণ্ডলের দিকে,—অবস্থিত,—যে-অংশ হিমমণ্ডলের সন্নিধান হেতু শীতপ্রধান,—সেই অংশকে হিমশীতোষ্ণমণ্ডল বলে। উষ্ণশীতোষ্ণমণ্ডল ৩০° উ. হইতে ৪৫° উ. ও ৩০° দ. হইতে ৪৫° দ. পর্যন্ত এবং হিমশীতোষ্ণমণ্ডল ৪৫° উ. হইতে ৬৬½° উ. ও ৪৫° দ. হইতে ৬৬½° দ. পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মূল চারিটি জলবায়ুমণ্ডলকে এগারটি জলবায়ু-অঞ্চলে বিভাগ করা যায়। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ুও এই সঙ্গে বিবেচ্য।

এই স্থানে বিভাগগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। **হিমমণ্ডল** (৯০° উ. হইতে ৬৬½° উ., এবং ৯০° দ. হইতে ৬৬½° দ.)

২। **হিমশীতোষ্ণমণ্ডল** (৬৬½° উ. হইতে ৪৫° উ., এবং ৬৬½° দ. হইতে ৪৫° দ.)

(ক) পশ্চিমে **বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

(খ) মধ্যে **সাইবিরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

(গ) পূর্বে **লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

৩। **উষ্ণশীতোষ্ণমণ্ডল** (৪৫° উ. হইতে ৩০° উ. এবং ৪৫° দ. হইতে ৩০° দ.)

(ক) পশ্চিমে **ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

(খ) মধ্যে **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও মরুভূমি-অঞ্চল**

(গ) পূর্বে **চীন আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

৪। **উষ্ণমণ্ডল** (৫° উ. হইতে ৩০° উ. এবং ৫° দ. হইতে ৩০° দ.)

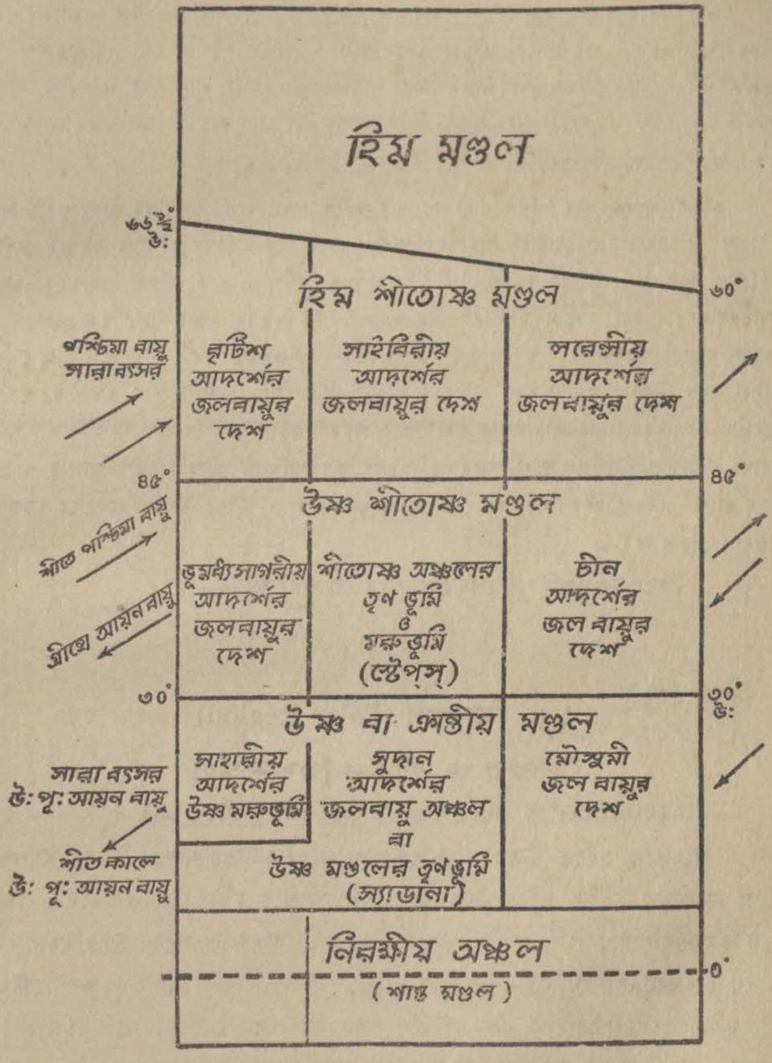
(ক) পশ্চিমে **সাহারীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মরু-অঞ্চল**

(খ) মধ্যে **সুদান আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

(গ) পূর্বে **মৌসুমী বা ভারতীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল**

৫। **নিরক্ষীয় মণ্ডল** (৫° উ. হইতে ৫° দ. পর্যন্ত)

৬। **পার্বত্য অঞ্চল**



৩নং চিত্র।—উত্তর গোলার্ধের প্রাকৃতিক বিভাগ।

দ্রষ্টব্য।—এই চিত্রটি কেবল উত্তর গোলার্ধের। দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ একটি বিভাগ আছে। তাহা বিষুবরেখা হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে দক্ষিণে-মেরুবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই চিত্রে তীরচিহ্নগুলি বায়ু-প্রবাহের গতি নির্দেশ করিতেছে। উপরের হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে দেখ

তীরটি দ.-পশ্চিম হইতে উ.-পূর্বমুখী। সুতরাং ইহা পশ্চিমা-বায়ু। ইহার নামও পশ্চিমা-বায়ু। ইহা সারা বৎসর একই দিকে প্রবাহিত থাকে। ইহা এই মণ্ডলের পশ্চিম দিকের সমুদ্র হইতে মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পূর্ব পার্শ্ব দিয়া বাহিরে যাইতেছে। সুতরাং এই মণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্ব অধিক আর্দ্র।

উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে তীর দেখ,—শীতে পশ্চিমা-বায়ু পশ্চিম হইতে পূর্বে যায়, এবং গ্রীষ্মে আয়ন-বায়ু পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসে। সুতরাং শীতে পশ্চিমে বৃষ্টিপাত বেশী, মধ্য-ভাগে বৃষ্টিপাত কম, পূর্বে আরও কম। কিন্তু এই মণ্ডলেই গ্রীষ্মে আয়ন-বায়ু পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসে বলিয়া বৃষ্টিপাত পূর্বে বেশী, মধ্য-ভাগে কম, পশ্চিমে আরও কম। ইহার ফলে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে বৃষ্টিপাত মধ্য-ভাগে, শীত ও গ্রীষ্ম—উভয় কালেই—কম। তাই এই মধ্য-ভাগে তৃণভূমি।

এইরূপ উষ্ণমণ্ডলে তীর দেখিলে জানা যায়, এই মণ্ডলে সারা বৎসর উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু উ.-পূ. হইতে দ.-প. আসিতেছে। মোটামুটি পূর্ব হইতে পশ্চিমে আসিতেছে। ইহাতে পূর্ব পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী, মধ্য-ভাগে কিছু কম, পশ্চিমে আরও কম। ইহার ফলে পূর্ব পার্শ্বে আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ুর দেশ, মধ্যভাগে তৃণভূমি, এবং পশ্চিমে মরুভূমি। এই মণ্ডলের পশ্চিমভাগের নিম্নের অংশ গ্রীষ্মকালে নিরক্ষীয় জলবায়ু-অঞ্চলের অন্তর্গত হয়। কারণ, সূর্য তখন উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির (২৩$\frac{১}{২}$° উ.) কাছে থাকে বলিয়া সমস্ত নিরক্ষীয় জলবায়ু-মণ্ডল উত্তরে প্রায় ১০° সরিয়া যায় ;—অর্থাৎ গ্রীষ্মে এই নিম্নের অংশে নিরক্ষীয় জলবায়ু হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম ভাগের এই নিম্নাংশ শীতকালে উ.-পূ. আয়ন-বায়ু প্রভাবে শুষ্ক থাকিলে গ্রীষ্মে নিরক্ষীয় জলবায়ু বশতঃ আর্দ্র থাকে। সেজন্য এই ভাগের উপরের অর্ধাংশ মরুভূমি হইলেও, নীচের অর্ধাংশ একেবারে মরুভূমি হয় না—তৃণভূমি হয়।

এক্ষণে মণ্ডলগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। হিমমণ্ডল (Polar Region)

উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল

(যথাক্রমে ৯০° উ. হইতে ৬৬$\frac{১}{২}$° উ. এবং ৯০° দ. হইতে ৬৬$\frac{১}{২}$° দ.)

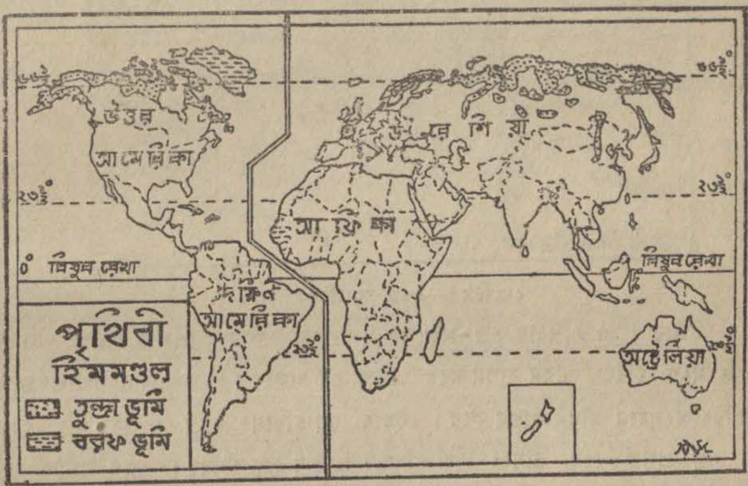
সুমেরুবৃত্ত হইতে উত্তর মেরু-বিন্দু পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তর অংশকে উত্তর হিমমণ্ডল, এবং কুমেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণ মেরু-বিন্দু পর্যন্ত অংশকে দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলে। এই দুই হিমমণ্ডলই সারা বৎসর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। উত্তর মেরুবিন্দু উত্তর মহাসাগর নামে এক বরফাচ্ছাদিত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু দক্ষিণ মেরুবিন্দু আণ্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মহাদেশ নামক এক সুবিস্তীর্ণ মালভূমি দ্বারা বেষ্টিত। এই মালভূমির গড় উচ্চতা ছয় হাজার ফিট্ অপেক্ষাও বেশী। ইহার কোন-কোন অংশ ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ।

12 (c) উত্তর গোলার্ধে উত্তর মেরু-বিন্দু হইতে দক্ষিণে ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত যে-বরফাচ্ছাদিত জলময় অংশ,—তাহাকে বলা

হয় তুষার অঞ্চল। সেখান হইতে সুমেরু বৃত্ত (৬৬½° উ.) পর্যন্ত অংশকে বলে তুন্দ্রাভূমি।

ইহা অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ। শীতের উত্তাপ ০° ফা. অপেক্ষা নীচে নামে। গ্রীষ্ম এখানে অল্পকালস্থায়ী। এই অঞ্চলে এশিয়াধীন রুশিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে ভারখয়ন্স্ক নামক স্থানের নিকটেই পৃথিবীর **হিমকেন্দ্র** (Cold Pole) অবস্থিত। এখানকার উচ্চতম তাপের বার্ষিক গড় +৫৮° ফা., এবং নিম্নতম তাপের বার্ষিক গড় −৫৮° ফা.। সুতরাং উত্তাপের প্রসর ১১৬° ফা.। ইহাই সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শীতল স্থান।

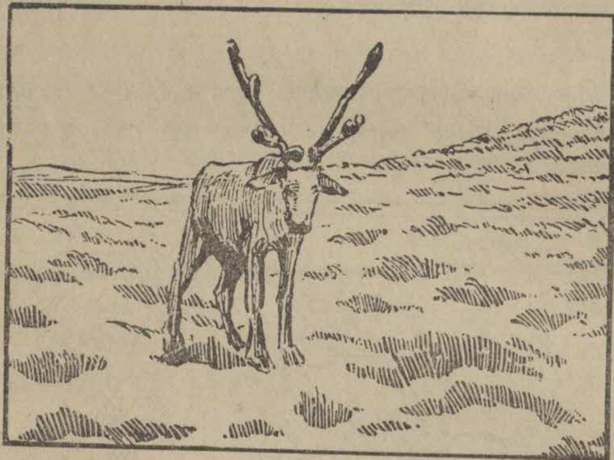
তুন্দ্রাভূমি।—উদ্ভিজ্জ।—তুন্দ্রাভূমি বৃক্ষহীন বরফাচ্ছন্ন হিমমরু। যে-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালেও গড় উত্তাপ ৫০° ফা. অপেক্ষা বেশী হয় না, সে-



৪নং চিত্র।—তুন্দ্রাভূমি।

অঞ্চলে বৃক্ষ জন্মে না। তুন্দ্রাভূমির দক্ষিণ সীমা মোটামুটি ৫০° ফা. জুলাই সমতাপরেখা অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এজন্য তুন্দ্রাভূমিতে গাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার উত্তর ভাগে জন্মে শৈবাল; এবং দক্ষিণ ভাগে উত্তাপ কিছু বেশী বলিয়া ছোট-ছোট ফলপূর্ণ চারাগাছের ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে এখানে যে-অল্প উত্তাপ বাড়ে, তাহাতে এখানকার বরফ ন্যূনাধিক এক ফুট গলিয়া যায়। তখন এই স্থানে নানা বর্ণের পুষ্প-সমন্বিত তৃণ জন্মিতে দেখা যায়, এবং ফুলে-ফুলে এই স্থান কার্পেটের মত দেখায়।

জীবজন্তু—এখানকার সমুদ্রে সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং স্থলভাগে বল্গাহরিণ, উত্তর আমেরিকার ক্যারিবু, কস্তুরিকা বৃষ, মেরু-দেশীয় শ্বেতভল্লুক, সেবল্, মেরু-খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেশের জন্তুগুলি প্রায়শঃ শীতের জন্য লোমশ জন্তু। এইরূপ শীতপ্রধান দেশেও মানুষ বাস করে। ইউরোপের উত্তর ভাগে ল্যাপলণ্ডে ল্যাপ, ফিন্‌লণ্ডে ফিন্‌গণ, সাইবেরিয়া-অঞ্চলে সাময়েদ্ ও ইয়াকুত, এবং গ্রীনলণ্ড ও উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রাভূমি-অঞ্চলে এস্কিমোগণ বাস



৫নং চিত্র।—একটি বল্গাহরিণ।

করে। ইউরোপ ও এশিয়ার তুন্দ্রা-অঞ্চলের লোকেরা প্রধানতঃ শিকার করিয়া, সীল ও অন্যান্য মৎস্য ধরিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রধান-প্রধান সম্প্রদায়গুলি বল্গাহরিণ অবলম্বনে জীবন যাপন করে। ইহারা বল্গাহরিণের মাংস ও দুধ খায়, হাড় দিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করে, চামড়া দিয়া পরিচ্ছদ ও তাঁবু প্রস্তুত করে। স্লেজ নামক এক প্রকার চক্রহীন গাড়ীতে বল্গা হরিণ জুড়িয়া ইহারা বরফের উপর দিয়া যাতায়াত করে। এই বল্গা-হরিণে শৈবাল খায়। সেজন্য তাহাদের চরাইবার জন্য এ-দেশের লোক অনবরত স্থান পরিবর্তন করে। এজন্য তাহাদের নির্দিষ্ট বাসগৃহ থাকে না। তাহারা যাযাবর। এস্কিমোগণ অনেকাংশে সমুদ্রতীরে বাস করে। সেজন্য তাহারা জীবন-ধারণের জন্য সীল প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুর উপর নির্ভর করে এবং "ইগলু" নামে খ্যাত বরফের ঘরে বাস করে। গ্রীনলণ্ডের



৬নং চিত্র।—একটি ক্যারিবু।

এস্কিমোগণ প্রধানতঃ ঐ দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে বাস করে। এই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সমুদ্রস্রোত বহিয়া বহু কাঠ ভাসিয়া আসে। এস্কিমোরা ঐ সকল কাঠ ধরিয়া নানারূপে ব্যবহার করে। উত্তর আমেরিকায় বল্গাহরিণ ছিল না। সেখানে 'ক্যারিবু' নামে এক প্রকার জন্তু বাস করে। কিন্তু ইহারা বল্গাহরিণের মত গৃহপালিত নহে। এখানকার আলাস্কা অঞ্চলে ইউরোপ হইতে বল্গাহরিণ ও তাহার রাখাল আনাইয়া বল্গাহরিণ প্রতিপালন করা হইতেছে। সুতরাং সীল ও বল্গাহরিণ—এই দুইই ইহাদের জীবনধারণের সহায়ক। তবে আমেরিকীয়গণ ও অন্য বিদেশীয়গণের সংস্পর্শে আসিয়া এখানকার এস্কিমোগণ অনেকটা সভ্য হইয়াছে।

পরিবহন।—তুন্দ্রা-অঞ্চলে বিদেশে পাঠাইবার মত কোন পণ্য দ্রব্য ছিল না। সুতরাং পরিবহনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার তুন্দ্রাভূমি হইতে জলপথে বল্গাহরিণের মাংস চালান যাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার অধীন ইউরোপীয় রুশিয়া ও সাইবেরিয়া হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্য চালান দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে। যে-সকল নদী উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে, সেইসকল নদী-যোগে পরিবহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উত্তর মহাসাগর তীরে কয়েকটি বন্দরেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইনিসি নদীতীরে ইগার্কা প্রধান। এই বন্দরটি গড়িবার জন্য বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। শীতকালে এ-অঞ্চল বরফে জমিয়া যায়। তাই এখানকার জলসরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জলের প্রধান নলের পার্শ্বে গরম জলের নল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পরিবহনের কিছু-কিছু সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে পরিবহনের সুবিধার অভাবে এ-অঞ্চলে কোন আর্থনীতিক উন্নতির চেষ্টাই হয় নাই। এক্ষণে হইতেছে।

আর্থনীতিক উন্নতি—এই তুন্দ্রা-অঞ্চলে—ইউরোপে ও এশিয়ায়—সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় অচিন্তিতপূর্ব আর্থনীতিক উন্নতি হইয়াছে। স্পিট্‌স্‌বেরগেন-এ কয়লাখনি, ল্যাপলণ্ডে লৌহখনি ও ভিক্টোরিয়া দ্বীপে তাম্রখনি বাহির হইয়াছে। সাইবেরিয়া হইতে এক্ষণে জাহাজ যাতায়াত করিতেছে, এবং এই অঞ্চলে ব্যোমযানও আসিতেছে। এখানকার কোন-কোন স্থানে গম উৎপাদন করা গিয়াছে, এবং কাচনির্মিত তপ্ত গৃহে শাকসব্জীর তরকারী উৎপন্ন করা হইতেছে। কোন-কোন স্থানে সব্জী প্রভৃতির চারা আনিয়া ফসল-উৎপাদন চলিতেছে। আবহাওয়াবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভের তপ্তগৃহে (hot house) বাস করিয়া নানারূপ পরীক্ষা চালাইতেছেন।

২। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল (Cool Temperate)

উত্তর ও দক্ষিণ হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল

(যথাক্রমে ৬৬½° উ. হইতে ৪৫° উ. ও ৬৬½° দ. হইতে ৪৫° দ.)

উত্তর হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল ৬৬½° উ. অক্ষরেখা হইতে ৪৫° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত, এবং দক্ষিণ হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল ৬৬½° দ. হইতে ৪৫° দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অংশ। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যে-অংশ বিষুবরেখা হইতে দূরে অবস্থিত, সে-অংশে শীত বেশী। তাই এই মণ্ডলকে বলা হয় হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ হিমপ্রধান শীতোষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল।

পূর্বেই বলিয়াছি (৩নং চিত্র দেখ) হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ক্রমশঃ (১) **বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল,** (২) **সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল,** এবং (৩) **লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল।** এই মণ্ডল

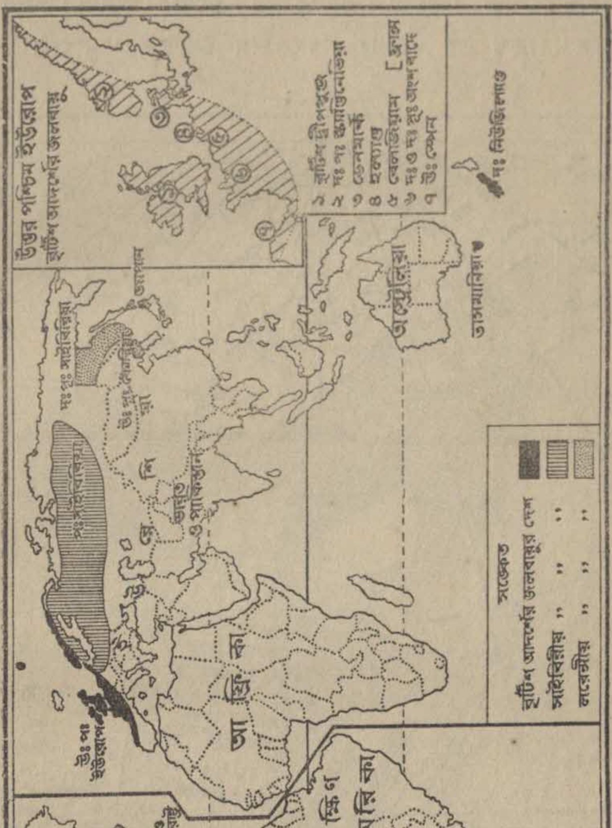
উত্তর আমেরিকায় ও ইউরেশিয়ায় বায়ুপথ

প্রশান্ত → মহাসাগর →	বৃটিশ বা পশ্চিম ইউরোপীয় আদর্শের জলবায়ু	সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু	লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু	আটলান্টিক → মহাসাগর →	বৃটিশ বা পশ্চিম ইউরোপীয় আদর্শের জলবায়ু	সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু	লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু	প্রশান্ত → মহাসাগর →

সারা বৎসর একইভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত পশ্চিমা-বায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমা বায়ু পশ্চিম হইতে আসিতেছে বলিয়া পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাত বেশী এবং শীতের কঠোরতা কম ;—মধ্য-ভাগে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম, গ্রীষ্মে উত্তাপও বেশী ও শীতের কঠোরতাও বেশী ;—এবং পূর্ব ভাগে বৃষ্টিপাত আরও কম। কিন্তু সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া এই পূর্ব ভাগে গ্রীষ্মকালে জলকণাযুক্ত বায়ু ইহার উপরে প্রবাহিত হয়। পশ্চিমা-বায়ু এই অঞ্চলে পৌছিবার পূর্বে শীতপ্রধান মধ্য-ভাগের উপর দিয়া আসে বলিয়া অধিকতর ঠাণ্ডা হয়। তাহাতে পূর্বের এ-অঞ্চলে শীতের কঠোরতা বেশী হয়। সুতরাং এই অঞ্চল শীতপ্রধান ও বৃষ্টিপ্রধান, এবং বৃষ্টি অনেক সময় তুষাররূপে পড়ে।

এই মণ্ডল উত্তর গোলার্ধে,—উত্তর আমেরিকায়, প্রশান্ত হইতে আটলান্টিক, এবং ইউরেশিয়া মহাদেশে আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

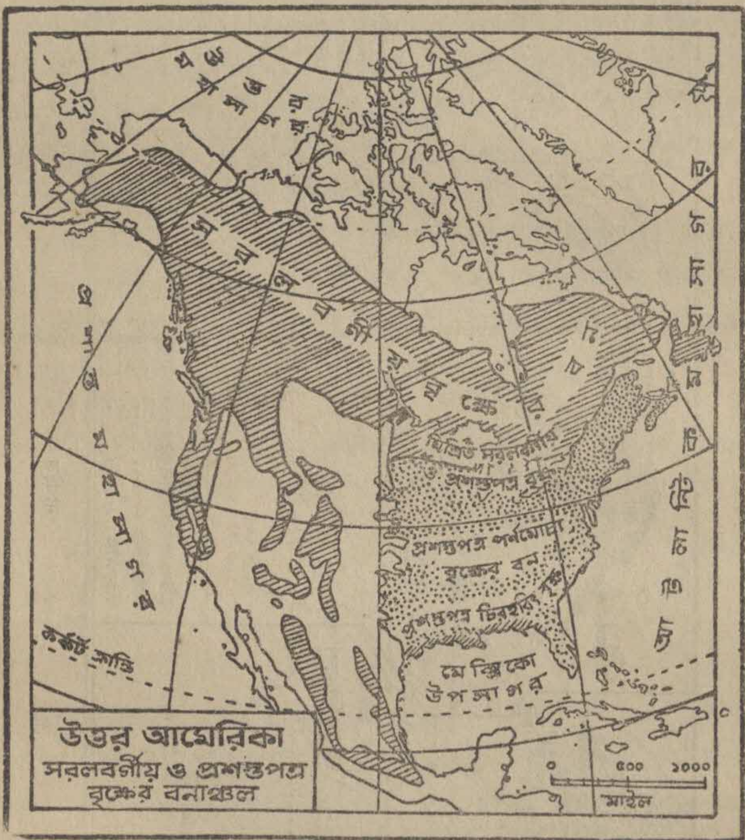
দক্ষিণ গোলার্ধে এই অংশে স্থলভাগ নিতান্ত কম। দক্ষিণ চিলির অল্পাংশ, অস্ট্রেলিয়ার তাসমেনিয়া দ্বীপ ও নিউজিলণ্ডের দক্ষিণের কতকাংশ এই বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু



৭নং চিত্র।

দক্ষিণ গোলার্ধের অংশগুলি এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, সন্নিকটস্থ সমুদ্রের প্রভাব ইহার উপর পড়ে। সেজন্য এই অংশগুলিতে জলবায়ুর পার্থক্য হয়।

উদ্ভিজ্জ।—উত্তর গোলার্ধে উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মধ্যে অবস্থিত এই হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে বৃষ্টিপাত বেশী না হইলেও উহা বনাচ্ছন্ন। সাধারণতঃ এই বনকে মোচাকৃতি ফলযুক্ত চিরহরিৎ **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন** (Coniferous Forest) বলে। কিন্তু এই মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগ উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের সন্নিহিত



৮নং চিত্র।—সরলবর্গীয় ও প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন ; উত্তর আমেরিকা ।

বলিয়া সেখানে শীতের প্রকোপ কম ও বৃষ্টিপাত বেশী। সেজন্য সে-অংশে শীতকালে পত্রহীন প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন (Deciduous forest) জন্মে। প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বনভূমি-অঞ্চলে যদি উচ্চ পর্বত থাকে, তবে তাহার উপরে শীতের প্রকোপ বেশী হয়। সেইজন্য ইউরোপের মধ্য-ভাগে জার্মানি, সুইজর্লণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারিতে অবস্থিত পর্বতের উচ্চ অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন আছে।



৯নং চিত্র।—ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন।

পাইন, ফার, স্প্রাস (spruce), লার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ সরলবর্গীয় বৃক্ষ* পর্যায়ের অন্তর্গত। ইহাদের ফল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মোচাকৃতি, কাঠ নরম এবং পত্রগুলি সূচের ন্যায়। যে-অঞ্চলে এই গাছ জন্মে সেখানকার মাটি ভাল নহে, বৃষ্টিপাতও সেখানে বেশী হয় না,—এবং সে-অঞ্চলে এমন ঠাণ্ডা ঝড় বহে যে, গাছের, বাঁচিয়া থাকাও উচিত নহে। তবুও সেখানে গাছ জন্মে ও বাঁচে, এবং গভীর বনের সৃষ্টি হয়। কারণ, বরফ-গলা জল বৃষ্টির অভাব দূর করে,—সূচের মত সরু পাতার অগ্রভাগ দিয়া গাছের জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে অধিক পরিমাণে বাহির হইতে পারে না,—এবং গাছের গায়ে বরফের আচ্ছাদন ঠাণ্ডা ঝড়ের



১০ নং চিত্র।—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন।

* পাইন (Pine), ফার (Fir), হেমলক (Hemlock), স্প্রাস (spruce), সাইপ্রেস (Cypress), রক্তকাষ্ঠ (Red wood), সিডার (Cedar), লার্চ (Larch), ট্যামারাক (Tamarack), এই পর্যায়ের বৃক্ষ।

প্রভাব হইতে গাছগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে। এ-কারণে এ-অঞ্চলে এই গাছের বন জন্মে এবং গাছগুলির দেহে আদৌ রসের অভাব হয় না বলিয়া গাছগুলি চিরহরিৎ (evergreen) থাকে।

ওক প্রভৃতি বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ ভাগে জন্মে। সেখানে উত্তাপও বেশী, বৃষ্টিপাতও বেশী, গাছের বৃদ্ধিও বেশী। তাই পত্রগুলি প্রশস্ত। এই প্রশস্ত পত্রের ভিতর দিয়া বৃক্ষের জীবনস্বরূপ যে রস,—তাহা অধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহাতে গাছগুলির শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই শীতকালে যখন বৃষ্টি হয় না, রস-সঞ্চয় খুবই কম হয়, তখন গাছগুলি পর্ণসকল মোচন



১১ নং চিত্র।—পাইন ফল।



১২নং চিত্র।—ওক গাছ।

করিয়া দেয়। ইহাতে গাছের রস আর বেশী দ্রুত বাষ্পাকারে বাহির হইতে পারে না—গাছগুলি বাঁচিয়া যায়। অবশ্য, গাছগুলি যদি এমন সরস স্থানে জন্মে যে, বারমাসই তাহার মাটি হইতে জীবনধারণের পক্ষে প্রচুর রস-সংগ্রহ সম্ভব হয়, তবে গাছগুলির পর্ণমোচনের দরকার হয় না। এরূপ স্থলে গাছগুলি শীতকালে পত্রহীন হয় না, চিরহরিৎই থাকে। মেক্সিকো উপসাগরের তীরে প্রশস্তপত্র বৃক্ষগুলি* পর্ণমোচী নহে। ভারতবর্ষে বট, অশত্থ এইরূপ প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষ।

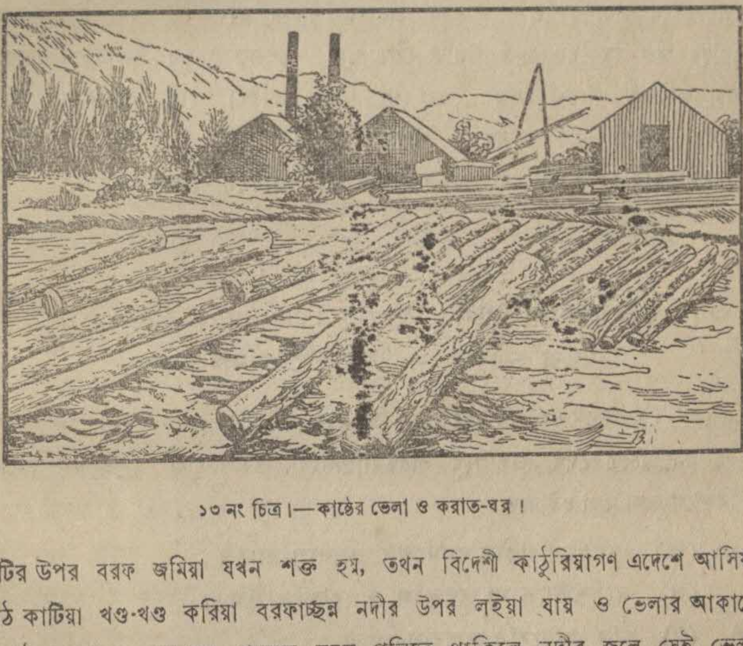
জীবজন্তু ও লোকবসতি।—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে আরমাইন, সেব্‌ল্, বীবর, মার্টেল, শ্বেত খেঁকশিয়ালী প্রভৃতি জন্তু বাস করে। এইসকল জন্তুর অনেকগুলি লোমশ। শীতকালে লোমশ জন্তুর লোম ঘন ও সুন্দর হয়। অনেক সৌখীন ব্যক্তি এইসকল লোম ব্যবহার করে। সেজন্য উত্তর আমেরিকার সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বনে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ এইসকল,

* ওক (Oak), মেপ্‌ল্ (maple), পপ্‌লার (Poplar), গাম (Gum), চেষ্টনাট্ (Chestnut), বীচ (Beech), এল্‌ম (Elm), তুলাকাষ্ঠ (Cotton wood), এ্যাস্ (Ash), হিকরি (Hickory), ওয়ালনাট (Walnut), সিকামোর (Sycamore) প্রশস্তপত্র বৃক্ষপর্যায়ের অন্তর্গত।

পশু ধরিয়া ও মৎস্য শিকার করিয়া জীবনযাপন করে। শীতকালে তাহারা এইসকল জন্তুর চামড়া সংগ্রহ করে ও শীত অন্তে নিকটবর্তী বিক্রয়স্থলে বিদেশীদের নিকট যাইয়া তৎপরিবর্তে বড়শী, বন্দুক, গুলি, গরম কাপড় প্রভৃতি লইয়া আসে।

পরিবহন।—এই অঞ্চলে রেলপথ নাই। জলপথেই যাতায়াত চলে।—এই অঞ্চলের-অধিবাসীর সংখ্যা এত কম যে, এখানে আজও রেলপথের প্রয়োজন হয় নাই।

আর্থনীতিক উন্নতি।—এই অঞ্চলে কাঠ কাটিয়া চালান দেওয়া একটি প্রধান ব্যবসায়। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে ক্যানাডা ও ফিন্‌লণ্ড বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। শীতকালে



১৩ নং চিত্র।—কাষ্ঠের ভেলা ও করাত-ঘর।

মাটির উপর বরফ জমিয়া যখন শক্ত হয়, তখন বিদেশী কাঠুরিয়াগণ এদেশে আসিয়া কাঠ কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া বরফাচ্ছন্ন নদীর উপর লইয়া যায় ও ভেলার আকারে সাজাইয়া রাখে। বসন্তের প্রারম্ভে বরফ গলিতে থাকিলে নদীর জলে সেই ভেলা ভাসাইয়া তাহারা নদীতীরস্থ করাত-ঘরে লইয়া যায়। পরে সেখান হইতে কাষ্ঠদ্রব্য ও কাষ্ঠের গুঁড়ি প্রভৃতি বিদেশে চালান দেয়। এক্ষণে কেবল জলপথে কাঠ চালান দেওয়া হয় না,—কাঠচালানের জন্য বনমধ্যে রেলপথেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পাইন প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ নরম বলিয়া উহা হইতে দেশলাইয়ের কাঠি হয়, এবং ঐ জাতীয় গাছ পিষিয়া মণ্ড করা হয়। সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হয়।

এইসকল বনের পরিষ্কৃত অংশে এখন কোথাও-কোথাও কৃষিকার্য হইতেছে, এবং রাই, ওট, আলু প্রভৃতি জন্মিতেছে। এক্ষণে এই বনাঞ্চলে এই শ্রেণীর

কাঠ হইতে **রজন, তার্পিন তৈল, আলকাতরা ও কাষ্ঠ সুরাসার** প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। প্যাকিং বাক্সের জন্যও এই শ্রেণীর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। মধ্য ইউরোপে জার্মানি প্রভৃতি দেশের পর্বতোপরি এইরূপ বৃক্ষের বনে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে।

ইউরেশিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে পরিবহনের অসুবিধাবশতঃ এতদিন কাষ্ঠের ব্যবসায় চলিত না। এক্ষণে সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায় জলপথে জাহাজ-যোগে কাষ্ঠ চালানের কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই মণ্ডলের মধ্যে যেখানে-যেখানে প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন ছিল, সেখানে-সেখানে মানুষ প্রথমে যাযাবর ছিল। তখন তাহারা শিকার করিত। কিন্তু এই অঞ্চলের জলবায়ুর জন্য ইহাদের দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। সেজন্য মানুষ ক্রমশঃ বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করিল, এবং গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ এই অঞ্চলে শিল্পসৃষ্টি হইতে লাগিল। একারণে ইউরোপ ও উ. আমেরিকার এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা **সমৃদ্ধিশালী** শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

৩। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল (Warm Temperate Region)

উত্তর ও দক্ষিণ উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল

(যথাক্রমে ৪৫° উ. হইতে ৩০° উ. এবং ৪৫° দ. হইতে ৩০° দ.)

৩নং চিত্রে দেখ, জলবায়ুর তারতম্যানুসারে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলকেও তিনটি প্র-বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও মরুভূমি-অঞ্চল।

এবং **(গ) চীন আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল।**

এই চিত্রে এবং ইহার নিম্নের স্মারক-সূচীতে দেখ, এই মণ্ডলে শীতকালে পশ্চিমাবায়ু পশ্চিম হইতে পূর্বে যাইতেছে। সেজন্য পশ্চিমের প্র-বিভাগটিতে বৃষ্টিপাত বেশী হইতেছে, তাহার পরের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত কম, এবং একেবারে পূর্বের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই মণ্ডল আয়ন-বায়ুর অধীন হয়। তখন বায়ু পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। তাহার ফলে পূর্বের প্র-বিভাগ অর্থাৎ চীন আদর্শের জলবায়ুর দেশে বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা বেশী, মধ্য-ভাগে শীতকালের ন্যায়ই বৃষ্টিপাত কম ও উত্তাপ বেশী, এবং একেবারে পশ্চিমের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত

নিতান্ত কম। তাহা হইলে শীত ও গ্রীষ্ম দুই কালেই মধ্যের প্র-বিভাগে বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম।

এই তিনটি প্র-বিভাগ একই মণ্ডলের অন্তর্গত হইলেও, ইহাদের রীতি-প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। সেজন্য এই তিনটি বিভাগের আলাদাভাবে আলোচনা করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি প্র-বিভাগই দরকারী বিভাগগুলির অন্যতম।

আমেরিকা ভূখণ্ডে ও ইউরেশিয়া ভূখণ্ডে বায়ুর গতি

শীতকালে → গ্রীষ্মকালে ←	ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ুর দেশ	শীতোষ্ণ (১) তৃণভূমির ও (২) মরুভূমির দেশ	চীন আদর্শের জলবায়ুর বা শীতোষ্ণ মৌসুমীর দেশ	শীতকালে →→ গ্রীষ্মকালে ←←	ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ	শীতোষ্ণ (১) তৃণভূমির ও (২) মরুভূমির দেশ	চীন আদর্শের জলবায়ুর বা শীতোষ্ণ মৌসুমীর দেশ	→ ←

(৩ ক) উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিমভাগের ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল

পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান।—উত্তর গোলার্ধে,—(১) ইউরেশিয়া ও আফ্রিকায়,—**ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ স্থানে** (অর্থাৎ মেসেতা মালভূমি বাদে স্পেন দেশে, পর্তুগালে, ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে, পো-নদীর অববাহিকা বাদে ইতালী দেশে, যুগোশ্লাভিয়া দেশে আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে, অভ্যন্তরভাগ-ব্যতীত বলকান উপদ্বীপে, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়)।

(২) **উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত** উপকূলের মধ্যভাগে দক্ষিণ **ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত স্থানে,** এবং

দক্ষিণ গোলার্ধে,—(৩) দক্ষিণ আমেরিকায় মধ্য **চিলি দেশে,**

(৪) দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে **উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলে,**

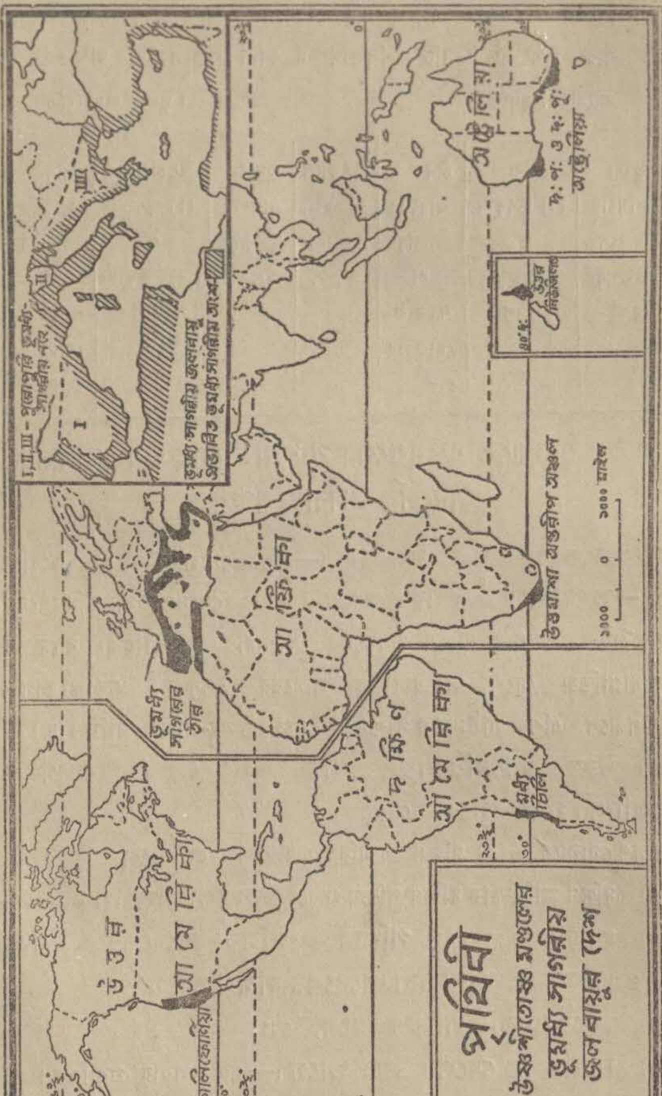
(৫) অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত **পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশের** দক্ষিণ-পশ্চিম **কোণে,** ও (৬) **দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে** ও

(৭) **ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম অংশে,** এবং

(৮) **নিউজিলণ্ড দেশের উত্তর ভাগে** ;—এই জলবায়ু প্রবাহিত।

দ্রষ্টব্য।—লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই সমস্ত স্থানই মহাদেশের পশ্চিম ভাগে ৩০° হইতে ৪৫° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।

উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভূমধ্য সাগর-তীরস্থ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বহুবিস্তৃত। তাই তাহার নাম অনুসারে এই জলবায়ুর অঞ্চলগুলির নাম হইয়াছে—ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল।



১৪নং চিত্র।—ভূমধ্যসাগরীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল।

কেবল শীতকালে বৃষ্টিপাতের কারণ।—সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে-সঙ্গে বায়ুবলয়গুলি সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়। সেজন্য এই অঞ্চল শীতকালে পশ্চিমা বায়ু-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিমা বায়ু পশ্চিমের সমুদ্র হইতে জলকণাপূর্ণ বায়ু বহন করিয়া আনে। সেজন্য শীতকালে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্য বেশী উত্তরে গেলে এই অঞ্চল আয়নবায়ু-বলয়ের অন্তর্গত হয়। আয়নবায়ু নিজ-নিজ গোলার্ধে অধিক উত্তপ্ত বিষুব-রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। অধিক উত্তাপের দিকে যাওয়ার জন্য এই বায়ুও উত্তপ্ত হয়। তাহাতে তাহার জলকণা ধারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সেজন্য গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না। এখানকার শীতকাল আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে, এবং গ্রীষ্ম উত্তপ্ত ও শুষ্ক।

এই প্রদেশের বিশেষত্ব এই যে,—(১) বৃষ্টিপাত শীতকালেই বেশী,—মেরুর দিকে ৩০ ইঞ্চি ও বিষুবরেখার দিকে ১০ই.;—মেরুর দিকে মাত্র একমাস বৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিষুবরেখার দিকে মাত্র আটদিন বৃষ্টিশূন্য মাস দেখিতে পাওয়া যায়। (২) এখানে শীত উগ্র নহে। উত্তাপ শীতকালে গড়ে ৫০° ফা.।—অত্যন্ত শীতের মাসেও ৪০° ডিগ্রির চেয়েও বেশী। গ্রীষ্মে উত্তাপের গড় ৭০° ফা.—সমুদ্র হইতে দূরে ৮০° ডি. ফা. অপেক্ষা বেশী। (৩) আকাশ গ্রীষ্মে মেঘমুক্ত ও রৌদ্রদীপ্ত,—শীতে সূর্যের তাপ মনোরম।

উদ্ভিজ্জ।—এই অঞ্চলে পাইন, সিডার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এখানকার প্রশস্ত-পত্র ওক প্রভৃতি বৃক্ষ পর্ণমোচী নহে। তাছাড়া ছোট-ছোট গাছ ও গুল্মবৎ গাছও জন্মে। অস্ট্রেলিয়ার জারা ও কারি প্রভৃতি ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় বৃক্ষও এই জলবায়ুর অঞ্চলে জন্মে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না বলিয়া রস অভাবে এখানকার গাছগুলি শুকাইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু এখানকার গাছগুলি নানা উপায়ে রস সঞ্চয় করিয়া রাখে। কোন-কোন গাছের পাতা চর্মবৎ,—কাহারও পাতার উপরে মোমের মত একটা প্রলেপ থাকে,—কোন-কোন গাছের ছাল অত্যন্ত পুরু—কাহারও বা পাতা রেশমী রোঁয়ায় আবৃত। ইহাতে গাছের জলীয় পদার্থ অপচয়ের বাধা ঘটে। কোন-কোন গাছের শিকড় অতি দীর্ঘ,—উহার দ্বারা সে বহু নিম্নস্তর হইতে রস সংগ্রহ করে। কোন-কোন গাছের শিকড় পেঁয়াজের মত অতি স্থূল,—ইহার ভিতর সে গ্রীষ্মকালে বাঁচিবার জন্য শীতকালে রস সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহাতে এ-অঞ্চলের গাছগুলি গ্রীষ্মে বৃষ্টির জল না পাইলেও অনায়াসে বাঁচিয়া থাকে,—এমন কি বাঁচিবার জন্য শীতকালে ইহাদের পর্ণও মোচন করিতে হয় না। এইরূপে এখানকার গাছগুলি চিরহরিৎ থাকে। এ-অঞ্চলে তৃণক্ষেত্র নাই।

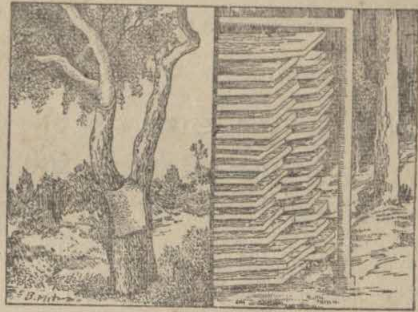
এ-অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী,—উত্তাপে ফল পাকিবার সহায়তা হয়। সেজন্য এই **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল প্রধানতঃ ফলের অঞ্চল**। কমলালেবু, আঙ্গুর, অম্ল লেবু, জলপাই, ডুমুর, পীচ, খুবানি, পেয়ারা, আপেল, কুল, বাদাম, দাড়িম প্রভৃতি ফল, এবং গম, যব, প্রভৃতি শস্য এখানকার উৎপন্ন-দ্রব্য। কিন্তু জলপাই জাতীয় অলিভ (olive) এদেশের বিশেষ উৎপন্ন ফল। এখানকার অন্য ফল অন্য-অন্য জায়গায়ও জন্মে, কিন্তু অলিভ অন্য কোন জলবায়ুর দেশে জন্মে না ;—কোথাও অলিভ দেখিলেই বুঝিতে হইবে ইহা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ। এখানকার জলবায়ু নিঃসন্দেহে গমের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু বহুবিস্তৃত সমতলভূমির অভাবে এখানে বেশী গম জন্মে না।

জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি।—এই জলবায়ু মনুষ্য-বাসের ও সহজে খাদ্যসংগ্রহ করার উপযোগী। ভূমধ্যসাগরের কোন-কোন উপত্যকা বা সমুদ্রগর্ভস্থ কোন-কোন দ্বীপ,—পর্বত, মালভূমি ও সমুদ্র প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক-বেষ্টিত বলিয়া সেখানে বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কাও কম। তাই ভূমধ্যসাগর-তীরে প্রাচীনকালে ফোনেশীয়, গ্রীসীয়, রোমীয় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সেজন্য এই অঞ্চলে লোকবসতি বেশী। পৃথিবীর যে-সকল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে পূর্বে লোকবসতি কম ছিল, সে-সকল স্থানেও এক্ষণে ইউরোপীয়গণ বাস করিতেছে ও ভূমধ্যসাগরীয় কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করিয়া নানাভাবে ব্যবসা করিতেছে। সেজন্য এক্ষণে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। কিন্তু খাদ্যের প্রাচুর্য ও জলবায়ুর মাধুর্যবশতঃ এখানকার লোক অলস ও অল্পে তুষ্ট। এই অঞ্চলে যেমন উত্তাপসহ বৃক্ষাদি জন্মে, সেইরূপ এখানকার জীবজন্তুও উত্তাপসহনশীল। এদেশে তৃণভূমি নাই,—তাই গোপালন হয় না। বড় ঘাস না থাকিলেও এ-অঞ্চলে যে ছোট-ছোট ঘাস জন্মে তাহা গরু তাহার মুখে ধরিতে পারে না বটে, কিন্তু ছাগল-ভেড়া তাহাদের ছোট মুখে ধরিতে পারে। তাই গরু না থাকিলেও এ-অঞ্চলে ছাগল, ভেড়া, গাধা, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়। ঘোড়াও কোথাও-কোথাও দেখা যায়।

পরিবহন।—এই অঞ্চল এখন বাণিজ্যপ্রধান। তাই এক্ষণে এই অঞ্চলে জলে ও স্থলে পরিবহনের সকল প্রকার সুবিধা আছে। গাধা ও উট প্রধান ভারবাহী পশু।

আর্থনীতিক উন্নতি।—পূর্বেই বলিয়াছি, কোন-কোন গাছের ছাল পুরু। পর্তুগাল অঞ্চলে ওক জাতীয় কতকগুলি গাছের ছাল এরূপ পুরু যে, তাহা কাটিয়া-কাটিয়া শিশি-বোতলের ছিপির জন্য বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এই গাছগুলিকে কর্ক-ওক বা ছিপি-ওক বলে।

তুঁত এই জলবায়ুর দেশের একটি বিশেষ গাছ। ইহার পাতা খাওয়াইয়া রেশম-পোকা প্রতিপালন করা হয়। সেজন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে **রেশম-শিল্প** বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এদেশে গরু নাই,—তাই মাখন নাই—এজন্য **জলপাই তেল** প্রধান স্নেহপদার্থ।



১৫ নং চিত্র।
ওক গাছ হইতে ছিপির জন্য ছাল-সংগ্রহ।

শিল্প এ-অঞ্চলে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই,—কারণ এখানে **কয়লার অভাব**। কেবল এ-অঞ্চলে উৎপন্ন ফলশস্য অবলম্বনে কিছু-কিছু ছোট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন,—জলপাই হইতে জলপাই তৈল, এবং তাহা হইতে ও বিদেশের তাল তৈল হইতে সাবান ও মোমবাতি প্রভৃতি, আঙ্গুর হইতে মদ্য, স্পেনের "মেরুণো" ভেড়ার লোমে মেরুণো পশমী কাপড় ইত্যাদি। অবশ্য, এক্ষণে বিদেশ হইতে নানাপ্রকার কাঁচা মাল আনাইয়া নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে।

স্বর্ণ, গন্ধক ও খনিজ তৈল এ-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও পাওয়া যায়, এবং ইহা অবলম্বন করিয়া এই সকল স্থানের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ফলের বাগান ও কৃষিকার্য এ-অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা।

(৩ খ) উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগের নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (স্টেপ্‌স্) ও মরুভূমি

উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগে (৩নং চিত্র দেখ) দুই পার্শ্বের সমুদ্র হইতে বহুদূরে এই প্র-বিভাগ অবস্থিত। ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিভাগ বটে, কিন্তু মহাদেশের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া (৪৯ পৃ. স্মারক সূচী দেখ) ইহার জলবায়ু শীতোষ্ণ নহে,—চরম ;—গ্রীষ্মে উত্তাপ অত্যধিক—৮০° ফা. অপেক্ষাও বেশী,—এবং শীতে শীত প্রবল, ও উত্তাপ অত্যন্ত কম—৩০° ফা. অপেক্ষাও কম। সুতরাং মহাদেশের মধ্যভাগের এই জলবায়ুকে **মহাদেশীয়** জলবায়ুও বলে।

এই অঞ্চলের কতকাংশ নিম্নভূমি, কতকাংশ পর্বতবেষ্টিত উচ্চভূমি। বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে অত্যন্ত কম (পৃ. ৪৮)—২০" ইঞ্চির বেশী নহে ;—কোন-কোন

অংশে আরও কম। বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের তারতম্যানুসারে অল্পবৃষ্টি স্থানে ঘাস জন্মে, এবং বৃষ্টিহীন স্থানে ঘাসও জন্মে না, মরুভূমির সৃষ্টি হয়। তদনুসারে এই প্র-বিভাগটিকে আরও দুই অন্তর্বিভাগে বিভক্ত করা হয় ;—যেমন,—

(১) **উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (স্টেপ্‌স্)**

(২) **উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমি**

(৩খ-১) উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (স্টেপ্‌স্—steppes—

পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান।—উত্তর গোলার্ধে—

(১) **ইউরেশিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত ষ্টেপ্‌স্**-ভূমি নামে বিখ্যাত স্থান —ইহার উত্তরে— সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় বৃক্ষের অঞ্চল,—পূর্বে—বৈকাল হ্রদ,—দক্ষিণে—এশিয়ার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল। পশ্চিমে ইহা কৃষ্ণসাগরের উপর দিয়া কার্পেথিয়ান পর্বত পর্যন্ত গিয়াছে ,—

(২) উত্তর আমেরিকার **ক্যানাডা** ও **আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রেইরিজ** (Prairies) ;—

দক্ষিণ গোলার্ধে—(৩) দক্ষিণ আমেরিকার **আর্জেণ্টিনার অংশ ও উরুগুয়ে** ;—

(৪) **দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ মালভূমি** ;—

(৫) অস্ট্রেলিয়ার **মারে-ডার্লিং অববাহিকা অঞ্চল**—এই জলবায়ুর দেশ।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই অঞ্চলে জলবায়ু চরম, এবং শীতগ্রীষ্মের উত্তাপের প্রভাব অত্যধিক—৫০°—৭০° ফা.। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের অঞ্চলগুলি মহাদেশের সঙ্কীর্ণ অংশে অবস্থিত বলিয়া সেখানে সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাব কিছু-না-কিছু আছেই। তাই সে-স্থানে শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসর কম,—মোটামুটি ২৫°-৩০° ফা.।

উদ্ভিজ্জ।—বৃষ্টির পরিমাণ এ-অঞ্চলে অত্যন্ত কম বলিয়া এখানে কেবল ঘাস জন্মে। প্রকৃতপক্ষে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের এই তৃণভূমি—বৃক্ষহীন,—চারিদিকে কেবল তৃণ ধূ ধূ করিতেছে। এই বহুবিস্তৃত তৃণভূমি বসন্তের প্রারম্ভে নয়নতৃপ্তিকর নব-নব ঘাসের জন্য শ্যাম-শোভা,—গ্রীষ্মের অবসানে রৌদ্রদগ্ধ তৃণের জন্য পিঙ্গলশ্রী, —এবং শীতের মধ্যভাগে তুষার আবরণে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্গত এই বৃক্ষহীন তৃণভূমি এই শ্রেণীর সকল দেশের তৃণভূমির মধ্যে বহুবিস্তৃত। রুশীয় ভাষায় এই বৃক্ষহীন তৃণভূমিকে স্টেপ্‌স্ (Steppes) বলে। তাই ইহার নাম অনুসারে পৃথিবীর যে-কোন স্থানের এইরূপ তৃণভূমিকে বলা হয় 'স্টেপ্‌স্', অর্থাৎ স্টেপ্‌স্-জাতীয় তৃণভূমি। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই ইহাদের একটা স্থানীয় নাম আছে ;—রুশিয়ায় ইহার নাম "স্টেপ্‌স্", উত্তর আমেরিকায়

'প্রেইরিজ' (prairies), দক্ষিণ আমেরিকায় 'প্যাম্পাস' (pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেল্ড্' (veldt), এবং অস্ট্রেলিয়ায় 'ডাউন্স্' (downs)।

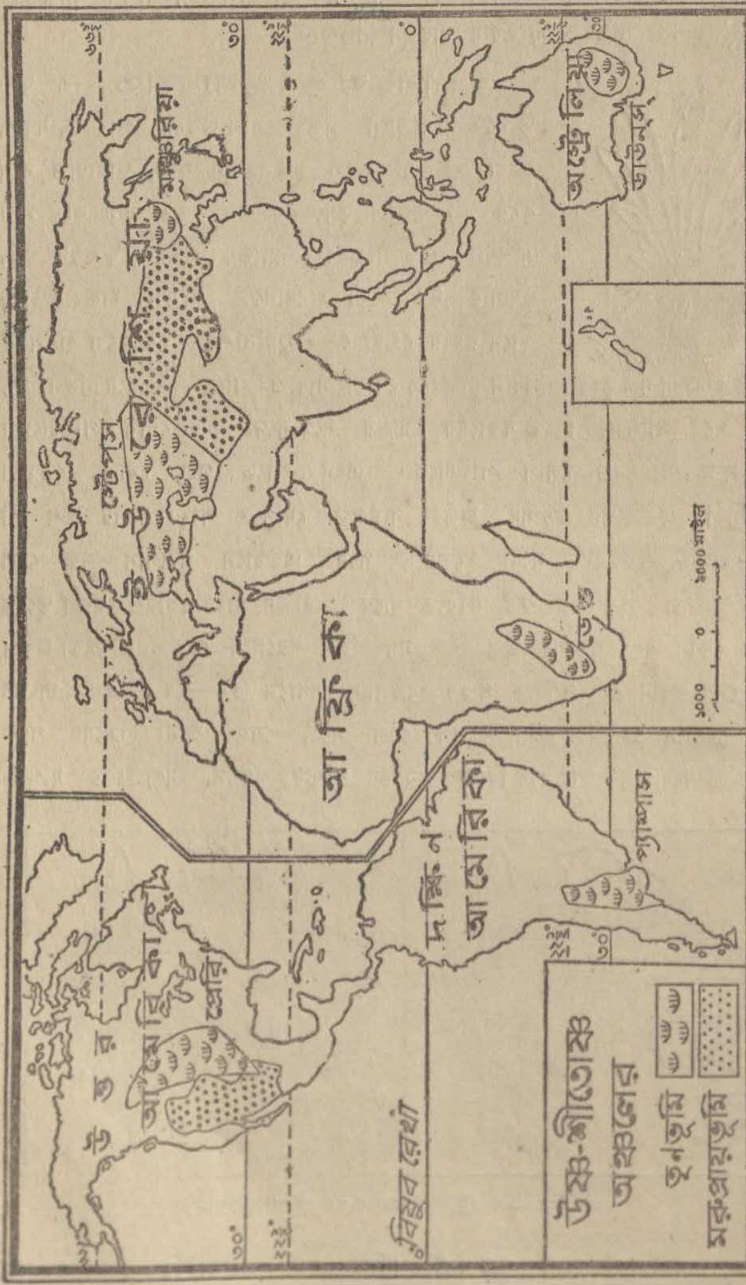

১৬নং চিত্র।—প্যাম্পাস তৃণ।

জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি।—এই তৃণ-ভূমিতে তৃণভোজী জন্তুই বাস করে; আর যে-সকল, হিংস্র জন্তু এই সকল জন্তু ভক্ষণ করে, তাহারাও বাস করে। কিন্তু সব তৃণক্ষেত্রে একই জন্তু বাস করে না। এশিয়ায় ও আফ্রিকায়—ঘোড়া, গাধা, দ্বি-ককুদ্ উষ্ট্র, কৃষ্ণসার মৃগ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার প্রেইরিতে—ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে বাইসনই প্রধান। তবে ঘোড়া, গাধাও আছে;—প্রথমে ছিল না, ইহারা পরে আসিয়াছে। কৃষিকার্যের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে তৃণ লোপ পাইয়াছে। সেই সঙ্গে বাইসনও লোপ পাইয়াছে। এখন আছে গরু, ঘোড়া, ভেড়া। অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষুরবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর পরিবর্তে দেখিতে পাওয়া যায় উপজীবী পশু,—কাঙ্গারু ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরে এইস্থানে খরগোস অন্য দেশ হইতে আসিয়া উৎপাতের সৃষ্টি করিতে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায়ও এইরূপ তৃণের অঞ্চলে কোন বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তু ছিল না, ছিল খরগোস প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্তী জন্তু। গরু ও মেষ প্রধান প্রতিপালিত পশু। বৃষ্টিপাত যেখানে ১০—১৫ ই. এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ যেখানে ৭৫° ডি. ফা. অপেক্ষা বেশী নহে,—সেই স্থানই মেষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী;—তাই পূর্ব দিকের পর্বতের পশ্চিম অঞ্চলে, মহাদেশের দক্ষিণ-



১৭নং চিত্র।—অস্ট্রেলিয়ায় মেষ ও গরু প্রতিপালন-স্থান।

পূর্ব কোণে সর্বাপেক্ষা বেশী মেষ প্রতিপালিত হয়। ডিভাইডিং পর্বতের পূর্বে সমুদ্রতীরে মেষ থাকে না, গরু থাকে; কারণ সেখানে বৃষ্টিপাত বেশী। আর মধ্য



১৮নং চিত্র।—উষ্ণ-শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি ও মরুভূমি বা মরুপ্রায় ভূমি-অঞ্চল।

ভাগেও মেষ থাকে না,—কারণ, সেখানে বৃষ্টিপাত ১০ ই. অপেক্ষা কম। এছাড়া অন্য-অন্য অংশে কম বেশী কিছু-কিছু মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষই এখানকার প্রধান সম্পদ।

পশুপালনই এখানকার লোকদিগের প্রধান জীবনোপায়। এক স্থানের তৃণ ফুরাইয়া গেলে তাহারা পশুর দল লইয়া অন্যত্র যায়। তাই তাহারা যাযাবর। এশিয়ার স্টেপভূমির অধিবাসিগণকে "কিরঘিজ" বলে। ইহারাও পশুপালক যাযাবর। ইহারা যখন যেখানে যায়, সেখানে তাঁবু ফেলে। ঘোড়া ও উষ্ট্র ইহাদের বিশেষ দরকারী পশু। ইহারা বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী। তাই ইহাদের 'কাজাক' বলে। 'কাজাক' শব্দের অর্থ অশ্বারোহী। অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই তাহারা পশুচারণ করে। দিনরাত অশ্বপৃষ্ঠে থাকিলেও তাহাদের কষ্ট হয় না। যদি কখনও কোথাও তৃণক্ষেত্র পুনঃপুনঃ নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাদের পশুর দল লইয়া তাহারা নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করে। 'প্রেইরি' অঞ্চলের লোকদিগকে 'রেড ইণ্ডিয়ান' বলে। এশিয়ার স্টেপ্‌সের লোকেরা প্রধানতঃ পশুপালক। কিন্তু এখানকার লোকেরা পশুপালক হইলেও প্রধানতঃ শিকারী। এখানকার তৃণভূমি এখন কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর্জেন্টিনার তৃণভূমির পশুরক্ষকদের 'গৌচো' বলে। এইরূপ দুঃখকষ্টের জন্য এইরূপ তৃণক্ষেত্রে লোকবসতি কম।

পৃথিবীর লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তৃণক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

পরিবহন।—উষ্ট্র ও অশ্বই এখানে ভারবাহী পশু। এক্ষণে এইসকল তৃণক্ষেত্রে রেলপথের বিস্তার হইতেছে।

আর্থনীতিক উন্নতি।—তৃণক্ষেত্রের এক্ষণে নানা স্থানে আর্থনীতিক উন্নতি হইতেছে। এগুলি ক্রমশঃ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে ও সেখানে শীতোষ্ণ অঞ্চলের উপযোগী শস্য উৎপাদন করা হইতেছে। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে প্রচুর গম, ভুট্টা উৎপন্ন হইতেছে। এশিয়াধীন রুশিয়ায় এবং ইউরোপের রোমানিয়া ও হাঙ্গারির তৃণক্ষেত্রে এখন গম ও রাই জন্মিতেছে। আর্জেন্টিনা এখন একটি বিখ্যাত গম উৎপাদক দেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণক্ষেত্রে মেষ, ছাগল, অষ্ট্রিচ পাখী প্রভৃতি ব্যবসায় হিসাবে প্রতিপালিত হয়। পশম, মোহের ও চর্ম প্রভৃতি এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্য। অস্ট্রেলিয়ায় মেষপালন একটি বড় ব্যবসায়। পশম ও মাংস এখানকার একটি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। এখানে গমও প্রচুর জন্মে।

(৩খ-২) উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমি বা মরুপ্রায় ভূমি (Temperate Desert)।—উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমির ন্যায় মরুভূমি ও

মরুপ্রায়ভূমি একই অঞ্চলে উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত (৩নং চিত্রে দেখ)। যে-স্থানে অল্প বৃষ্টি হয়, সেখানে তৃণ জন্মে। কিন্তু বৃষ্টিপাত যেখানে যতই কম হইতে থাকে সেখানে তৃণও তত কম জন্মিতে থাকে। তখন সেস্থানকে বলে মরুপ্রায়-ভূমি। অবশেষে যেখানে বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম বা আদৌ হয় না, সেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। এসকল স্থানে উত্তাপ ও শৈত্য অত্যন্ত প্রখর, এবং বৃষ্টিপাত কম হয়।

পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান।–উত্তর গোলার্ধে,—উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মধ্যভাগে এই জলবায়ুর স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

এশিয়ায়,—**এশিয়া মাইনরের আভ্যন্তরীণ অংশ, আরবের কিয়দংশ, ইরাণ** (পারস্য), **বেলুচিস্তান, তিব্বত, তুর্কিস্তান** (তুরাণ), **মোঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত গোবি** এই জলবায়ুর স্থান।

উত্তর আমেরিকায়—যুক্তরাষ্ট্রের **দক্ষিণ-পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহ ও উত্তর মেক্সিকো** এইরূপ জলবায়ুর দেশ। মোটামুটি উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চল উত্তর মেক্সিকো হইতে গ্রেট বেসিন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উভয় পার্শ্বে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ পর্বত রহিয়াছে বলিয়া আয়ন-বাতাস এ-অঞ্চলে আসিতে পারে না।

দক্ষিণ আমেরিকায়—**আর্জেন্টিনার পশ্চিম ভাগ** ও মোটামুটি এই শ্রেণীভুক্ত; পশ্চিমে আন্দিজের অবস্থিতির জন্য এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম। **প্যাটাগোনিয়াকেও** এই বিভাগভুক্ত করা হয়। কিন্তু প্যাটাগোনিয়া অক্ষরেখা হিসাবে হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত,—উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে নহে। তবে ইহার জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিচার করিয়া কোন-কোন ভৌগোলিক ইহাকে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি এবং কেহ-কেহ ঐ মণ্ডলেরই মরুভূমি বলিয়া মনে করেন। ইহার বিবরণ পরে (পৃ. ৬০) দেওয়া যাইবে।

জলবায়ু—এই জলবায়ুর দেশের বিশেষত্ব এই যে, এখানে (১) শীতকালে শীতের, এবং গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের প্রাখর্য হয়। তাহাতে শীতকালে এ-অঞ্চলে উচ্চচাপের এবং গ্রীষ্মকালে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ইহাতে শীতকালে এই অঞ্চল হইতে বাহিরের দিকে, এবং গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়;—(২) **শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসর অত্যন্ত বেশী**। পৃথিবীতে উত্তাপের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসরের যতগুলি স্থল আছে, তাহার অনেকগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত;—(৩) **বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম**। বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালেই হয়। কিন্তু যে-সকল স্থান ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর স্থানের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত, তাহাদের পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর মতই শীতকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়।

এই বহুবিস্তৃত স্থানের বিভিন্ন অংশের উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্বের তারতম্য, পর্বত-বেষ্টনীর তারতম্য প্রভৃতির জন্য, জলবায়ুর পার্থক্য হয় বলিয়া ইহার কোথাও পূর্ণ মরুভূমি, কোথায়ও বা মরুপ্রায়ভূমি। সেই হিসাবে এই অঞ্চলকে আরও ক্ষুদ্রতর উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

(১) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত ইরাণ (পারস্য) দেশে শাত ও গ্রীষ্মের প্রার্থর্ব বেশী। বৃষ্টিপাত শীতকালে অল্প হয়। এইরূপ জলবায়ুকে **ইরাণ আদর্শের জলবায়ু** বলে। উত্তর আমেরিকার গ্রেট বেসিন মালভূমিতে লবণ হ্রদ অঞ্চলের জলবায়ু এইরূপ।

(২) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত তিব্বত দেশে শীত অত্যন্ত বেশী। এখানকার জলবায়ুর বিশেষত্ব এই যে;—ইহার উন্মুক্ত স্থানে যখন অত্যন্ত গরম— ছায়ায় তখন বরফ জমিয়া যায়। তিব্বতের অত্যুচ্চ স্থানেই এইরূপ জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জলবায়ুকে **তিব্বতীয় আদর্শের জলবায়ু** বলে।

(৩) পূর্ব তুর্কিস্তানের তারিম অববাহিকা তিন দিকে উচ্চ পর্বতবেষ্টিত। সেজন্য কেবল উত্তর দিক্ হইতে ঠাণ্ডা বাতাস এই দেশে আসিতে পারে। শীতকালে এখানে ০° ফা. অপেক্ষাও উত্তাপ কম হয়। এই ঠাণ্ডা বাতাস উত্তরের শীতলতম স্থান হইতে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তাপের স্থানের দিকে আসে বলিয়া এই বায়ুতে বৃষ্টিপাত প্রায়ই হয় না। সুতরাং এখানে বৃষ্টিপাত কম। তাই এস্থান মরুপ্রায়ভূমি। এইরূপ জলবায়ুকে **তুর্কিস্তান বা তুরাণ আদর্শের জলবায়ু** বলে। এখানে বালুকার বড়-বড় পাহাড় আছে।

(৪) মোঙ্গোলিয়া মালভূমির উপর অবস্থিত গোবি মরুভূমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনহীন মরুভূমি। এখানকার জলবায়ুর মত জলবায়ুকে **গোবি আদর্শের জলবায়ু** বলে।

উদ্ভিজ্জ।—এই অঞ্চলে কোথাও-কোথাও ঘাস জন্মে। বৃষ্টির তারতম্যানুসারে এই ঘাস ছোট-বড় হয়। সুতরাং পশুপালন এ-অঞ্চলের উপজীবিকা ও লোকগুলি যাযাবর। এখানকার জমি উর্বরা। কিন্তু জল অভাবে শস্য-উৎপাদন সম্ভব নহে। এক্ষণে মরূদ্যান ও নদী হইতে জলসেচন করিয়া কোন-কোন স্থানে শস্য উৎপাদন করা হইতেছে। ধান্য, গম, ভুট্টা, ফল ও তুলা এখানকার উৎপন্ন-দ্রব্য।

জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি। জীবজন্তু মরুভূমি-অঞ্চলে কম। উষ্ট্রই প্রধান জন্তু। এখানকার লোক সাধারণতঃ যাযাবর। কিন্তু মরুভূমির মধ্যে যে ওয়েসিস্ বা মরূদ্যান আছে, সেখানে কৃষিকার্য হয় ও লোকে স্থায়িভাবে বাস করে। লোকবসতি এইরূপ জলবায়ুর স্থানে নিতান্ত কম।

পরিবহন। এ-সকল অঞ্চলে উষ্ট্রই একমাত্র ভারবাহী পশু।

আর্থনীতিক উন্নতি। এক্ষণে এই সকল স্থানে, স্থানে-স্থানে কৃষিকার্য ও পশুপালন হইতেছে এবং কৃষিদ্রব্য ও পালিত পশু অবলম্বনে শিল্পদ্রব্যও প্রস্তুত করা হইতেছে। পারস্যের মরুস্থানে গম, ভুট্টা, যব, তরমুজ, তামাক, তুলা, আঙ্গুর, ডুমুর, তুঁত, খুবানি ও বেদানা প্রভৃতি জন্মিতেছে। মনে রাখিতে হইবে, ইরাণের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে এতদূর আসিয়াছে। তাই এখানে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর উপযোগী ফল ও শস্য জন্মিতেছে।

প্যাটাগোনিয়া।—পূর্বেই বলিয়াছি (পৃ. ৫৮) প্যাটাগোনিয়া উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত নহে। তাছাড়া ইহা মহাদেশের অভ্যন্তরেও অবস্থিত নহে। দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণভাগে সঙ্কীর্ণ অংশে ইহা অবস্থিত। তাই সমুদ্র-বায়ুর প্রভাবে ইহার শীতও প্রচণ্ড হয় না, গ্রীষ্মও প্রখর হয় না। ইহার পশ্চিমে আন্দিজ পর্বত অবস্থিত বলিয়া "পশ্চিমা বাতাস" ইহার পূর্বভাগে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। উত্তরে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই প্যাটাগোনিয়ার অবস্থা মরুভূমি ও তৃণভূমির মাঝামাঝি। এখানে কিছু ঘাস জন্মে, ও মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষই এখানকার লোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

(৩গ) উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের পূর্বভাগের চীন আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল—

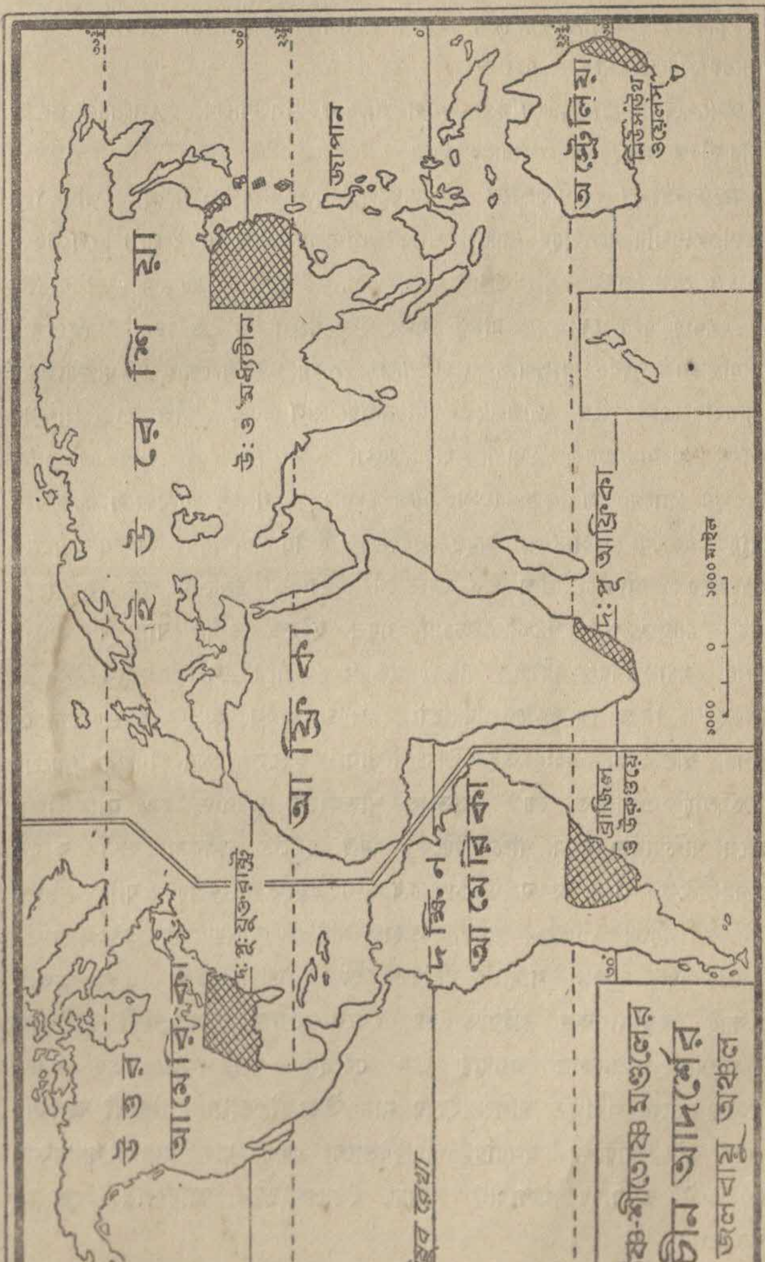
উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের পূর্বভাগে উষ্ণমণ্ডলের নিকটে এই অঞ্চলটি বিশেষ আর্দ্র। এজন্য ইহাকে **আর্দ্র উপক্রান্তি অঞ্চলও** (Humid Sub-tropical region) বলে। আবার উষ্ণমণ্ডলের পূর্বভাগের মৌসুমী অঞ্চলের মত এখানে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত হয়, তাই ইহাকে **শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলও** বলে।

পৃথিবীতে এই জলবায়ুর স্থান। **উত্তর গোলার্ধে**,—**এশিয়ায়**—মধ্য ও উত্তর চীন, পশ্চিম কোরিয়া, দক্ষিণ জাপান,—

উত্তর আমেরিকায়,—দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ মোটামুটি ৯৫° প. দ্রাঘিমা হইতে আটলান্টিক তীর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং ৪৫° উ. অক্ষরেখা হইতে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যুক্তরাষ্ট্রের অংশ,—

দক্ষিণ গোলার্ধে,—**দক্ষিণ আমেরিকায়**,—দক্ষিণ ব্রাজিল, ও উরুগুয়ে ;—

Sri Tapan Kumar Ganguly.



১৯নং চিত্র।—উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের চীন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল।

দক্ষিণ আফ্রিকায়,—দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অংশ,—এবং

অস্ট্রেলিয়ায়,—দক্ষিণ কুইন্সলণ্ড, ও নিউসাউথ ওয়েল্‌সের প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ অংশ,—এই জলবায়ুর দেশ।

জলবায়ু।—গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের গড় উত্তাপ ৮০° ফা। শীতকালে যে-কারণে লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চলে শীতের প্রাবল্য ঘটে (৪২ পৃ.) সেকারণে এখানকারও শীত প্রবল—গড় উত্তাপ ৫০° ফা.। সুতরাং এখানকার জলবায়ুকে "চরম" জলবায়ু বলা হয়। আবার উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল ৩০° ও ৪৫° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। পূর্বেই বলিয়াছি (৪৮ পৃ.) সূর্যের উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের জন্য পৃথিবীর এই অংশ গ্রীষ্মকালে আয়নবায়ু-মণ্ডল এবং শীতকালে পশ্চিমা-বায়ুমণ্ডলের অধীন হয়। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত এই বিভাগ এই মণ্ডলের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত (৩নং চিত্র দেখ)। সেজন্য গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃ আয়নবায়ু প্রভাবে পূর্বদিকের সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এখানে বৃষ্টিপাত করে। আবার, গ্রীষ্মকালে মধ্যভাগে অত্যধিক উত্তাপের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেজন্য পূর্ব পার্শ্বের উচ্চচাপ সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস মহাদেশের মধ্যভাগের দিকে যায়। সুতরাং গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু শীতকালে মধ্যভাগে শীত প্রবল হয়। সেজন্য সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়, এবং এই উচ্চচাপ-স্থান হইতে তখন নিম্নচাপ-সমুদ্রের দিকে শুষ্কবায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু শীতকালে পশ্চিমাবায়ু যখন পশ্চিম দিকের সমুদ্র হইতে জলকণা বহন করিয়া মধ্যভাগের দিকে আসে, তখন উচ্চচাপ মধ্যভাগ হইতে যে-বায়ু প্রবাহিত হইয়া পূর্ব দিকের সমুদ্রের দিকে আসে, তাহার সহিত মিশিয়া যায় এবং সেজন্য পূর্ব পার্শ্বের এই অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। তাহা হইলে এই অঞ্চলে সারাবৎসরই কিছু-না-কিছু বৃষ্টিপাত হয়। তবে **গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টিপাত হয়।** সুতরাং এখানকার জলবায়ু উষ্ণ মৌসুমী বায়ুর মত। এই অঞ্চল উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম **উষ্ণশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল।** চীন দেশে এই আদর্শের জলবায়ু পরিস্ফুটভাবে দেখা যায় এবং সেখানকার উদ্ভিজ্জও এই জলবায়ুর উপযোগী বলিয়া ইহাকে **চীন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চলও** বলে।

জলবায়ুর বিশেষত্ব।—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একই জলবায়ুর বিভিন্ন অঞ্চল থাকিলে তাহাদের মধ্যে জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু

বিভিন্ন মহাদেশে এই জলবায়ুর যে-যে অঞ্চল আছে, সেগুলি একই অক্ষ-রেখায় অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে এই বিভাগভুক্ত বলা হয় বটে, কিন্তু আবেষ্টন অনুসারে তাহাদের মধ্যে জলবায়ু, কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি ও মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালীতে পার্থক্য ঘটিয়াছে। মোটামুটি-ভাবে উত্তর গোলার্ধের উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার এই বিভাগভুক্ত অঞ্চল দুইটির মধ্যে জলবায়ু সম্বন্ধে কিছু সাদৃশ্য আছে। দুইটিকেই (উষ্ণশীতোষ্ণ) মৌসুমী জলবায়ুর দেশ বলা যায়। ঋতু বিশেষে স্থানীয় কারণে যদি নিয়ত বায়ুর গতি পরিবর্তন হয়, তবে তাহাকেই বলে মৌসুমী বা "মরসুমী" বায়ু। এশিয়ায় ও উত্তর আমেরিকায় গ্রীষ্মকালে মধ্যভাগে উত্তাপবশতঃ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেজন্য উচ্চচাপ উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু, গতি পরিবর্তন করিয়া মহাদেশের মধ্যভাগের নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে যায়। সমুদ্রের দিক হইতে আসে বলিয়া **গ্রীষ্মকালে** এই অঞ্চলে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। **শীতকালে** এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। সুতরাং মহাদেশের অভ্যন্তর হইতে বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পশ্চিম বায়ুরূপে বাহিরের দিকে আসিতে থাকে। এই বায়ু শুষ্ক। কিন্তু এশিয়া মহাদেশে এই উত্তর-পশ্চিম বায়ু সমুদ্র হইতে বাঁকিয়া পুনরায় মহাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া, এবং এশিয়ার ও উত্তর আমেরিকার ঝড়ের জন্য এই দুই স্থানে শীতকালেও বৃষ্টিপাত হয়। চীনে গ্রীষ্মেই বৃষ্টিপাত বেশী। উত্তর আমেরিকায় মোটামুটি সারা বৎসরই সমান বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলির দক্ষিণ অংশ সঙ্কীর্ণ বলিয়া সেখানকার এই বিভাগভুক্ত অঞ্চলগুলির জলবায়ু কতকাংশে পৃথক্। সেখানকার মহাদেশগুলির মধ্যভাগে শীতকালে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না,—সেজন্য সেখানে উচ্চচাপ হয় না। এ-কারণে সারা বৎসরই এই সকল অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং এখানে মৌসুমী বায়ু নাই। বৃষ্টিপাত সারা বৎসরই হয়, কিন্তু গ্রীষ্মে বেশী হয়। শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসর উত্তর গোলার্ধের এই জলবায়ুর স্থান অপেক্ষা এখানে কম।

উদ্ভিজ্জ।—এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের মত বনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানকার বনের গাছ উষ্ণ মৌসুমী বনের গাছ অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। এখানকার নিম্নভূমিতে অতিপ্রচুর ও অতিসতেজ পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষ, এবং পর্বতের উপর চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। সেজন্য দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপালাশিয়ান পর্বত, দক্ষিণ ব্রাজিলের পর্বত, দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত, এবং অস্ট্রেলিয়ার ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতে পাইন বন দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যেখানে যেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, সেখানে-

সেখানে প্রশস্তপত্র বৃক্ষগুলি পর্ণমোচী নহে,—চিরহরিৎ। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরের তীরে প্রধানতঃ বালুমাটি ও বৃষ্টির আধিক্যের জন্য প্রশস্তপত্র ও সরলবর্গীয় এই দুই প্রকারের বৃক্ষ জন্মে—দুইটিই চিরহরিৎ।

উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের মত এখানে তালজাতীয় বৃক্ষ, পরগাছা, বাঁশ, কর্পূর, নানাপ্রকার ফুলের গাছ এবং বনের তলায় নানাপ্রকার ঝোপ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বীচ ও ওকগাছও এখানে জন্মে। ইক্ষু, ধান্য ও তূলা মোটামুটি সব স্থানেই হয়। কিন্তু জাপানে ও চীনে ধান, যুক্তরাষ্ট্রে তূলা, এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ইক্ষু প্রধান শস্য। আবার, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন শস্যই উৎপন্ন হয়,—যেমন দক্ষিণ আমেরিকায় গম ও ভুট্টা ও আল্‌ফা-আল্‌ফা ঘাস জন্মে,—অস্ট্রেলিয়ায় ভুট্টা জন্মে ও মেষপালন হয়, এবং আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা জন্মে।

জীবজন্তু ও মনুষ্য-বসতি।—এই অঞ্চলে জীবজন্তুর কোন বিশেষত্ব নাই। তবে জাপানে তৃণভোজী পশু কম। এক্ষণে কৃষিকার্যের উপযোগী গৃহপালিত পশুও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল অংশ,—চীন ও জাপান—এই অঞ্চলে অবস্থিত। অন্যান্য মহাদেশের এই অঞ্চলেও লোকসংখ্যা বেশী।

আর্থনীতিক উন্নতি।—চীনা আদর্শের অঞ্চলগুলি প্রথমে বনভূমি ছিল। বন পরিষ্কার করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে চীনে লোকবসতি বহু পুরাতন,—কত দিনের তাহা বলা যায় না। অতি প্রাচীনকালে উত্তর চীনে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় চীন উন্নত হইয়াছিল। অন্য স্থানে মনুষ্য-বসতি বেশী দিনের নহে। চীন আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চলের বনভূমি কাষ্ঠের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে নাই। কারণ, প্রথমতঃ—শীতকালে এ-অঞ্চলে মাটির উপর বরফ জমিয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ—এ-অঞ্চলের প্রশস্তপত্র বৃক্ষের কাঠ এত ভারী যে ভাসাইয়া লওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ—প্রশস্তপত্র বৃক্ষের কাঠ এত শক্ত যে তাহা দিয়া সূক্ষ্ম কাজ হয় না। কিন্তু এখানকার বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য হইতেছে এবং কৃষিকার্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে লোকবসতি বাড়িতেছে। এই অঞ্চলে মোটামুটি ধান, গম, ভুট্টা, তূলা, ইক্ষু, চা, তুঁত গাছ প্রভৃতি জন্মে। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি, কৃষিদ্রব্য সর্বত্র সমান হয় না,—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দ্রব্য বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থান-উপযোগী কিছু-কিছু শ্রমশিল্পের প্রচলন আছে বটে, কিন্তু জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোথাও উচ্চশ্রেণীর শিল্পসৃষ্টি হয় নাই। জাপানে লৌহ, কার্পাস, রেশম প্রভৃতি বহু শিল্পের এবং দক্ষিণ-পূর্ব

যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ, পেট্রল, সার প্রভৃতি নানা শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় স্থানীয় ইক্ষু অবলম্বনে শর্করা, দক্ষিণ-আমেরিকায় পশুপালন অবলম্বনে চর্মদ্রব্য, এবং গম অবলম্বনে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে।

৪। উষ্ণ বা ক্রান্তীয় মণ্ডল (Tropical Hot Zone)

(৩০° দ. হইতে ৩০° উ.)

৩০° দ. অক্ষরেখা হইতে ৩০° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত সমস্ত স্থানই **উষ্ণ মণ্ডল** বা **ক্রান্তীয় মণ্ডল**। ইহার মধ্যে মোটামুটি ৫° দ. অক্ষরেখা হইতে ৫° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত নিরক্ষীয় অঞ্চল বাদ দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের এই মণ্ডলের অবশিষ্ট অংশের জলবায়ু এইস্থানে বিবৃত হইবে। ৫° উ. হইতে ৩০° উ. **উত্তর ক্রান্তীয় মণ্ডল** এবং ৫° দ. হইতে ৩০° দ. পর্যন্ত **দক্ষিণ ক্রান্তীয় মণ্ডল**।

উত্তর গোলার্ধে উত্তর উষ্ণমণ্ডলে উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং সমুদ্রের উপর দিয়া আসিয়া মহাদেশের পূর্বভাগে (৩নং চিত্র দেখ) যখন এই বায়ু ক্রান্তীয় মণ্ডলের পূর্ব উপ-বিভাগের উপর পৌছে, তখন সেখানকার মহাদেশের পূর্বভাগেই ইহার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং এই অঞ্চলে বন জন্মে। মধ্যভাগে বৃষ্টিপাত কম;—সুতরাং সেখানে কিছু বৃক্ষ, কিছু তৃণ জন্মে, অর্থাৎ সেখানে "স্যাভানা" জাতীয় তৃণভূমি। পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত একেবারে কম;—সেজন্য সেখানে মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু পূর্বভাগের সমস্ত অংশেই যেমন বৃষ্টিপাত হয়,—উহা যেমন মৌসুমী বায়ুর দেশ,—**পশ্চিমভাগে মরুভূমি সেরূপ সমস্ত অংশে বিস্তৃত নহে** (৩নং চিত্র দেখ)। মরুভূমি ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের মধ্যে মধ্যভাগের স্যাভানা জাতীয় তৃণভূমি বিস্তৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সূর্যের গতির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত নিয়ত বায়ু-মণ্ডল উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়া যায়। সুতরাং গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য উত্তর গোলার্ধে কর্কট ক্রান্তির দিকে যাইতে থাকে, তখন বৃষ্টিবহুল নিরক্ষীয় অঞ্চল ক্রমশঃ উত্তরে সরিতে থাকে। সেজন্য উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিমভাগের মরু-অঞ্চলের বিষুবরেখার দিকের কতকাংশে বৃষ্টিপাত হয়। এ-কারণে সেস্থানে তৃণ জন্মে। দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য যখন মকর ক্রান্তির দিকে যাইতে থাকে, তখন এই একই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিমভাগের বিষুবরেখার দিকের অংশে তৃণ জন্মে। এই জন্যই **পশ্চিম দিকের মরুভূমি-অঞ্চল মোটামুটি বিষুবরেখার দিকে ২০° পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহার পরে এই মরুভূমি ও নিরক্ষীয় বনভূমির মধ্যে তৃণভূমি রহিয়াছে।**

এইরূপে স্যাভানা ভূমির ও পূর্বের বনভূমির সর্বত্রই আয়ন-বায়ু প্রভাবে যতটা বৃষ্টিপাত হয়, নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই পরিচলন বৃষ্টির (Convection rain) যোগে বিষুবরেখার দিকে কতকাংশে সেই বৃষ্টিপাত আরও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্যাভানা অঞ্চলে ঘাস নিবিড় ও দীর্ঘতর, এবং মৌসুমী অঞ্চলে বন গভীরতর হয়।

বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুসারে এই উষ্ণ বা ক্রান্তীয় মণ্ডলকে পূর্বের ন্যায় তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (৩নং চিত্র)। যথা,—

(ক) পশ্চিমভাগে,—সাহারীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মরু-অঞ্চল।

(খ) মধ্যভাগে,—সুদান আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি বা স্যাভানা-অঞ্চল।

(গ) পূর্বভাগে,—(উষ্ণ) মৌসুমী জলবায়ু-অঞ্চল।

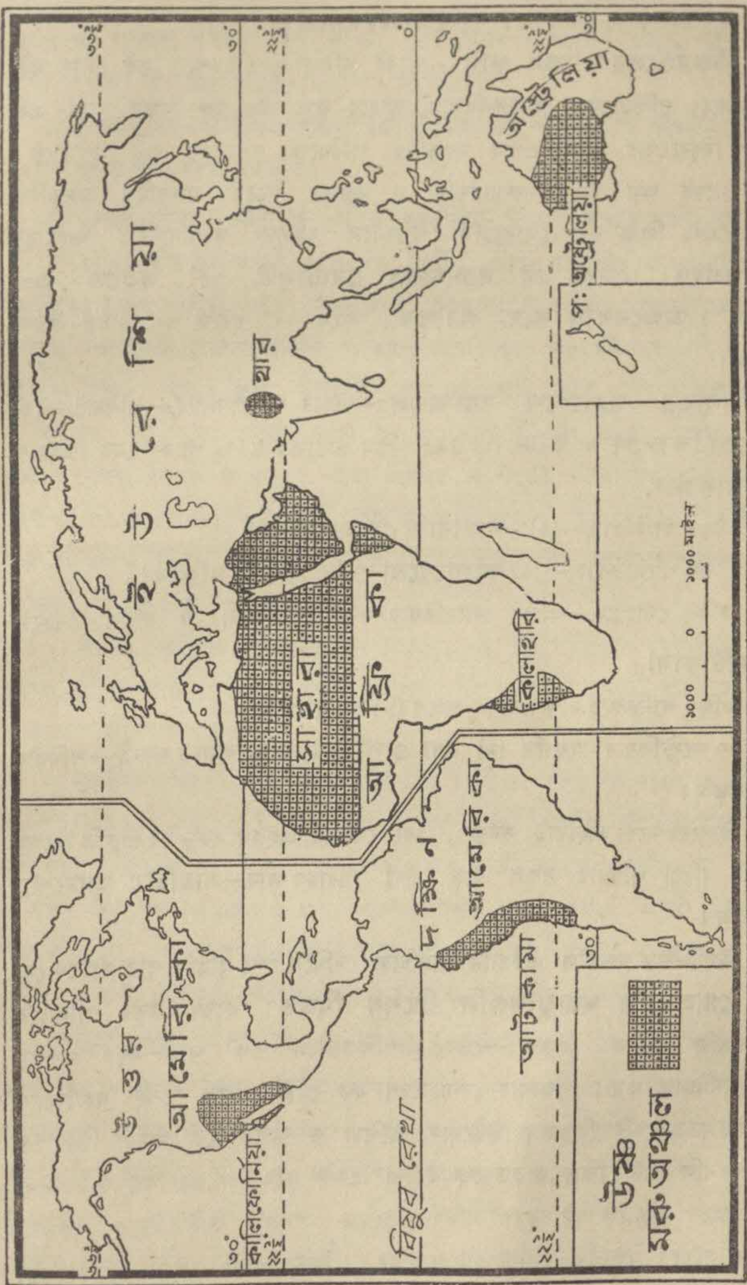
৪ (ক)। উষ্ণমণ্ডলের পশ্চিমভাগের সাহারীয় আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণ মরু-অঞ্চল।

মরুভূমি সৃষ্টির কারণ—নানা কারণে উষ্ণ মরুর সৃষ্টি হয়। (১) উত্তর গোলার্ধে যে উষ্ণ মরু-অঞ্চল আছে, তাহার মেরুর দিকের সীমায় ৩০° উ. অক্ষরেখার নিকটে কর্কটীয়,—এবং দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণ মরু-অঞ্চলের মেরুর দিকের সীমায় ৩০° দ. অক্ষরেখার নিকটে মকরীয়,—**উচ্চচাপ** শান্তবলয় অবস্থিত। বিষুবীয় **নিম্নচাপ** শান্তবলয় হইতে যে বায়ুপ্রবাহ ঊর্ধ্বে উঠিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে যায়, তাহা ক্রমশঃ শীতল ও ঘন হইয়া ৩০° অক্ষরেখার সন্নিহিত স্থানে নামিতে থাকে, ও এই উচ্চচাপের সৃষ্টি করে। চাপ ও সংকোচন (compression) বশতঃ এই বায়ুর উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, এবং ইহাতে ইহার জলকণা ধারণের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। সুতরাং এই স্থানে বৃষ্টি হইতে পারে না। সেইজন্য এই স্থানে জলের অভাবে মরুর সৃষ্টি হয়।

(২) পূর্বেই বলিয়াছি, (৬৫পৃ.), উষ্ণ মরু-অঞ্চল উষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্বে আয়ন বায়ুপথে অবস্থিত। এই বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বিষুবরেখার অভিমুখে আসে, এবং ভূখণ্ডের পূর্বভাগে প্রবেশ করিবার পূর্বে পূর্বদিকের সমুদ্র হইতে জলকণা সংগ্রহ করিয়া আনে। কিন্তু পশ্চিমভাগের এই অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্বে উহার অধিকাংশ বৃষ্টিরূপে পড়িয়া যায়। ঐ বায়ু উষ্ণতর বিষুবরেখার দিকে আসিতেছে বলিয়া ক্রমশঃ উষ্ণতর হয়, ও অবশিষ্ট জলকণা অনায়াসে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। সেজন্য এ-অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না, ও মরুর সৃষ্টি হয়।

(৩) আয়ন-বায়ুর পথে উচ্চ পর্বত থাকিলে ঐ বায়ু পর্বত অতিক্রম করিয়া যখন অনুবাত পার্শ্বে (leeward side) বৃষ্টিচ্ছায়া প্রদেশে (rain shadow) আসিয়া নামিতে থাকে, তখন চাপ ও সংকোচন বশতঃ বায়ুর উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। ইহাতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আন্দিজ, রকি, ড্রাকেন্সবার্গ, ও ডিভাইডিং পর্বতের পশ্চিমদিকে এই কারণে উষ্ণ মরুর সৃষ্টি হইয়াছে।

(৪) যে-সকল মরুর পার্শ্ব দিয়া শীতল সমুদ্রস্রোত বিষুবরেখার দিকে প্রবাহিত, এই স্রোতের জন্য তাহাদের মরুপ্রকৃতির কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, এই শীতল স্রোতের উপর দিয়া সমুদ্র হইতে কোন



২০ নং চিত্র।—উষ্ণ মরু-অঞ্চল

বায়ু উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রবেশ করিলেই উষ্ণতর হয়,—ইহাতে তাহাদের জলকণা ধারণের শক্তি বাড়িয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ইহাতে মরুসৃষ্টির সহায়তা হয়।

উষ্ণমণ্ডলের পশ্চিম ভাগ।—পূর্বেই বলিয়াছি, (৬৬পৃ.), দুই গোলার্ধেই উষ্ণ বলয়ের পশ্চিমভাগে যে-উপ-বিভাগ, তাহার নাম উষ্ণ মরু অঞ্চল, এবং এই অঞ্চলে বিষুবরেখার দিকে প্রথমে মরুভূমির পরিবর্তে তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পরেই অল্প অংশ মরুপ্রায়ভূমি ও তাহার পরেই মরুভূমি। মরুভূমির পরেই মেরুর দিকে দুই গোলার্ধেই শীতকালে বৃষ্টিযুক্ত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ অবস্থিত। এইজন্য এই **মরু-অঞ্চল মোটামুটি ১৫° হইতে ৩০° (বা ৩৫°) অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।** তবে ২০° হইতে ৩০° পর্যন্ত প্রকৃত মরুভূমি।

বিভিন্ন মহাদেশে মরু-অঞ্চল।—উত্তর গোলার্ধে,—এশিয়ায়,—(১) **আরবের কিয়দংশ** ও **জর্ডন**, (২) উত্তর-পশ্চিম ভারতের ও (৩) পাকিস্তানের কিয়দংশ লইয়া **থার মরু**;

উত্তর আফ্রিকায়,—(৪) **সাহারা** ও **সোমালিল্যাণ্ড**;

উত্তর আমেরিকায়,—(৫) **কলোরেডো** ও (৬) **উত্তর মেক্সিকো**;

দক্ষিণ গোলার্ধে,—দক্ষিণ আমেরিকায়,—**উত্তর চিলি** ও দক্ষিণ পেরুতে (৭) **আটাকামা**;

দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে (৮) **কালাহারি**;—

ও অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত (৯) **মধ্য ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুই**—পৃথিবীর উষ্ণ মরুভূমি।

ইহাদের মধ্যে সাহারাই সর্ববৃহৎ, এবং সেখানে এইরূপ মরুভূমির প্রকৃতি বিশেষ পরিস্ফুট বলিয়া পৃথিবীর সকল উষ্ণ মরুর সাধারণ নাম—**সাহারীয় আদর্শের মরুভূমি।**

উপরি-উক্ত মরুগুলি একখানি মানচিত্রে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, **উত্তর গোলার্ধের মরুভূমিগুলি বিশেষ বিস্তৃত।** কারণ, উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলি অধিক বিস্তৃত;—সেজন্য পশ্চিমভাগে শুষ্ক আয়ন-বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম। আবার যে-মহাদেশ যত বেশী বিস্তৃত, সেই মহাদেশের মরুভূমিও তত বেশী বিস্তৃত। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাকে আমরা ভিন্ন-ভিন্ন মহাদেশ বলি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই বৃহৎ ভূখণ্ডের অন্তর্গত সংস্পর্শী বিভিন্ন অংশ মাত্র। এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বৃহত্তম ভূখণ্ড; তাই ইহার মরুভূমি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি,—ইহা এই ভূখণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত হইতে সাহারা মরু,

জর্ডন ও আরবের ভিতর দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে **থার মরু** পর্যন্ত বিস্তৃত,—ইহা প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল দীর্ঘ।

আবার দেখ, অস্ট্রেলিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মহাদেশ। তাই পশ্চিমভাগে সমস্ত মহাদেশের ⅔ অংশ ইহার মরুভূমি।

জলবায়ু।—**উত্তাপ**—গ্রীষ্মে মরুভূমিতে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, (মোটামুটি ৯০° ফা.)—নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চল অপেক্ষাও বেশী। কারণ, নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্যে উত্তাপ কমিয়া যায়। মরুভূমিতে আকাশ মেঘমুক্ত। দিবসে সূর্যোত্তাপ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু রাত্রিতে নির্মল আকাশে তাপবিকিরণ সহজেই হয়, তাই রাত্রিতে ঠাণ্ডাও বেশী। আবার গ্রাষ্মে মরুভূমি যেমন তাড়াতাড়ি তাপ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, শীতকালে তেমনই তাহা খুব তাড়াতাড়ি বিকিরণ করিয়া অত্যন্ত শীতল হয়। সেজন্য দিবার ও রাত্রির, এবং গ্রীষ্মের ও শীতের উত্তাপের প্রসর অত্যন্ত বেশী। এজন্য এখানকার জলবায়ুকে **চরম জলবায়ু** বলে। উত্তাপের এই পার্থক্যের জন্য এখানকার শিলা ফাটিয়া যায়, এবং ক্রমশঃ গুঁড়া হইয়া বালিতে পরিণত হয়। শীতের মোটামুটি উত্তাপ ৬০° ফা.।

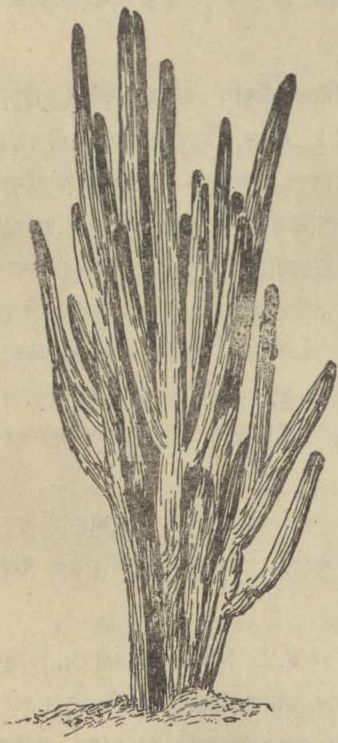
আবার, পৃথিবীর মরুভূমিতে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ উত্তর গোলার্ধেই হয়। কারণ, দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ বলিয়া ইহার মরুপ্রদেশেও সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে উত্তাপের ক্ষীণতা হয়।

বৃষ্টিপাত।—বৃষ্টিপাত মোটামুটিভাবে ১০ ই.। কিন্তু বলাবাহুল্য যে, বিভিন্ন মরুভূমিতে, এমন কি একই মরুর বিভিন্ন অংশে, স্থানীয় কারণে এই বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—আন্দিজের অনুবাতপার্শ্বে আটাকামা মরুতে অবস্থিত ই-কুইক (Iquique) ও এন্টোফাগাস্টা প্রভৃতি স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় না বলিলেই হয়। সাহারার অন্তর্গত কায়রো সহরে বৎসরে ১·৩ই, আরবের অন্তর্গত এডেনে ১·১ ই., থার মরুর পার্শ্বস্থিত জ্যাকোবাবাদে ৪ ই. বৃষ্টিপাত হয়।

উদ্ভিজ্জ।—মরুভূমি বলিলেই মনে হয় ইহা বালির দেশ। কিন্তু ইহা সত্য নহে যে, মরুভূমির সর্বত্র বালুকা থাকে, অথবা, সব মরুই বালুকাময়। **সাহারা** মরুর পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত—বালুকাময়, দক্ষিণপ্রান্ত তৃণময়, এবং মধ্যভাগ—আন্দোলিত মালভূমি,—শিলাময় ও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরময়। কালাহারি মরুভূমির কতকদূর (৩০-৪০ মা) বালুকাময় মরুবৎ। কিন্তু অবশিষ্ট অংশ গুল্মভূমি—স্থানে-স্থানে কাঁটাঝাড় ও হীনতৃণ জন্মে। সেজন্য এই মরুভূমিতে পশুচারণ হয়।

এই সব মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত কম। কিন্তু সেজন্য মরু-অঞ্চল একেবারে উদ্ভিজ্জ-হীন নহে। এ-অঞ্চলে কয়েক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে,—তাহাদের মরু-উদ্ভিজ্জ বলে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চলের উদ্ভিজ্জের ন্যায় এ-অঞ্চলেরও উদ্ভিজ্জগুলি প্রবল উত্তাপে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করে। কোন-কোন উদ্ভিদের শিকড় অত্যন্ত দীর্ঘ,—দীর্ঘ শিকড় দিয়া তাহারা মরুভূমির বহু নিম্ন অংশ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। কোন-কোনটির শিকড় দীর্ঘ নয় বটে, কিন্তু সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক এবং চারিদিকে বিস্তৃত,—মরু-অঞ্চলে কখনও একটুমাত্র বৃষ্টি হইলে ইহারা চারিদিক্ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া রাখে। সেজ্‌গুল্ম, উট্‌কাঁটা, ক্যাক্‌টাস, ইউকা, বাব্‌লা প্রভৃতি মরুভূমির উদ্ভিজ্জ। ক্যাক্‌টাস ও ইউকা প্রধানতঃ আমেরিকার মরুতে দেখা যায়।



২১নং চিত্র।—মরুভূমির উদ্ভিজ্জ।

কিন্তু মরুভূমিতে, যদি কোন নিম্নভূমিতে জল চোঁয়াইয়া আসিয়া মাটির অব্যবহিত নিম্নে অথবা কোন নিম্নতর স্থানে সংগৃহীত হইতে পারে, তবে সেই অঞ্চলে কৃষিকার্য হইতে পারে, এবং বৃক্ষাদিও জন্মিতে পারে। এই সকল স্থানকে **মরূদ্যান** বলে। এই মরূদ্যানে খর্জুরই প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। এখানে গরু, ছাগল, ঘোড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রতিপালনও চলে, এবং গম ও বার্লির চাষও হয়। এই মরূদ্যানগুলির কোন-কোনটি খুব ছোট,—খর্জুরবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত একটি ছোট্ট জলাশয় মাত্র। কিন্তু কয়েক শত বর্গমাইল বিস্তৃত মরূদ্যানও আছে। আরবে এইরূপ মরূদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি।—এই মরুভূমিতে মানুষও বাস করে, এবং এই অত্যুষ্ণ প্রদেশের উপযোগী করিয়া জীবনযাত্রা নিরূপণ করে। উষ্ট্র, অশ্ব, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুই তাহাদের সম্পত্তি। তুন্দ্রা-অঞ্চলের লোকেরা যেমন তাহাদের খাদ্য, পরিধেয় বা আশ্রয়স্থানের জন্য বল্গা হরিণের উপর নির্ভর করে, মরু-অঞ্চলের লোকেরাও সেইরূপ এজন্য এই সকল গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভর করে।

যাহারা প্রকৃত মরুতে বাস করে, তাহারা প্রধানতঃ যাযাবর। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া, এবং উষ্ট্রের দল লইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, এবং বহুবিস্তৃত মরুভূমিতে মরূদ্যান লক্ষ্য রাখিয়া ভ্রমণপথ নির্দিষ্ট করিয়া লয়। মরূদ্যান তাহাদের যাত্রাপথে স্টেশন-স্বরূপ। মরুমধ্যে ইহারা দস্যুতা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মরূদ্যানে যাহারা বাস করে, তাহারা স্থায়িভাবেই বাস করে। কারণ, মরূদ্যান হইতেই তাহারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারে।

পরিবহন।—মরু-অঞ্চলে উষ্ট্রই একমাত্র ভারবাহী পশু। মরুর উপর দিয়া বালুকার জন্য রেলপথ বিস্তার কষ্টকর। পথিমধ্যে জল, কয়লা বা কাষ্ঠ পাইবার সম্ভাবনাও কম। তবে উত্তর-পশ্চিম সাহারা-অঞ্চলে শুয়াপোকা গাড়ী (Caterpiller tractor) চালাইবার ব্যবস্থা আছে।

আর্থনীতিক উন্নতি।—মরু-অঞ্চলের যেখানে-যেখানে খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে, বা নদী অবলম্বন করিয়া জলসেচন সম্ভব হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই কিছু-কিছু উন্নতি হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুতে তাম্র, পক্ষিপুরীষ ও নাইট্রেট পাওয়া যায়। নাইট্রেট একপ্রকার খনিজ লবণ। এই মরুর পাশেই প্রবাহিত শীতল স্রোত যেখানে উষ্ণস্রোতের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেখানে প্রচুর মৎস্য জমিয়া থাকে। এই মৎস্য খাইয়া পক্ষীসকল এই মরুতে পুরীষ পরিত্যাগ করে। ইহা হইতেও সার হয়। এই পক্ষিপুরীষ ও লবণ জমির সারের জন্য বহুদিন হইতে বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে রাষ্ট্রের বিশেষ আয় হইত। কিন্তু অনেক দেশে কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইতেছে। সেজন্য এখানকার এই সার-বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মরুতে স্বর্ণ ও হীরক, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুতে স্বর্ণ ও কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য এ-অঞ্চলে লোকবসতি হইয়াছে। এই লোকবসতি অধিকাংশ স্থলেই অস্থায়ী,—খনির কার্য শেষ হইলেই বিদেশের লোক বিদেশে চলিয়া যায়। এই সকল জলশূন্য মরুতে জলের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়।

মিশরে নীল নদীর জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলোরেডো নদীর জন্য জলসেচন সম্ভব হইয়াছে। সেজন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উন্নতিও হইয়াছে।

মরুর কার্য।—সমুদ্র ও পর্বতাদির ন্যায় মরুভূমিও সভ্যতা-বিস্তারের প্রতিবন্ধক। দক্ষিণ ইউরোপের ও উত্তর আফ্রিকার কোন সভ্যতাই সাহারা ভেদ করিয়া মধ্য আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। মরুর উপর দিয়া পথ থাকিলেও সে-পথে যাতায়াত কষ্টকর।

৪ (খ)। উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগের সুদান আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চল বা উষ্ণতৃণভূমি অঞ্চল বা স্যাভানা (Savanna) অঞ্চল

পৃথিবীর উষ্ণ তৃণভূমি-অঞ্চল।—দক্ষিণ আমেরিকায়,—ওরিনকো নদীর অববাহিকায় অবস্থিত **ভেনেজুয়েলা** (তীরভূমি বাদে) ও **দক্ষিণ ব্রাজিল** ;

আফ্রিকায়,—**নাইজেরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, নিয়াসাল্যাণ্ড, এঙ্গোলা** ও **উত্তর রোডেশিয়া** ;

অস্ট্রেলিয়ায়,—উত্তর তীরস্থ বনভূমি ও মধ্যভাগের মরুভূমির মধ্যবর্তী **পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উত্তরভাগে**, ও **উত্তর টেরিটরি** ও **কুইন্সলণ্ড প্রদেশের উত্তরভাগে অবস্থিত অংশ**,—এই জলবায়ুর দেশ।

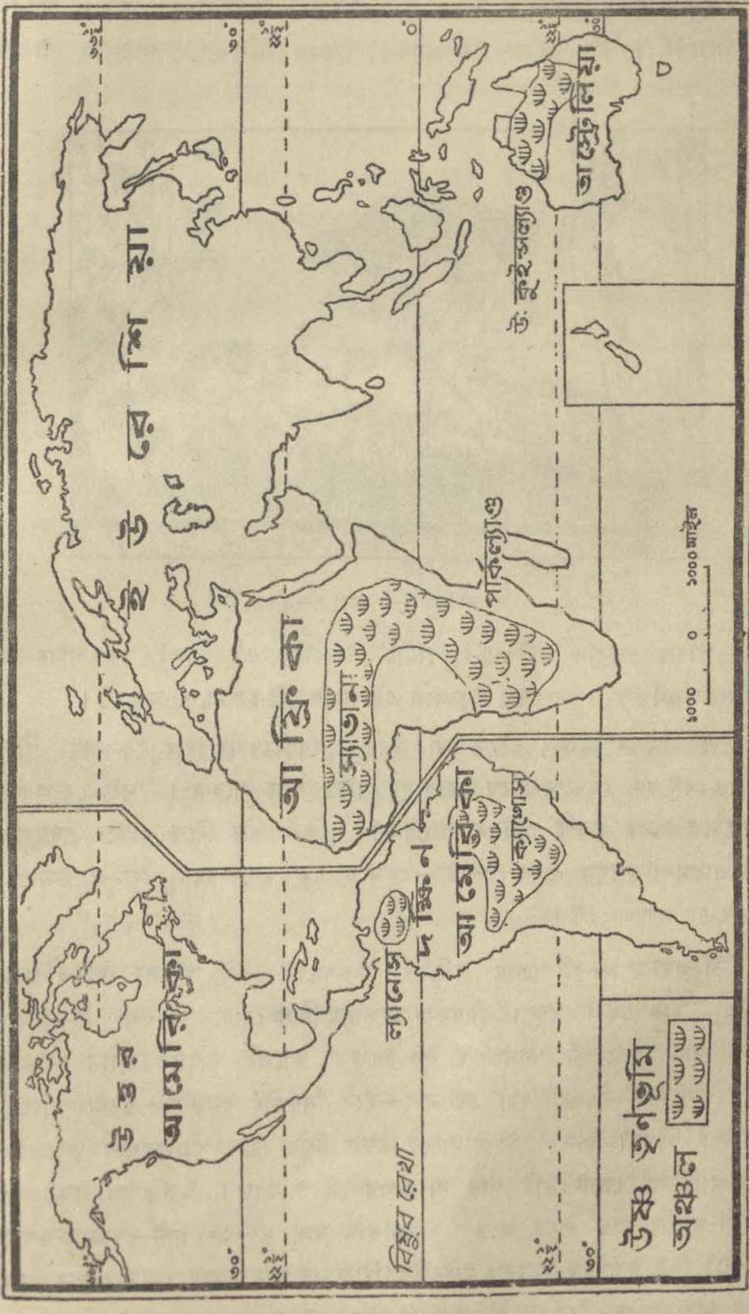
তৃণভূমির স্থানীয় নাম অনুসারে আফ্রিকার তৃণভূমিকে বলা হয় **স্যাভানা** (Savanna), দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনকো অববাহিকায় ইহাকে বলে **ল্যানোস** (Llanos), ব্রাজিলে ইহার নাম **ক্যাম্পস্** (Campos), রোডেশিয়ায় ইহার নাম **পার্কল্যাণ্ড** (Parkland)।

আফ্রিকায় এই ধরণের তৃণভূমি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বলিয়া এই শ্রেণীর সকল তৃণভূমিরই সাধারণ নাম,—**সুদান আদর্শের তৃণভূমি**, বা **স্যাভানা**।

স্টেপ্‌স্‌ ও স্যাভানা।—পূর্বে যে উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমির কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত এই তৃণভূমির পার্থক্য এই যে, শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি (Steppes) **বৃক্ষহীন তৃণভূমি**, কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি (Savanna)-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া এখানে কিছু-কিছু বৃক্ষও জন্মে,—তাই এই তৃণভূমি **বৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি**।

জলবায়ু।—**উত্তাপ**,—এ-অঞ্চলে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয়—৮০° হইতে ৯০° ফা.। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের যে-অংশ মরুভূমির দিকে অবস্থিত সেই অংশে উত্তাপ বেশী, এবং যে-অংশ বিষুবরেখার দিকে সেই অংশে উত্তাপ কম ;—কারণ সেই অংশে বৃষ্টিপাত বেশী।

বৃষ্টিপাত।—বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ;—নিরক্ষীয় বনভূমির অর্থাৎ বিষুবরেখার দিকে বেশী,—মোটামুটি ৮০" ই.—এবং মরুর দিকে ক্রমশঃ কম হইতে-হইতে মরু-সন্নিহিত স্থানে সর্বাপেক্ষা কম,—মোটামুটি ১৫ ই.।



২২ নং চিত্র।—উষ্ণ তৃণভূমি-অঞ্চল।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, (৬৫ পৃ.) বায়ুবলয় সূর্যের অনুসরণ করে। সুতরাং এই আদর্শের তৃণভূমি-অঞ্চলের বিষুবরেখার দিকের কতকাংশে পরিচলন বৃষ্টিপাত



২৩ নং চিত্র।—স্যাভানা-অঞ্চল।

হয়। আবার প্রত্যেক গোলার্ধের 'স্থানীয়' শীতকালে এই অংশই শুষ্ক আয়ন-বায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত হয়। সুতরাং শীতকালে এই অংশে বৃষ্টি হয় না, বা অল্প হয়।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, বিষুবরেখার দিকে যে-অঞ্চলে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত বেশী হয়, সেখানে গ্রীষ্মে উত্তাপ খুব বেশী হইতে পারে না। তাই সে-অঞ্চলে **উত্তাপের প্রসর বেশী হইতে পারে না**। কিন্তু অন্য দিকে বৎসরে সর্বাপেক্ষা বেশী ও কম উত্তাপের প্রসর বেশীই,—৩০° ও ৪০° ফা.—হয়। দৈনিক উত্তাপের প্রসরও এই অঞ্চলে বেশী।

উদ্ভিজ্জ।—বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ হইয়া থাকে। নিরক্ষীয় বনভূমির দিকে যেখানে ৭০—৮০ ই. বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষ জন্মে। কাজেই তাহাকে সুদান আদর্শের জলবায়ু-অঞ্চলের ভিতর ধরা হয় না;—ইহা নিরক্ষীয় বনভূমি,—সুদান আদর্শের উদ্ভিজ্জের পরবর্তী স্থান। ইহার পরেই মরুর দিকে বৃষ্টির অল্পতাবশতঃ তৃণ, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট-ছোট গাছ বা বৃক্ষের ঝোপ জন্মে। আফ্রিকার উত্তরভাগে বাব্‌লা জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে। এখানকার ঘাস ৮—১০ ফিট্—কখনও-কখনও ১২—১৪ ফিট্ লম্বা হয়। কিন্তু মরুভূমির দিকে এই ঘাস ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে, শেষে গুল্মে পরিণত হয়। গ্রীষ্মের আতিশয্যে এই সকল ঘাস শুকাইয়া যায়, এবং

বসন্তের প্রারম্ভে বৃষ্টি পড়িলেই গজাইয়া উঠে। গ্রীষ্মে এই ঘাসরাজ্যের কোথাও একটু আগুন লাগিলে ধূ ধূ করিয়া সমস্ত রাজ্যটাই অবিলম্বে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

জীবজন্তু ও তাহাদের উপর আবেষ্টনের প্রভাব।—এই তৃণরাজ্যে তৃণভোজী জীবজন্তু বাস করে। সুতরাং যে-সকল হিংস্রজন্তু তাহাদের ভক্ষণ করে তাহারাও এখানে বাস করে। তৃণভোজী জন্তুদিগের এই সকল হিংস্রজন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। তাই ইহারা দ্রুতগামী—ইহাদের পাগুলি সরু-সরু, পলায়নক্ষম।

কিন্তু সব স্যাভানা-দেশের জীবজন্তু একপ্রকার নহে। আফ্রিকার স্যাভানা-অঞ্চলে হরিণ, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি তৃণভোজী ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু দেখিতে



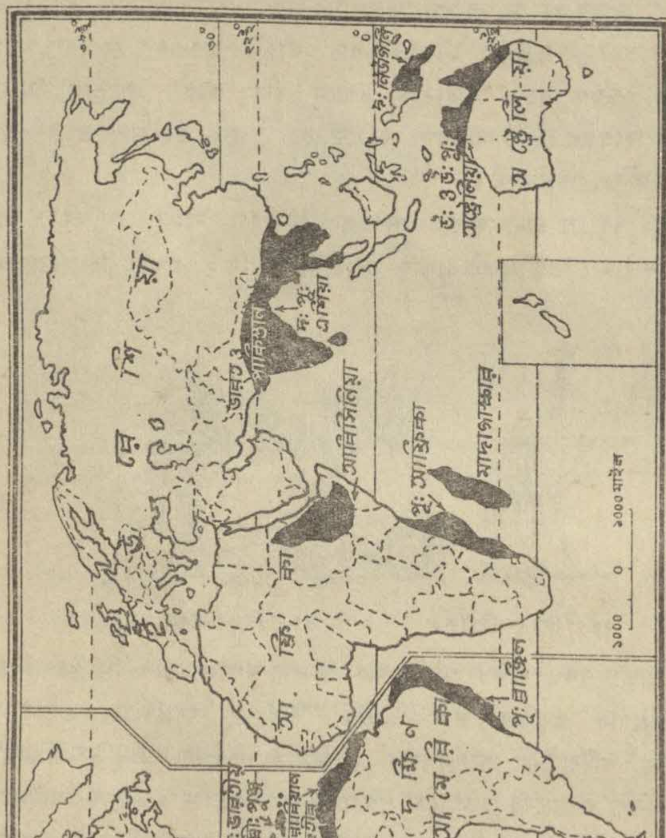
২৪ নং চিত্র।—জিরাফ। ২৫ নং চিত্র।—জেব্রা।

পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার স্যাভানা-অঞ্চলের জন্তুগুলি গৃহপালিত জন্তু নহে,—খরগোস প্রভৃতির ন্যায় তীক্ষ্ণদন্তী চিন্‌চিল্লা, ক্যাপিবারা প্রভৃতি জন্তুই এখানকার অধিবাসী। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে খরগোস প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্তী জন্তু ছিল। কিন্তু খরগোসের উৎপাতে শস্যহানি হইত বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া খরগোস নির্বংশ করিয়াছে। এক্ষণে কাঙ্গারু প্রভৃতি উপজঠরী জন্তুই অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমির প্রধান জন্তু।

আর্থনীতিক উন্নতি।—আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তৃণভূমির উন্নতির তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে তৃণভূমির অধিবাসীরা শিকার করিয়া জীবন-যাপন করে,—তখন তাহারা থাকে যাযাবর। দ্বিতীয় স্তরে, তাহারা একস্থানে স্থির হইয়া পশুপালন করে ও কৃষিদ্বারা জীবন-যাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের যাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ী গৃহবাসী হইবার সম্ভাবনা এই অঞ্চলেই হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে, তাহারা কৃষিদ্রব্যমূলক শিল্প উৎপাদন করিতে শিখে।

কিন্তু স্যাভানা-অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা ছিল অনুন্নত শ্রেণীর লোক, তাই এই অঞ্চলের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে নাই। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের পশুগুলি বিভিন্ন

রকমের। তাই একই রকমের জীবিকা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আফ্রিকার স্যাভানা-অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের উপজীবিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এক



২৬ নং চিত্র।—উষ্ণ মৌসুমী জলবায়ু-অঞ্চল।

শ্রেণীর নিগ্রোরা যাযাবর,—পশুপালনও করে, শিকারও করে। কোথাও আবার কৃষিরও উন্নতি হইয়াছে, এবং কৃষিদ্রব্য অবলম্বন করিয়া শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য অনেক স্থাভানা-অঞ্চলে ইউরোপীয়দিগের চেষ্টায়ই গরু, ভেড়া ও অশ্ব প্রভৃতি আসিয়াছে, এবং এই সকল পশুর প্রতিপালন ও ইহাদের সাহায্যে কৃষির চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ল্যানোস্ ও ক্যাম্পস্ ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্থাভানা-অঞ্চলে এখনও পশুচারণ বিশেষভাবে চলে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে এখনও যাতায়াতের সুবিধা নাই। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে এই সকল জন্তুসম্পর্কীয় ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত তৃণভূমি ক্রমশঃ কৃষিভূমিতে পরিণত হইতেছে। কালক্রমে এই অঞ্চল হইতে পশুপালন লুপ্ত হইবে, এবং কৃষিই এখানকার অবলম্বন হইবে।

৪(গ)। উষ্ণ মণ্ডলের পূর্বভাগে উষ্ণ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীতে মৌসুমী (মরসুমী) জলবায়ুর স্থান।—

এশিয়া মহাদেশে,—**ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ** ;—

উত্তর আমেরিকায়,—**মধ্য আমেরিকা, ক্যারাবিয়ান সমুদ্রের তীর** (ভেনেজুয়েলা ও কোলোম্বিয়ার তীরভাগ), **পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ** ;

দক্ষিণ আমেরিকায়,—**ব্রাজিলের পূর্বতীরের কতকাংশ** ;—

আফ্রিকায়,—**আবিসিনিয়ার পূর্বাংশ, পুর্ব আফ্রিকার তীরভুমি, মাদাগাস্কার** ;—

অস্ট্রেলেশিয়ায়,—**কুইন্সলণ্ড ও উত্তর টেরিটরির তীরভূমি** এবং **নিউগিনির দক্ষিণভাগ** মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। ইহাদের মধ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশেই **প্রকৃত মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত**।

মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তির কারন।—পূর্বেই বলিয়াছি (৬৩পৃ.) যে, **যদি ঋতু** (মরসুম) **বিশেষে স্থানীয় কারণে নিয়ত-বায়ুর গতি-পরিবর্তন হয়**, তবে সেই বায়ুকে বলে **মৌসুমী (মরসুমী) বায়ু**। এবং আরও বলিয়াছি যে, **ভারত যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উত্তর অষ্ট্রেলিয়া** প্রকৃত উষ্ণ **মৌসুমী আদর্শের জলবায়ুর প্রধান স্থান**।

মৌসুমী অঞ্চলগুলি উঃ-পূঃ আয়নবায়ু প্রভাবিত অঞ্চলে অবস্থিত। এই বায়ুই পার্শ্বের সমুদ্র হইতে জলকণা লইয়া আসিয়া এখানে বৃষ্টিপাত করে। কিন্তু স্থানীয় কারণে কোন মরসুমে ইহার গতি পরিবর্তিত হয় ও সেই বায়ুবশেই বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী বায়ু—গ্রীষ্মকালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান-এর উত্তর-পশ্চিম ভাগে নিম্নচাপের এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপর উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। সেজন্য ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে-উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু সমস্ত বৎসর প্রবাহিত হওয়া উচিত, তাহা ভারত ও পাকিস্তানের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে আরবসাগর ও বঙ্গ উপসাগরের দিক্ হইতে বায়ু উত্তর-পূর্ব দিকে যায়। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আসে বলিয়া ইহার নাম **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**।

আবার, গ্রীষ্মকালে এশিয়ার মধ্যভাগে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় বলিয়া, এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে চীনের উপর দিয়া মধ্য এশিয়ার দিকে **দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু** প্রবাহিত হয়।

কিন্তু **শীতকালে** এই দুই স্থানে যথাক্রমে **উত্তর-পূর্ব** ও **উত্তর-পশ্চিম বায়ু** প্রবাহিত হয়। এই বায়ুকেও মৌসুমী বায়ু বলা হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে যে গ্রীষ্মকালে **দক্ষিণ-পশ্চিম** ও শীতকালে **উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** প্রবাহিত হয়, তাহাকে "গ্রীষ্মের মৌসুমী" ও "শীতের মৌসুমী" বলাই ভাল। কারণ, এই দুই বায়ু সর্বদাই উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখী নহে। পর্বত, উপত্যকা, সমতলভূমি ও উত্তাপের তারতম্যবশতঃ এই বায়ুর গতি বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্নমুখী হয়।

জলবায়ু।—মৌসুমীবায়ু-প্রবাহিত দেশে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ মোটামুটি ৮০°—৯০° ফা. ও **শীতকালে** ৬০°—৭০° ফা. পর্যন্ত হয়, এবং শীতকালে শীত কিছু কম হয়। গ্রীষ্মকালে যখন জলগর্ভ মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের দিক্ হইতে আসে, তখন বায়ুপথে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের উপায়স্বরূপ পর্বতাদি থাকিলে সেখানে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, এবং যেখানে ঘনীভবনের সম্ভাবনা যত বেশী, বৃষ্টিপাতও সেখানে তত বেশী। এই জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে ও ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। **মৌসুমী-অঞ্চলে গ্রীষ্মেই প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে এ-অঞ্চল শুষ্ক**।

মৌসুমীবায়ু-প্রবাহিত দেশ গরম দেশ। বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই উত্তাপ কমিয়া যায়। সুতরাং মৌসুমী বায়ুর দেশে তিনটি মাত্র ঋতু প্রবল; (১) মার্চ মাস হইতে মে-র মধ্যভাগ পর্যন্ত **গ্রীষ্মকাল**, (২) মে-র মধ্যভাগ হইতে অক্টোবর পর্যন্ত **বর্ষাকাল**, এবং (৩) নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত **শীতকাল**।

মান্দ্রাজ উপকূলে শীতকালে বৃষ্টিপাত।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবর মাসের পর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বেগ কমিতে ও উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ুর বেগ বাড়িতে থাকে। এই অপস্রিয়মাণ দুর্বল দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু বঙ্গোপসাগরে ক্রমশঃ প্রবলতর উত্তর-পূর্ব বায়ুর চাপে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণাপথের পূর্ব উপকূলে মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু;—সেজন্য মান্দ্রাজ উপকূলে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। মান্দ্রাজে বৃষ্টিপাত বৎসরে এইরূপ—

জা. ১·১ ই.	এ. ০·৬ ই.	জুলা. ৩·৮ ই.	অ. ১১·২ ই.
ফে. ০·৩ ই.	মে. ১·৮ ই.	আ. ৪·৫ ই.	ন. ১৩·৬ ই.
মা. ০·৩ ই.	জু. ২·০ ই.	সে. ৪·৭ ই.	ডি. ৫·৪ ই.

অস্ট্রেলিয়া।—মৌসুমীবায়ু-প্রবাহিত দ্বিতীয় প্রধান স্থান অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষে যখন শীতকাল (জানুয়ারী), অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল। এই জানুয়ারী মাসেই অস্ট্রেলিয়ায় মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়।

উত্তর গোলার্ধে শীতকালে প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ন-বায়ু বিষুবরেখা পার হইলেই ফেরেল সূত্রানুসারে উত্তর-পশ্চিম বায়ুতে পরিবর্তিত হয়। এই সময় সূর্য অস্ট্রেলিয়ার উপরে থাকে, এবং সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এই নিম্নচাপের দিকে উপরি-উক্ত উত্তর-পশ্চিম বায়ু আকৃষ্ট হয়। ইহাই অস্ট্রেলিয়ার মৌসুমী বায়ু;—এবং ইহার জন্য অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগে বিশেষতঃ উত্তর টেরিটরি ও কুইন্সলণ্ড দেশের উত্তর ভাগে, এই সময় বৃষ্টিপাত হয়।

অন্য মৌসুমী বায়ুর দেশ।—প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াই প্রকৃত মৌসুমী বায়ুর স্থান। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার, এবং আফ্রিকা মহাদেশের, যে মৌসুমীবায়ু-প্রবাহিত স্থানগুলির উল্লেখ পূর্বে (৭৭ পৃ.) করা হইয়াছে, উহাদের সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার পার্থক্য আছে। এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালেও উত্তাপ বেশী হয় বটে, এবং এখানে গ্রীষ্মকালেই বেশী বৃষ্টিপাত হয় বটে, কিন্তু এ-সকল স্থান এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মত শীতকালে শুষ্ক নহে,—শীতকালেও এ সকল স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য কোন-কোন ভৌগোলিক শেষোক্ত শ্রেণীর স্থানগুলিকে **ভারতীয় আদর্শের মৌসুমী দেশ** না বলিয়া **ক্যারাবিয়ান আদর্শের মৌসুমী-অঞ্চল** বলেন।

উদ্ভিজ্জ।—পূর্বে-উক্ত উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে বৃষ্টির তারতম্যহেতু তাহার মেরুর দিকে তৃণ ও বিষুবরেখার দিকে চিরহরিৎ বন জন্মে। বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের

জন্যই এই পার্থক্য হয়। মৌসুমী বায়ুর দেশে বৃষ্টিপাত বেশী,—সুতরাং ইহার **সর্বত্র প্রায় বন** দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পর্বতাদির অবস্থান, এবং সমুদ্র ও নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে দূরত্বের তারতম্যবশতঃ বৃষ্টিপাত সর্বত্র সমান নহে। সেজন্য, **বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ অনুসারে** কোথাও **পর্ণমোচী বৃক্ষের বন,** কোথাও তৃণ, কোথাও বা গুল্ম জন্মে। তবে বিষুবরেখার সন্নিহিত অঞ্চলে বনই জন্মে।

জীবজন্তু ও মনুষ্য-বসতি।—মৌসুমী জলবায়ুর দেশে প্রায় সকল রকম উদ্ভিজ্জ আছে। সেজন্য এখানে নানা প্রকারের জীবজন্তু আছে। বনে বাঘ, হরিণ, বানর, ভালুক, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি প্রধান জন্তু। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি গৃহপালিত পশু। এই দেশে বিস্তর সাপ আছে। কৃষিকার্যের সুবিধা আছে বলিয়া এ-অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেশী। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী-অঞ্চলে বাস করে।

পরিবহন।—মৌসুমী জলবায়ুর দেশ প্রধানতঃ নদীবহুল। তাই এখানে পরিবহনের সুবিধা। জলে জাহাজ ও নৌকা, স্থলে রেলপথ, দিয়া যাতায়াত চলে।

আর্থনীতিক উন্নতি।—মৌসুমী-বায়ু-প্রবাহিত অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের জন্য উৎকৃষ্ট **কৃষিকার্য** হয়, এমন কি পর্বতগাত্রে খাঁচ কাটিয়াও এখানে কৃষিক্ষেত্র রচনা করা হয়। বৃষ্টিবহুল স্থানে **ধান** প্রধান কৃষিদ্রব্য। বৃষ্টির তারতম্যবশতঃ **গম, ভুট্টা, ইক্ষু, তৈলবীজ, যব, চা, কফি, পাট, তুলা,** প্রভৃতি জন্মে। পাট একমাত্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান-এর এক অংশে জন্মে। দক্ষিণ চীনে **কর্পূর ও দারুচিনি** জন্মে। ইহার সর্বত্র বাঁশ, ও গাছে পরগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধান্য-উৎপাদন-স্থান :—এজন্য এ-অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি হইয়াছে।

এ-দেশের বন হইতে শক্ত কাঠের ব্যবসায় চলে। ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড—সেগুন, এবং ভারতবর্ষ—শাল কাঠের জন্য বিখ্যাত।

শিল্প।—শিল্প কিন্তু এই অঞ্চলে এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। সহজেই কৃষিকার্য দ্বারা জীবন যাপন করা যায় বলিয়াই বোধ হয় শিল্পের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। এখনও এই সকল দেশ শিল্পোপযোগী কাঁচামাল চালান দিবার ও ঐ কাঁচামাল হইতে বিদেশে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের প্রধান স্থান হইয়া আছে। তবে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জীবিকা অর্জনের নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে, ও লোকের শিল্পচেতনা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান দেশে ক্রমশঃ শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

এই সকল অঞ্চলে অতি সহজেই কৃষিকার্য করা ও তদ্দ্বারা সহজেই জীবিকা অর্জন করা যাইত বলিয়া এখানকার লোক অতি প্রাচীনকালে জ্ঞানচর্চায় উন্নতি করিয়াছিল এবং ভারতবর্ষ ও চীনদেশ অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার শীর্ষে উঠিয়াছিল।

৫। নিরক্ষীয় মণ্ডল বা বিষুবরৈখিক মণ্ডল
(Equatorial Region)

নিরক্ষীয় মণ্ডল বিষুবরেখার উভয়পার্শ্বে মোটামুটি ৫° পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নহে,—স্থানে-স্থানে ইহা ১৫° পর্যন্তও বিস্তৃত আছে,—এবং এই অঞ্চল সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে মোটামুটি যথাক্রমে ১০° পর্যন্ত সরিয়া যায়।

জলবায়ু।—বিষুবরেখার উপরিস্থিত ও সন্নিহিত স্থান বলিয়া এখানে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী। মধ্যাহ্ন-সূর্য এখানে বারমাসই প্রায় মাথার উপরে থাকে। সেজন্য বিষুবরেখার উপরে দিবারাত্র বারমাসই সমান ও অন্য সন্নিহিত স্থানে প্রায় সমান।

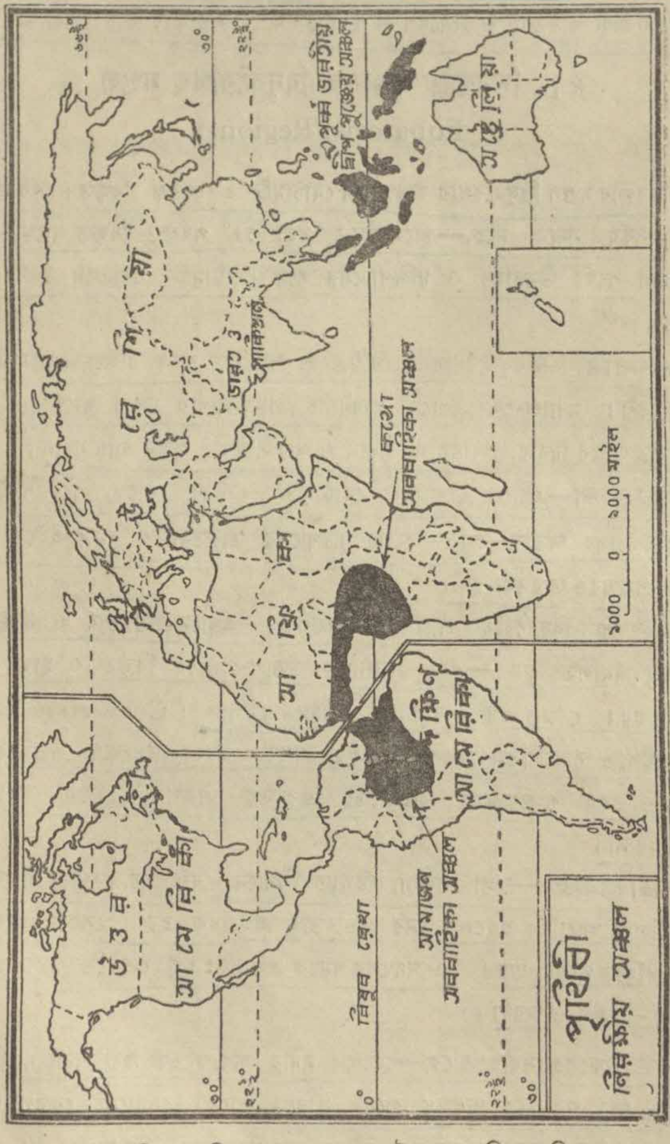
উত্তাপ—এখানে বারমাসই মোটামুটি ৮০° ফা. থাকে, এবং বাৎসরিক শীতাতপের প্রসর অত্যন্ত কম;—অবশ্য বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও সমুদ্র হইতে দূরত্ব অনুসারে প্রসরেরও তারতম্য হয়।

এই অঞ্চল বিষুবরৈখিক শান্তবলয়ের অন্তর্গত;—এখানে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন-বায়ু মিলিত হয়;—এবং অত্যধিক উত্তাপ-প্রভাবে বিস্তৃত ও হাল্কা হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। সেজন্য এখানে বারমাসই পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convection Rain) হয়। বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ বৈকালেই হইয়া থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বজ্রপাত ও মেঘগর্জনও হয়। শান্তবলয়ের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতিই ঐরূপ। সকালে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না।

উদ্ভিজ্জ।—বলা বাহুল্য, বৃষ্টিপাত যেখানে বেশী হয়, সেখানে বনের সৃষ্টি হয়,—বৃষ্টিপাত অত্যধিক হইলে বনের গভীরতাও অত্যধিক হয়। সেজন্য এ-অঞ্চলে ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায়। এ-অঞ্চলের বনকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায়,—জঙ্গল ও অরণ্য।

এই অঞ্চলের নদীর ধারে,—যেখানে নদীর অবস্থিতির জন্য বনভূমি বিভক্ত হইয়া যায়, এবং সূর্যকিরণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারে,—সেখানেই কেবল **জঙ্গল** জন্মে। আর বনের যে-অংশ নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত,—যে-অংশে বন অত্যন্ত নিবিড়,—সূর্যকিরণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সারা বন অন্ধকারাচ্ছন্ন,—তাহাকে বলা যাইতে পারে **অরণ্য**।

বিষুবরৈখিক বন বৃহৎ-বৃহৎ নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ—বন অত্যন্ত গভীর, —পুষ্পসমন্বিত নানাপ্রকার লতায়-লতায় সমস্ত বন পরিপূর্ণ,—নানাপ্রকারের পরগাছা



২৭ নং চিত্র।—নিরক্ষীয় অঞ্চল।

গাছের গায়ে লাগিয়া-লাগিয়া ও গাছ হইতে ঝুলিয়া-ঝুলিয়া বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অরণ্যের গভীরতা এত বেশী যে, সেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এইরূপ স্থানকে বলে "গোধূলি অঞ্চল" (Region

of twilight)। আলোকই বৃক্ষের জীবন ;—সেজন্য অরণ্যের তলদেশের ভূমিতে আগাছা জন্মিতে পারে না। কোথাও একটি বৃক্ষের চারা জন্মিলে যদি সেই চারা বহু উর্দ্ধে কোন স্থানে একটি আলোকের রেখামাত্র দেখিতে পায়, তবে প্রাণপণে অতি দ্রুত সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া বাড়িতে থাকে। তাই এই



২৮ নং চিত্র।—নিরক্ষীয় অঞ্চলের বন।

বনের গাছগুলি অতি দীর্ঘ। এই অরণ্যের আর এক বিশেষত্ব এই যে, এখানে বহু-প্রকারের গাছ হয়। যে-সকল অংশে সূর্য্যালোক বনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, সেই সকল অংশে মাটির উপর এত জঙ্গল জন্মে যে, চলাফেরা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে-সকল বন আছে, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন।

বিষুবরৈখিক বন।—বিষুবরেখা দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ও এশিয়ার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে এই নিরক্ষীয় অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) আমাজন অববাহিকা-অঞ্চল,
(২) কঙ্গো অববাহিকা-অঞ্চল,
(৩) পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-অঞ্চল।

(১) আমাজন অববাহিকা-অঞ্চল।—দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায় সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য এখানে এক নিবিড় বনের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-দেশে এই অঞ্চল অবস্থিত, তাহা বহুদিন পর্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল। সেজন্য পর্তুগীজ ভাষায় এই বনকে "সেল্‌ভা" (Selva) বলে। তিনটি প্রধান নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের মধ্যে এইটি সর্ববৃহৎ। এই বন আমাজন নদীর মুখ হইতে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে এবং ওরিনকো নদী হইতে মাদিরা উপনদী পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই বন "অরণ্য-জাতীয়" (৮১ পৃ.)—এখানে বন অত্যন্ত নিবিড় ও বৃক্ষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে দুই উপনদীর মধ্যে যে-উচ্চ জলবিভাজিকা আছে, তাহার উপরে কিছু তৃণ জন্মে। সেজন্য স্থানে-স্থানে এই সেল্‌ভা-অঞ্চল, তৃণভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

(২) কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চল।—বিষুবরেখা আফ্রিকাকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। আবার, পূর্ব-আফ্রিকা পর্বতবহুল উচ্চ মালভূমি। সেজন্য পশ্চিম ভাগের কঙ্গো অববাহিকায় ও গিনি উপসাগরের উত্তর উপকূলে বৃষ্টির আধিক্য-বশতঃ আমাজন অববাহিকার বনের ন্যায় তৃণভূমির-দ্বারা বিচ্ছিন্ন গভীর বন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আফ্রিকা পর্বত, মালভূমি ও উচ্চভূমি-বহুল স্থান বলিয়া ইহার উপরিস্থিত তৃণভূমি বিস্তৃততর।

পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ব-আফ্রিকা মালভূমি। সেজন্য এই অঞ্চলে অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টিপাতও খুব বেশী নহে ;—সুতরাং বনও খুব গভীর নহে ; এবং উদ্ভিজ্জ-সংস্থানও বিভিন্ন উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন।

(৩) এশিয়ার পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপ লইয়া যে-অঞ্চল,—সেখানেও বৃষ্টির প্রাচুর্যবশতঃ বনভূমির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এ-অঞ্চলও পর্বত ও মালভূমিবহুল, সুতরাং এখানেও উদ্ভিজ্জ-সংস্থান বিভিন্ন প্রকারের হয়, এবং দ্বীপ বলিয়া এখানকার উত্তাপ কমিয়া যায়।

জীবজন্তু ও মনুষ্যবসতি।—বিষুবরৈখিক বন এরূপ ঘন যে, সেখানে কোন বৃহৎ জন্তু বাস করিতে পারে না। বানরকুল গাছে-গাছে লাফাইয়া-

লাফাইয়া এই বনে বাস করে। দক্ষিণ আমেরিকার বনের বানরের লেজ লম্বা। আফ্রিকার বনে গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষ ও অনেক প্রকার বানর বাস করে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বনে ওরাং-আউটাং নামক বনমানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বনে বিস্তর সর্প ও নানাপ্রকার সুন্দর-সুন্দর পক্ষী ও পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ বনে লোক বাস করিতে পারে না। তবে দক্ষিণ আমেরিকার বনের কোন-কোন অংশে একপ্রকার খর্বকায় মানুষ বাস করে। বনের এক অংশে যত লোক বাস করে তাহারা সকলে মিলিয়া বন পরিষ্কার করিয়া এবং গাছপালা, খড় ও লতাপাতা দিয়া জানালা-দরজাহীন প্রকাণ্ড ঘর বাঁধিয়া, তাহার মধ্যে একসঙ্গে বাস করে। আফ্রিকার বনের পাতলা অংশে যে-খর্বকায় লোকেরা বাস করে তাহাদের পিগ্‌মি বলে। এশিয়ার বিষুবরৈখিক অঞ্চলের বনের নদীতীরে যাহারা বাস করে তাহারা কাঠ ও গাছপালা দিয়া মাচা তৈয়ার করিয়া বাস করে। মালয় উপদ্বীপ ও সন্নিহিত কোন-কোন দ্বীপের লোকে গাছের উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে।



২৯নং চিত্র।—হ্রদের তীরে উচ্চ বৃক্ষে বাস।

আর্থনীতিক উন্নতি।—পৃথিবীর বনাঞ্চলের এই আবেষ্টনে,—এই আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ুযুক্ত বনপ্রদেশে—অধিবাসিবর্গের কর্মতৎপরতা কিরূপ হইতে পারে? —এই অঞ্চল পৃথিবীতে বনজাত দ্রব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ। সামান্য আয়াসে এখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়,—বন হইতেও কিছু-কিছু খাদ্য পাওয়া যায়,—অত্যধিক গরমে বস্ত্রাদিরও বিশেষ দরকার হয় না;—তাই এই অঞ্চলের লোকদিগের অভাব-অভিযোগ কম,—এবং বোধহয় অনেকটা এইজন্যই এখানকার লোকে সভ্যতা হিসাবে কোন উন্নতি করিতে পারে নাই।

জীবিকা।—এখানকার লোকেরা প্রধানতঃ **শিকারী**। শিকার করিয়া ও প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া তাহারা মুখ্যতঃ জীবন ধারণ করে। কোন-কোন স্থলে **কৃষিকার্য**ও হয়। ইহাদের জীবনযাত্রার ন্যায় ইহাদের কৃষি-প্রণালীও সরল ও সহজ। অরণ্যের প্রান্তভাগে ইহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া

লয়, এবং পাছে অতিশীঘ্র আবার জঙ্গল জাগিয়া উঠে, তাই সেই স্থানটি আগুনে পুড়াইয়া তৃণহীন করিয়া দেয়। পরিশেষে একটি শলাকা বা তদনুরূপ অন্য কিছু দিয়া গর্ত করিয়া সেই গর্তে শস্যবীজ দিয়া উহা মাটি দিয়া ঢাকা দেয়। পরে শস্য হইলে ও পাকিলে তাহা কাটিয়া লয়, এবং সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় ও পূর্ববৎ সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যায়। পাকিস্তানে,—পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এইরূপ চাষ করিবার প্রথা আছে। এই চাষকে সেখানে বলে "জুম" চাষ। ইংরাজিতে ইহাকে বলে,—Milpa Agriculture। এক্ষণে আমাজন ও কঙ্গো—এই দুই নদীর অববাহিকাতে ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে কৃষিকার্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। তবে এক্ষণে অনেকস্থলে উন্নত ধরণের চাষ হইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি (৮২ পৃ.) যে, এই বন নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কিন্তু কাষ্ঠের ব্যবসায় এখানে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এখানে শীতকালে জমির উপর বরফ জমে না, সেজন্য পাইন বনের মত এখানে কাঠ কাটিয়া বরফের উপর দিয়া টানিয়া লওয়া (৪৭ পৃ.) সম্ভব নহে, এবং কাষ্ঠবহনের জন্য অন্য কোন উপায়ও এখানে নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের পাইন কাঠ হাল্কা বলিয়া জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু এখানকার কাঠ ভারী। তৃতীয়তঃ, এখানকার কাঠ এত শক্ত যে, গভীর বনের ভিতর এই কাঠ ছেদন করা কষ্টসাধ্য। ইহার উপর কারুকার্যও কষ্টকর। চতুর্থতঃ, এখানে একই রকমের গাছ একস্থানে বেশী পাওয়া যায় না,—বনের বিভিন্ন অংশে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাও নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার।

আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকার বন রবারের আদি জন্মভূমি। এই বনে রবার আপনা-আপনি জন্মিত, এবং প্রথমে কেবল স্বচ্ছন্দবনজাত রবারই পাওয়া যাইত। এখন রবারের চাষ হইতেছে। এইস্থানে **রবার-সংগ্রহও** দুরূহ ব্যাপার। নদীর ধারে-ধারে এই গাছ থাকিলে নৌকাযোগে রবার সংগ্রহ করা যায়, নতুবা, পথ কাটিয়া-কাটিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিতে হয়। আমাজন ও নেগ্রো নদীর সঙ্গম-স্থলে ম্যানাওস রবার-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থান। গভীর বনমধ্যস্থ এই স্থান রবার-সংগ্রহের জন্যই বর্তমানকালের আবাস ও আমোদপূর্ণ সহরে পরিণত হইয়াছে। এ-অঞ্চলের রবার পূর্ব-উপকূলস্থ প্যারা নামক বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। তাই এই রবারের নাম "প্যারা রবার"। এখানকার চারা লইয়াই মালয় উপদ্বীপে রবারের চাষ করা হইয়াছিল। তাই সেই রবারের নামও প্যারা রবার। দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলের নদীতীরস্থ স্থানে রবারের চাষও হইতেছে।

তবে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ু অন্য-অন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষা ইউরোপীয়দের পক্ষে বাসোপযোগী বলিয়া, এখানে তাহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল, এবং তাহাদের উৎসাহে ও কর্মপটুতায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের এই অংশ পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে যবদ্বীপের লোকবসতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ঘন। এই অঞ্চলে এখন রবারের আবাদ হইতেছে, এবং স্বচ্ছন্দজাত বনের রবার অপেক্ষা এই রবারই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। **রবার উৎপাদনে মালয় উপদ্বীপ পৃথিবীতে** এক্ষণে (১৯৬০) **প্রথম** এবং **ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র,** দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত গিনি উপকূলে ও সন্নিহিত স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এক্ষণে চাষ-আবাদ হইতেছে। রবারের মত ক্যাকাও-এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর অর্ধেক ক্যাকাও উৎপন্ন হয় গিনি উপকূলের জঙ্গলের পরিষ্কৃত অংশে। ক্যাকাও এখানে এখন প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এই বাণিজ্যদ্রব্য যাহারা উৎপন্ন করে তাহাদের প্রয়োজনের জন্য এখানে **ধান্য, কদলী, ভুট্টা** প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হইতেছে।

এই **গিনি-অঞ্চলের** আরও **একটি** কৃষি ও বাণিজ্যদ্রব্য **তৈলতাল**। ইহা তালজাতীয় বৃক্ষ,—ইহার ফল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, এবং সেই তৈল দিয়া বাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। **পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ তালতৈল উৎপন্ন হয় বেলজীয় কঙ্গো দেশে,—এক তৃতীয়াংশ—নাইজেরিয়া দেশে,** এবং নাইজেরিয়া নদী বাহিয়া নাইজেরিয়ার তালতৈল এত বিদেশে চালান যায় যে, এই নদীকে বলে "তেলের নদী"

এই গিনি-অঞ্চলের লোকের জীবনযাপন-প্রণালী ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে। বনাঞ্চলের লোক স্তরে-স্তরে যে কত উন্নতি করিতে পারে, ইহা তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষণে এই অঞ্চল হইতে নারিকেল, নারিকেল-দ্রব্য, কদলী, ধুনা, হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ, ক্যাকাও, রবার, গাটাপার্চা, সার্সাপেরিলা, কফি প্রভৃতি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

ভূমধ্যসাগরীয় ও মৌসুমী জলবায়ুর তুলনা

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু-অঞ্চল	মৌসুমী জলবায়ু-অঞ্চল
১। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্বে উভয় গোলার্ধে ৩০° হইতে ৪৫° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।	১। উষ্ণ মণ্ডলের পূর্ব পার্শ্বে উভয় গোলার্ধে ৫° হইতে ৩০° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।

২। ইহার উপর দিয়া শীতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমা বায়ু, এবং গ্রীষ্মে শুষ্ক আয়নবায়ু প্রবাহিত হয়।

৩। **বৃষ্টিপাত**।—আর্দ্র পশ্চিমা-বায়ু-প্রভাবে এখানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। তাই ইহাকে বলে শীতকালে বৃষ্টিপাতের দেশ। গ্রীষ্মকালে ইহা প্রায় বৃষ্টিহীন। বৃষ্টিপাতের গড় ৩০" ইঞ্চি।

৪। **উত্তাপ**।—গ্রীষ্ম ও শীতকালের উত্তাপ পর্যায়ক্রমে ৭০° ফা ও ৫০° ফা.। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানে গ্রীষ্মকালের গড় উত্তাপ ৮০° ফা.।

৫। **আকাশ**।—বৎসরের অধিকাংশ দিন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে।

৬। **উদ্ভিজ্জ**।—অল্পবৃষ্টির স্থানে ছোট-ছোট গাছ ও গুল্ম জন্মে। কিন্তু বেশী বৃষ্টির স্থানে চিরহরিৎ প্রশস্তপত্র বৃক্ষের (ওক প্রভৃতির) বন জন্মে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না বলিয়া এখানকার গাছ নানা উপায়ে বাঁচিয়া থাকে। কোনটির শিকড় অতি দীর্ঘ, কোনটির শিকড় বর্তুলপ্রায় মূলযুক্ত, কোনটির ছাল পুরু ইত্যাদি।

৭। **আর্থনীতিক উৎপন্ন-দ্রব্য**।—এখানে আঙ্গুর, কমলালেবু, লেবু, অলিভ প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। প্রধানতঃ ইহা ফলের দেশ। খাদ্যশস্যের মধ্যে গম প্রধান।

২। ইহার উপর দিয়া সারা-বৎসরই উ.-পূ. আয়নবায়ু প্রবাহিত হয়।

৩। **বৃষ্টিপাত**।—প্রধানতঃ আর্দ্র উ.-পূ. আয়নবায়ুই বৃষ্টিপাতের কারণ কিন্তু স্থানীয় কারণে অন্য বায়ু প্রভাবেও বৃষ্টি হয়। যেমন, ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু, অস্ট্রেলিয়ায় উত্তর-পশ্চিম বায়ু, দক্ষিণ-চীনে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু বৃষ্টিপাতের কারণ। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়, শীতকালে ইহা শুষ্কপ্রায়। বৃষ্টিপাতের গড় ৫০-৭৫ ইঞ্চি।

৪। **উত্তাপ**।—গ্রীষ্মের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী ৮০°—৯০° ফা.। শীতের উত্তাপ ৬০° ফা.।

৫। **আকাশ**।—বৎসরের অধিকাংশ দিন আকাশ মেঘযুক্ত থাকে।

৬। **উদ্ভিজ্জ**।—অধিক বৃষ্টির স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বন,—অপেক্ষাকৃত অল্প বৃষ্টির (৪০"—৮০") স্থানে পর্ণমোচী বৃক্ষের (শাল) বন, তদপেক্ষা অল্পবৃষ্টির স্থানে তৃণ—ও বৃষ্টিহীন স্থানে মরুভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। **আর্থনীতিক উৎপন্ন দ্রব্য**—ধান্য, গম, পাট, ডাল, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি প্রধান কৃষিদ্রব্য।

৬। পার্বত্য অঞ্চল

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত উচ্চ পর্বত ও মালভূমিগুলিকে একটি বিভিন্ন অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পর্বতগুলি যে-স্থানে অবস্থিত তাহার পাদদেশে হয়ত জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ বা মানুষের রীতি-প্রকৃতি চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের মতই। কিন্তু পর্বতের নিম্নদেশ হইতে অত্যুচ্চ অংশ পর্যন্ত নানা রকমের জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চে উঠিলে ১° ফা. উত্তাপ কমিয়া যায়। সেজন্য হিমালয় প্রভৃতির ন্যায় অত্যুচ্চ পর্বতের উচ্চতম ভাগ চিরতুষারে আবৃত থাকে। পর্বতের যে-সীমারেখার উপর সারাবৎসর আদৌ বরফ গলে না, তাহাকে বলে **হিমরেখা**।

আবার, পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে জলগর্ভ বাতাস প্রতিহত হইলে সে-স্থানে বৃষ্টিপাত হয়, ও চিরহরিৎ বন প্রভৃতি জন্মে। কিন্তু প্রতিবাত পার্শ্বে বৃষ্টিচ্ছায়া-অংশে বৃষ্টির অভাবে তৃণাদি জন্মে। এইরূপে একই পর্বতের গাত্রে নানাস্থানে, এমন কি পাশাপাশি, এরূপ বিভিন্ন জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় যে, পর্বতীয় জলবায়ু সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর। সেজন্য পর্বতীয় জলবায়ুকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) নিম্নে—**উষ্ণ**, (২) মধ্যে—**শীতোষ্ণ**, (৩) উচ্চে—**শীতল** জলবায়ু। বলা বাহুল্য, বিষুবরেখার উপরিস্থিত পর্বতের পাদদেশের জলবায়ু উষ্ণ। তাহার উপরে ক্রমশঃ শীতোষ্ণ ও শীতল। শীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশস্থ অঞ্চলের জলবায়ু শীতোষ্ণ। তাহার উপরে জলবায়ু শীতল। মেরু-অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশের জলবায়ু শীতল। বিষুবরেখার উপর, উষ্ণ ও শীতোষ্ণ অঞ্চল, সমুদ্র সমতল হইতে ক্রমশঃ ৩০০০ ফিট্ ও ৬০০০ ফিট্ এবং শীতল অঞ্চল ৬০০০ ফিট্ হইতে উচ্চতর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ২০° অক্ষরেখার উপর পর্বতের উষ্ণ অঞ্চল হয়ত ১০০০ ফিটের বেশী নহে।

উদ্ভিজ্জ।—জলবায়ু অনুসারে উদ্ভিজ্জ, উৎপন্ন শস্য ও মানুষের জীবনধারাও বিভিন্ন। উষ্ণ অঞ্চলে পর্বতের পাদদেশে উষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি পাওয়া যায়। তাহার উপরে ক্রমশঃ উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের চিরহরিৎ বন, ও তাহার উপরে হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন জন্মে, তাহার উপরে গাছ ছোট হইতে থাকে। তাহার উপরে তৃণভূমি। তাহার উপরে তুষার-ভূমি। পৃথিবীপৃষ্ঠে নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে মেরু-অঞ্চল পর্যন্ত উদ্ভিদের এইরূপই পরিবর্তন দেখা যায়।

মনুষ্যবসতি ও আর্থনীতিক উন্নতি।—উষ্ণ অঞ্চলে পর্বতের কিছুদূর উপরে, কিংবা মালভূমির উপরে বাস করা সুখকর। ইউরোপীয়গণ এইরূপ স্থলে সমতল-ভূমিতে বাস করিতে পারে না বটে, কিন্তু পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে, এবং এইরূপ স্থানে এই অধিবাসিগণ শস্য-উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে।

শীতোষ্ণ অঞ্চলে—গম, ভুট্টা, ফল, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু কৃষিকার্য এখানে কষ্টকর। **কফি** পর্বতীয় শীতোষ্ণ অঞ্চলের একটি প্রধান অর্থপ্রসূ উৎপন্ন-দ্রব্য ;—পৃথিবীর $\frac{৯}{১০}$ অংশ কফি এই পর্বতীয় শীতোষ্ণ অঞ্চলে ৩০০০ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চ অংশে পাওয়া যায়। এই অংশকে কফি-অঞ্চল বলে। এই অঞ্চলের আর একটি উৎপন্ন-দ্রব্য শিশল তন্তু,—ইহার সূতায় শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। কেনিয়া-অঞ্চলে এই দুইটি দ্রব্যই প্রচুর জন্মে। কোন-কোন স্থলে পর্বতগাত্র কাটিয়া খাঁজ করিয়া ধান্যাদি উৎপাদন করা হয়।

উচ্চতর **শীতল অঞ্চল** প্রধানতঃ তৃণভূমি—পশুপালনই সেখানে প্রধান উপজীবিকা। সুইজর্লণ্ডে পর্বতের উচ্চাংশে গ্রীষ্মকালে পশুপালন হয় ও দুগ্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু কোথাও-কোথাও আলু ও যব জন্মে। ১৩০০০ হইতে ১৬০০০ ফিট উচ্চ অংশ কৃষির অনুপযোগী। তাহার উপর চিরতুষার বিরাজিত।

পর্বতের এই সকল উচ্চ অংশে বাণিজ্য বিশেষ পরিণতি লাভ করে নাই। যাতায়াতের অসুবিধাই তাহার প্রধান কারণ।

উষ্ণ অঞ্চলের কোন-কোন পর্বতে খনিজ পদার্থের আকর আছে, এবং এই খনি অবলম্বন করিয়া সেখানকার লোক উন্নতি করিয়াছে। মেক্সিকো, পেরু, বোলিভিয়া হইতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য বিদেশীরা লইয়া গিয়াছিল। মেক্সিকো এখন প্রধান রৌপ্য-উৎপাদন স্থান। বোলিভিয়া এককালে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-উৎপাদন স্থান ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা হইতে এখনও খনিজ পদার্থ প্রচুর পাওয়া যায়। জোহান্স্বর্গ এখন পৃথিবীতে অন্যতম প্রধান স্বর্ণ-উৎপাদন-স্থান।

পূর্বেই বলিয়াছি (৮৯ পৃ.), পর্বতের কিছুদূর উচ্চ অংশে এবং উচ্চ মালভূমির উপরে বাস করা সুখকর। অত্যুচ্চ পর্বতের উপরে, স্বাস্থ্যকর ও সুখকর জলবায়ুর মধ্যে বাস করিয়া, পার্বতীয় শীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক স্থলে মানুষ পাদদেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য হইয়াছিল। মধ্য-দক্ষিণ আমেরিকা এ-বিষয়ে

অগ্রগণ্য। পেরুর "ইন্‌কা"-গণ, এবং মেক্সিকোর "আজটেক"-গণ প্রাচীনকালেও সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল ও সমধিক রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল।

মানুষের জীবন-যাপনে পর্বত নানাভাবে কার্য করিয়া থাকে। (১) দুই দেশের মধ্যে পর্বত সীমা-নির্দেশের প্রকৃষ্ট উপায়, (২) শত্রু হইতে আত্মরক্ষাকল্পে পর্বতের অবস্থিতি সুবিধাজনক; (৩) পর্বত—উদ্ভিজ্জ, সভ্যতা, জীবজন্তু ও মানবজাতি-বিস্তারের প্রতিবন্ধক; (৪) পর্বত বৃষ্টিপাতের অন্যতম কারণ; (৫) পর্বতীয় নদী বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক; (৬) পর্বতবেষ্টিত স্থানে প্রাচীন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং ভাষার প্রকৃতি বহুকাল অব্যাহত থাকে।

২

ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বিভাগ

(Natural Regions)

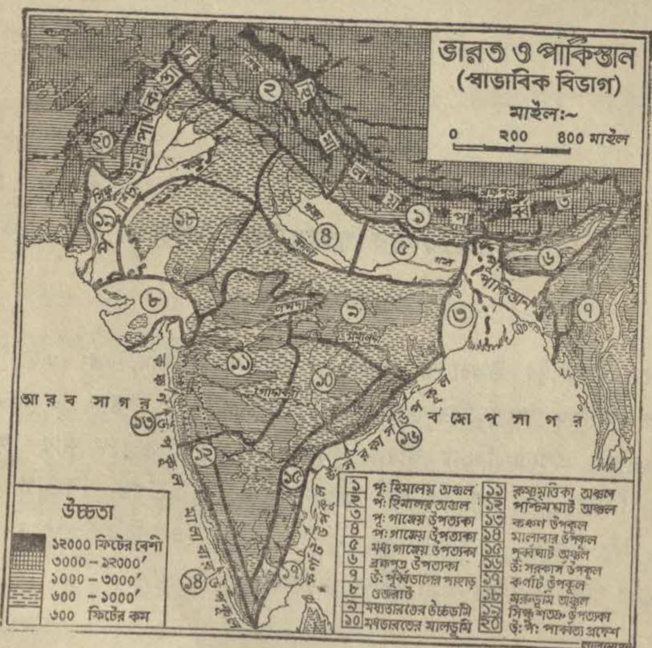
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ পর্বতময়, দক্ষিণাংশে মালভূমি, এবং এই দুইয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত অংশ নিম্ন-সমতলভূমি। কিন্তু জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, উৎপাদন-শক্তি এবং ভূ-প্রকৃতি একত্রে বিচার করিয়া ভূপৃষ্ঠের এই বিভাগগুলিকে আরও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এই বিভাগগুলিকে **স্বাভাবিক বিভাগ** বলে। দেশের রীতি-প্রকৃতি, উৎপাদন-শক্তি, বাণিজ্য ক্ষমতা ও বিবিধ সম্পদ্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে এই বিভাগগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(ক) হিমালয় পর্বতশ্রেণী –

সমস্ত হিমালয় পর্বতশ্রেণীই প্রস্তরময় ও বনাচ্ছন্ন। কিন্তু ইহার পূর্বভাগে মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, এবং ক্রমশঃ পশ্চিমে বৃষ্টির পরিমাণ ন্যূন হইতে ন্যূনতর। সেজন্য এই পর্বত-প্রদেশের সর্বত্র বনের গভীরতা একরূপ বা

বনের গাছপালা একজাতীয় নহে। কৃষিদ্রব্যও সর্বত্র সমান উৎপন্ন হয় না। এইরূপ পার্থক্য অনুসারে সমগ্র হিমালয়-অঞ্চলকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১। **পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল**।—নেপালের পশ্চিম-প্রান্ত হইতে আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত নামচা বারওয়া শৃঙ্গ পর্যন্ত—**পূর্ব-হিমালয়**। গঙ্গার মধ্য-ভাগের উপত্যকার উত্তরে ইহা অবস্থিত। উচ্চতা অনুসারে প্রথমে (১) **তেরাই**—ইহা অস্বাস্থ্যকর, ঘাস ও গুল্মপূর্ণ স্যাঁৎসেঁতে উচ্চভূমি,—উত্তরবঙ্গের উত্তর ভাগে এই তেরাই-অঞ্চলে প্রধানতঃ চা-এর বাগানের জন্য লোকবসতি ঘন। এখানে তেরাই অংশকে বলে **দুয়ার** (দ্বার—অর্থাৎ হিমালয়ের প্রবেশ-দ্বার)। উত্তর-প্রদেশের উত্তরে তেরাই-অঞ্চলে শস্য উৎপন্ন হইতেছে;—সেখানে এই অঞ্চল পূর্ব দিকের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর নহে,—প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তরে,—



৩০নং চিত্র

(২) **ছোট-ছোট পাহাড়ময় ভূমি**—৫০০০ ফি. উচ্চ,—ইহা প্রধানতঃ শালবনে পূর্ণ,—কোথাও-কোথাও কাঁটাগাছের বন আছে,—আবার যেখানে বৃষ্টির অল্পতা, সেখানেই ঘাস। ইহার উত্তরে,—

(৩) **বহিঃ-হিমালয়**—ও তাহার উত্তরে,—

(৪) **প্রধান হিমালয়**।—ইহা ১৮০০০ ফি. উচ্চ। সুতরাং গঙ্গার উপত্যকা হইতে ১৮০০০ ফি. উচ্চস্থান পর্যন্ত পার্বত্য উদ্ভিজ্জের বিশেষ-বিশেষ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকার উত্তরেই চিরহরিৎ বৃক্ষের আবাসভূমি।

২। পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চল।—এই অঞ্চলে কারাকোরম, লাডক, জাস্কার, প্রধান হিমালয় ও বহিঃ-হিমালয় বা নিম্ন-হিমালয় আছে। নিম্ন-হিমালয়ের উচ্চতা ৫০০০ ফি.। তাহার দক্ষিণে গঙ্গার উপত্যকা পর্যন্ত প্রথমে শিবালিক পর্বত—৫০০০ ফি. উচ্চ উপত্যকা,—তাহার দক্ষিণে ৩০০০ ফি. পর্যন্ত উচ্চভূমি। তেরাই-এর অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল এদিকে নাই। হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণে যে-উচ্চভূমির কথা বলা হইল, সেখানে এখন শস্য উৎপন্ন হইতেছে,—খাল খনন করিয়া অনেক জমিতে গম, ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করা হইতেছে, এবং সেখানে অনেক সহরও গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিমালয়ের নিম্নভাগে পর্বতগাত্রে পলাশের বন ও বাঁশঝাড় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পর্বতের উচ্চতা অনুসারে যথানিয়মে উদ্ভিজ্জের পার্থক্য হয়। কিন্তু পূর্ব-হিমালয়ের যেমন এক-এক স্থানে একই রকম গাছের বন বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, এই অঞ্চলে বন সম্পূর্ণভাবে সেরূপ নহে। এখানে অনেক স্থলে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—

মোটামুটি দিল্লী হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং ইহার পূর্বভাগে অত্যধিক বৃষ্টি পাওয়া যায়, এবং বৃষ্টি পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। তদনুসারে এবং অন্য কারণেও, শস্য-উৎপাদন ও জীবনযাপন-প্রণালীও এখানে বিভিন্ন। এই পার্থক্য দেখাইবার জন্য সমগ্র গঙ্গা-উপত্যকা তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

৩। পূর্ব-গাঙ্গেয় উপত্যকা—বা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অংশ :—উত্তরের পার্বত্য ও তেরাই-অঞ্চল এবং পূর্বের পার্বত্য-অঞ্চল বাদে মোটামুটি পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গ—এই দুই বঙ্গদেশ লইয়া এই বিভাগ কল্পিত। এই অঞ্চল নরম পলিমাটি

দিয়া গঠিত ;—বৃষ্টিপাত এখানে অত্যন্ত বেশী,—জলবায়ু আর্দ্র ও উত্তপ্ত। এজন্য এ-অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা **বেশী ধান্য** জন্মে। খুব উত্তাপপ্রিয় শস্য,—হয় এখানে আদৌ জন্মে না, অথবা অল্পই জন্মে। ১৯৫৯-৬০ সালের ভারতের পাটের জমির ৪৩ শতাংশ জমি পশ্চিমবঙ্গে ও ১৪ শতাংশ আসামে আছে।

৪। **পশ্চিম-গাঙ্গেয় উপত্যকা**।—প্রধানতঃ এলাহাবাদ হইতে উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশ। এই বিভাগে বৃষ্টিপাত মোটামুটি ৪০ ই. ও তদপেক্ষা কম। উত্তাপ গ্রীষ্মে বেশী ও শীতকালে কম,—সুতরাং উত্তাপের প্রখরতা বেশী ;—জলবায়ু চরম। সুতরাং ইহা শুষ্ক দেশ। সেজন্য উত্তাপপ্রিয় গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্য। জলসেচন দ্বারা এখানে শস্যের প্রাচুর্য বাড়ানো হয়। অধিবাসীরা প্রধানতঃ গমভোজী।

৫। **মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা**—মোটামুটি বিহার-রাষ্ট্র, এবং উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ হইতে পূর্বাংশ ইহার অন্তর্ভূত। বৃষ্টিপাত এ-অঞ্চলে ৪০ ই. অপেক্ষা বেশী,—মোটামুটি ৬০ ই.। সুতরাং এ-অঞ্চল পশ্চিম-গাঙ্গেয় অঞ্চল অপেক্ষা আর্দ্র। তাই এ-অঞ্চলে ধান্য বেশী জন্মে, এবং যব প্রভৃতি উত্তাপপ্রিয় শস্য কম জন্মে। এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ অন্নভোজী।

উত্তাপপ্রিয় জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, যব প্রভৃতি বঙ্গদেশে হয় না বলিলেই হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ যব উত্তরপ্রদেশেই জন্মে। উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে পাট হইতেছে। ভারতে ১৯৫৯-৬০ সালে মোট পাটের জমি ৯১১ সহস্র হেক্ট-এয়র। তন্মধ্যে পাটের জমি উ. প্রদেশে ১৩ সহস্র ও বিহারে ১১০ সহস্র হেক্ট-এয়র।

৬। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**।—ইহার উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী, এবং দক্ষিণে আসামের গারো, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড়মালা। আসামের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে গঙ্গার সহিত মিলনস্থান পর্যন্ত ইহা ৫০০ মা. দীর্ঘ। কিন্তু এই উপত্যকা সঙ্কীর্ণ,—চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল মাত্র বিস্তৃত। গারো পাহাড়শ্রেণীতে মৌসুমী বায়ু প্রতিহত হইলে, তাহার উত্তরে অবস্থিত ইহার উপত্যকাংশে বৃষ্টিপাত কম হয়। নতুবা অন্যত্র বৃষ্টিপাত ৮০—৯০ ই. হইয়া থাকে। সেজন্য এখানে ধান্যের ফসল ভালই হয়। এই অঞ্চলেই পাহাড়ের পাদদেশে ঢালু জমিতে প্রচুর চা জন্মে।

৭। **উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভাগের পাহাড় অঞ্চল**।—আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত হইতে কতকগুলি নীচু পাহাড় বাঁকিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে। উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারিত পাটকই, নাগা, লুসাই, চীন প্রভৃতি পর্বত দ্বারা এই পার্বত্য-অঞ্চল সৃষ্ট হইয়াছে। আসাম ও মণিপুর এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে ইহা প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত আছে। নাগা পর্বত হইতে পশ্চিমে জয়ন্তিয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড় লইয়া গঠিত এক পাহাড়শ্রেণী পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ইহারই উত্তর-পার্শ্ব দিয়া ইহারই সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং যেখানেই গারো পাহাড় শেষ হইয়াছে, সেখানেই দক্ষিণমুখী হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এখানে প্রধানতঃ দক্ষিণা বায়ুরূপে আসিয়া এই পাহাড়শ্রেণীতে প্রতিহত হয়। তাই ইহার দক্ষিণ গাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়—উত্তর গাত্রে বৃষ্টিপাত কম। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালের উপর অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় ৪২৫ ই. বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পাহাড়ের অপর পার্শ্বে অবস্থিত শিলং সহরে বৃষ্টিপাত মাত্র ৮৪ ই.। বৃষ্টির প্রাচুর্য হেতু এই অঞ্চলে বনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বনে শাল, গর্জন প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়। পার্বত্য-অঞ্চল বলিয়া কৃষিকার্য ভাল হয় না। তবে স্থানে-স্থানে ধান্য জন্মে এবং মালভূমির উপর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া এখানে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮। **গুজরাট**।—ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বৃষ্টিবহুল পশ্চিম-উপকূলের, এবং উত্তর প্রান্ত বৃষ্টিবিরল মরুভূমির সন্নিকটে অবস্থিত। সেজন্য ইহার দক্ষিণ-অংশ আর্দ্র হইলেও ইহা উত্তরে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহা নিম্ন সমতলভূমি,—মধ্যে-মধ্যে বনাবৃত ছোট-ছোট পাহাড় আছে। পশ্চিমে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ প্রায়শঃ অনুর্বর ভূমি,—এবং যেখানেই উর্বরা ভূমি আছে, সেইখানেই লোকবসতি বেশী হইয়াছে। কাথিয়াবাড়ের মধ্য-ভাগে ঘনবনাবৃত পাহাড় আছে। এই অঞ্চলে যেখানেই কৃষ্ণমৃত্তিকা আছে সেখানে প্রচুর ফসল হয়,—বিশেষতঃ তূলা জন্মে, এবং স্থানে-স্থানে নদীর উপত্যকায় যেখানে পলিমাটি আছে, সেখানে ধান্য জন্মে। এতদ্ব্যতীত বাজরা, ইক্ষু প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

(গ) দাক্ষিণাত্য-অঞ্চল—

৯। **মধ্যভারতের মালভূমি**।—ইহা ক্রমশঃ উত্তরে ঢালু হইয়া গাঙ্গেয়-উপত্যকায় মিশিয়াছে। তূলা ও বাজরা প্রধান উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য।

১০। **দাক্ষিণাত্য মালভূমি**।—ইহা পশ্চিম-ঘাটের প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত,—সেজন্য এখানে বৃষ্টিপাত কম। ২০০০ ফিট উচ্চ মহীশূর, এবং ১০০০ ফিট

উচ্চ হায়দরাবাদ এই অংশেই অবস্থিত। পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টিপাত বেশী। সুতরাং সেখানে বনের সৃষ্টি হইয়াছে। শুষ্ক অংশে মেষপালন হয়। তূলা ও বাজরা প্রধান উৎপন্ন শস্য।) বৃষ্টিপাতের অল্পতা-প্রযুক্ত জলসেচ-সাহায্যে এখানে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষের এক প্রাচীন অংশ। সেজন্য এখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

১১। **কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল**।—দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে একটি **কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল**—বোম্বাই রাষ্ট্রের দক্ষিণে সমুদ্র হইতে অল্পদূর বাদে পশ্চিম-ঘাটের পূর্বে প্রায় সমস্ত স্থানেই—বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিমে গুজরাটের দক্ষিণ ভাগে, উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্বে মহীশূরের ও অন্ধ্রের কিয়দংশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। ভূ-নিঃসৃত গলিত লাভা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা বিশেষ উর্বর। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার উপর সামান্য বৃষ্টিপাত হইলে সেই জল একেবারে শুষিয়া যায় না,— মাটির অল্প নীচে জমিয়া থাকে। তাই এই অঞ্চলের কতকাংশ পশ্চিম-ঘাটের প্রতিবাত পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও এখানে উৎকৃষ্ট ফসল হয়। প্রকৃতপক্ষে এই কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চলই ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-উৎপাদন স্থল। গম ও বাজরাও এখানে প্রচুর জন্মে।

১২। **পশ্চিম-ঘাট অঞ্চল**।—উত্তরে তাপ্তী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণাপথের মালভূমি ক্রমশঃ সরু হইয়া দক্ষিণে গিয়াছে। এই মালভূমি মোটামুটি ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ।

পশ্চিমে আরব সাগরের তীর হইতে অল্প কিছুদূর পূর্বে তীরের সহিত সমান্তরাল-প্রায়ভাবে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বত দক্ষিণে প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত গিয়াছে। বোম্বাই সহরের নিকট ইহার উচ্চতা ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার ফিট্। এই মালভূমির সর্বোচ্চ অংশ মহীশূরের দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতের দোদাবেতা শৃঙ্গ ৮৭৬০ ফি. উচ্চ। নীলগিরি পশ্চিম-ঘাটেরই অংশ। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ পালঘাট গিরিপথ—১০০০ ফিট্ মাত্র উচ্চ ও ৩০ মা. বিস্তৃত। বোম্বাই সহরের নিকট থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি এবং গোয়ার নিকট কুইসিম (Kwissim) নামে একটি গিরিপথ আছে। পশ্চিম-ঘাটের এই সকল গিরিপথ ভেদ করিয়া রেলপথ সমুদ্রতীর পর্যন্ত গিয়াছে।

পালঘাটের দক্ষিণে আনৈমালৈ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনৈমুদি (৮৮৫০ ফি.) —দক্ষিণাপথে ইহাই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এখান হইতে পূর্বে পুল্‌নি নামে শাখা গিয়াছে। ক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের নাম হইয়াছে কার্ডামম।

১৩। **কঙ্কণ উপকূল**।—পশ্চিম উপকূলের গোয়া হইতে বোম্বাই পর্যন্ত উত্তরের অংশ **কঙ্কণ উপকূল**। ইহা সঙ্কীর্ণ ও সরল। সেজন্য বন্দরের ও পোতাশ্রয়ের অনুপযোগী। এই উপকূল পর্যন্ত কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল আসিয়াছে। সেজন্য এই অঞ্চলে প্রচুর তূলা জন্মে। এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরে মৌসুমী-বায়ু-বাহিত বালুকাময় স্থানে প্রচুর নারিকেল গাছ আছে। তাহার পশ্চিমে, পলিমাটির জলাভূমি;—বালুকা-প্রাচীর কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া এখানে জল আটকাইয়া থাকে। আবার, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নদী পশ্চিম-ঘাট হইতে আসিয়া এখানে বালুকাভূমির দ্বারা প্রতিহত হয়, ও জলাভূমির সৃষ্টির সহায়তা করে। এই স্থানে প্রচুর ধান জন্মে, ও সুপারি গাছ হয়। ইহার পূর্বে পশ্চিম-ঘাটের পাদতলে বনাবৃত পাহাড়পূর্ণ স্থান। পশ্চিম-ঘাটের পাদদেশও বনাচ্ছন্ন,—শাল-গাছে পূর্ণ। জঙ্গলে অন্য অনেক প্রকার মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। এই বনে গাছ কাটিয়া পাহাড়ের নদীতে ভাসাইয়া আনা হয়।

১৪। **মালাবার উপকূল**।—কঙ্কণ উপকূলের দক্ষিণে মালাবার উপকূলের প্রাকৃতিক অবস্থা কঙ্কণ উপকূলেরই মত;—সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ী,—তাহার পশ্চাতে জলাভূমি,—এবং তাহার পশ্চাতে পার্বত্য-অঞ্চল। কিন্তু এ-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। তাই পার্বত্য নদীগুলি উপকূল ব্যাপিয়া উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপহ্রদগুলিকে খাল দিয়া যোগ করার জন্য, সমগ্র উপকূল ব্যাপিয়া এক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। সমুদ্রের উপকূলে যে-সকল বন্দর আছে, সেখানে জাহাজ আসিতে পারে না;—ছোট-ছোট নৌকা মাল বহন করে। বড় নৌকাগুলিও দূরে থাকে। ধান্য, নারিকেল, সুপারি এবং আদা ও মরিচ প্রভৃতি মশলা, ও রবার এ-অঞ্চলের উৎপন্ন-দ্রব্য। এই সকল অবলম্বন করিয়া এখানে নানা শিল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

১৫। **পূর্বঘাট অঞ্চল**।—দাক্ষিণাত্য মালভূমি পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে গিয়াছে,—ইহার পূর্বপ্রান্তে পূর্বঘাট ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি হইতে আসিয়া বঙ্গোপসাগরের তটভূমির সহিত সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইয়া মহীশূরের দক্ষিণে পশ্চিম-ঘাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্বঘাট পশ্চিম-ঘাটের মত উচ্চ নহে, এবং ইহা ভেদ করিয়া দক্ষিণাপথের নদীগুলি বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে।

১৬। **উত্তর-সরকার্‌স্ (Northern Circars) উপকূল**।—ইহা কৃষ্ণানদীর উত্তরে অবস্থিত। ইহারও সমুদ্রতীরে বালুকাময় ভূমি,—ও তাহার পশ্চাতে পাহাড়ময় জমি। কিন্তু বালুকাময় ভূমি এখানে সঙ্কীর্ণ;—ইহার পশ্চাতে ধান্যক্ষেত্র। এই অঞ্চলে তিনটি নদীর ব-দ্বীপ আছে। এই ব-দ্বীপে জলসেচ দ্বারা

ধান্য উৎপাদন করা যায়। ধান্য এখানকার প্রধান ফসল,—এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে এখানে ধান্যের উৎপাদন বেশী হয়।

১৭। কর্ণাট উপকূল।—কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কৃষ্ণা নদীর মুখ পর্যন্ত এই উপকূল অবস্থিত। ইহার উপকূলভাগে বালুকাময় ভূমি,—এবং তীর হইতে দূরে প্রস্তরময় ভূমি। ধান্য ও বাজরা এখানকার উৎপন্ন শস্য। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চিম-ঘাটে প্রতিহত হইলে, এই উপকূলে তজ্জনিত বৃষ্টিপাত হয় না। অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অপস্রিয়মাণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী, ও আগচ্ছমান উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়;—পরিমাণে ইহা অল্প,—মোটামুটি ১২-১৩ ই.। এই হেতু এই বর্ষাকালে এখানে কৃত্রিম জলাশয়ে জলসঞ্চয় করিয়া সেই জলে কৃষিকার্য হয়। এক্ষণে এই অঞ্চলে খালের জলেও সেচকার্য হইতেছে। এখানে গাছ খর্বকায়।

(ঘ) ভারতে ও পাকিস্তানে—

১৮। উত্তর-পশ্চিমের মরুভূমি-অঞ্চল।—ইহার অল্প অংশ পাকিস্তানে রহিয়াছে। ইহা বালুকাময় ও বৃষ্টিবিরল। জলাভাবে কোন ফসল হয় না। কোন-কোন স্থলে সামান্য জলের সন্ধান পাইলেই, সেখানে অল্পদিনস্থায়ী বসতি গড়িয়া উঠে। উষ্ট্র এখানকার ভারবাহী পশু। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এখানে সমুদ্র হইতে লবণ বহন করিয়া আনে। তাই এই অঞ্চলে স্থানে-স্থানে মাটিতেই লবণ জমিয়া থাকে।

(ঙ) পাকিস্তানে

১৯। সিন্ধু-শতদ্রু উপত্যকা।—সিন্ধু ও তাহার উপনদী শতদ্রু—ইহার অন্তর্গত অঞ্চল থার মরুর অন্তর্গত। কিন্তু মরুভূমির ন্যায় ইহা একেবারে বৃক্ষ-বিরল নহে,—কাঁটাঝোপ এবং বাবলা প্রভৃতি বহু দূরে-দূরে অবস্থিত বৃক্ষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। শতদ্রু নদীর জলে এখানে জলসেচ হয়, ও সেজন্য কৃষিকার্য চলিতেছে।

সিন্ধু ও তাহার উপনদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত পশ্চিম-পাঞ্জাব প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের জমি উর্বরা। কিন্তু জল অভাবে পূর্বে এখানে কৃষিকার্য হইত না। এক্ষণে সিন্ধু ও তাহার উপনদীগুলিতে খাল কাটিয়া জলসেচন করা হইতেছে, এবং সেজন্য এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট কৃষি-অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। গম ও কার্পাস এখানে প্রচুর জন্মে।

পার্বত্য-অঞ্চলের পাদদেশে, এই সমতলভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণে **লবণ-পর্বত** প্রায় ১০০০ ফি. উচ্চ।

২০। উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল ও সন্নিহিত সিন্ধু-উপকূল।—পশ্চিম পাঞ্জাবের উত্তরে ও কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামির-গ্রন্থি হইতে **হিন্দুকুশ** পর্বত পশ্চিমে আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুকুশের এক শাখা **সফেদ কো** দক্ষিণে আসিয়াছে। তাহার দক্ষিণে **সুলেমন পর্বত।**—ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তক্তি-সুলেমন—কিঞ্চিদধিক ১১ হাজার ফি. উচ্চ। সুলেমন দক্ষিণে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়াছে ও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। শাখাগুলি পশ্চিমে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব-পূর্বের শাখার নাম **ক্ষীরথর পর্বত।**

এই পর্বত-প্রাচীরের পশ্চিমে বেলুচিস্তান;—শুষ্ক, সূর্যতপ্ত, অনুর্বর পর্বত,—মধ্যে-মধ্যে ভীষণ খাদ,—মৌসুমী-বায়ু-প্রভাবের বহির্ভূত বলিয়া বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম, বৎসরে ৬-৭ ই. মাত্র। শীতকালে অল্প বৃষ্টি পড়ে ও তাহাতে চাষের সাহায্য হয়। জলবায়ু চরম। কোথাও শুষ্ক মরু, কোথাও বা প্রস্তরাকীর্ণ সমতলভূমি। পর্বতের উপত্যকায় 'কারেজ' প্রথায়, বা ঝর্ণা প্রভৃতির জল লইয়া জলসেচের সাহায্যে চাষ হয়;—সেখানে গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য ও ফল প্রচুর জন্মে। পর্বতের গাত্রে থাক কাটিয়াও চাষ হয়।

QUESTIONS

1. What do you mean by the Climatic Regions of the World? Into how many major regions can the world be divided? Name them and indicate their position in a map of the World. (I. P. S. 1931, 1932).

2. What are monsoons? Describe briefly their effects on the economic conditions of India (Cal. Inter. 1931).

3. What do you understand by a "Monsoonal" type of climate? Carefully describe the characteristic products. (Cal. Inter. 1944, 1947, Indian Institute of Bankers, 1945).

4. Describe and account for the characteristics of the monsoon climate. (Cal. B. Com. 1933).

5. "Probably there is no other group of weather phenomena which is so far-reaching in the effects as the Indian Monsoon",—Explain. (Cal. B.Com. 1925)

6. What is meant by the Mediterranean type of climate? Account for it and compare it with monsoonal type. Also give the chief products in each of them. (Cal. Inter. 1935, 1940, 1941; B.Com. 1933).

7. Name the temperate grasslands in the different continents and account for the characteristics of their cliamate and natural vegetation. (Cal. B.Com. 1953).

8. Explain the phenomenon—In the Mediterranean regions most of the rains fall in winter months.

9. Is the rainfall in the southern monsoon region due to north-east trade winds? Explain and illustrate your statement.

10. "Hot deserts are situated between 30°N and 30°S latitudes."—Account for this. Do you know any hot desert which produces articles of commercial importance?

11. What are the steppe lands? How do they differ from the savannah lands? Account for this difference. Which of the Steppe Lands of the world has made the most progress? Is it true to say that the remaining areas may develop in the near future? Why?

12. Discuss the characteristics of climate and natural vegetation of the Steppe Lands of the World.—(Delhi U. Prep. 1950.)

13. Write short notes on (*a*) Temperate Monsoon or China type of climate? How it differs from monsoon type? (*b*) Tundra type; (*c*) Polar Ice Caps.

14. What do you understand by "a natural region?" Into how many natural regions can the Indian Union be divided? Name them and indicate their position in a map.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষিকার্য

অন্নবস্ত্র ও কৃষিকার্য।—মানুষের জীবনধারণের জন্য সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অন্ন ও বস্ত্র, এবং অন্ন ও বস্ত্র লাভের উপায় প্রধানতঃ কৃষিকার্য। মানুষ আদিম কালে তাহার খাদ্য ও পরিধেয়ের জন্য আগ্রহের সহিত নিজ-নিজ পরিবেশের প্রতি তাকাইয়া থাকিত, এবং এই পরিবেশ হইতে কৃষিকার্যের দ্বারা উহা সংগ্রহ করিত। এই কৃষিকার্য-বশেই মানুষ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে একস্থানে বাস করিতে শিখিয়াছিল। কালক্রমে মানুষ কৃষিকার্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কৃষি কাহাকে বলে,—কৃষির নানারূপ। শস্য উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল দিয়া ভূমি **কর্ষণ করাকেই** আমরা সাধারণতঃ কৃষিকার্য বলি। কিন্তু **ভূমিতে সার দেওয়া** ও **জলসেচন** করাও কৃষিকার্যের অন্তর্গত। সাধারণতঃ কৃষিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) **শস্যচাষ** (Crop Farming)—এইরূপ চাষ দ্বারা ধান, গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য, এবং তূলা, পাট প্রভৃতি শিল্পসহায় দ্রব্য প্রচুর উৎপাদন করা হয়।

(খ) **বহুরূপী চাষ বা বিমিশ্র চাষ** (Mixed Farming)—এইরূপ চাষ দ্বারা চাষী একই ক্ষেত্রে নিজেদের সংসারের জন্য ও স্থানীয় অভাব দূরীকরণের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, মাংস, দুগ্ধ ও সারদ্রব্যের জন্য শূকর, মুরগী, গরু ও ভেড়া প্রভৃতি পশু ও পক্ষী প্রতিপালন করে, এবং ব্যবসায়ের জন্য এখানেই কিছু অর্থপ্রসূ শস্যাদি উৎপাদন করে।

(গ) **পশুচাষ** (Stock Farming)—এই চাষ দ্বারা পশম, চামড়া প্রভৃতির জন্য, এবং মাংস, দুগ্ধ, মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতির জন্য গরু, ভেড়া প্রভৃতি প্রতিপালন করা হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য নহে। তথাপি আর্থনীতিক ভূগোলে ইহাকে চাষ-পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

চাষের প্রকৃতি।—কৃষিকার্য দুই উপায়ে সম্পাদিত হয়। সে-হিসাবে কৃষিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, (১) **রোপণকৃষি** (transplantation), ও (২) **বপনকৃষি** (Non-transplantation)। গম, যব, তৈলবীজ প্রভৃতির বীজ কর্ষিত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া (broadcast) দেওয়া হয়। সেজন্য এগুলি বপনকৃষি।

কিন্তু নারিকেল গাছের চারা একস্থানে জন্মাইয়া পরে সেখান হইতে তুলিয়া অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আমন ধানের এক স্থানে চারা করিয়া পরে অন্য জমিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া দেওয়া হয়। সেজন্য ইহারা "রোপণকৃষির" অন্তর্গত। ধানের মধ্যে আবার বর্ষাকালীন আউশ ধান্য বা আশু ধান্য (বিহারে ইহার নাম "ভাদুই") বপনকৃষি।

চাষের সফলতার জন্য আবশ্যক—(১) উর্বর জমি। কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকায় যদি অধিক জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে, তবে তাহাকে উর্বর মৃত্তিকা বলা যায়।

(২) **উত্তাপ**—যে-সকল স্থানে গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ৫২° ফা. অপেক্ষা বেশী, সেই সকল স্থানে ভাল কৃষিকার্য হয়। গ্রীষ্মকালই শস্য উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। উচ্চ অক্ষাংশে উত্তাপ কম বটে, কিন্তু দিবাকাল দীর্ঘ। সেজন্য সেখানে কৃষিকার্য হয়।

(৩) **বৃষ্টিপাত**—কৃষির জন্য যেমন উত্তাপ দরকার, সেইরূপ জলও দরকার। যে-সকল অঞ্চলে বাষ্পীভবন বেশী হয়, সে-সকল অঞ্চলে বেশী জলের দরকার। এজন্য মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ১০" ই. এবং উষ্ণমণ্ডলে ২০" ই. অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত দরকার।

চাষের উন্নতির জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য:—কোন জমিতে ক্রমাগত চাষ করিলে উহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়। আবার কোন-কোন জমি স্বভাবতঃই অনুর্বর। এইসকল জমির উন্নতির জন্য জমিতে নানাপ্রকার সার দেওয়া হয়। যেমন,—

(১) **গোবর**—ইহা পচাইয়া জমিতে দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। (২) **খইল**—সরিষা, তুলার বীচি, মহুয়া, চীনাবাদাম প্রভৃতি হইতে তৈল নিষ্কাশনের পরে যে-খইল পাওয়া যায়, তাহাও উৎকৃষ্ট সার। (৩) **মিশ্রসার**—তরকারীর খোসা, গৃহের ও প্রাঙ্গণের আবর্জনা, গোয়ালঘরের মৃত্তিকা, রান্নাঘরের ছাই প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও পচাইয়া উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। (৪) **মানুষের বিষ্ঠা**—শ্রেষ্ঠসার। চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে ইহা আদৌ নষ্ট হইতে পারে না। (৫) **পক্ষী পুরীষ**—চিলি দেশের আটাকামা মরুর উপর সমুদ্রতীরে মৎস্যের আশায় বহু পক্ষী আসে। সেখানে তাহারা যে-পুরীষ ত্যাগ করে তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। (৬) **সোডিয়াম নাইট্রেট**—(Sodium Nitrate)—পেরু, চিলি ও বলিভিয়া দেশের মরু-অঞ্চলে এই সার পাওয়া যায়। (৮) **এমোনিয়া সালফেট** (Ammonium Sulphate)—কয়লা হইতে এমোনিয়া পাওয়া যায়। তাহা হইতে ইহা

প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে। (৮) **ক্যালসিয়াম সাইনামাইড** (Calcium Cynamide)—ক্যালসিয়ম কার্বাইড (Calcium Carbide) ও নাইট্রোজেন (Nitrogen) মিশাইয়া এই সার প্রস্তুত করা হয়। এখন দেশে-দেশে এই সারের কারখানা আছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কেরলে ও বিহারে ইহার বড় কারখানা আছে।

শস্যাবর্তন—জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য শস্যাবর্তনও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কয়েক প্রকার শস্য পর্যায়ক্রমে একই জমিতে চাষ করিলে ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রণালীকে **শস্যাবর্তন** (Crop Rotation) বলে। জমিতে শস্যের যে-সকল নানারূপ ভক্ষ্যদ্রব্য বর্তমান থাকে, কোন শস্যের চাষ করিলে সেই শস্য তাহা হইতে তাহার উপযোগী খাদ্য অনেকটা গ্রহণ করে। সেই ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ একই শস্যের চাষ করিলে সেই শস্যের খাদ্য একেবারে ফুরাইয়া যায়। সেই সময় অন্য শস্য উৎপাদন করিলে জমির প্রণষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য পুনরায় বাড়িতে পারে। শস্যের ডাঁটা ও পাতা যদি জমিতে পড়ে তাহা হইতেও জমির উর্বরতার বৃদ্ধি হয়। হিসাব মত কতকগুলি শস্যের, জমির গুণানুযায়ী ক্রম নির্ণয় করিয়া চাষ করিলে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়, অক্ষুণ্ণও থাকে।

শস্যের ক্রম নানাভাবে নির্ণয় করা যায়। তবে সাধারণ চাষের পক্ষে প্রথম বৎসর গম, দ্বিতীয় বৎসরে মূলা, গাজর, আলু ও বীট প্রভৃতি শিকড়প্রধান শস্য, তৃতীয় বৎসরে যব কিংবা জই, চতুর্থ বৎসরে কলাই বা পশুখাদ্যোপযোগী তৃণ প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বপন করিলে জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। আবার, একই জমির জন্য অন্যরূপ শস্যাবর্তনও সম্ভব।

কৃষির শ্রেণীভেদ—চাষের জন্য জলের বিশেষ দরকার। জলের তারতম্যানুসারে কৃষিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(১) **আর্দ্র কৃষি** (Humid Farming)—যেখানে ৮০ ই. বৃষ্টিপাত হয়, অথবা নদীর চরের যে-জমি জলে ডুবিয়া যায়, সেখানকার চাষকে **আর্দ্র** কৃষি বলে। মালাবারে, পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে, নিম্নবঙ্গে সুন্দরবনের জমিতে এইরূপ চাষ হয়।

(২) **সেচন কৃষি** (Irrigation Farming)—কৃষির জন্য যেমন জল চাই, সেইরূপ চাষের সময়েও জল পাওয়া দরকার। অন্য সময় যদি প্রচুর জল হয়, কিন্তু চাষের সময়ে জল পাওয়া না যায়, তবে সেখানে ফসল হওয়া কষ্টকর। এইজন্য এই সকল স্থানে প্রাচীন কাল হইতে কূপ বা জলাশয় হইতে জলসেচন করার ব্যবস্থা

ছিল। এখন খাল কাটিয়া জলসেচন হইতেছে। জলসেচন দ্বারা যে-কৃষিকার্য হয় তাহাকে বলে **সেচন-কৃষি**।

(৩) **শুষ্ক কৃষি** (Dry Farming)—কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হইলেও বা জলসেচনের স্থবিধা না থাকিলেও অন্য উপায়ে কৃষিকার্য হয়। এই প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টিবিরল স্থানে যদি সামান্যমাত্র বৃষ্টিপাত হয়, তবে তাহা যেন শস্য উৎপাদনের কার্যেই নিয়োজিত হয়, বাষ্প হইয়া উড়িয়া না যায়। এইজন্য এইসকল স্থান গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, যেন নীচে অনেক দূর পর্যন্ত মাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। পরে বীজ ছড়াইয়া উপরের মাটি উল্টাইয়া বীজতলা ঢাকা দিয়া রাখা হয়। উপরের মাটি ইহার পরে খুব গুঁড়া করিয়া দিতে হয়, যেন বৃষ্টির জল সহজে উহার ভিতরে ঢুকিতে পারে। তাহার পরে বীজ হইতে চারা বাহির হওয়া পর্যন্ত, কোনদিন বৃষ্টি হইলেই বিদে মই (harrows) দিয়া উপরের মাটি এমনভাবে উল্টাইয়া দিতে হয়, যেন জল মাটিচাপা থাকে,—বাষ্প হইয়া উড়িয়া না যায়,—অথচ নীচের মাটিতে বীজের কোন ক্ষতি না হয়। এইরূপে শুষ্ক দেশের অল্পমাত্র জলকেও কাজে লাগানো যায়। এইরূপ কৃষিকে বলা হয় শুষ্ক কৃষি।

প্রয়োজনভেদে চাষের শ্রেণীভেদ

(১) মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া যখন চাষ করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিল, তখন খাদ্য ও বস্ত্রের উপাদান প্রভৃতি একই জমি হইতে উৎপাদন করিতে লাগিল। নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য নিজেদের জমিতে নিজেদের আবশ্যকীয় কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে-চাষ তাহার নাম **স্বয়ংপূর্ণ চাষ** (Self-sufficient Agriculture)। আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকায়, মধ্য-এশিয়ার কোন-কোন অংশে, চট্টগ্রামের পার্বত্য-অঞ্চলে এইরূপ চাষ এখনও আছে।

(২) ক্রমশঃ দেশ-বিদেশের সহিত পরিচয় বাড়িলে ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইলে, মানুষ একই জমিতে একই চাষ করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার করিতে ও উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতে লাগিল, এবং নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্য দ্রব্যের জন্য তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইল। একই বৎসরে একমাত্র ফসল উৎপাদনের জন্য যে-চাষ, তাহার নাম **এক ফসলী চাষ** (One Crop Agriculture)।

বাণিজ্যের জন্য ও অর্থ উপার্জনের জন্য যে-শস্য উৎপাদন করা হয়, তাহাকে বলে **বাণিজ্যিক শস্য** (Commercial Crop) বা অর্থপ্রসূ চাষ (Cash Crop)। ভারতবর্ষের পাট, তূলা, চা এইরূপ অর্থপ্রসূ কৃষিদ্রব্য।

এক ফসলী চাষের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ **কৃষি উপনিবেশ** (plantation)। উষ্ণ অঞ্চলের এবং কোন-কোন স্থলে উষ্ণশীতোষ্ণ অঞ্চলের উর্বর অংশে শীতোষ্ণ অঞ্চলের বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া **নিজেদের অর্থব্যয়ে ও স্থানীয় শ্রমিকের** সাহায্যে কৃষিকার্যের জন্য যে-উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তাহাকে **কৃষি উপনিবেশ** বলে। এই সকল স্থানে রবার, ইক্ষু, চা, ক্যাকাও, কলা, আনারস প্রভৃতির চারা রোপণ করিয়া কৃষিকার্য করা হয়। এইসকল স্থানে শ্বেতাঙ্গদিগের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যের ও জমির উন্নতি হয়—যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা ও রেলপথ প্রভৃতি নির্মিত হয়, এবং এই উপনিবেশেরই এক অংশে শ্রমিকদিগের ও অন্য অংশে চাষের পশুদিগের বাসস্থান থাকে, এবং খাদ্যও উৎপাদন করা হয়।

(৩) ব্যাপক চাষ ও (৪) প্রগাঢ় চাষ—দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য ও খাদ্য-শস্যের আবশ্যকতা অনুসারে কৃষিরও পার্থক্য হয়। যে-সকল দেশ বহু-বিস্তৃত, যেখানে লোকসংখ্যা কম এবং খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা নাই, সে-সকল দেশে লোকের শস্য-উৎপাদনের আগ্রহ কম থাকে। সুতরাং **সে-সকল দেশে অল্প ধনশক্তি ও জনশক্তি নিয়োগ করিয়া বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃষিকার্য অযত্নের সহিত করা হয়।** এইসকল স্থানের প্রায় একই ক্ষেত্রে বৎসরে একই প্রকার শস্য উৎপাদন করা হয়, এবং একরপ্রতি জনশক্তি ও ধনশক্তি কমই নিয়োজিত হয়;—সুতরাং একরপ্রতি শস্যের পরিমাণ ও আয় কমই হয়। ইহাকে বলে **ব্যাপক কর্ষণ** (Extensive method of Cultivation)।

আবার, যে-সকল দেশের অবস্থা ইহার বিপরীত—দেশ ছোট, লোকবসতি ঘন, লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ কম, সুতরাং জমির দাম বেশী,—অথবা যেখানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ড জমি বিচ্ছিন্নভাবে চাষ করিতে হয়,—সে-দেশে কম জমি হইতে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হয়,—চাষের জন্য বিজ্ঞানসম্মত সার প্রদান ও শস্যাবর্তন করা হয়,—উপযুক্ত বীজ নির্বাচন করা হয় এবং কম জমিতে প্রচুর জনশক্তি ও ধনশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রগাঢ় যত্নের সহিত চাষ করা হয়। এইরূপ প্রণালীকে বলা হয় **প্রগাঢ়** বা **নিবিড়** বা **সযত্ন কর্ষণ** (Intensive method of cultivation)। মৌসুমী বায়ুর দেশে জমি প্রায় খণ্ডবিখণ্ড,—দূরে-দূরে অবস্থিত,—পশ্চিম ইউরোপে জমির পরিমাণ লোক-সংখ্যার তুলনায় কম,—তাই চীন, জাপান, যবদ্বীপ, বেলজিয়ম, হলণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তীক্ষ্ণ প্রগাঢ় কর্ষণ হইয়া থাকে। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জমির পরিমাণ বেশী, লোকসংখ্যা কম, এবং শ্রমিকেরও অভাব,—এজন্য সে-সকল স্থানে ব্যাপক কর্ষণ হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা

ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের সর্বোপরিস্থ যে-স্তর বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ জন্মিবার ও কৃষিকার্য করিবার উপযোগী, তাহাকে বলে **মৃত্তিকা**। মৃত্তিকা হইতেই কৃষিশস্য তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে। যে-মৃত্তিকা হইতে কৃষিশস্য যত অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে, সে-মৃত্তিকাকে তত উর্বরা বলা হয়। মৃত্তিকাতে একবার ফসল হইলেই মৃত্তিকার খাদ্যাংশ কমিয়া যায়। ইহাকেই বলে জমির উর্বরতা কমিয়া গিয়াছে। তখন পুনরায় জমির উর্বরতা বাড়াইতে হয়। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।



৩১নং চিত্র।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ—মৃত্তিকার মধ্যে সাধারণতঃ বালি, কর্দম, চূণ ও সারমাটি (humus) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ ও জন্তু পচিয়া সারমাটি হয়। প্রধানতঃ এই সারমাটির জন্য জমির উপরিভাগ কাল দেখায়। জমিতে সারমাটি বেশী থাকিলে জমি অধিক আর্দ্র থাকে। মাটিতে এইসকল দ্রব্যের সমাবেশের তারতম্যানুসারে জমির গুণাগুণ হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারে মৃত্তিকাকে বেলেমাটি, দো-আঁশমাটি, হাল্কা দো-আঁশমাটি, কাদামাটি প্রভৃতিতে ভাগ করা যায়। মাটিতে কাঁকরাদি মিশ্রিত থাকিলে তাহা অনুর্বর হয়। এই সকল বিবরণ পূর্বেই (২৩ পৃ.) দিয়াছি।

মাটির আর এক প্রকারের নাম আছে,—যেমন পলিমাটি, কৃষ্ণমৃত্তিকা। মৃত্তিকা নদীবাহিত হইয়া আসিয়া নদীর উপত্যকায় সঞ্চিত হইলে তাহাকে বলা হয় **পলিমাটি**। পলিমাটি অতি উর্বরা। আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লাভা,—রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে চূর্ণীকৃত হইলে,—মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই মাটি মোটামুটি কৃষ্ণবর্ণ। এজন্য ইহাকে বলে **কৃষ্ণমৃত্তিকা**। এ-মাটিও অতিশয় উর্বরা। মৃত্তিকার উর্বরতা কমিয়া গেলে নানাপ্রকার সার ব্যবহৃত হয়। ইহার কথা পূর্বেই (১০২ পৃ.) বলিয়াছি।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) পলিমাটি (Alluvial Soil)।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের **উত্তর ভাগে** সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের উপনদী বাহিত হইয়া ইহাদেরই উপত্যকায় পলিমাটি সঞ্চিত হইতেছে। (পাকিস্তানের সিন্ধু-প্রদেশের অধিকাংশ, পশ্চিম পাঞ্জাব), পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাটের অধিকাংশ, উত্তর রাজপুতানা, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, (পূর্ববঙ্গ), আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকায় এই মাটি প্রচুর পরিমাণে আছে। দক্ষিণ ভারতেও সমুদ্র-উপকূলে, এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর উপত্যকায়ও এই মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া আছে। কিন্তু এই মৃত্তিকা উপরি-উক্ত স্থলের সর্বত্রই একপ্রকার নহে। যেমন,—রাজপুতানার মাটি বালুকা-প্রধান। কৃষ্ণমৃত্তিকা হইতে আগত নদীগুলির উপত্যকায় কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। পার্বত্য-অঞ্চলের পুরাতন পলিমাটি কঙ্করময়।

(২) কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black Soil)—গুজরাট, মালব মালভূমি, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতির উপর ইহা সঞ্চিত (৩১নং চিত্র)। বোম্বাই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরিজাত যে-প্রস্তর আছে, তাহারই উপর ইহা প্রধানতঃ অবস্থিত। গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেনগঙ্গা, ভীমা প্রভৃতি যে-সকল নদী এই কৃষ্ণ মৃত্তিকা-অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদেরও উপত্যকায় ইহা পলিমাটিরূপে সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের মধ্যেও কোন-কোন অংশে এই মাটি আছে। এই মাটিও সর্বত্র একরূপ নহে, কোথাও গভীর কৃষ্ণ, কোথাও মধ্যম ধরণের কৃষ্ণ, কোথাও অল্প কৃষ্ণ। পচা সারের (humus) তারতম্যানুসারে ইহা বেশী ও কম কৃষ্ণ হয়, এবং কৃষ্ণবর্ণের গভীরতার তারতম্যানুসারে উর্বরতারও তারতম্য হয়। এই মাটিতে অল্প নিম্নে জল সঞ্চিত থাকে। ইহা অত্যন্ত উর্বরা। কার্পাস এই মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট জন্মে। গম, জোয়ার, তিসি প্রভৃতিও ভালভাবে জন্মে। ইহা দুই লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত।

(৩) **লোহিত মৃত্তিকা** (Red Soil)।—পরিবর্তিত শিলার রাসায়নিক পরিবর্তনে এই মৃত্তিকার উদ্ভব হয়। ইহা হাল্কা দো-আঁশ মাটি;—লৌহ (Iron peroxide) সংযোগে ইহার বর্ণ লোহিত বা পিঙ্গল হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য-অঞ্চলে, এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকা-অঞ্চল, ও উপকূল-অঞ্চল বাদে—অবশিষ্ট অংশে, ইহা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় ইহার উর্বরতা বেশী। ওয়েনগঙ্গা-উপত্যকায়ও ইহার উর্বরতা বেশী। সেখানে ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বিহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি ও মির্জাপুর জেলা, প. বঙ্গের বীরভূম জেলা, রাজপুতানার কিয়দংশ, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড ও আরাবলী-অঞ্চলে এই মৃত্তিকা আছে। বৃষ্টিপাত বা জলসেচ এবং সার ব্যতীত এই মৃত্তিকায় ভাল শস্য হয় না।

(৪) **মাকড়া** (Laterite)।—ইহা গ্রীষ্মমণ্ডলের শিলা। দক্ষিণ-ভারতের ল্যাটারাইট প্রস্তরের (মাকড়া পাথরের) উপর এই মৃত্তিকা প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণও অম্লজান-জারিত লৌহের (Iron Peroxide) মিশ্রণে লোহিত বর্ণ। কিন্তু পূর্বোক্ত লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা হইতে ইহা বিভিন্ন। এই মাটি সূক্ষ্ম-ছিদ্রবহুল—সুতরাং ইহার উপর বৃষ্টি পড়িলে মাটি শুকাইয়া যায়। ইহা উর্বরাও নহে। এইজন্য সার দিয়া জলসেচদ্বারা ইহার উপরে চাষ করিতে হয়। দাক্ষিণাত্যে ১৮° উঃ অক্ষরেখার দক্ষিণেই এই মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে কয়েকটি উচ্চস্থানে ইহা আবরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। দাক্ষিণাত্যে পশ্চিমঘাটের ২,০০০ হইতে ৫,০০০ ফিট্ উচ্চে এই মৃত্তিকা রহিয়াছে। ইহার নিম্ন অঞ্চলেও এই ল্যাটারাইট কোন-কোন অংশে আছে। কিন্তু মহীশূরে পশ্চিম-ঘাটের ঢালুস্থানে নীলগিরি পর্বতের গাত্রে ৬,০০০ ফিট্ উচ্চস্থানে একপ্রকার লোহিত বা লোহিতাভ মৃত্তিকা আছে, ইহাকে কেহ-কেহ ল্যাটারাইট শ্রেণীভুক্ত করেন বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ল্যাটারাইট নহে। এইখানেই মহীশূরের কফিক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যে চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা অনেক পর্বতের মস্তক এই মৃত্তিকায় আবৃত।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, উত্তরভারতে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রধানতঃ পলিমাটি আছে। পাঞ্জাবে কিছু বায়ুতাড়িত লোয়েস মৃত্তিকা ও মরুভূমি-অঞ্চলে বালুকাই প্রধান। দক্ষিণভারতে (১) পলিমাটি (২) কৃষ্ণমৃত্তিকা, (৩) লোহিত মৃত্তিকা, ও (৪) ল্যাটারাইট মৃত্তিকাই প্রধান। পার্বত্য-অঞ্চলে কঙ্করময় পলিমাটি আছে।

মৃত্তিকার ক্ষয় ও তাহার প্রতিকার

কৃষিকার্যে মৃত্তিকার আবশ্যকতা অসামান্য,—মৃত্তিকা না থাকিলে কৃষিকার্যই হয় না। কিন্তু এই মৃত্তিকা অনবরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জলের স্রোতেই হউক, বায়ু-প্রবাহেই হউক, অথবা মানুষের দ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারেই হউক, একস্থানের মৃত্তিকা অপসারিত হইলে সেইস্থানের জমি কৃষিকার্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্য ও পশুদিগের দ্বারাও এই ক্ষয় নিয়ত সাধিত হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রায় ২ কোটি একর জমি মৃত্তিকার ক্ষয়হেতু কৃষিকার্যের অযোগ্য হইয়াছে এবং প্রায় দশ কোটি একর জমি কৃষির জন্য পুনঃসংস্কার করিতে হইয়াছে। মৃত্তিকাক্ষয়ের কয়েকটি কারণ ও প্রতিকার-সম্বন্ধে নিম্নে স্থূলভাবে আলোচনা করা যাইতেছে :—

(১) **পশুচারণ**।—মাটিতে ঘাস জন্মিলে সেই ঘাসে মাটি এমনভাবে আবদ্ধ থাকে যে, তাহা বাতাসে উড়িয়া যাইতে বা জলের স্রোতে একেবারে ভাসিয়া যাইতে পারে না। মানুষেরা পশুখাদ্যের জন্য এই ঘাস ছিঁড়িয়া লইলে, অথবা ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি তাহাদের ছোট মুখ ও ধারালো দাঁতে ঘাস ছিঁড়িয়া মাটিকে এই তৃণমূল-বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে মাটির ক্ষয়-সাধন হয়।

অনেকস্থলে, বিশেষতঃ পশ্চিম-হিমাচল-অঞ্চলে ও হিমালয়ের পাদদেশে অনেক বনে পশুচারণের অবাধ অধিকার আছে। তাহার ফলে এই সকল বনের গাছ এরূপভাবে বিনষ্ট হয় যে, প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে মাটি ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, ও নীচের শিলা বাহির হইয়া পড়ে।

গ্রামের শস্যক্ষেত্রের শস্য কাটা হইলে, তাহা পশুচারণ-ভূমিতে পরিণত হয়। যতদিন আবার শস্য না হয় ততদিন ইহা গ্রাম্য পশুগণের বিচরণক্ষেত্র হইয়াই থাকে। ইহাতে শস্যের যে-মূল ইত্যাদি থাকে, পশুসকল তাহা তুলিয়া ফেলে, ও অত্যন্ত বিচরণের ফলে জমি কোন-কোন দিকে ঢালু হইয়া পড়ে,—পরে যখন বৃষ্টি হয়, তখন সেই পথে মৃত্তিকা ধুইয়া যায়। এইসকল ক্ষেত্রে পশুচারণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা সর্বথা বিধেয়।

পশুচারণক্ষেত্রে পশুগণ যে-মল পরিত্যাগ করে, তাহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এইসকল সার যেন সাধারণ লোকে জ্বালানির জন্য কুড়াইয়া লইয়া না যায়,—সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(২) **বন-উৎসাদন**।—(ক) মৃত্তিকা গাছের শিকড় দ্বারা যথাস্থানে আবদ্ধ থাকে। বৃষ্টির সময় যে-জোরে বৃষ্টিপাত হয়, গাছের ডালে ও পাতায় বাধিয়া

বৃষ্টির ফোঁটার সে-জোর কমিয়া যায়। ইহাতে জলের তোড় মাটি কাটিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। গাছের তলায় যে-সকল আগাছা থাকে তাহারাও বৃষ্টির জলের গতিতে বাধা উৎপাদন করিয়া মাটি সংরক্ষণ করে। আবার, বনের মধ্যে, বন্যা আসিলে বা জলের স্রোত প্রবল হইলেও, মৃত্তিকা গাছের শিকড়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। নদীর উপকূলে এইরূপ বন থাকিলে মাটির ক্ষয় নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু বন যদি না থাকে, তবে দুই পাশের মাটি ধুইয়া আসিয়া নদীগর্ভে পড়ে। এইজন্য বন যথেচ্ছভাবে কাটিতে দেওয়া উচিত নহে। সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই এইজন্য আইনবলে বন রক্ষা করেন এবং যে-সকল বনের গাছ কাটিলে বা যেখানে পশুচারণ করিলে জমির ক্ষতি হইবে না, সেইস্থানে মাত্র গাছ কাটিতে ও পশু চরাইতে দেন। এইজন্য ভারতবর্ষেও গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বনরক্ষার নিয়মাদি করেন, এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বনবিধি (Forest Act) আইনবদ্ধ করেন। কোন দেশের মোট জমির সিকি-অংশে বন থাকা দরকার। অন্ততঃ স্থানীয় লোকের জ্বালানি কাষ্ঠ ও গৃহাদি নির্মাণের কাষ্ঠের জন্য ছোট-ছোট বন থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে নানাভাবে উপকার হয়।

আসাম, বঙ্গদেশ প্রতি প্রদেশে জুম-চাষ হয়। জুমিয়ারা বনের মধ্যে-মধ্যে কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া, তাহা প্রথমে অগ্নিদগ্ধ করে, পরে সেখানে চাষ করে। নূতন জমিতে প্রথমে দুই-এক বৎসর চাষ ভাল হয় বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে উপরের মাটি ধুইয়া গেলে সেখানে আর ফসল হয় না। তাই জুমিয়ারা দুই-এক বৎসর পরে সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া বনের অন্য অংশে চলিয়া যায় ও সেখানে এইরূপ চাষ করে। ইহাতে জমির অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৩) **অব্যবস্থিত চাষ**।—চাষের অপব্যবহারের জন্যও জমির ক্ষতি হয়।

(ক) জমি চাষ করিয়া কোন-কোন **শস্যের ক্ষেত্রে নালা** কাটিয়া দেওয়া হয়। এই নালা দিয়া যদি জমির ঢালু অংশের দিকে জল প্রবাহিত হয়, তবে জমির ক্ষতি হয়। স্থানে-স্থানে এইরূপ নালা বাড়িয়া-বাড়িয়া খালে পরিণত হয় ও নানাপ্রকারে মৃত্তিকা ক্ষয়িত হয়। এরূপ নালা কাটা উচিত নহে। (খ) জমি **চাষ করিয়া ফেলিয়া রাখিলে** তাহার উপরের মাটি সহজেই জলে ধুইয়া যাইতে পারে। ইহাতে মৃত্তিকা ও শস্যের খাদ্য একসঙ্গে চলিয়া যায়। (গ) পাহাড়ের গাত্রে বা অন্য ঢালু জমিতে চাষ করিলে, পাহাড়ের গা বাহিয়া বা খুব **ঢালু জমি বাহিয়া মৃত্তিকা ধুইয়া বাহির হয়**। এইরূপ ঢালু জমির গায়ে যদি ঢাল অনুসরণ করিয়া নালা কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে সর্বনাশ আরও শীঘ্র-শীঘ্র সংসাধিত হয়। গাছপালা উপ্‌ড়াইয়া যায়। কখন-কখনও সেখানে বড় নালার সৃষ্টি হয়। এরূপস্থলে

ঢালু জমির গায়ে আড়াআড়ি থাক কাটিয়া চাষের জমি করা উচিত। তাহাতেও উপকার না হইলে ঐরূপ থাক-কাটা জমির ধারে আইল দেওয়া উচিত। (ঘ) পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় জমির বাহিরে যথাক্রমে আইল দিলে বা গাছ লাগাইলে জমির ক্ষতি হইতে পারে না।

(৪) বাঁধ দিয়া বন্যা নিবারণ করিয়া, শস্যানুবর্তন দ্বারা এবং জমি উদ্ভিজ্জে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও, জমির ক্ষতি নিবারণ করা যাইতে পারে।

(৫) **বাতাস**।—বাতাসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে-দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসে, সে-দিকে বনের সৃষ্টি করা উচিত। তাহা হইলে সেই বনে বাতাস বাধিয়া যায়, ও জোরে মাটি উড়াইতে পারে না।

জলসেচ ও তাহার উপকারিতা

জলসেচের আবশ্যকতা।—কৃষির জন্য জলসেচের আবশ্যকতা খুবই বেশী। এমন কি, জমি যদি বিশেষ উর্বরাও হয়, তথাপি জলের অভাব হইলে সেখানে কৃষিকার্য হইতে পারে না। পাকিস্তানের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাবে এখন খাদ্যশস্য বিশেষ উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পশ্চিম পাঞ্জাবে কৃষকদিগের দুরবস্থার শেষ ছিল না,—দুর্ভিক্ষ তখন সেখানে নিত্যবস্তু বলিয়া গণ্য হইত। এক্ষণে পশ্চিম পাঞ্জাবের যে-খাল-অধ্যুষিত ভূমিতে লক্ষ্মীশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, পূর্বে উহা মরুপ্রায় ভূভাগমাত্র ছিল। সেখানকার জমি আদৌ অনুর্বরা ছিল না, জল অভাবে সেখানে ফসল হইত না।

যেখানে জল নাই, সেখানে জলসেচের আবশ্যকতা ত আছেই, যে-দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় সেখানেও জলসেচের দরকার। কারণ,—

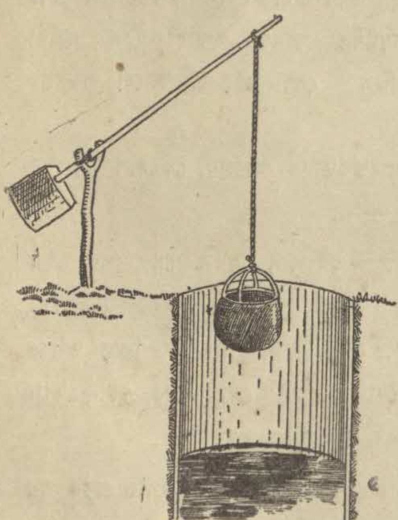
(১) **বৃষ্টিপাত**—কোন দেশে বেশী হইলেও, হয়ত সে-দেশের সর্বত্র উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয় না। সেজন্য বৃষ্টিহীন বা বৃষ্টিবিরল অংশে জলসেচন দরকার হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বৎসরে ৪২৫" ই. বৃষ্টিপাত হয়. কিন্তু উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমভাগে স্বাভাবিক বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫ই., বোম্বাইয়ের কোন কোন স্থানে ২১" ই., হায়দারাবাদে ২৩" ই.। এ-সকল স্থলে জলসেচ দরকার।

(২) **অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত**।—কোন-কোন দেশে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় বটে, কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও সময়—সকলই অনিশ্চিত। কোন বৎসর হয়ত বৃষ্টিপাত দেরীতে আরম্ভ হয়, তাহাতে কৃষিদ্রব্য পরিপুষ্ট হইতে পারে না। কোন বৎসর হয়ত ফসল পরিপুষ্ট হইবার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শেষ হইয়া যায়। কোন বৎসর হয়ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হয়, কোন বৎসর হয়ত অতিবৃষ্টিতে বন্যা হইয়া

ফসল নষ্ট হয়। সেজন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর না করিয়া আবশ্যকমত জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই এদেশের লোক ফসলের জন্য এই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই বৃষ্টির পরিমাণ ও সময় অনিশ্চিত। সেজন্য অনেক সময় ফসল ভাল হয় না।

(৩) **অসময়ে বৃষ্টিপাত**।—বৃষ্টিপাত কোন-কোন স্থানে বার মাস হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টি বৎসরের কোন এক সময়ে হয়। তাহাতে কেবল বৎসরের সেই সময়মাত্র ফসল হইতে পারে, অন্য সময় ফসল হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকালেই প্রধানতঃ বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য সেখানে গ্রীষ্মেই ফসল উৎপাদন করা হয়, শীতকালে যে-সকল শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের জলের অভাব ঘটে।

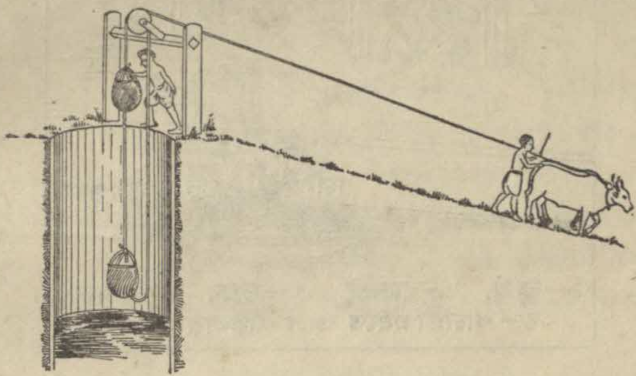
এইসকল অভাব দূরীকরণের জন্য সব দেশেই যথাসম্ভব জলসেচের ব্যবস্থা করা আছে। তবে কোন-কোন দেশের জলসেচন-প্রণালী অতি উন্নত। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে কূপ হইতে, এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নানা আকারের জলাশয় হইতে জলসেচন করিয়া কৃষিকার্য করা হইতেছে। এক্ষণে প্রায় সকল দেশেই জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। জলসেচ প্রধানতঃ তিন উপায়ে করা হয়। যেমন—(১) **কূপ**, (২) **জলাশয়**, (৩) **খাল**।


৩২নং চিত্র—দণ্ডযন্ত্র।

(১) **কূপ**—কূপ হইতে প্রধানতঃ (ক) **দণ্ড যন্ত্র**, (২) **গোবাহিত যন্ত্র**, ও (৩) **পারসিক চক্র** যোগে জল-সেচন হয়।

(ক) **দণ্ডযন্ত্র**।—একটি খুঁটির উপরে **একটি দণ্ডের এক দিকে** বাল্তি ঝুলাইয়া ও অপর দিকে লৌহখণ্ড প্রভৃতি ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া দেওয়া থাকে। বালতির দড়ি জোরে টানিয়া সহজেই বাল্তি জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অপর প্রান্তে ভারের প্রাবল্যহেতু বাল্তি জলসহ আপনিই উঠিয়া আসে। ইহাতে কূপ হইতে জল সহজেই তুলিয়া লওয়া যায়। এই যন্ত্রকে **ঢেঁকিকল**ও বলে।

(খ) গো-বাহিত যন্ত্র।—একগাছি দড়ির একপ্রান্তে জল ধারণের জন্য বাল্‌তি বা চামড়ার বড় মশক বাঁধিয়া দিতে হয়, এবং দড়িগাছি একটি কাষ্ঠের উপর আবদ্ধ চাকার উপর দিয়া চালাইয়া একজোড়া গোরুর জোয়ালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয়। কূপের পার্শ্বে কতকটা জমি নীচু দিকে ঢাল করা থাকে। গোরু সেই ঢাল দিয়া সহজেই নীচের দিকে চলিলে উপরি-উক্ত মশক জলপূর্ণ হইয়া উপরে উঠে, এবং ঐ জল মাঠে ঢালিয়া দেওয়া হয়। গোরু দুটি ঢাল বাহিয়া পুনরায় উপরের দিকে উঠিবার কালে মশক কূপের ভিতর নামিয়া যায়। গোরুর বদলে



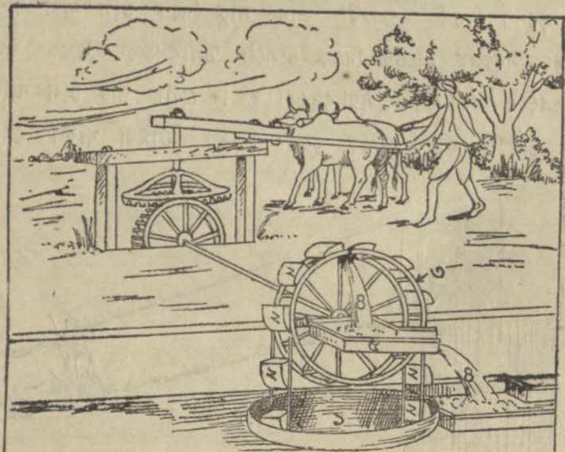
৩৩নং চিত্র।—গো-বাহিত যন্ত্র।

কোন-কোন স্থলে মহিষও ব্যবহৃত হয়, এবং দড়ির বদলে লোহার শিকলও ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রকে উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি ভারতের কোন-কোন অংশে "চর্‌ষা" বলে।

(গ) পারসিক চক্র (Persian wheel)।—এই চাকা অনেক প্রকারের হয়। এই প্রকার চাকার গায়ে একটি শিকল লাগানো থাকে, ও তাহাতে অনেকগুলি বাল্‌তি বাঁধা থাকে। বাল্‌তির গাত্রে ঐ শিকলটি কূপের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। চক্র ঘুরাইয়া সেই বাল্‌তিতে জল তুলিয়া ক্ষেতে দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ যে-সকল নিম্নসমতল স্থানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী না হইলেও ফসলের পক্ষে হয়ত একেবারে কম নহে,—অথচ আরও জল পাইলে ফসলের প্রাচুর্য হইতে পারে—এবং যেখানে অল্পদূর খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়, সেখানে কূপ খনন করা হয়। ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে, উত্তর-প্রদেশে, বিহারে ও পশ্চিম-বঙ্গের পশ্চিম অংশ প্রভৃতি স্থানে এই কূপ-সেচন-প্রথা প্রচলিত। কূপ হইতে জল তুলিবার সময় কখনও-কখনও এক জোড়া গোরুর স্থানে দুই জোড়া

গোরু জুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারতে পূর্বপাঞ্জাব, কাথিয়াবাড়, রাজপুতানা ও মালাবার উপকূলে পারসিক চক্র প্রচলিত আছে।



৩৪নং চিত্র।—পারসিক চক্র।

(২) **জলাশয়**।—কোথাও-কোথাও ছোট বা বড় জলাশয় হইতে ডোঙ্গা প্রভৃতি দ্বারা জল তুলিয়া সেচন করা হয়। এখনও এই প্রথা অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে জমি অসমান। সেজন্য সেদেশের সর্বত্রই প্রায় স্বাভাবিক গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গর্তে, ও নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া, জল সঞ্চয় করিয়া তাহার সাহায্যে জলসেচন হয়। দাক্ষিণাত্যে যে-সব অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী, সে-সকল অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই জলাশয় দেখা যায়। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় নানাস্থানে বড়-বড় জলাশয় খনিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে, মহীশূরে ও অন্ধ্রপ্রদেশে এইরূপ জলাশয় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষাকালে জল ধরিয়া রাখা হয় ও উপযুক্ত সময়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি বড়-বড় পুষ্করিণী ও হ্রদের মত বড় হয়। কোন-কোনটি পাঁচ-ছয় মাইল লম্বা। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে জলাশয় হইতে জলসেচন-স্থানের পরিমাণ ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ২৯ হাজার হেক্ট-এয়র।

ইহা ব্যতীত নলকূপ দ্বারাও জলসেচ হয়। এক্ষণে উত্তর-প্রদেশে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা **নলকূপ** হইতে জলসেচন হইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২৫ লক্ষ কূপ আছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমে বৃষ্টিপাত কম। সেখানে মিরাট, বুলন্দসহর, আলিগড়, বুদাউন, বিজনোর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিদ্যুৎ-চালিত নলকূপ-যোগে জলসেচনব্যবস্থা হওয়াতে চাষের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

কূপ বা জলাশয় হইতে যেখানে জল তোলা হয়, সেখান হইতে একটি বড় নালী কাটিয়া জমির ভিতর লওয়া হয়। সেই প্রধান নালী হইতে জমির ভিতর চারিদিকে শাখা-নালী কাটা হয়। প্রধান নালীতে কূপ বা জলাশয় হইতে জল আসিলে, সেই জল শাখা-নালী যোগে জমির চারিদিকে যায় ও জমিকে আর্দ্র করে।

(৩) **খাল**।—খাল দ্বারা জলসেচনই শ্রেষ্ঠ উপায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ অব্দের হিসাবে ৯৬ লক্ষ ৬৩ হাজার হেক্ট-এয়র জমিতে খাল দ্বারা জলসেচ হয়। এই খাল দুই প্রকার—(ক) প্লাবন খাল, (খ) নিত্যবহ খাল।

(ক) বর্ষাকালে নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে সেই সময় নদী হইতে কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত খনিত খালে জল প্রবেশ করে, এবং তখনই কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন সম্ভব হয়। এই খালকে **প্লাবন খাল** (Inundation canal) বলে। এই খালের মুখে জল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বাঁধ থাকে না।



৩৫নং চিত্র।—নালী দ্বারা জলসেচনের প্রণালী।

(খ) আবার কতকগুলি খাল, নদী যেখানে পর্বত পরিত্যাগ করিয়া সমভূমিতে নামিয়া আসে ঠিক সেখান হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। পাকা বাঁধ দিয়া এই খালে জল সংগ্রহ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই খালকে বলে **নিত্যবহ খাল**

(Perennial canal)। এখানে বারমাসই **খালের শাখাপ্রশাখা দ্বারা** ক্ষেত্রে ইচ্ছামত জল পরিচালিত করা যায়। এইরূপ খাল উত্তর-ভারতেই বেশী। কারণ, উত্তর-ভারতের নদীগুলিতে বারমাসই জল সংগ্রহ করা যায়। উত্তর-প্রদেশের **সার্দা খাল** পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে-পাঁচ হাজার মাইল। খাল দ্বারা জলসেচনে পাঞ্জাব প্রদেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। উত্তর-প্রদেশ ও বিহার প্রদেশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রেও খালের দ্বারা জলসেচন হয়। দক্ষিণ-মাদ্রাজ প্রদেশে জলসেচ-খালের সংখ্যা কম। কারণ দক্ষিণ-ভারতে বৃষ্টি কম। সেজন্য কেবল ইহার বৃষ্টিবহুল পশ্চিমভাগে এবং গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে প্রধানতঃ খালদ্বারা জলসেচন হয়।

---

(১)

কৃষিজ দ্রব্য,—খাদ্যশস্য

ধান্য, গম, চা, কফি, ইক্ষু, বীট

১। ধান্য

ব্যবহার।—ধান্য মৌসুমী-বায়ু-প্রবাহিত অঞ্চলের প্রধান শস্য। পৃথিবীর শতকরা ৫০ জন লোকের খাদ্য চাউল। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে চাউল জন্মে বেশী,—সুতরাং সেখানে লোকের প্রধান খাদ্য চাউল, এবং লোকবসতিও ঘন। পৃথিবীর উৎপন্ন মোট খাদ্যশস্যের শতকরা ১১ ভাগ ধান্য।

চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা।—ধান চাষের জন্য প্রচুর জলের দরকার। সেইজন্য মৌসুমি অঞ্চলে প্রচুর ধান হইয়া থাকে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে জলসেচন দ্বারা ধান্য-ক্ষেত্রে জল দিতে হয়। পাললিক মাটি, বিশেষতঃ মিশ্রিত পাললিক মাটি ও কর্দম মাটি, ধান্য চাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী, এবং জলাভূমি ও নিম্নভূমি ধান চাষের উপযোগী স্থান। উচ্চভূমি ও পাহাড়ের উপরেও ধানচাষ হয় বটে, তবে ফসল ভাল হয় না। সমতল নিম্নভূমিতেই চাষ ভাল হয়। ধান্য-ক্ষেত্রের অধোভূমি (subsoil) দুর্ভেদ্য হওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত জলই শুষিয়া যায়। ধানের জন্য অন্ততঃ ৪০″ ই. বৃষ্টিপাত দরকার, এবং ধানের 'কলা' বাহির হওয়ার সময়, বৃদ্ধির সময়, এবং পাকিবার সময়,—সকল সময়েই উত্তাপ দরকার। ৬৮° ডি. ফা. অপেক্ষা কম উত্তাপে অনেক সময় ধানের কলা বাহির হয় না। বৃদ্ধির সময় ৭০° ফা. এবং পাকিবার সময় ৮০° ফা. উত্তাপ দরকার। ৪৫° অপেক্ষা কম উত্তাপে ধানের চাষ হয় না। গ্রীষ্মমণ্ডল ও তৎসন্নিহিত স্থানই ধান্য উৎপাদনের প্রধান স্থান। ধান চাষের জন্য সুলভ শ্রমিক দরকার।

উৎপাদন স্থান।—এশিয়া মহাদেশে,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, লায়স, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর বোর্ণিও, চীন, কোরিয়া, ফর্মোজা, ফিলিপাইন ও জাপান লইয়া গঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান্য উৎপাদন-স্থান।

পৃথিবীর ৯০-৯৫% চাউল এই অংশে জন্মে। চাউল-উৎপাদনে **চীনদেশ প্রথম** (১৯৬০-৬১ সালে পৃথিবীর ৩৫%), **ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়** (পৃথিবীর ১১%) **ও পাকিস্তান তৃতীয়** (পৃথিবীর ৭%)।

চীনে ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় ও তাহার দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-চীনে প্রচুর ধান জন্মে। পাকিস্তানে প্রধানতঃ পূর্ব-পাকিস্তানে প্রচুর ধান জন্মে। জাপানে প্রধানতঃ পর্বত-গাত্রে থাক কাটিয়া ধানের চাষ হয়।

ইউরোপ মহাদেশে।— ইতালী ও স্পেন দেশই প্রধান চাউল-উৎপাদনস্থান। ইতালীর পো-উপত্যকায়, ও স্পেনের সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চলেই প্রধানতঃ ধান জন্মে।

আফ্রিকায়।—মালাগাসি (পূর্বনাম—মাদাগাস্কার) **দ্বীপ ও মিশর দেশই** উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদন-স্থান। পশ্চিম আফ্রিকাতেও কিছু ধান জন্মে।



৩৬ নং চিত্র—ধানক্ষেত।

উত্তর আমেরিকায়—যুক্তরাষ্ট্র-ই অল্প পরিমাণে (পৃথিবীর ২'৪%, উ. আমেরিকার ৭৭'৭%) উল্লেখযোগ্য ধান-উৎপাদন-স্থান। এখানে পশ্চিমে কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর উপকূলে লুইসিয়ানা ও টেক্সস্ এবং মিসিসিপি উপত্যকায় আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে ধান্য জন্মে।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ব্রাজিল (পৃথিবীর ২'২%) ও **গায়েনা** দেশ ও অন্য কোন-কোন অংশে সমুদ্র-উপকূলস্থ স্থানে ধান জন্মে।



৩৭ নং চিত্র।—ধান কাটা।

মহাদেশভেদে ধান্যের উৎপাদন এইরূপ—

মহাদেশভেদে ধান্যের উৎপাদন

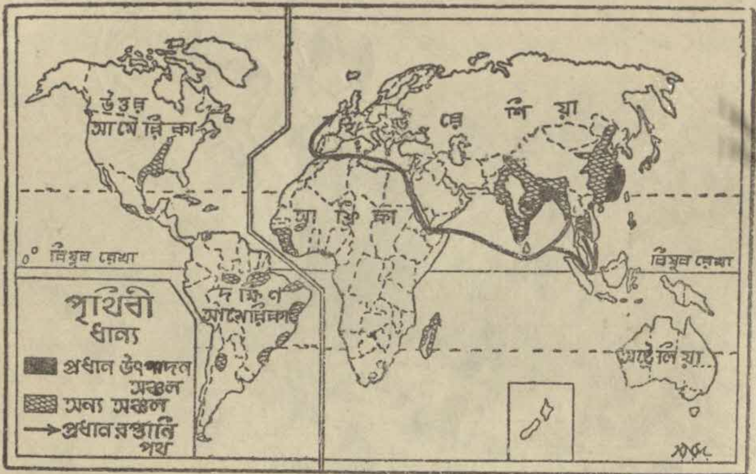
১৯৪৮-৫২ সালের গড় ও ১৯৫৯ সালের তুলনা

মহাদেশ	ধান্য উৎপাদনের জমি লক্ষ হেক্ট-এয়র		উৎপন্ন ধান্য লক্ষ মেট্রিক টন	
	১৯৪৮-৫২ গড়ে	১৯৫৯	১৯৪৮-৫২ গড়ে	১৯৫৯
এশিয়া	৯৫৮˙০	১০৯০˙০	১৫২৪˙০	২৫০৮˙০
ইউরোপ	৩˙১*	৩˙৬	১৩˙১	১৬˙২(১)
আফ্রিকা	২৮˙৩	২৬˙৮	৩৪˙৫	?
দক্ষিণ আমেরিকা	২৪˙১	৩২˙৫	৪১˙২	৫৫˙২
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা	১১˙৪	১২˙১	২৫˙২	৩৩˙৬
ওশিয়ানিয়া	০˙১	৪˙০	০˙৯	১˙৫
পৃথিবী (রুশিয়া বাদে)	১০২৫˙০	১১৬৯˙০	১৬৩৮˙৯	২৬৫৯˙০

* রুশিয়া বাদে। রুশিয়ার ৪ বৎসরের গড় ০˙৩৩

(১) রুশিয়া ১৯৫৯ সালে ০˙২১

উপরে লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে, এশিয়ায় পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৯০-৯৫ অংশ ধান্য উৎপন্ন হয়।



৩৮ নং চিত্র।—পৃথিবীর ধান্য-উৎপাদন-স্থান।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৯-'৬০ সালের চাউল উৎপাদন*

রাষ্ট্র	ধান্য সহস্র মে. টন	রাষ্ট্র	ধান্য সহস্র মে. টন
পশ্চিমবঙ্গ	৪২৩৯	গুজরাট ও মহারাষ্ট্র	১৬১১
বিহার	৩৯৪৮	মহীশূর	১৩১০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৬৭২	কেরল	১০৪১
মাদ্রাজ	৩৪৬০	পাঞ্জাব	৪১২
মধ্যপ্রদেশ	৩১৬৬	জম্মু ও কাশ্মীর	২১১
উত্তর প্রদেশ	২৪০৮	রাজস্থান	১১৬
উড়িষ্যা	২১৭২	অন্যান্য	৩৮৭
আসাম	১৬৫৫	মোট ভারত	২৯৮০৮

* Agricultural situation in India.

ফলন।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ধান্য বেশী উৎপন্ন হইলেও, এখানে ফলন বেশী নহে। যেমন—

ভিন্ন-ভিন্ন দেশে হেক্ট-এয়র প্রতি ফলন* (১৯৫৪)

দেশ	হেক্ট-এয়র † প্রতি ফলন (শত কিলোগ্রাম) ††	দেশ	হেক্ট-এয়র † প্রতি ফলন (শত কিলোগ্রাম) ††
১। অস্ট্রেলিয়া	৬১'৮	৬। পেরু	৪১'৪
২। স্পেন	৫৬'৮	৭। গ্রীস	৪০'৫
৩। জাপান	৪৮'১	৮। পর্তুগাল	৪০'৩
৪। ইতালী	৪৮'০	৯। উরুগুয়ে	৩৯'৩
৫। বেলজীয় কঙ্গো	৪৩'৭	১০। যুগোশ্লাভিয়া	৩৪'৪

* F. A. O., † ১ হেক্ট-এয়র—২'৪৭ একর। †† ১ কিলোগ্রাম=২'২ পা. (এড.)

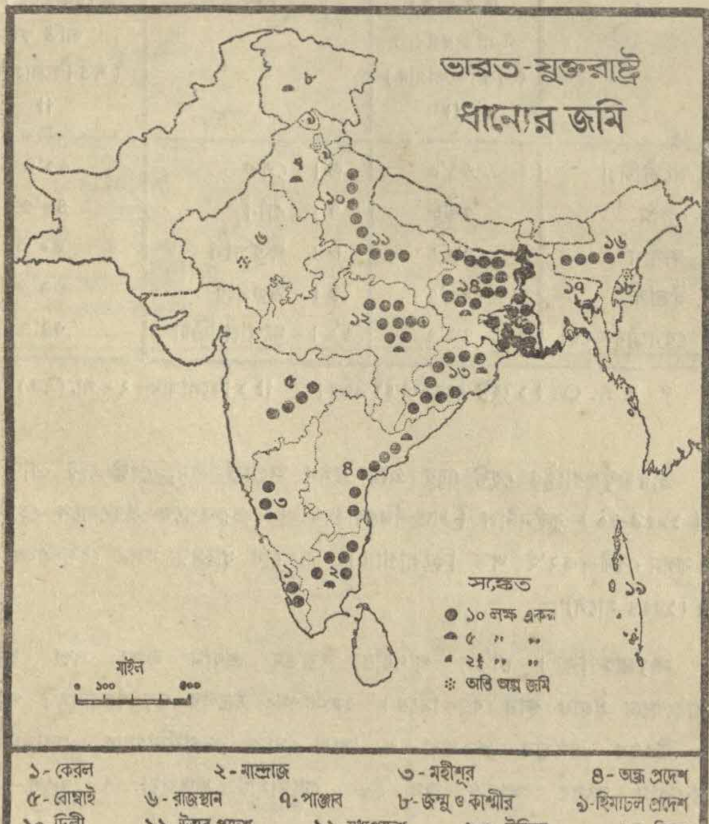
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের হেক্ট-এয়র প্রতি ফলন অনেক কম, হেক্ট-এয়র প্রতি মাত্র ৯'১ (১৯৫৯-৬০) কুইনটাল (শত কিলোগ্রাম)। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে হেক্ট-এয়র প্রতি ফলন বেশী—৪২'২ শত কিলোগ্রাম। এশিয়ায় ধানের ফলন হেক্ট-এয়র প্রতি ১৬'৫ (১৯৫৪ সালে)।

ব্যবসায়।—চাউল পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভক্ষ্য শস্য হইলেও ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহার স্থান বহু নিম্নে। ১৯৩৪-৩৮ সালের গড় হিসাবমত পৃথিবীর সমস্ত উৎপন্ন ধান্যের শতকরা ৬ অংশ মাত্র রপ্তানিক্ষেত্রে আসিয়াছিল। কোন-কোন বৎসর আরও কম হয় মোটামুটি শতকরা ৭ অংশ চাউল ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আসে।

পূর্বেই বলিয়াছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ চাউল-উৎপাদন-স্থল। ইহাই আবার সর্বপ্রধান ধান বা চাউল আমদানি এবং রপ্তানির অঞ্চল। কিন্তু এ-অঞ্চলে মাত্র দুইটি দেশ হইতে ধান্য বা চাউল রপ্তানি হয়,—যেমন, ব্রহ্মদেশ,, ও থাইল্যাণ্ড। তৎপরে ক্রমান্বয়ে (১৯৬০ সালে) চীন, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলের অন্য দেশ কয়টির উৎপন্ন-দ্রব্য দ্বারা তাহাদের নিজেদেরই অভাব-মোচন হয় না। অবশ্য অনেক দেশ চাউল আমদানিও করে,

রপ্তানিও করে। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, মালয়-সিঙ্গাপুর, সিংহল, হংকং, জাপান, পাকিস্তান প্রধান আমদানি-কারক দেশ।

১৯৫৯-৬০ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতবর্ষে উৎপন্ন চাউল ২৯৮০৭ মে. টন, আমদানি ৭০০ সহস্র মে. টন এবং রপ্তানি কিছুই নয়।



৩৯ নং চিত্র।

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন পৃথিবীতে চাউল রপ্তানিতে প্রথম। থাইল্যাণ্ড চাউল-রপ্তানির দ্বিতীয় বন্দর।

২। গম

ব্যবহার—গম পৃথিবীর লোকের,—বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ জাতির,—প্রধান খাদ্য। পৃথিবীতে যত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৫২ ভাগই (১৯৫৬) গম। অধিকাংশ গম হইতে **ময়দা, আটা** ও **সুজি** প্রস্তুত হয়। ইতালী দেশের ম্যাকারোনী (Macaroni) ও ভার্মিসেলি (Vermicelli) নামক খাদ্য ময়দার সহিত ডিম, চিনি ও জাফরান প্রভৃতি মিশাইয়া ছোট-ছোট সূত্রাকারে গঠিত বিখ্যাত খাদ্য। গম হইতে প্রস্তুত শ্বেতসার (Starch) একটি মূল্যবান্ বস্তু। গ্লুকোজ, কাগজ জুড়িবার আঠা, চর্মকারের আঠা প্রভৃতি শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার দ্রব্য। চেয়ারে বসিবার আসন প্রস্তুত করিতে, এবং শক্ত অথচ হাল্কা টুপি প্রস্তুত করিতে গমের খড়ের দরকার হয়। ইহার খড় হইতে মোড়কের জন্য সস্তা কাগজও প্রস্তুত হয়।

গম চাষের—উপযোগী অবস্থা।—বৃষ্টিপাত।—গমের চারা বীজ হইতে বাহির হইবার পর, গমের দানা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত চারি মাস সময় লাগে। ইহার দুইটি অবস্থা বলা যায়,—(১) **গঠনকাল** ও (২) **পরিপুষ্টি কাল।**

গঠনকালে—ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় গমের গাছ সতেজ হইতে পারে। গাছ যদি খুব সতেজ হয়, ও ঝাড় বাঁধিয়া উঠে, তবে গমের শীষের সংখ্যা বেশী হয়, সুতরাং দানা বেশী হয়, ও ফসল ভাল হয়। গম চাষের পক্ষে চাষের প্রথম অবস্থায় কিছু বৃষ্টিপাত, এবং পরে একক্রমে কিছুদিন আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার আবশ্যকতা বেশী। গম পাকিবার সময় নির্মল, উজ্জ্বল ও শুষ্ক আবহাওয়ার এবং সূর্যোত্তাপের দরকার হয়। পাকিবার সময় বৃষ্টি হইলে ফসল নষ্ট হয়। সেইজন্য উষ্ণপ্রধান ও বৃষ্টিবহুল স্থানে গমের ফসল ভাল হইবার সম্ভাবনা কম। মোটামুটি হিমশীতোষ্ণ অঞ্চলে ১০ হইতে ৪০ ই. এবং উষ্ণশীতোষ্ণ অঞ্চলে ২০ হইতে ৪০ ই. বৃষ্টিপাত আবশ্যক।

উত্তাপ।—যেখানে গ্রীষ্মকালে মোটামুটি ৫৭° ফা. অপেক্ষা গড় উত্তাপ কম, সেখানে গম জন্মে না। সেজন্য উত্তর গোলার্ধে ৬৬° উ. অক্ষাংশের চেয়ে বেশী অক্ষাংশে গম হয় না। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশগুলি সঙ্কীর্ণ বলিয়া সেখানে মোটামুটি ৪৬° দ. অক্ষাংশ পর্যন্ত দক্ষিণে গম জন্মে না। গম পাকিতে বেশী উত্তাপ লাগে। সেজন্য উ. মেরুর দিকে গম যতদূর উচ্চ অক্ষাংশে জন্মে, তাহার উচ্চতর অক্ষাংশে যব, রাই ও জই জন্মে।

মৃত্তিকা।—কৃষ্ণমৃত্তিকা (Charnozem) গম চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাটি। সোজাসুজি গমের জন্য বালুকা ও পচা পাতা ইত্যাদি মিশ্রিত ভাল দো-আঁশ মাটি দরকার।

শ্রেণীভেদ।—ঋতুভেদে গম দুই প্রকার, (১) শীতের গম ও (২) বসন্তের গম।

(১) শীতের গম।—শরৎকালে (Autumn) ইহার বীজ বপন করা হয় ও গ্রীষ্মে ইহা কাটিয়া লওয়া হয়। আমেরিকায় শরৎকালকে বলে Fall ;—সেজন্য সেখানে সে-সময়ের গমকে বলে Fall wheat.

(২) বসন্তের গম।—বসন্তকালে ইহার বীজ বপন করা হয়, এবং গ্রীষ্মকালে শস্য-সংগ্রহ হয়।

শৈত্যে ও উত্তাপ হিসাবে **বিভিন্ন অক্ষাংশে বিভিন্ন সময়ে** গম উৎপাদন করা হয়। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে বসন্তকাল হইতে গ্রীষ্মের কতক দূর পর্যন্ত আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে, এবং গ্রীষ্মের শেষে ও শরতের প্রথমে গম পাকিবার উপযোগী শুষ্ক ও উজ্জ্বল আবহাওয়া ও সূর্যোত্তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু তুষারপাতে গমের চাষ নষ্ট হয়,—তাই এই অঞ্চলে বসন্তে বৎসরের শেষ তুষারপাত হইয়া গেলে গমের চাষ আরম্ভ করিতে হয়, এবং শরতে বৎসরের প্রথম তুষারপাতের পূর্বেই চাষ শেষ করিতে হয়।

গমের উৎপাদন-স্থল।—উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য কথা।—পূর্বেই বলিয়াছি শীতাতপ হিসাবে প্রধানতঃ শীতোষ্ণমণ্ডলেই গম জন্মে, এবং উত্তর গোলার্ধে **৬৬° উ. অক্ষাংশের চেয়ে বেশী অক্ষাংশে গম হয় না।** কিন্তু **উষ্ণমণ্ডলেও গম জন্মে।** কারণ উষ্ণমণ্ডলেও শীত আছে, এবং শীত তীব্রও নহে, দীর্ঘস্থায়ীও নহে। সেজন্য শীতের অব্যবহিত পূর্বে গমের চাষ হয়, এবং শীতের মধ্যে গাছগুলি বাড়িবার সুবিধাও পায়।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু গম চাষের সবিশেষ উপযোগী। কারণ শস্যের বৃদ্ধিকালে অর্থাৎ শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয়, এবং শস্যচ্ছেদনের কালে বৃষ্টি হয় না।

তুষারপাতে গমের চাষ নষ্ট হয় বলিয়া যে-সকল স্থানে শীত বেশী ও তুষারপাত অল্পদিন বন্ধ থাকে, সেখানে শীতের অব্যবহিত পরে যেইমাত্র তুষারপাত বন্ধ হয়, সেই সময়ে গমের চাষ আরম্ভ করিয়া পুনরায় তুষারপাত আরম্ভ হইবার পূর্বেই যদি গম পাকাইয়া লওয়া যায়, তবে এরূপ স্থলেও গম-চাষের কোন বাধা থাকে না। সেইজন্য মেরুর দিকে কতকদূর পর্যন্ত—যেখানে সাধারণতঃ গম-চাষ সম্ভব নহে, সেখানে—বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বীজের উন্নতি-সাধন করিয়া তাহাকে অল্পদিনে পাকিবার উপযোগী করা হইয়াছে। এইজন্য ক্যানাডা ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ অক্ষাংশেও গমের চাষ হইতেছে। ঐ

সকল স্থানে ৯০ দিনের মধ্যেই গম পাকিয়া উঠে। আরও শীঘ্র পাকাইবার জন্য এখনও গবেষণা চলিতেছে।

সুতরাং এক্ষণে **পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই** গমের চাষ হইতেছে। আলাস্কা ও সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত এবং সমুদ্রতীর হইতে বহু উচ্চ স্থান পর্যন্ত গমের চাষ হইয়া থাকে।

গমের চাষে মহাদেশগুলির স্থান। (১৯৫৯)—মহাদেশগুলির মধ্যে গম-উৎপাদনে **এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ,** তাহার পরে **ইউরোপ,** তাহার পরে উ. ও ম. **আমেরিকা।** তাহার পরে ক্রমান্বয়ে **দক্ষিণ আমেরিকা, ওশিয়ানিয়া, আফ্রিকা।**

নিম্নে মহাদেশগুলিতে উৎপন্ন গমের হিসাব দেখানো হইল।

মহাদেশ হিসাবে গমের উৎপাদন (১৯৬০)*

পৃথিবী—১৮০৯ লক্ষ মেট্রিক টন†

মহাদেশ	উৎপন্ন গম (লক্ষ মে. টন)	পৃথিবীর উৎপাদনে শতকরা অংশ ১৯৬০	মহাদেশের উৎপাদনে বার্ষিক গড় (১৯৩৪-৩৮ সালের গড় হিসাব লক্ষ মে. টন)
এশিয়া	৬১৮	৩৪'১	৩৬৮ (১)
ইউরোপ	৫৬৭ (৩)	৩১'৩	৪১১'৩ (২)
উ. ও ম. আমেরিকা	৪৩৪	২৩'৯	৪৫০'৯
দ. আমেরিকা	৮২	৪'৫	৭৪'১
ওশিয়ানিয়া	৫৬	৩'১	৫৩'০
আফ্রিকা	৫২	২'৮	৪৩'০
পৃথিবী	১৮০৯	×	১৪০১'০

* F. A. O. Agricultural Statistics অবলম্বনে রচিত।

† ১ মেট্রিক টন='৯৮ বড় টন=১'১০২ ছোট টন—২২০৪'৬ পা. (এভ.)=মোটামুটি ২৬'৮ মণ।

(১) চীন মহাদেশীয় অংশ বাদে উৎপাদন ২১১'৬ ল. মে. টন।

(২) সো. রুশিয়ার তিন বৎসরের গড় ৩৫৭'৬ ল. মে. টন।

(৩) সো. রুশিয়ার তিন বৎসরের গড় ৬৯১'০ ল. মে. টন

দেশ হিসাবে

সর্বপ্রধান গম উৎপাদন স্থান*

(১৯৬১—৬২)

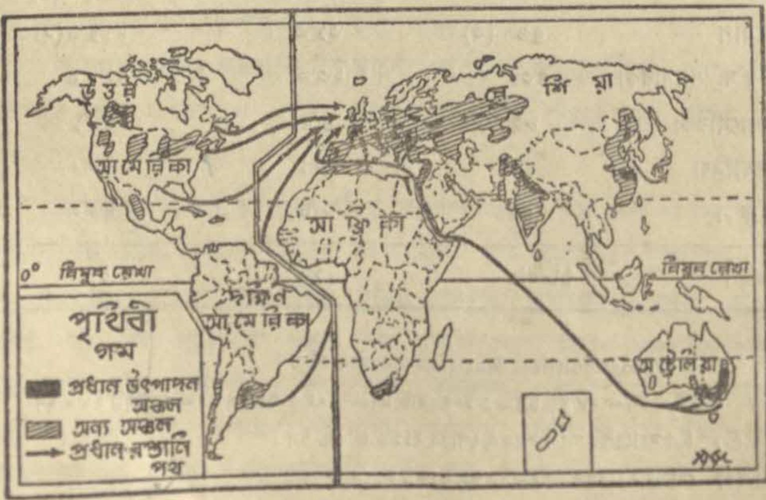
পৃথিবী—২৩ কোটি ৪৬ লক্ষ মে. টন

দেশ	উৎপন্ন গম স. মে. টন	দেশ	উৎপন্ন গম স. মে. টন
১। সো. রুশিয়া	৬,৫৫,০০	৬। ইতালী	৮২,৯২
২। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩,৩৬,০৩	৭। তুরস্ক	৭১,৩৫
৩। চীন †	৩,১২,৯৪	৮। ক্যানাডা	৭১,২২
৪। ভারতবর্ষ	১,০৮,১৯	৯। অস্ট্রেলিয়া	৫৯,৮৮
৫। ফ্রান্স	৯৪,৩০	১০। আর্জেন্টিনা	৫১,৫০

* F. A. O. Monthly Bulletin 1962.

† ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাবে।

দেশ হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ গম উৎপাদন স্থান **সোভিয়েট রুশিয়া**। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এদেশে ইহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ পূর্ব দিকে মধ্য সাইবেরিয়া পর্যন্ত গম-উৎপাদন ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইহার মধ্যে ইউক্রেন সর্বপ্রধান শীতের গম-উৎপাদন স্থান। এখানে



৪০নং চিত্র।—পৃথিবীর গম উৎপাদন স্থান।

এত গম উৎপাদন হয় যে ইহাকে রুশিয়ার "রুটির ঝুড়ি" (bread busket) বলে। ডন নদীর পূর্বে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বসন্তের গম উৎপাদন স্থান। রুশিয়ায় পৃথিবীর ২৮% গম উৎপন্ন হয় (১৯৬০-৬১)।

পৃথিবীর দ্বিতীয় গম উৎপাদক দেশ (১৫%) **আ. যুক্তরাষ্ট্র**। পশ্চিমে রকি পর্বতমালা এবং পূর্বে আপালাশিয়ান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে সমতল ভূমি—ইহাই আ. যুক্তরাষ্ট্রের "প্রেইরি" নামক তৃণক্ষেত্র। এখানে স্থপ্রচুর শস্য জন্মে। উত্তর-দক্ষিণ ডাকোটা, নেব্রাস্কা, ক্যানসাস, ওকলাহোমা, মুসৌরী, ইল্লিনইস্, ইণ্ডিয়ানা, ওহাইও অঙ্গরাজ্যগুলি প্রধান গম-উৎপাদন স্থান।

তৃতীয় গম উৎপাদন স্থান **চীনদেশ**। চীনের উত্তরে "চীনের দেওয়াল" আছে। তাহার দক্ষিণে উত্তর চীন এখানকার প্রধান গম উৎপাদন স্থান। চীনের অন্তর্গত মঙ্গোলিয়ার অংশে ও মাঞ্চুরিয়ায় গম জন্মে। মাঞ্চুরিয়া এখন চীনের অন্তর্ভূক্ত। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অবস্থিত চীনের প্রসিদ্ধ ধান্য ক্ষেত্রেও শীতকালে কিছু-কিছু গম জন্মে।

চতুর্থ গম উৎপাদন-স্থান **ভারতবর্ষ**। এ-বৎসর গম-উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান উচ্চতর হইয়াছে। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

ইউরোপের মধ্যে **ফ্রান্স** পৃথিবীর পঞ্চম গম উৎপাদন স্থান। ফ্রান্সের চাষের জমির এক-চতুর্থাংশ জমিতে গম জন্মে।

এ বৎসরে ষষ্ঠ গম উৎপাদক দেশ **ইতালী**। ভূমধ্যসাগরীয় স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশ জলবায়ুর উপযোগিতায় গম উৎপাদন করে। ইতালীতে এবৎসর অধিক গম জন্মিয়াছে।

এবৎসর ৭ম উৎপাদন স্থান অধিকার করে তুরস্ক, ৮ম স্থান অধিকার করে ক্যানাডা, ৯ম স্থান অষ্ট্রেলিয়া, দশম স্থান অধিকার করে আর্জেন্টিনা।

ক্যানাডার প্রেইরি অঞ্চলই (আলবার্টা, সাস্কাচুয়েন, ম্যানিটোবা) শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদন অংশ। কানাডার উত্তর অংশে তুষারপাতহীন দিনের সংখ্যা কম। এই অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে গম পরিপুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে সেজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাছাড়া এ-অঞ্চলের একটি সুবিধা আছে—গম চাষের সময়েই এখানে দিনগুলি ১৭।১৮ ঘণ্টা দীর্ঘ হয়। ইহাতে গম উত্তাপ বেশী পাইয়া শীঘ্র-শীঘ্র পরিপুষ্ট হয়।

দেশ হিসাবে উপরের দশটি স্থলই প্রধান গম উৎপাদন স্থান। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কয়েকটি গম উৎপাদন-স্থান—

উত্তর আমেরিকায়—মেক্সিকো প্রভৃতি।

দক্ষিণ আমেরিকায়—চিলি প্রভৃতি।

আফ্রিকায়—আলজিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি।

এশিয়ায়—পাকিস্তান, জাপান প্রভৃতি।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে গম-উৎপাদক রাষ্ট্রগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল—

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

গম-উৎপাদক প্রধান-প্রধান রাষ্ট্র ১৯৫৯-৬০

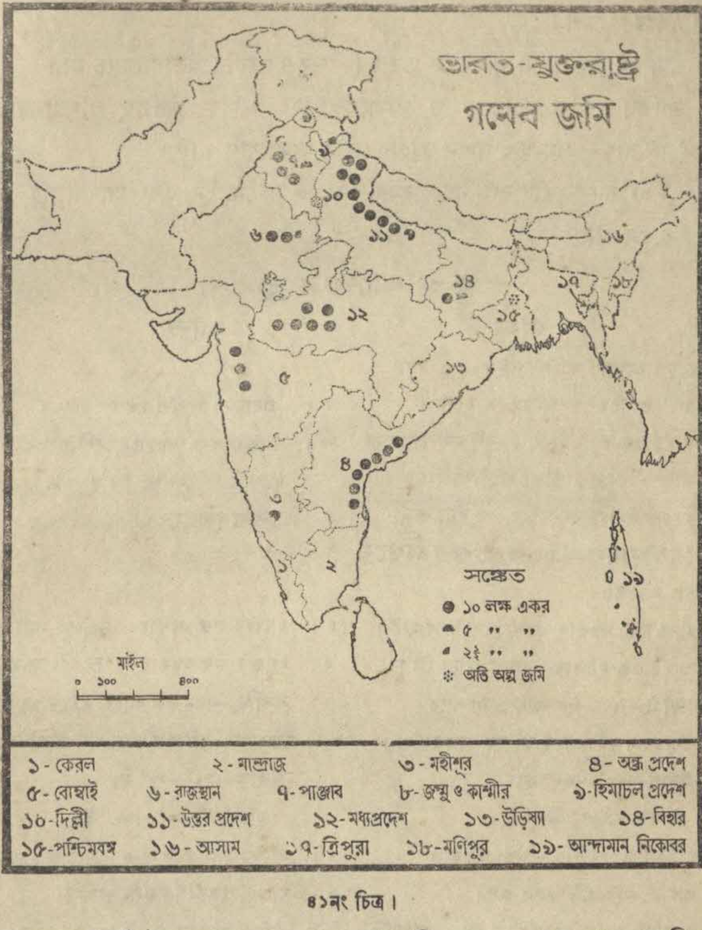
সমগ্র ভারত—৯৮৯০ সহস্র মে. টন

রাষ্ট্র	উৎপাদন-পরিমাণ সহস্র মে. টন	রাষ্ট্র	উৎপাদন-পরিমাণ সহস্র মে. টন
১। উত্তর প্রদেশ	৩২৯১	৯। পশ্চিমবঙ্গ	৩১
২। মধ্যপ্রদেশ	২১৪৬	১০। অন্ধ্র	৪
৩। পাঞ্জাব	২১১৯	১১। উড়িষ্যা	৪
৪। রাজস্থান	১০২৩	১২। আসাম	১
৫। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র	৬৭৫	১৩। মাদ্রাজ	১
৬। বিহার	৩২৬	১৪। অন্যান্য	১৩৭
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	৬৯	মোট ভারত—	৯৮৯০
৮। মহীশূর	৬৩		

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ উপরের প্রথম পাঁচটি রাষ্ট্রেই গম জন্মে। মোটামুটি উত্তর-পশ্চিম ভারতই গম-উৎপাদন-স্থান, এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে গম জন্মে না বলিলেই হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান খাদ্য গম। সেখানে দেশের মধ্যে ধান্য-বহুল স্থান হইতে কিছু-কিছু গম রপ্তানি হয় বটে, কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতেও গম আমদানি হয়।

ব্যবসায়।—পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে (১৯৬০) গমের স্থান অতি উচ্চে। পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে **গম রপ্তানি হয়** প্রধানতঃ আ. যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স হইতে। পৃথিবীতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপই প্রধান গমের বাজার। এ-অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী। এখানে গমের প্রগাঢ় চাষ হয়। গমের ফলনও বেশী। তথাপি গমের অভাব পূর্ণ হয় না। ইহা হইতে দেখা যায়,

যে-দেশগুলি লোকবিরল ও বহুবিস্তৃত সেইগুলিই গম রপ্তানি করে ;—আর যে-গুলি লোকবহুল, তাহারা প্রধানতঃ শিল্পনির্ভর ;—তাহারা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়াও



৪১নং চিত্র।

দেশের অভাব মিটাইতে পারে না,—গম আমদানি করে। অন্য গম রপ্তানিকারক উল্লেখযোগ্য দেশ—ফ্রান্স, সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি। ১৯৬০ সালে রুশিয়া হইতে ১৭% গম রপ্তানি করা হয়।

গম আমদানির উল্লেখযোগ্য দেশ (১৯৬০)—ভারতবর্ষ, গ্রেট বৃটেন, জাপান, ব্রাজিল, পূর্ব ও প. জার্মানি, পোলণ্ড ও পাকিস্তান। ইহাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেন পৃথিবীর মধ্যে চিরদিন সর্বাপেক্ষা বেশী (তাহার মোট খরচের ২/৩ হইতে ৩/৪ অংশ) গম আমদানি করে। এমন কি কোন-কোন বৎসর সমগ্র ইউরোপে মোট যত গম আমদানি হয়, তাহার অর্ধেক আমদানি হয়, গ্রেট বৃটেনে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, গ্রেট

বৃটেন শিল্পজীবী হইয়াছে। ১৯৬০ খৃঃ অব্দে গ্রেট বৃটেন ইউরোপের মোট আমদানির ২৮% অংশ আমদানি করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালের হিসাবে ভারতবর্ষ সর্বপ্রধান আমদানিকারক দেশ।

চীন গম উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয়। তবুও তাহার অভাব ঘোচে না।

ব্রাজিল—কফি, ক্যাকাও ও তামাকের চাষ অধিক অর্থপ্রসূ বলিয়া তাহাদের চাষ লইয়াই ব্যস্ত—গম-উৎপাদনে তাহার কোন মনোযোগ নাই।

১৯৬০ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ ৩৩৬৩৮ স. মে. টন, এবং আমদানির পরিমাণ ৩০৭২২ স. মে. টন।

গম ও ধান্যের তুলনা

গম	ধান্য
১। চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।	
২। প্রধানতঃ হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে রখাদ্য।	২। প্রধানতঃ ক্রান্তীয় মণ্ডলের খাদ্য।
৩। গমের জন্য প্রথম অবস্থায় বেশী জল লাগে না লাগে—কেবল ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া। সেজন্য ইহা স্থান-বিশেষে, হয় শীতের শেষভাগে,না হয় বসন্তের প্রথমে চাষ করা হয়।	৩। ধান্যের প্রথম অবস্থায়ই বেশী জলের দরকার। সেজন্য ইহার চাষ আরম্ভ হয় বর্ষাকালে।
৪। গমের জন্য দরকার—হাল্কা দো-আঁশ মাটি।	৪। ধান্যের জন্য দরকার—পাললিক মাটি।
৫। গমের জন্য দরকার—অল্প-ঢালু উঁচু জমি,—যেন জল জমিতে না পারে।	৫। ধান্যের জন্য দরকার নীচু সমতল জমি,—যেন জল বাহির হইতে না পারে।
৬। উষ্ণপ্রধান বৃষ্টিবহুল স্থানে গম ভাল হয় না। উত্তাপ—৪০°—৬০° ফা. বৃষ্টিপাত—১৫"—৪০" ই.	৬। উষ্ণপ্রধান বৃষ্টিবহুল স্থানে ধান ভালই হয়। উত্তাপ—৬০°—৮০° ফা. বৃষ্টিপাত—৪০"—৬০" ই.
৭। গমের জন্য দরকার—শুষ্ক গ্রীষ্মকাল	৭। ধানের জন্য দরকার—আর্দ্র গ্রীষ্মকাল।
৮। গমের একরপ্রতি ফলন কম।	৮। ধানের একরপ্রতি ফলন বেশী।
৯। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গমের স্থান উচ্চ—আমদানি-রপ্তানি বেশী।	৯। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ধানের স্থান বহু নিম্নে,—আমদানি-রপ্তানি কম।
১০। গম শ্বেতজাতির প্রধান খাদ্য।	১০। চাউল অশ্বেতজাতির প্রধান খাদ্য।
১১। গম উৎপাদনে ইউরোপ সর্বশ্রেষ্ঠ।	১১। চাউল উৎপাদনে এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ।
১২। উৎপন্ন গমের অধিকাংশ বিক্রয়ার্থ বাজারে আসে।	১২। উৎপন্ন চাউলের অধিকাংশ উৎপাদকের নিজেদের সংসার প্রতিপালনে ব্যয়িত হয়।
১৩। গম যেখানে জন্মে সেখানে জমি সস্তা, শ্রমিক দুর্মূল্য এবং বসতি-বিরল।	১৩। যে-অঞ্চলে ধান জন্মে সেখানে জমি মহার্ঘ, শ্রমিক সস্তা, এবং বসতি অত্যন্ত ঘন।

৩। চা

ব্যবহার।—মৃদু-উত্তেজক পানীয়রূপেই চা ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতে তৈল হয়, সেই তৈল হইতে সাবান উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া চা হইতে ক্যাফিন (caffeine) নামে একপ্রকার ক্ষারদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।



৪২নং চিত্র—চ-এর শাখা।

উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা।—চা-এর জন্য দরকার—প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬০"—১০০", কখনও-কখনও তদপেক্ষা বেশী), বৃদ্ধিকালে প্রচুর উত্তাপ, উর্বরা জলনিকাশী জমি এবং পাতা খুঁটিয়া তোলা ও পাতা ঝলসানো, পাকানো ও সাজানো প্রভৃতি কার্যে অভিজ্ঞ ও সুলভ শ্রমিক। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত দরকার বলিয়া উষ্ণমণ্ডলে ও তৎসন্নিহিত স্থানে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে চা ভাল জন্মে। সাধারণতঃ মনে করা হয় ভাল জমি না হইলে চা-এর চাষ হয় না, তাই পর্বতগাত্রই চা-চাষের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রেও এখন চা-এর চাষ হইতেছে। চা-এর জমিতে লৌহ-মিশ্রণ উপকারী।

চা-গাছ হইতে তাহার শাখার একটি কুঁড়ি ও দুইটি কচিপাতা মাত্র কাটিয়া লওয়া হয়। আমরা যে চা ব্যবহার করি তাহা চা-এর গাছের ঐ অংশটুকু মাত্র।



৪৩নং চিত্র। চা-গাছ হইতে একটি কুঁড়ি ও দুইটি পাতা কাটিয়া লওয়া হইতেছে।

উৎপাদন স্থান।—চা উষ্ণ প্রদেশের ও নিকটবর্তী নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের কৃষিদ্রব্য। ধানের মত **চা-ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গর্বের সম্পদ**। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলই **পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা-উৎপাদন স্থান**। পৃথিবীর উৎপন্ন চা-এর ৭৫·৫% চা এই অঞ্চলে জন্মে। ইহার সর্বপ্রধান কারণ দুইটি,—(১) ইহা গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ুর দেশ।

(২) এই অঞ্চলে শ্রমিক সুলভ, চা-এর কার্যে অভিজ্ঞ ও সহজপ্রাপ্য, এবং (৩) ভারতবর্ষ বৃটিশ-অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া সেখানে চা-চাষের বিজ্ঞান-সম্মত উন্নতি হইয়াছে, ও তাহাদের চেষ্টায় চা-এর ব্যবহার দেশ-বিদেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং চা-এর ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে। তাছাড়া (৪) এই অঞ্চলই চা-এর আদি জন্মভূমি।



৪৪নং চিত্র। চা-চয়ন।

মোটামুটি **এশিয়া** মহাদেশে—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফর্মোজা, ইন্দোচীনে চা জন্মে।

আফ্রিকা মহাদেশে চা জন্মে—কেনিয়া, নিয়াসাল্যাণ্ড, মোজাম্বিক, উগাণ্ডা প্রভৃতি স্থানে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ইংরাজেরা তাহাদের আফ্রিকা মহাদেশীয় উপনিবেশে চা-এর চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

ইউরোপে—সোভিয়েট রুশিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ব্রাজিল, পেরু।

[উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে জমি ও জলবায়ু চা-চাষের উপযোগী। কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিকের অভাবে এখানকার চা-এর চাহিদা নাই।]

পৃথিবীর চা-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে প্রধানগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

পৃথিবীর উৎপন্ন চা*—১৯৬১

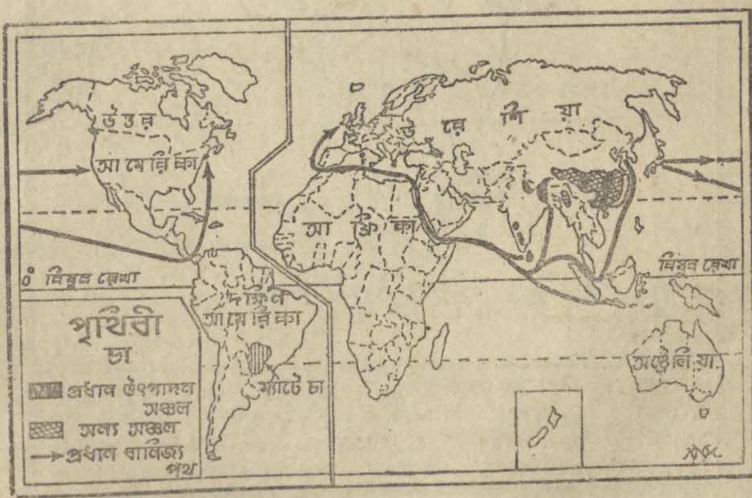
পৃথিবী—১০৩৮ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপন্ন চা স. মে. ট.	দেশ	উৎপন্ন চা স. মে. ট.
ভারত	৩৫৫	ইন্দোনেশিয়া	৬৩
সিংহল	২১০	সো. রাশিয়া	৩৮
চীন	১৫৮	পাকিস্তান	২৭
জাপান	৮৪	ফর্মোজা	১৭

*F. A. D. Monthly Bulatin 1962

সিংহল এক্ষণে চা উৎপাদনে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। ইহার মধ্য-ভাগের দক্ষিণে পর্বতগাত্রে চা বিশেষভাবে উৎপন্ন হয়।

চীনদেশে সর্বাপেক্ষ অধিক চা উৎপন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু ইহার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। এদেশে বড়-বড় চায়ের আবাদ হয় না;—নানাপ্রকার জঙ্গলী ঝোপের গাছের পাতা হইতে চা পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন উপায়ে কৃষ্ণ চা ও সবুজ চা প্রস্তুত হয় এবং এই সকল চা-এর পরিত্যক্ত নিকৃষ্ট অংশ পিষিয়া ছাঁচে ফেলিয়া



৪৫নং চিত্র।—পৃথিবীর চা-উৎপাদন স্থান।

ইষ্টকাকার করিয়া তিব্বতে চালান দেওয়া হয়। ইয়াংসি ও হোয়াং নদীর মধ্যের

পর্বতগুলি চা উৎপাদনের উত্তর সীমা। এখান হইতে দক্ষিণে সী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত সর্বত্রই অল্পবিস্তর চা জন্মে। কিন্তু ইয়াংসি-উপত্যকাই প্রধান চা-উৎপাদন-স্থান।

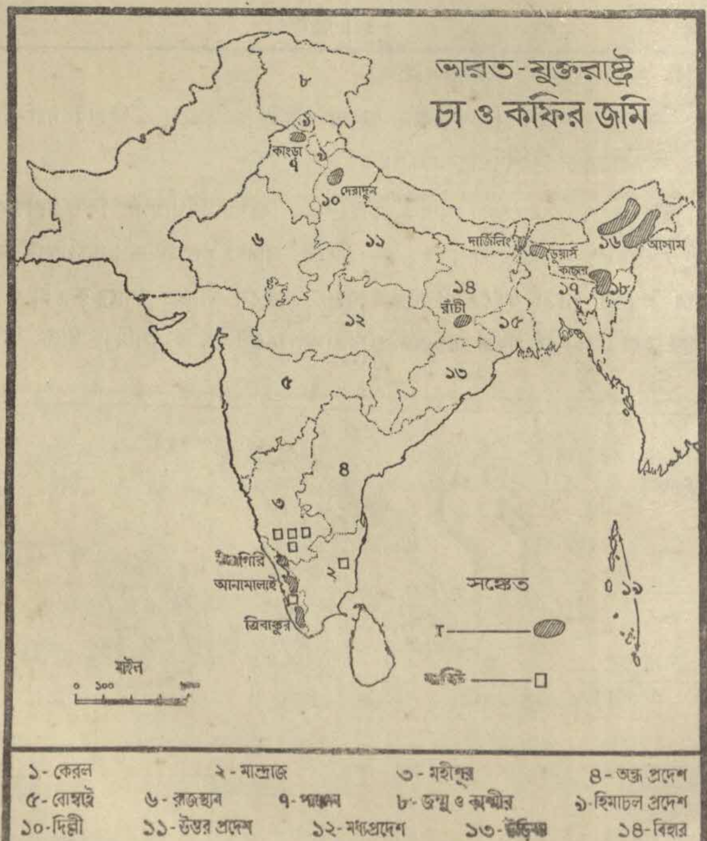
জাপানে—মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে পর্বতগাত্রে থাক কাটিয়া চা উৎপাদন করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ায়—সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে চা জন্মে।

পাকিস্তানে—শ্রীহট্টে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চা জন্মে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—প্রায় ৬৬২২ আবাদে ৮ লক্ষ একর জমিতে চা-এর চাষ হয়। ১৯৬০ সালে ৭০৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা (৩২০'২ স. মে. ট.) ভারতে উৎপন্ন



৪৬নং চিত্র।

হইয়াছিল। ভারতের চা উত্তর-পূর্ব ভারতেই জন্মে। **আসামে**—ব্রহ্মপুত্রের দুইপার্শ্বে

ও কাছাড় জেলায় চা জন্মে। সর্বাপেক্ষা বেশী চা-চাষের জমি আসামেই আছে। ভারতের চা-এর অর্ধেক (৫৫%) অপেক্ষাও বেশী এখানে জন্মে ।

পশ্চিমবঙ্গে—দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়। দার্জিলিং জেলার পর্বত-গাত্রে ১০০০ হইতে ৬০০০ ফিটের মধ্যে চা জন্মে। ভারতে উৎপন্ন চা-এর কিঞ্চিদধিক ২২ শতাংশ এখানে আছে।

উত্তর ভারতে—রাঁচিতে, দেরাদুনে ও কাংড়া উপত্যকায় মোটামুটি ১% চা জন্মে।) 4

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন চা—১৯৫৯-৬০

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—৩১৭.২ স. মে. টন

প্রদেশ	উৎপন্ন চা সহস্র মে. ট.	প্রদেশ	উৎপন্ন চা সহস্র মে. ট.
১। আসাম	১৭৮.৮	৬। মহীশূর	২.০
২। পশ্চিমবঙ্গ	৭০.৭	৭। পাঞ্জাব	১.০
৩। কেরল	৩৪.৭	৮। উত্তরপ্রদেশ	০.৮
৪। মাদ্রাজ	২৬.৫	৯। বিহার	০.১
৫। ত্রিপুরা	২.৫	১০। হিমাচল প্রদেশ	০.১

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে—কেরল স্টেটে, নীলগিরি পর্বতে, ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থলে কিঞ্চিদধিক ১৮ শতাংশ চা জন্মে ।

ভারতে যে-দ্রব্যগুলি রপ্তানি করিয়া বিদেশ হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়, তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্রব্য—চা ।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা বাড়াইবার জন্য ভারতবর্ষে একটি International Tea Market Expansion Board সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ব্যবসায়।—**ভারত-যুক্তরাষ্ট্র** পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ** রপ্তানিকারক দেশ। তাহার পর **সিংহল দ্বীপ**। তাহার পরে আফ্রিকার দেশগুলি। তাহার পরে চীন ও তৎপরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি।

চা আমদানি হয়—যুক্তরাজ্য, আ. যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইরাক, মিশর, রুশিয়া, ক্যানাডা, প্রভৃতি দেশে।*

পৃথিবীর সর্বপ্রধান আমদানি-কারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে সর্বাধিক চা (প্রায় ৬০%) গ্রেট বৃটেনে রপ্তানি হয়।

৪। কফি (Coffee)

ব্যবহার—কফি কেবল মৃদু-উত্তেজক পানীয়রূপেই ব্যবহৃত হয়।

উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা।—কফি উৎপাদনের জন্য,—

(১) চা-এর মত জলনিকাশী, উর্বরা, লৌহমিশ্রিত জমি দরকার। এইজন্য চা-এর মত পর্বতগাত্র ও উচ্চভূমি কফি-চাষের উপযোগী।

দ্রষ্টব্য—"বিষুবরেখা হইতে কফি-উৎপাদন-স্থান যত দূরবর্তী, সমুদ্র-সমতল হইতে তাহার উচ্চতাও তত নিম্নতর।" ভৌগোলিক ক্লারেন্স ফিল্ডেন জোন্স ও গর্ডন জেরাল্ড ড্রাকেনওয়াল্ড সাহেবদ্বয়ের এই উক্তি কতক সত্য।

যেমন—কোলোম্বিয়া—৭°৪০′ ডি. উ.—কফি জন্মে ৫০০০—৬০০০ ফিট উচ্চে।

ব্রাজিল —১১°০ ডি, দ.—ভাল কফি জন্মে ১০০০—২৫০০ ফিট উচ্চে।

কিন্তু ব্রাজিলে ৮৫০—৩০০০ ফিট পর্যন্ত স্থানে কফি জন্মে।

মেক্সিকো —২৩°০ ডি. উ. —ভাল কফি জন্মে ১০০০—১২০০ ফিট উচ্চে।

পোর্টোরিকো—১৮°১৫′ ডি. উ. ,, ,, ১০০০—১২০০ ,, ,, ।

যে-কফি যত উচ্চ স্থানে জন্মে, তাহার স্বাদও তত ভাল হয়।

(২) আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু দরকার। ইহার জন্য দরকার মাঝারি রকমের পরিমিত উত্তাপ ও ৭৫″—১২০″ ই. বৃষ্টিপাত।

(৩) তুষারপাতহীন স্থান ও সময়। কফিগাছ তুষারপাত সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য উষ্ণমণ্ডলই ইহার উপযুক্ত উৎপাদন-স্থান। তবে ইহার বাহিরেও অল্প কিছুদূর স্থানে ইহা জন্মে।

(৪) সুলভ ও সহজলভ্য শ্রমিক।

(৫) সূর্যোত্তাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য ছায়া নিতান্ত আবশ্যক। কফিক্ষেত্রে ভুট্টা প্রভৃতির গাছ পুতিয়া ছায়ার ব্যবস্থা করিতে হয়।

---

* F. A. O. Trade yearbook.

কফির উৎপাদন-স্থল—কফি ২৮° উ. অক্ষাংশ হইতে ৩৮° দ. অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রধানতঃ উষ্ণ প্রদেশের কৃষিদ্রব্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ **কফি-উৎপাদন-মহাদেশ** দক্ষিণ আমেরিকা (১৯৬০ সালে পৃথিবীর ৬২%), এবং **সর্বশ্রেষ্ঠ কফি-উৎপাদন-দেশ** দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত **ব্রাজিল** (পৃথিবীর ৪৬%, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ৭৫%); পৃথিবীর কফি-উৎপাদন-স্থান—

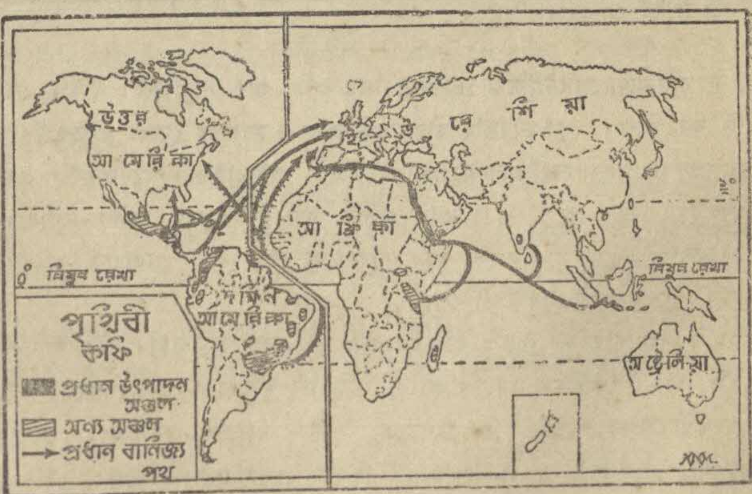


৪৭নং চিত্র।—কফি পাতা।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ব্রাজিল, কোলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, পেরু।

মধ্য আমেরিকায়—সালভেডর, গোয়াতেমালা, কোস্টারিকা, হণ্ডুরাস।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—সকল দ্বীপেই কফি জন্মে। তন্মধ্যে কিউবা ডোমিনিকান রিপাবলিক, হেইটি, পোর্টোরিকো, জ্যামেকা প্রধান।



৪৮নং চিত্র।—পৃথিবীর কফি উৎপাদন-স্থান।

এশিয়া মহাদেশে—আরব, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত—সুমাত্রা, বোর্ণিও ও যব, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন।

আফ্রিকা মহাদেশে—হস্তিদন্ত উপকূল, এঙ্গোলা, উগাণ্ডা, মাদাগাস্কার (মালাগাসি) গিনি, ক্যামেরুণ, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা।

দেশ হিসাবে সর্বপ্রধান কফি উৎপাদন-স্থান

পৃথিবীর উৎপন্ন কফি ১৯৬০

পৃথিবী ৩৮৭০ স. মে. টন

দেশ	উৎপন্ন কফি স. মে. ট.	দেশ	উৎপন্ন কফি স. মে ট.
১। ব্রাজিল	১৭৯৬	৬। উগাণ্ডা	১১৯
২। কোলোম্বিয়া	৪৫৬	৭। সালভেডর	৯৩
৩। হস্তিদন্ত উপকূল	১৮৫	৮। ইন্দোনেশিয়া	৯২
৪। এঙ্গোলা	১৩২	৯। গোয়াতেমালা	৮৪
৫। মেক্সিকো	১২৩	১০। কোষ্টারিকা	৭০
		১১। ভারত	৬৭

* U. N. O. 1961

ইহাদের মধ্যে পোর্টোরিকো ও জ্যামেকার কফি গুণে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু এখানে কফি কম জন্মে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কফি ও আরবের 'মোকা' কফিও উৎকৃষ্ট। কিন্তু কফি উৎপাদনে **ব্রাজিল**-এর স্থান সর্বোচ্চে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কফি এখানে উৎপন্ন হয়। সাও পলো ও মিনাস জেরাইস অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ৭০% কফি উৎপন্ন হয়। সাও পলো কফি ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। সুবিখ্যাত কফি-বন্দর স্যাণ্টস্ এই অঞ্চলেরই নিকটবর্তী বন্দর।

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় কফি উৎপাদন-স্থান **কোলোম্বিয়া**। ইহা পৃথিবীরও দ্বিতীয় কফি উৎপাদন-স্থান। দক্ষিণ আমেরিকাই পৃথিবীর কফি উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাদেশ। ইহার পরেই কফি উৎপাদক দ্বিতীয় মহাদেশ আফ্রিকা। **হস্তিদন্ত উপকূল, এঙ্গোলা,** ও **উগাণ্ডা,** এই তিনটি দেশ আফ্রিকার অর্ধেকের বেশী কফি উৎপাদন করে।

মেক্সিকো-র দক্ষিণ ভাগে পর্বতগাত্রে কফি জন্মে। দক্ষিণের টেহুয়ান্তেপেক যোজক হইতে পানামা খাল পর্যন্ত মধ্য-আমেরিকার পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই কফি জন্মে। **সালভেডর** ও **গোয়াতেমালা** প্রধান উৎপাদন স্থান, এবং উত্তর আমেরিকার প্রধান কফি রপ্তানিকারক দেশ।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৯-৬০ সালে ১১১ একর জমিতে ৪৯·৬ সহস্র টন কফি জন্মিয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ৬৬ সহস্র টন।

ভারতে কফি উৎপাদন ১৯৫৯-৬০

মহীশূর	৩৩·৯ স. মে. ট.
কেরল	৭·৪ ,,
মান্দ্রাজ	৪·৮ ,,

মহীশূরই প্রধান কফি উৎপাদন-স্থান। ভারতের ৭০০ কফিক্ষেত্রের মধ্যে ৬০০ এখানেই অবস্থিত। ভারতের ৭৩% কফি এখানেই জন্মে,—কেরলে জন্মে ২২%।

ব্যবসায়।—১৯৬১ সালে কফি জন্মিয়াছিল ৩৮৭০ স. মে. টন। তন্মধ্যে ২৬৯০ স. মে. টন **রপ্তানি** ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। **ব্রাজিল** যেমন পৃথিবীতে উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ, রপ্তানি কার্যেও ইহা সর্বপ্রধান। সান্‌টস ব্রাজিলের কফি রপ্তানির প্রধান বন্দর। অন্য বন্দর—রিও ডি জানেরো, ভিক্টোরিয়া। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীতে সর্বপ্রধান কফি রপ্তানিকারক মহাদেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ **কোলোম্বিয়া**ও দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

দক্ষিণ আমেরিকার পরেই ক্যারাবিয়ান সমুদ্র-তীরস্থ দেশ ও সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপগুলি প্রধান কফি উৎপাদন-স্থান; যেমন,—**মেক্সিকো**, **সালভেডর**, **গোয়াতেমালা**, **কোষ্টারিকো**, **নিকারাগুয়া**, **হেটি** ও **ডোমিনিকান রিপাবলিক**।

ইহার পরে আফ্রিকা মহাদেশই কফি রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। এই মহাদেশে **হস্তিদন্ত উপকূল**, **এঙ্গোলা**, **উগাণ্ডা**, **ইথিওপিয়া** প্রভৃতি কফি রপ্তানির প্রধান দেশ।

এশিয়া মহাদেশে **ইন্দোনেশিয়া** ও **ভারতবর্ষ**ও কফি রপ্তানি করে। কোচিন, কোঝিকোড ও ম্যাঙ্গালোর ভারতের রপ্তানি-বন্দর।

পৃথিবীতে আ. যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা বেশী কফি **আমদানি** করে। তাহার পরে ইউরোপ,—বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিই বেশী কফি আমদানি করে। তন্মধ্যে **পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালী** প্রধান। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরাজী ভাষাভাষী লেকেরা চা বেশী ভালবাসে। সেইজন্য গ্রেট বৃটেনে চা-এর ব্যবহার বেশী। কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্রে কফির ব্যবহার বেশী। ভারত হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে দেশের মধ্যে বিক্রীত হইয়াছিল ৩০,৭৬৪ টন, এবং রপ্তানি হইয়াছিল ১৮,৫৪২ টন কফি। ১৯৬০-৬১ সালে দেশের মধ্যে বিক্রীত হইয়াছিল ৩৩,০০০ টন এবং রপ্তানি-বাজারে প্রেরিত হইয়াছিল ৩৩,৬০০। ভারতের কফি ভাল। সেজন্য রপ্তানি-বাজারে আরও বিক্রীত হওয়া উচিত।

চা ও কফির তুলনা

চা ও কফির মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ও কতক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে। যেমন—

সাদৃশ্য

১। উভয়েই মৃদু-উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

২। উভয়ের জন্য একই প্রকার উর্বরা, অ-পূর্বকৃষ্ট, জলনিকাশী জমি দরকার।

৩। বৃষ্টি ও উত্তাপ উভয়ের জন্য প্রচুর দরকার।

৪। উভয়ের জন্য সুলভ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক দরকার।

৫। কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের জন্য ছাটাই আবশ্যক।

বৈসাদৃশ্য

চা	কফি
১। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় ফসল।	১। ক্রান্তীয় ফসল।
২। প্রস্তুত হয় পাতা হইতে।	২। প্রস্তুত হয় বীজ হইতে।
৩। তুষারপাত সহ্য করিতে পারে।	৩। তুষারপাত সহ্য করিতে পারে না।
৪। চাষকালে ছায়ার ব্যবহার দরকার করে না।	৪। চাষকালে ছায়ার নিতান্ত দরকার।
৫। ইংরাজী-ভাষী দেশ বেশী ব্যবহার করে।	৫। ইংরাজী-ভাষী ব্যতীত অন্য ভাষা-ভাষীর মধ্যে ব্যবহার বেশী।

৫। ইক্ষুদণ্ড (Sugar Cane)

ব্যবহার—ইক্ষু হইতে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চিনি ও গুড়। কিন্তু ইক্ষু-গাছের কোন অংশই নষ্ট হয় না। ইহার দণ্ড হইতে রস বাহির করিয়া উহাতে

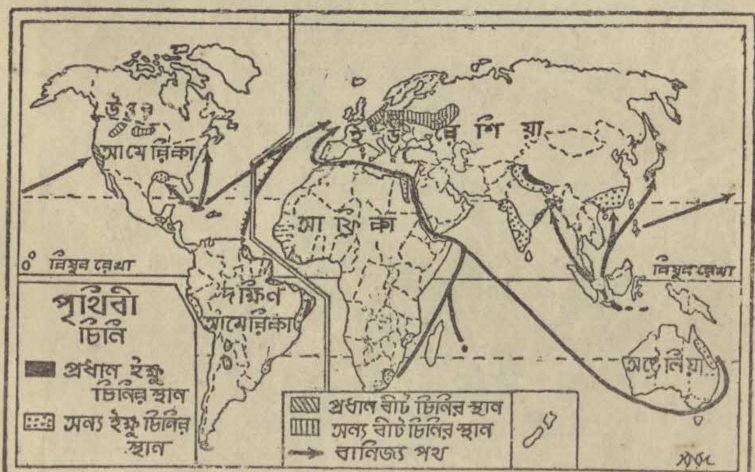


৪৯নং চিত্র—ইক্ষুক্ষেত্র।

গুড় প্রস্তুত করা হয়। গুড় হইতে চিনি হয়। রস বাহির করার পর যে-ছিবড়া থাকে তাহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহা দিয়া শক্ত কাগজ, এলকোহল, কয়লা ও আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহার গায়ের শুষ্কপত্র হইতে প্যাক করার কাগজ হয়;—দণ্ডের অগ্রভাগের পাতা গরুর খাদ্য। ছিবড়া পোড়াইলে যে-ছাই হয়, তাহা দিয়া জমির সারও হয়, কাচও হয়।

ইক্ষু চাষের উপযোগী অবস্থা—ইক্ষু উৎপাদনের জন্য,—**(১) উর্বরা জমি, (২) নদী ও জলাভূমির সন্নিকটস্থ আর্দ্র নিম্নভূমি, (৩) প্রচুর উত্তাপ—মোটামুটি ৭০°-৭৫° ফা. (৪) প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬০" ই.), (৫) সহজপ্রাপ্য ও সুলভ শ্রমিক,** এবং **(৬) তুষারপাত-মুক্ত সময় আবশ্যক।**

ইক্ষু সম্বন্ধে নানাকথা—ইক্ষু ঘাসজাতীয় গাছ। ইহার উৎপাদনে উষ্ণতা ও আর্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া উষ্ণমণ্ডলই ইহার আদি ও প্রধান



৫০নং চিত্র।—ইক্ষু ও বীটচিনির উৎপাদন-স্থান।

আবাস-স্থান। ক্রমশঃ শীতোষ্ণমণ্ডলেও ইহা উৎপাদন করা হইতেছে। কিন্তু এখনও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উষ্ণমণ্ডলের আবাদ হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ জমিতে ভালভাবে লাঙ্গল দিয়া ও সার দিয়া এবং উহাতে তিন-চারি ফিট অন্তর-অন্তর নালা কাটিয়া সেই নালার ভিতর ৬ই. হইতে ১০ই. গর্ত কাটিয়া সেই গর্তে আকের মাথার পত্রযুক্ত অংশ দু'তিনটি গাঁইট্ বা পাব সমেত কাটিয়া, অথবা আকের গাঁইট কাটিয়া পুতিয়া দিতে হয়। ইহা হইতেই আক উৎপন্ন হয়। আকের পাব পুতিয়া দিবার পর জলসেচ আবশ্যক। ভারতবর্ষে ভাদ্র হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত আকের চাষ করা চলে। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস চাষ করিবার এবং পর বৎসরের পৌষ ও মাঘ মাস আক কাটিবার প্রশস্ত সময়।

যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী, জমি উর্বরা, এবং উত্তাপও বেশী, সেখানে একবার আকের চাষ করিলে সে-চাষ নষ্ট করা হয় না। আক কাটিয়া লইবার পর তাহার গোড়া হইতে আবার অঙ্কুর বাহির হয়। এই অঙ্কুর শেষে বড় হইয়া গাছ হয়। কোন-কোন স্থানে দুইবার, কোথাও বহুবার উদ্গত অঙ্কুরের গাছ হইতে রস বাহির করিয়া প্রতি বৎসর চিনি প্রস্তুত করা হয়। ইংরাজীতে আকের এই অঙ্কুরকে বলে ratoon। অঙ্কুর-আকের ফসল ক্রমশঃ কম হয়।

উৎপাদন-স্থান—পূর্বেই বলিয়াছি উষ্ণমণ্ডল ইক্ষুচাষের প্রধান স্থান, এবং এখন উষ্ণমণ্ডলের অব্যবহিত বাহিরে শীতোষ্ণমণ্ডলেও কোথাও-কোথাও ইক্ষু জন্মে। মোটামুটি ৩২° উ. অক্ষরেখা হইতে ৩২° দ. অক্ষরেখা পর্যন্ত স্থানে ইক্ষু-জন্মে। ইক্ষু প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানে জন্মে—

উত্তর আমেরিকায়—আ. যুক্তরাষ্ট্রে, **মেক্সিকোয়** ও হয়াই দ্বীপে।

মধ্য আমেরিকায়—সমগ্র রাষ্ট্রে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্র। (**কিউবা, পোর্টোরিকো,** ডোমিনিকান রিপাবলিক, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ)।

দক্ষিণ আমেরিকায়—চিলি ব্যতীত সবদেশে। (গায়েনা, **ব্রাজিল** ও **আর্জেণ্টিনা** প্রধান)।

আফ্রিকায়—দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত **নাটাল দেশে,** মিশর দেশে ও মরিশস্ দ্বীপে।

এশিয়ায়—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, চীনে, পাকিস্তানে, ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভা (যব) দ্বীপে ও ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে।

ওশিয়ানিয়ায়—অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিলণ্ডে।

ইউরোপে—দক্ষিণ ইতালী ও দক্ষিণ স্পেনে অল্প ইক্ষু হয়।

প্রধান-প্রধান ইক্ষুদণ্ড উৎপাদক দেশ* (১৯৫৯-৬০)

পৃথিবী—৩৮৮৬০০ স. মে. ট.।

দেশ	উৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড স. মে. ট.	দেশ	উৎপন্ন ইক্ষুদণ্ড স. মে. ট.
১। ভারতবর্ষ	৭৬৪০৮	৬। চীন	১৩৯৩১
২। ব্রাজিল	৫৩৪৭৭	৭। আর্জেন্টিনা	১০০৮৬
৩। কিউবা	৪৭৫০০	৮। অস্ট্রেলিয়া	৯১৪৭
৪। মেক্সিকো	১৭৮৬৩	৯। পোর্টোরিকো	৯০৭২
৫। পাকিস্তান	১৪৩৩১	১০। দ. আফ্রিকা	৮২৭৭

*F. A. O. 1961

নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, মহাদেশ হিসাবে এশিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু-উৎপাদন স্থান।

মহাদেশ হিসাবে ইক্ষুদণ্ড-উৎপাদন*

(১৯৫৯-৬০ সাল)

পৃথিবী—৩০৮,০৭০

মহাদেশ	উৎপন্ন ইক্ষু (স. মে. ট.)	মোট উৎপন্ন ইক্ষুর শতকরা অংশ
এশিয়া	১২৯,৫৫০	৩৩'৩
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা	১১৫,১৫০	২৯'৬
ওশিয়ানিয়া	৯৩,৩৬০	২৫'০
দক্ষিণ আমেরিকা	১১,৬৩০	৪'০
আফ্রিকা	২৪,৬২০	৭'১
ইউরোপ	৩৭০	১'০

*F A. O. 1961

এশিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষুদণ্ড-উৎপাদক মহাদেশ ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষুদণ্ড-উৎপাদক দেশ। ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব মত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ২৩ শতাংশ, কিউবা ১৮ শতাংশ ও ব্রাজিল ১৩ শতাংশ ইক্ষু উৎপাদন করিয়াছিল। ইক্ষুদণ্ড উৎপাদক দেশের নাম করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভারত, কিউবা, ব্রাজিল দেশের নাম মনে পড়ে। হয়ত কোন-কোন বৎসর কোথাও কিছু কম-বেশী হইতে পারে। ইক্ষু অধিকাংশ দেশেই জন্মে। কিন্তু প্রধানতঃ ইহা দেশের লোকের ব্যবহারে লাগে। অল্প দেশ হইতেই ইহার রপ্তানি হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান ইক্ষুদণ্ড উৎপাদন স্থান

(১৯৫৯-৬০)

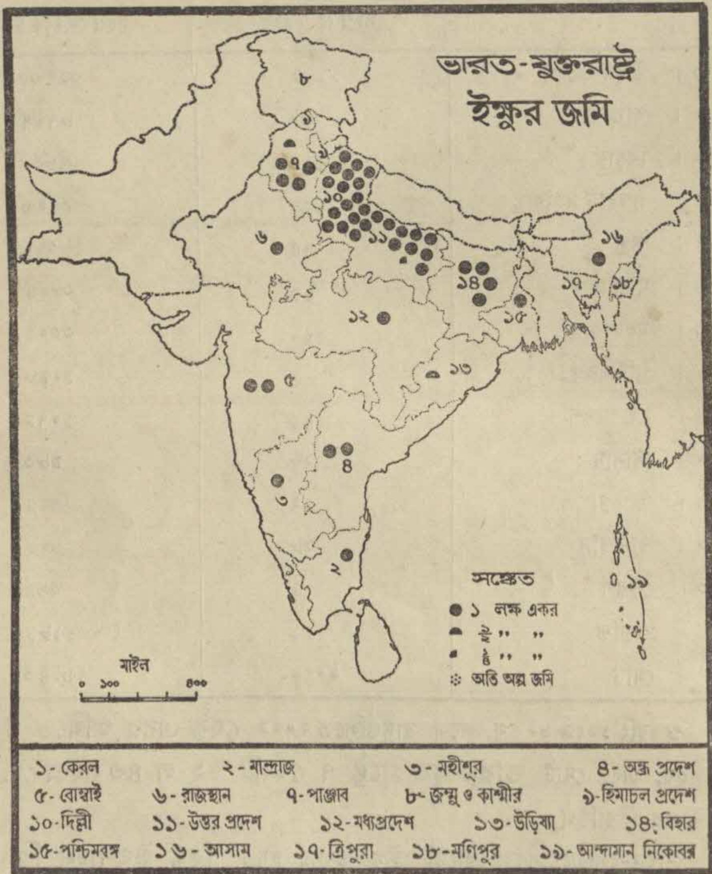
প্রদেশ	চাষের জমি সহস্র হেক্ট এয়র	উৎপন্ন ইক্ষু সহস্র মেট্রিক টন
১। উত্তর-প্রদেশ	১১৮১	৩২৫৩৯
২। পাঞ্জাব	২৪০	৮৭০৭
৩। বিহার	১৭৯	৬৬৩০
৪। গুজরাট মহারাষ্ট্র	১৩৪	৯০২৬
৫। অন্ধ্র	৭৪	৬৩৭০
৬। মান্দ্রাজ	৫৯	৩৮০৪
৭। মহীশূর	৬০	৩৩০৫
৮। পশ্চিমবঙ্গ	৩৩	১২৯৮
৯। মধ্যপ্রদেশ	৪০	১০৭৯
১০। আসাম	২৮	৯৮৩
১১। উড়িষ্যা	২২	৭৪৪
১২। রাজস্থান	২৮	৬০৫
১৩। কেরল	৯	৩৬৪
অন্যান্য	১১	১৮৪
মোট	২০৫৯	৭৬২৪৩

সুতরাং ১৯৫৯-৬০ খৃ. অব্দে রাষ্ট্রগুলিতে ২০৫৯ **হেক্ট-এয়র জমিতে ইক্ষুর চাষ** হয়, এবং মোট **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৭ কোটি ৬২ ল. ৪৩ সহস্র মে. টন** ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সকল রাষ্ট্রেই ইক্ষু উৎপন্ন হয়। কিন্তু **উৎপাদন হিসাবে** দুইটি কেন্দ্র প্রধান—একটি উত্তর ভারতে (১) উত্তরপ্রদেশ, (২) বিহার, ও (৩) পাঞ্জাব লইয়া গঠিত, এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণভারতে (১) মহারাষ্ট্র, (২) অন্ধ্র ও (৩) মান্দ্রাজ লইয়া গঠিত। এক্ষণে মহীশূরকেও এই দ্বিতীয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যায়।

উত্তরপ্রদেশে পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত বেশী, পশ্চিমে কম। সেজন্য পূর্বভাগে বিনা সেচে ইক্ষুর চাষ হয়। মধ্যভাগে ও পশ্চিমভাগে সেচের জলই বৃষ্টির জলের

অভাব পূরণ করে। এখানে গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটিও উর্বর। সেজন্য উত্তরপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানে ইক্ষুর চাষ বেশী হইবার আর এক কারণ এই যে, এখানে ইক্ষুই সর্বপ্রধান অর্থপ্রস্থ শস্য। সেজন্য চাষীরা ইহার চাষ করিতে আগ্রহশীল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশী



৫১নং চিত্র।—ইক্ষুর জমি।

ইক্ষু ও গুড় এখানেই জন্মে। ইহার গোরক্ষপুর, মীরাট, মজঃফরনগর, বেরিলি, খেরি, মোরাদাবাদ, সাহারাণপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতেই ইক্ষুর চাষ বেশী হয়।

পাঞ্জাবে জমি উর্বরা, কিন্তু উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, বৃষ্টিপাত কম এবং শীতে বরফ পড়ে। সে-হিসাবে ইক্ষুর চাষ ভাল হওয়া উচিত নহে। কিন্তু জলসেচন দ্বারা জলের অভাব বিদূরিত হয় এবং চাষ ভাল হয়।

বিহারে পলিমাটির জমিও উর্বরা, বৃষ্টিও বেশী। তাই এখানে ইক্ষুর চাষ ভালই হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত বেশী, জমিও উর্বরা। আবার সমুদ্রবায়ু-প্রবাহিত জমিতে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। সে হিসাবেও প. বঙ্গ ইক্ষুচাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু প. বঙ্গে বৃষ্টিপাত কোথাও বেশী, কোথাও কম। কোথাও চাষের সময় জল পাওয়া যায়, কোথাও যায় না। সেজন্য এখানে ইক্ষুর চাষ ভাল হয় না। তাছাড়া পাটের চাষে খুব পয়সা পাওয়া যায়। সেজন্য পাট ছাড়িয়া সহজে কেহ ইক্ষুর চাষ করিতে চায় না।

দক্ষিণ ভারতে ইক্ষু চাষের এক সুবিধা এই যে, শীতকালে এখানে উত্তাপ উত্তর ভারতের মত বিশেষ কম হয় না। সেজন্য এখানে শীতকালেও ইক্ষুর চাষ সম্ভব হয়।

জলবায়ুর জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্রের মধ্যস্থানে ইক্ষু-উৎপাদন ভাল হয় না।

ইক্ষুচাষের জমি, উৎপাদন ও ফলন। ইক্ষুচাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে আশ্চর্য রকমের পার্থক্য আছে। ১৪৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে,—বিহারে জমির পরিমাণ অন্ধ্রের প্রায় আড়াইগুণ; কিন্তু উৎপাদন প্রায় সমান। অন্ধ্র ও মাদ্রাজের ফলন অন্য সকল রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ফলন উত্তর ভারতের ফলন অপেক্ষা বেশী। সুতরাং কোন প্রদেশের জমির পরিমাণ হইতে সেই প্রদেশের উৎপাদন অনুমান করা সম্ভব নহে।

ব্যবসায়।—ইক্ষু অনেক দেশে জন্মে। কারণ, সভ্য জগতে চিনি একটি আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু অধিকাংশ দেশই চিনি রপ্তানি করিতে পারে না,—দেশের লোকের জন্য খরচ করিয়া ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতবর্ষ ইক্ষু উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু রপ্তানিক্ষেত্রে তাহার কোন স্থান নাই। ১৯৬০ সালে পৃথিবীর রপ্তানি করা চিনির ৫১% লাটিন আমেরিকা অঞ্চল হইতেই রপ্তানি করা হয়। ক্যারাবিয়ান সমুদ্রে কিউবা পৃথিবীর সর্বপ্রধান রপ্তানিকারক দ্বীপ (৩২%)। কিউবা তাহার এই গৌরব বহুদিন ধরিয়া রক্ষা করিতেছে। ইহার পরে রপ্তানিকারক স্থান ক্রমান্বয়ে (১৯৬০)—ডোমিনিকান রিপাবলিক, ফিলিপাইন, ফর্মোজা, পাকিস্তান, পোর্টোরিকো, ব্রাজিল, হয়াই প্রভৃতি। মরিশস্ দ্বীপও চিনি রপ্তানিকারক দেশ।

আমদানি ক্ষেত্রে ১৯৬০ সালে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ মে. টন চিনি আসিয়াছিল। ইহার অধিকাংশ আমদানি করে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র (২৬%)। তাহার

পরে বেশী চিনি আমদানি করে ইউরোপের,— বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপের,—দেশগুলি (২৬%)। তাহাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সই প্রধান। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ৫২% একা যুক্তরাজ্যই আমদানি করে। পূর্ব ইউরোপে রুশিয়াও প্রচুর চিনি (১৩%) আমদানি করে। হয়াই অন্য একটি চিনি আমদানিকারক উল্লেখযোগ্য দ্বীপ।

৬। বীট (Sugar Beet)

ব্যবহার।—পূর্বেই বলিয়াছি ইক্ষু হইতে চিনি পাওয়া যায়। ইহার পরেই চিনি-উৎপাদনে বীটের স্থান। মোটামুটি পৃথিবীর চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ চিনি পাওয়া যায় ইক্ষু হইতে, এবং এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয় বীট হইতে। চিনি প্রস্তুত করার পর বীটের মণ্ডের যে-অংশ অবশিষ্ট থাকে, এবং বীটের পাতা প্রভৃতির অগ্রভাগ গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা।—বীট উৎপাদনে (১) কাঁকর-বিহীন দো-আঁশ, উর্বরা, চুণবহুল মাটি, (২) অনুগ্র পরিমিত উত্তাপ (৬৭°-৭২° ফা.), (৩) বৃদ্ধির সময়ে রৌদ্রদীপ্ত ~~দীর্ঘদিন, কিন্তু~~ কবোষ্ণ আবহাওয়া, (৪) জুন হইতে আগষ্ট পর্যন্ত পরিমিত বৃষ্টিপাত, এবং (৫) সুলভ শ্রমিক দরকার। বীটের বৃদ্ধির সময় মাত্র পাঁচ মাস। শরৎকালে বীট তুলিতে হয়।

উৎপাদন-স্থান।—বীট নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মূলা, শালগম ইত্যাদি জাতীয় কৃষিদ্রব্য। ইহার শিকড় হইতে চিনি হয়। এশিয়া যেমন ইক্ষু-উৎপাদনের প্রধান স্থান, ইউরোপ তেমনি বীট-উৎপাদনের প্রধান স্থান। পৃথিবীর অধিকাংশ বীট জন্মে মধ্য ইউরোপে পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে ও আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে। ইউরোপের বীট-অঞ্চল আয়ার দেশ হইতে ইংলণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, হলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলণ্ডের মধ্য দিয়া মধ্য-রুশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। স্পেন ও ইতালীতেও অল্প বীট জন্মে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান ম্যাগডেবুর্গের নিকটবর্তী মধ্য জার্মানির অংশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুশিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার কিয়েভ ও কুর্স্ক অঞ্চল শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের পার্বত্য পশ্চিমভাগে জলসেচ দ্বারা বীট উৎপাদন হয়। কলোরেডো, ইউটা, ওয়াইওমিং, নেব্রাস্কা প্রধান উৎপত্তি-স্থল। ইহাদের পার্শ্ববর্তী স্টেটগুলিতেও অল্পবিস্তর বীট জন্মে। আ. যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ যেখানে বীট-চিনি ও ইক্ষুচিনি—দুইই জন্মে।

১৯৬০-৬১ সালে
প্রধান-প্রধান বীট উৎপাদন-স্থল
পৃথিবী ১৮৫১৪০ স. মে. টন

দেশ	উৎপন্ন বীট স. মে. ট.	দেশ	উৎপন্ন বীট স. মে. ট.
১। রুশিয়া	৫৭৭২৮	৫। চেকোশ্লোভাকিয়া	৭৮৯৩
২। ফ্রান্স	১৮০০০	৬। ইতালী	৭৫৫৪
৩। আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৪৮৯৭	৭। যুক্তরাজ্য	৭০৩১
৪। প. জার্মানি	১২৮৬০	৮। পূ. জার্মানি	৬৮৩৭

বাণিজ্য।—বীটচিনি সাধারণতঃ নিজ-নিজ দেশের অভাব মিটাইতেই শেষ হইয়া যায়। সেজন্য বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বীট বা বীটচিনি অনেক দেশেই দেখা যায় না। কেবল জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলণ্ড ও রুশিয়া হইতে বীটচিনি রপ্তানি হয়। ইংলণ্ড প্রধান খরিদ্দার।

ইক্ষু ও বীটের তুলনামূলক আলোচনা

ইক্ষু	বীট
১। প্রধানতঃ উষ্ণ অঞ্চলের কৃষি।	১। প্রধানতঃ শীতোষ্ণমণ্ডলের কৃষি।
২। বৃদ্ধির সময় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার।	২। বৃদ্ধির সময় কবোষ্ণ ও রৌদ্রদীপ্ত আবহাওয়া দরকার।
৩। বৃষ্টি—৬০ই.—৮০ই.।	৩। বৃষ্টি—পরিমিত (২০ই.—৪০ই.)।
৪। বৃদ্ধিকাল—৯ মাস হইতে ১ বৎসর।	৪। বৃদ্ধিকাল—৫-৬ মাস।
৫। পাললিক বা অগ্ন্যুৎপাত-সম্ভূত নরম দো-আঁশ মাটি দরকার।	৫। বালুকাপ্রধান দো-আঁশ ও চুণযুক্ত উর্বরা জমি দরকার।
৬। একবার চাষ করিলে কোন-কোন স্থানে ইক্ষু ৩-৪ বৎসর চাষ করিতে হয় না।	৬। প্রতিবৎসরই চাষ করিতে হয়।
৭। ইক্ষুর কাণ্ড হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।	৭। বীটের শিকড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।
৮। সমুদ্রসন্নিধান ইক্ষু চাষের ও ব্যবসায়ের পক্ষে উপকারী।	৮। সমুদ্রসন্নিধানের বিশেষ দরকার নাই।
৯। সুলভ পুরুষ শ্রমিক হইলেই চলে।	৯। স্ত্রী ও শিশু-শ্রমিক বিশেষ উপযোগী।
১০। ইক্ষু বৎসরের সকল সময়ে জন্মে।	১০। বীট বৎসরে একবার জন্মে।

QUESTIONS

1. What climatic and physical conditions are necessary for the production of wheat and rice ? (Cal. Inter. 1936, 1938, 1940, 1946, 1948)

2. Explain the geographical distribution of, and trade in, wheat.

3. Compare and contrast physical and economic factors associated with the production of rice and wheat. Mention the chief countries engaged in foreign trade in those commodities. (I.P.S. 1934)

4. What are the principal countries of production and export in tea and coffee ? (Cal. Inter. 1934)

5. State accurately the areas in which sugar is manufactured. India produces large quantities of sugar-cane, but still imports sugar from other countries,—why ? (I.P.S. 1930)

6. Describe the world distribution of sugar-beet and sugar-cane. (Cal. Inter. 1933, 1946)

7. Name the different countries from which sugar is principally exported. (Cal. B.Com. 1925)

8. From climatic and physical conditions W. Bengal is suitable for the growth of sugar-cane. Still West Bengal lags far behind as a producer of suger-cane,—why ?

9. In India there are two principal centres of sugar production. What are they ? Which of them is the better producing area ?

10. The state in India having the greater area of sugar-cane production is not necessarily the producer of greater quantity of cane-sugar—Explain.

11. Account for the importance of Uttarpradesh, Punjab and Andhra as producer of sugar-cane.

২

কৃষিজ পণ্যদ্রব্য,—বাণিজ্যিক ফসল

(Commercial Crops)

(১) তুলা, (২) পাট, (৩) শণ (hemp), (৪) রেশম (silk), (৫) রবার (rubber), (৬) তৈলবীজ (oil seeds).

(১) তুলা (Cotton)

ব্যবহার।—মানুষের জীবনযাপনের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান যেমন দরকার, বস্ত্রও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়। যত রকমের মূল উপাদান দ্বারা এই বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়, তাহার মধ্যে কার্পাস তুলাই প্রধান।

গ্রেট বৃটেনের পশ্চিমে ল্যাঙ্কাশায়ার,—আ. যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্রগুলি, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, চীনদেশের সাংহাই, জাপান (ওসাকা),—ইউরোপে উত্তর ইতালী, সুইজর্লণ্ড, উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স, বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থানে কার্পাস তুলা সংক্রান্ত বস্ত্রাদি ও নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন বালিশ ও গদি প্রভৃতির ভিতর দিবার জন্য, ডাক্তারখানায় ব্যবহৃত ব্যাণ্ডেজ ও তুলার প্যাড্ করিবার জন্য এবং সূতা ও দড়িদড়া এবং সতরঞ্চি প্রস্তুত করিতেও তুলার দরকার হয়। গ্যাসের ম্যান্‌টেল (mantle), গান-কটন (gun-cotton) নামক বিস্ফোরক দ্রব্য এবং কোন-কোন কাগজ প্রস্তুত করিতেও তুলা লাগে। তুলা হইতে বিশুদ্ধ সেলুলোজ (cellulose) পাওয়া যায়, এবং সেলুলোজ দিয়া সেলুলয়েড বা কাঁচকড়ার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সাধারণ লোক ইহাকে বলে নকল হাতীর দাঁতের দ্রব্য বা আলুব দ্রব্য। অথচ, আলুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শিশি-বোতলের মুখের সুদৃশ্য স্ক্রুর পেঁচকাটা মুখোস, ফটোগ্রাফের ছবি ভিজাইবার পাত্র, বিদ্যুৎ-অপরিচালক কয়েকটি দ্রব্য প্রভৃতি এই সেলুলয়েডের দ্বারাই প্রস্তুত হয়। নকল রেশম প্রস্তুত করিবারও ইহা অন্যতম মূল পদার্থ। এক্ষণে সুদৃঢ় রাস্তা প্রস্তুত কার্যেও তুলার কার্যকারিতার পরীক্ষা হইতেছে।

তুলার বীচি হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। তুলার বীচির খৈল দিয়া জমির সার হয়।

তুলার উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা।—তুলার চাষের জন্য দরকার,—

১। উর্বরা, কিংবা উত্তমরূপে সার দেওয়া জমি। জমির জল নিষ্কাশিত হইয়া যাওয়া দরকার,—কিন্তু জমি আর্দ্র থাকাও দরকার। যাহার জল নিষ্কাশিত হইতে পারে এমন পাললিক মাটি সর্বোৎকৃষ্ট। ঘন, ভারী, কর্দম জমি ভাল নহে।

২। গাছের বৃদ্ধিকালে অল্পদিন অন্তর-অন্তর পরিমিত বৃষ্টিপাত ভাল। তুলার চাষের জন্য ২০ই. হইতে ৪০ই. বৃষ্টিপাত দরকার। দুই বৃষ্টিপাতের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে রৌদ্র চাষের পক্ষে ভাল। তুলার ফল ভাঙ্গিবার সময়ে বৃষ্টিপাত ভাল নহে।

৩। তুলার পক্ষে বৃষ্টির অভাব খুব বড় নহে,—উত্তাপের অভাবই বড়। আবার বেশী উত্তাপও ভাল নহে। পরিমিত সমভাবাপন্ন উত্তাপ ও পরিষ্কার রৌদ্র তুলার চাষের পক্ষে ভাল। গ্রীষ্মকালে গাছের বৃদ্ধিকালে মোটামুটি ৭৫° ফা. উত্তাপ এবং জুলাই মাসে ৮০° হইতে ৯০° ফা. উত্তাপ হইলে ভাল হয়।

৪। সাত মাস তুষারপাতহীন সময় তুলার জন্য বিশেষ দরকার। তুলার চাষ সম্পূর্ণ হইতে মোটামুটি ২০০ দিন লাগে। সেজন্য যে-অঞ্চলে অন্ততঃ ২০০ তুষারপাতহীন দিন না পাওয়া যায়, সে-অঞ্চলে তুলার চাষ হয় না।

৫। সস্তা শ্রমিক দরকার। কলে তুলার আঁশ বীচি হইতে ছাড়ানো যায়। কিন্তু গাছ হইতে তুলার ফল তুলিবার ভাল যন্ত্র নাই। কারণ, তুলার সব ফল একই কালে পাকে না, এবং বাছিয়া-বাছিয়া তুলা তুলিতে পারে এমন যন্ত্রও সম্ভব নহে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিলে ৪৩° উ. অক্ষরেখার উত্তর, এবং ৩০° দ. অক্ষরেখার দক্ষিণে তুলা জন্মে না। কিন্তু এই সীমারেখা আনুমানিক। ইউরোপীয় রুশিয়া দেশে এমন কি ৪৭° উ. অক্ষরেখায় অল্পদিনে পাকিবার উপযোগী তুলার চাষ হইতেছে।

তুলার শ্রেণীভেদ।—তুলার আঁশের রং, মসৃণতা, এবং প্রধানতঃ দৈর্ঘ্য, অনুসারে চারি শ্রেণীর তুলা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দেখা যায়:—

(১) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলার নাম **দ্বীপ-কার্পাস** (Sea Island Cotton);—ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ২½ ইঞ্চি। কিন্তু সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যে-তুলা পাওয়া যায় তাহার দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১½ ই.। ইহার আঁশ খুব মিহি এবং রেশমের মত মসৃণ ও কোমল। ইহা আ. যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া ও ক্যারোলাইনা নামক রাষ্ট্র দুইটির অন্তর্গত সমুদ্রতীর-সন্নিহিত দ্বীপে ও পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। এই তুলা এখন দুর্লভ হইয়াছে।

(২) **মিশরীয় তুলা**।—আঁশের দৈর্ঘ্যে ও চাহিদায় দ্বীপ-কার্পাসের পরেই ইহার স্থান। এক্ষণে আ. যুক্তরাষ্ট্রেই ইহা জন্মিতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১$\frac{১}{৮}$ই. অপেক্ষা বেশী।

(৩) **উচ্চভূমির** (ডাঙ্গা জমির—uppers) তুলা,—ইহা দীর্ঘতন্তু ও হ্রস্বতন্তু—দুই প্রকারের হয়, এবং ইহাই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘতন্তুগুলির আঁশ ১$\frac{১}{৪}$ই. হইতে ১$\frac{৩}{৪}$ই. এবং হ্রস্বতন্তুগুলি মোটামুটি ১ই.।



৫২ নং চিত্র।—তুলার শাখা ও প্রস্ফুটিত তুলা।

(৪) **ভারতীয় তুলা**।—ইহার আঁশ সর্বাপেক্ষা ছোট। ইহাও দুই প্রকারের হয়। দীর্ঘতন্তুগুলির আঁশের দৈর্ঘ্য $\frac{৭}{৮}$ ই. হইতে ১ই. ;—কিন্তু হ্রস্বতন্তুগুলি $\frac{৩}{৪}$ ই. অপেক্ষাও কম। ভারতীয় তুলার মধ্যে দীর্ঘতন্তুগুলির চাহিদাই বেশী। হ্রস্বতন্তুগুলি কর্কশ।

১৯৫৮-৫৯ খৃ. অব্দে ভারতে যত তুলা জন্মিয়াছিল তাহার ৩৪·৭৮%লম্বা-আঁশ (১ ই. লম্বা), ৪৮·৭২% মধ্যম-আঁশ ($\frac{৭}{৮}$ই. হইতে ১$\frac{১}{১৬}$ই.) ও ১৬·৫০% ছোট-আঁশ ($\frac{৭}{৮}$ই. অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কম)।

উৎপাদন-স্থান—১৯৬০-৬১ সালে,
মহাদেশ অনুসারে তুলা-উৎপাদন

মহাদেশ	তুলা উৎপাদন লক্ষ মে. টন	পৃথিবীর যত শতাংশ
উ. ও মধ্য আমেরিকা	৩৬	৩৩·১
এশিয়া	৩৯	৩৫·৮
আফ্রিকা	৯	৮·২
দ. আমেরিকা	৮	৭·৩
ইউরোপ (রুশিয়া সমেত)	১৭	১৫·৬
পৃথিবী	১০৯	১০০

দেশভেদে পৃথিবীর তুলা উৎপাদন ১৯৬১-৬২*

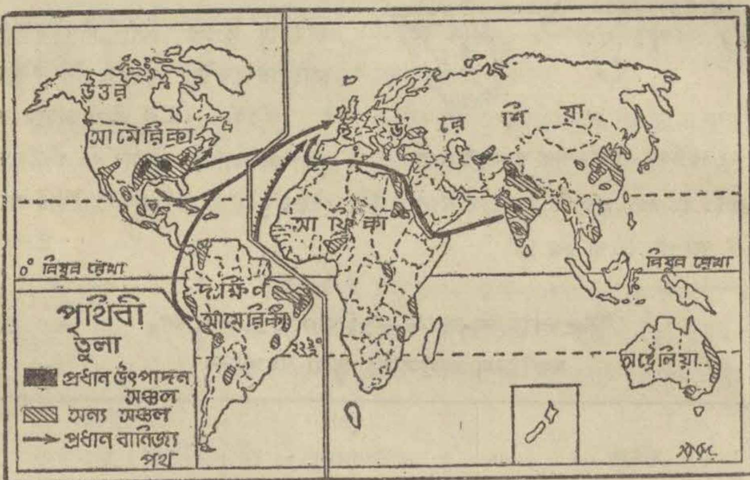
শ্রেষ্ঠ দশটি দেশের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

পৃথিবী—১০৯০০ স. মে. টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. ট	দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩১ ল. ১৪ স.	৬। মেক্সিকো	৪ ল. ৭ স.
২। চীন†	×	৭। পাকিস্তান	৩ ল. ৪ স.
৩। সো. রুশিয়া	১৫ ল. ৫৬ স.	৮। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র	৩ ল.
৪। ভারত	৮ ল. ৩৫ স.	৯। তুরস্ক	২ ল.
৫। ব্রাজিল	৬ ল. ১৩ স.	১০। সুদান	১ ল. ৭৩ স.

* F. A. O. Monthly Bulletin 1962

† চীনের উৎপাদন অজ্ঞাত। তবে ১৯৫০-৬০ সালে গড়ে ২৪ ল. ১০ হাজার মে. টন।



৫৩নং চিত্র।—পৃথিবীর তুলা-উৎপাদন-স্থান।

দেশভেদে তুলা-উৎপাদন

এক্ষণে প্রত্যেক মহাদেশের প্রধান-প্রধান তুলা-উৎপাদক দেশগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে,—

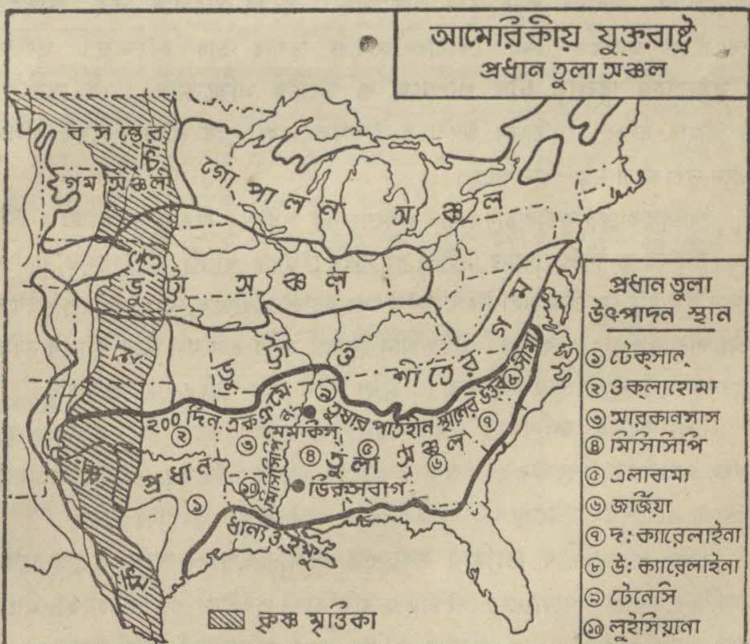
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা-য়—আ. যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো।

দক্ষিণ আমেরিকা-য়—ব্রাজিল, পেরু, আর্জেন্টিনা।

এশিয়া-য়—**ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান**, তুরস্ক, ইরাণ।

আফ্রিকা-য়—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র (মিশর), সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন (নাটাল), কঙ্গো।

উপরেই বলিয়াছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তূলা-উৎপাদন-স্থান—**আ. যুক্তরাষ্ট্র।** ইহার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে মোটামুটি ১০টি রাষ্ট্রে তূলা জন্মে। মোটামুটি পশ্চিমে—টেক্‌সাস হইতে পূর্বে—প্রায় আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত ;—এবং উত্তরে—৩৭° উ. অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে ৩১° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত এই তূলা-অঞ্চল বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমার অর্থাৎ ৩৭° উ. অক্ষরেখার সহিত প্রায় ২০০ দিন তুষারপাতহীন রেখা (৫৫নং চিত্র দেখ) মিলিত হইয়াছে, এবং এই সীমার দক্ষিণে শীত কম। সেজন্য কোন স্থানেই একক্রমে ২০০ দিন তুষারপাত হয় না। তূলার চাষ সম্পূর্ণ হইতে ১৮০ দিন লাগে। কিন্তু এই তূলা-অঞ্চলেরই উত্তর অংশে শীতের দিন কম বলিয়া এখানে তূলার চাষের পরম শত্রু কোষকীট (boll weevil) আছে। এই পোকা তূলার



৫৪নং চিত্র।—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান-তূলা-উৎপাদন-স্থান।

কাঁচা বীজ-কোষে ডিম পাড়ে, এবং ডিম হইতে পোকা বাহির হইয়া তূলার বীজ একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহা মেক্সিকো দেশ হইতে এদেশে আসে বলিয়া ইহাকে মেক্সিকো-কীটও বলে। যে-অঞ্চলে বৃষ্টি বেশী সেই অঞ্চলে এই কীট বেশী জন্মে।

সেইজন্য আ. যুক্তরাষ্ট্রের তূলা-অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল **পূর্বভাগে তুলার চাষ কমিয়া যাইতেছে,** এবং **বৃষ্টিবিরল পশ্চিমভাগে তুলার চাষ বেশী হইতেছে।** এই কোষকীটের জন্যই জর্জিয়া ও ক্যারোলাইনা স্টেটের সন্নিহিত দ্বীপে এখন আর দ্বীপ-কার্পাস হয় না। বৃষ্টির বাহুল্যও এখানে তূলা না হইবার আর একটি কারণ। পূর্বেই বলিয়াছি এই তূলা-অঞ্চলের উত্তর অংশে শীত কম বলিয়া সেখানে কোষকীটের অত্যাচার হয়। কিন্তু উত্তর সীমার উত্তরেও অপেক্ষাকৃত শীতবহুল সুবিধাজনক স্থানেও তূলার চাষ হইতেছে।

উপরি-উক্ত তূলা-অঞ্চলের পশ্চিম সীমারেখার সহিত ২০" ইঞ্চি সমবর্ষণ রেখা (iso-hyet) মিলিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পশ্চিমে বৃষ্টিপাত ২০" ই. অপেক্ষা কম ও শীত বেশী। সেজন্য সেদিকে কোষকীটের অত্যাচার কম। এ-কারণে এই তূলা-অঞ্চল পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। এজন্য নব মেক্সিকো, আরিজোনা, ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেটেও প্রচুর তূলা জন্মিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি এই অঞ্চলের উত্তর সীমার উত্তরেও এখন কোথাও-কোথাও তূলার চাষ হইতেছে। সুতরাং **আ. যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ পশ্চিমে ও উত্তরে সরিতেছে।** এই অঞ্চলের দক্ষিণ-সীমার দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর উপকূলে এবং পূর্বে বৃষ্টিপাত বেশী বলিয়া সেখানে তূলা জন্মে না,—ধান জন্মে।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের তূলার চাষ-প্রধান দক্ষিণের এই অঞ্চলকে বলে **তুলা-রাজ্য**।

চীনের তূলা উৎপাদনের পরিমাণ সব সময়ে ঠিকমত পাওয়া না গেলেও এক্ষণে অনুমান করা যায় যে, চীন তূলা উৎপাদনে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে, এবং এক্ষণে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর চীনে হোয়াং নদীর এবং মধ্য চীনে ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় ও ব-দ্বীপে প্রচুর তূলা জন্মে। দক্ষিণ চীনে অতি অল্পই তূলা পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রুশিয়ায় তূলা জন্মে ইহার দক্ষিণ ভাগে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে, ককেশস পর্বতাঞ্চলে, এবং উজ-বেকিস্তান ও তুর্কমেন প্রভৃতি রুশীয় মধ্য এশিয়ার কয়েকটি সোভিয়েট প্রদেশে। ইউরোপে রুশিয়াই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র তূলা উৎপাদন-স্থান।

দক্ষিণ আমেরিকায় **ব্রাজিল সর্বশ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান। পেরুতে,** আর্জেন্টিনার উত্তরে—প্যারাগুয়ের পশ্চিমে ও বলিভিয়ার পূর্বভাগে যে গ্রানচাকো নামে বনভূমি আছে সেখানেও বন পরিষ্কার করিয়া তূলা জন্মিতেছে। **মেক্সিকো** তূলা উৎপাদনে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। পূর্বে এদেশে যে-তূলা জন্মিত, তাহা হইতে রপ্তানি সম্ভব হইত না। এক্ষণে রপ্তানি-বাজারে মেক্সিকো ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমার নিকটে রিও গ্রাণ্ডির ধারে-ধারে ও পশ্চিম উপকূলের স্থানে-স্থানে এদেশে প্রধানতঃ তূলা জন্মে।

আফ্রিকা মহাদেশে **মিশর প্রধান তূলা-উৎপাদন-স্থান**। উচ্চ অঙ্গের তূলার উৎপাদনে মিশরের স্থান তূলা-উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার তূলার আঁশও ভাল, চাহিদাও বেশী। এখানে বৃষ্টিপাত নাই বটে, তবে নীলের জলপ্লাবন হেতু জল যতদূর উঠে, ততদূরই চাষ হইয়া থাকে। অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান—সুদান। ইংলণ্ডের নিজের দেশে তূলা উৎপন্ন হয় না বলিয়া আফ্রিকার পূর্বভাগের মালভূমিতে ইহার উপনিবেশ উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, রোডেশিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলন প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের চেষ্টায় তূলা জন্মিতেছে।

ভারত-বিভাগের পূর্বে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ তূলা-উৎপাদন-স্থান ছিল। ভারত-বিভাগের পর উৎকৃষ্ট তূলাক্ষেত্র প্রায়ই পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। সমগ্র তূলার জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। তাছাড়া আমেরিকার বড় আঁশের তূলার জমি অধিকাংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। ভারত-বিভাগের সময় ১৯৪৭ খৃ. অব্দে সমগ্র ভারতে তূলার কল ছিল ৪২৩, পাকিস্তানে ১৪। সুতরাং ভারতে তূলার অভাব হইতে থাকে। এক্ষণে ১৯৬১ সালে ভারতে কাপড়ের কল ৪৬১। সুতরাং ভারতে এখন তূলার দরকার বেশী। ভারতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫৭'৬ লক্ষ বেল (১ বেল=৪০০পা.) তূলা লাগিয়াছিল। সেজন্য ভারতে তূলা-উৎপাদন বৃদ্ধির ও ভাল তূলা-উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তূলার চাষের হিসাব নিম্নে দেখানো হইল,—

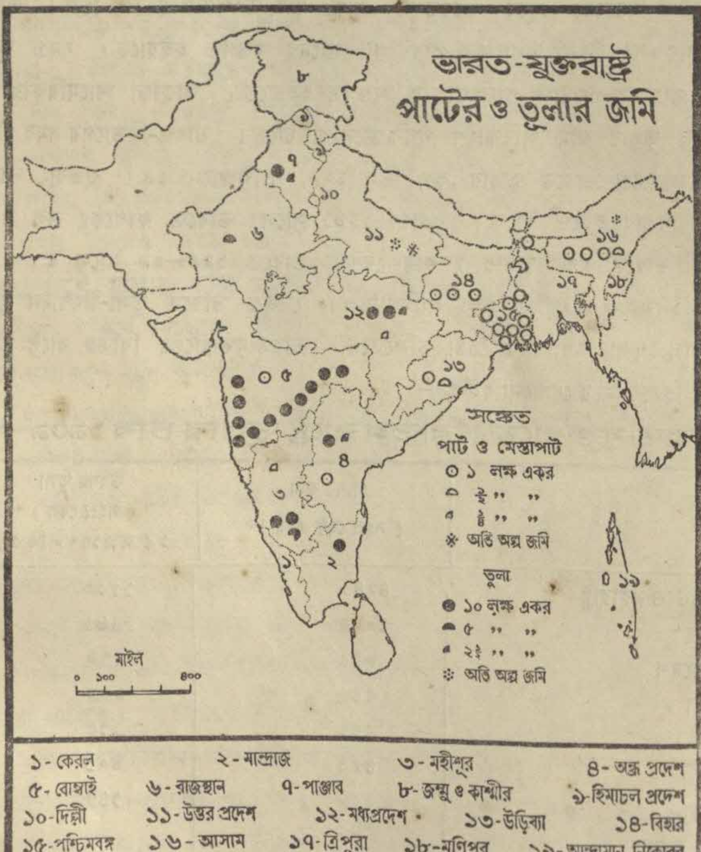
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে তূলার চাষ ১৯৫৯—৬০

রাষ্ট্র	চাষের জমি (সহস্র হেক্ট এয়র)*	উৎপন্ন তূলা (সহস্র বেল) ১ বেল=১৭৭'৮ কি.গ্রা. †
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র	৪২৪৮	১৫৩৩
মহীশূর	১০০৯	৪৬৫
মধ্যপ্রদেশ	৮৪৪	২৭৯
পাঞ্জাব	৫৪৫	৮০০
অন্ধ্র	৩৪৪	১১৫
মাদ্রাজ	৪৫৭	৪০১
রাজস্থান	২৩৮	১৪৮
উত্তর প্রদেশ	৬৮	৬৭
অন্যান্য স্টেট	৫৩	২৭
সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৭৭৯১	৩৮৩৫

* ১ হেক্ট এয়র—২'৪৭১১ একর। † ১ কিলোগ্রাম=২'২০ পাউণ্ড।

উল্লিখিত ঐ তালিকা হইতে দেখা যাইবে, দক্ষিণ ভারতের মধ্য-পশ্চিম ভাগে

কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলই শ্রেষ্ঠ তুলা-উৎপাদন-স্থান। গোয়া ও নাগপুর একটি রেখার দ্বারা যোগ করিলে তাহার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে এই কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চল অবস্থিত। ইহার পরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় বালুকাপ্রধান **পলিমাটি অঞ্চলে** অবস্থিত পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ। এ-অঞ্চলে সেচের জলই প্রধান অবলম্বন। আর একটি অঞ্চল মাদ্রাজের **লোহিত মৃত্তিকা অঞ্চল**। মাদ্রাজে কতক চাষ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া মে-জুন মাসে হয়, কতক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর সময়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে হয়। উপরে তূলা উৎপাদক প্রদেশগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে।



৫৫ নং চিত্র।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের ও তুলার জমি।

কেরলে ও মহীশূরে বিখ্যাত দীর্ঘ আঁশের দ্বীপ কার্পাস (Sea Island Cotton) জন্মিতেছে। মোট উৎপন্ন তুলার এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে।

ভারতে যে তূলা জন্মে তাহা ভারতের কলেই ব্যবহার করা হয়। ভারত-বিভাগের পর হইতে ⅞ই. হইতে ১ই. ও তদূর্ধ্ব তূলার জন্য ভারতকে পূর্ব আফ্রিকা, আমেরিকা, মিশর ও সুদানের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

ব্যবসায়।—পৃথিবীর রপ্তানি করা তূলার প্রায় ৫০ শতাংশই আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান রপ্তানি-বন্দর—নিউ অর্লিয়ান্স (New Orleans), গ্যালভেস্টন ও হাভানা। বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান প্রধান ক্রেতা। অন্য রপ্তানি-কারক স্থান—মিশর, সো. রুশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, সুদান, পেরু, ব্রাজিল, পাকিস্তান, প্রভৃতি। পৃথিবীর সর্বপ্রধান আমদানি-কারক দেশ—জাপান। অন্য আমদানিকারক দেশ—প. জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ইতালী, প্রভৃতি। ভারতে উৎপন্ন তূলা ভারতেই ব্যয়িত হয়। ইহার ছোট আঁশের তূলার বড় খরিদ্দার আ. যুক্তরাষ্ট্র। যদিও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি শ্রেষ্ঠ তূলা-উৎপাদন-স্থান, কিন্তু সূতি-কম্বল আমেরিকার তূলায় ভাল হয় না। ভারতের পরিষ্কার, সাদা ও কর্কশ ছোট আঁশ তূলা ইহার বিশেষ উপযোগী। ১৯৬০ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানি ৩৮৮৯ স. মে. টন। তন্মধ্যে ভারতের ৩৩.৬ ও পাকিস্তানের ৮৮.৫ স. মে. টন;—মোট আমদানি ৩৮১১ স. মে. টন, তন্মধ্যে ভারত আমদানি করে ২০৪.৭ স. মে. টন ও পাকিস্তান ১.০ স. মে. টন।

---

(২) পাট (Jute)

ব্যবহার।—পাট হইতে দড়ি, দড়া, সূতালি, বস্তা, চট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বয়ন-শিল্পের জন্য যত রকমের তন্তু ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উৎপত্তির পরিমাণে পাটের স্থান তৃতীয়* এবং পাটের তন্তু সর্বাপেক্ষা সুলভ। পাটে যে-থলি প্রস্তুত হয়, তাহার সাহায্যে গম, যব প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্যস্থানে সহজে ও সুলভে পাঠানো যায়। সেইজন্য ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পাটের খুব আদর।

পাট দিয়া কাগজ, নাইট্রো-সেলুলোজ (Nitro-Cellulose), কাঁচকড়ার দ্রব্য (Celluloid Articles), নকল রেশম (Rayon) প্রভৃতি দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। পাট রং করিয়া তাহার দ্বারা সুন্দর কার্পেট প্রস্তুত হয়। এক্ষণে পাট

---

* প্রথম তূলা, দ্বিতীয় পশম। বয়নশিল্পে ব্যবহৃত তন্তুগুলির বার্ষিক উৎপত্তির মোটামুটি হিসাব—
১৯৩৪-৩৮ সালের গড় হিসাবে

তূলা—১৫৭১৯ পা.	পাট—৩৩৪৭ পা.	কৃত্রিম পশম—১০৭১ পা.
পশম—৩৮৮৯ পা.	শণ—১৭৫০ পা.	মসিনার তন্তু—৮৮৬ পা.

দিয়া শক্ত রাস্তা প্রস্তুত করাও চলিতেছে। পাটের গাত্র হইতে তন্তু ছাড়াইয়া লইলে যে-কাঠি পাওয়া যায়, তাহা জ্বালানি-দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা।—পাট চাষের জন্য দরকার,—১। **উর্বরা পলিমাটির জমি।** যেখানে বানের জল উঠে নদীর নিকটবর্তী সেই জমিই পাট-চাষের পক্ষে ভাল। ২। **বেশী উত্তাপ**—(চাষের সময় ৮০° ডি. ফা.)। ৩। **প্রচুর বৃষ্টিপাত** (৭ " ই.)। ৪। **কষ্টসহিষ্ণু, দক্ষ কিন্তু সস্তা শ্রমিক।** পাটের জমি হইতে অনবরত আগাছা তুলিয়া ফেলিতে হয়, এবং জলের ভিতর দাঁড়াইয়া (৫৭নং চিত্র দেখ) পাটের কাঠি হইতে তন্তু ছাড়াইতে হয়, পরে তন্তু শুকাইতে হয়। এজন্য দক্ষ শ্রমিকের দরকার বেশী।

উৎপাদন স্থান।—সমগ্র পৃথিবীতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা পাট-চাষের শ্রেষ্ঠ উপযোগী স্থান,—একমাত্র উপযোগী স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য বঙ্গদেশ (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ) পৃথিবীতে একমাত্র পাট-চাষের স্থান ছিল। এই অঞ্চলের চাষীদিগেরও ইহা **সর্বপ্রধান অর্থপ্রসূ চাষ।** কিন্তু



৫৬নং চিত্র —পাট ধোওয়া।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পণ্যশস্য চালান দেওয়ার জন্য পাটের জিনিষের দরকার খুব বেশী। এজন্য পৃথিবীর লোকের বাঙ্গালা দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত। ইহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই পাট-উৎপাদনের চেষ্টা বা পাটের স্থলে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য প্রদেশেও পাট-উৎপাদনের

চেষ্টা হইতেছে। এক্ষণে মেস্তা পাট নামক একপ্রকার পাট সর্বত্রই জন্মিতেছে। নিম্নে পৃথিবীর পাট-উৎপাদন-স্থান, ও উৎপাদন-পরিমাণ সম্বন্ধে একটি হিসাব দেওয়া গেল,—

পৃথিবীর পাট-উৎপাদন ১৯৫৯-৬০

পৃথিবী—২৫৮০ স. মে. ট.

উৎপাদন-স্থান

দেশ	পাট	মেস্তা	দেশ	পাট	মেস্তা
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৭৩১	২০৮	ফর্মোজা	২১	×
পাকিস্তান	১০২১	×	থাইল্যাণ্ড	৬	১৮১
ব্রাজিল	৩৬		ভিয়েতনাম	১	×

এতদ্ব্যতীত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কঙ্গো, মাদাগাস্কার, নেপাল, জাপান প্রভৃতি স্থানে অত্যল্প পাট জন্মে, স্পেনে অল্প মেস্তা জন্মে। কিন্তু **প্রকৃতপক্ষে ভারত ও পাকিস্তান** এবং বিশেষভাবে এই **দুই দেশের বঙ্গদেশ** নামক প্রদেশ দুইটিতেই আবশ্যকীয় পাট জন্মে। পাটের দেশ বলিলেই ভারত ও পাকিস্তানের বঙ্গদেশ বুঝায়। নেপালের পাট ভারতবর্ষে রপ্তানি করা হয়।

পাকিস্তানের পাট ভারতের পাট অপেক্ষা ভাল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পাটের জমি, ও উৎপাদন

(১৯৫৯-৬০)

স্টেট	জমি সহস্র হেক্‌ট এয়র			উৎপাদন সহস্র বেল ১ বেল=১৮১·৪ কিলোগ্রাম		
	পাট	মেস্তা	মোট	পাট	মেস্তা	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩৩	৮৭	৪২০	২১৭০	৪০৮	২৫৭৮
আসাম	১৩৫	৩	১৩৮	১১১৪	১৫	১১২৯
বিহার	১৭০	৪৯	২১৯	৯৩০	১৫০	১০৮০
অন্ধ্র	×	৩৪	৩৪	×	১৭২	১৭২
উড়িষ্যা	৩০	১১	৪১	১৮৮	৫২	২৪০
উত্তর-প্রদেশ	১৩	×	১৩	৮৯	×	৮৯
ত্রিপুরা	৮	১০	১৮	৫৭	৫০	১০৭
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৬৯১	২৮৬	৯৭৭	৪৫৪৮	১০৯৮	*৫৬৪৬

উপরি-প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায়,—(১) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক পাটের

* আরও কোন-কোন রাষ্ট্রে কেবল মেস্তাপাট হয়। এই যোগফলে তাহাও ধরা হইল।

জমিতে অর্ধেক পাট হয় পশ্চিমবঙ্গে (৫৬নং চিত্র)। এত পাট অন্য কোন স্টেটে হয় না। (২) পাটের জমি ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতেছে।



৫৮নং চিত্র।—পাটের ক্ষেত।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পাটশিল্পে পৃথিবীতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এক্ষণে এখানে পাটসংক্রান্ত নানারকমের ১০৬টি কল (রেজিষ্ট্রিকৃত কল ৫৬টি)

আছে। এই সকল কলে মোটা ও সরু সূতা, থলে, হেসিয়ান থলে, মোটা চট, হেসিয়ান চট ও দড়ি, টোয়াইন সূতা, কার্পেট প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তত হয়। ভারত-বিভাগের পর পাটের জন্য ভারত পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু পাকিস্তান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেকে পাট দিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না। সেজন্য খাদ্যশস্যের জমিতেও পাট চাষ করাইয়া উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সব কারণে ভারতে পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—

	পাটের জমি সহস্র একর		পাট উৎপাদন সহস্র বেল	
	পাট	মেস্তা	পাট	মেস্তা
১৯৬০-৬১	১৫১২	৬৮৯	৩৯৮২	১১৩১
১৯৬১-৬২	২২৫৯	৯৫১	৬২৬৯	১৭০৫

পাটের ও পাটদ্রব্যের ব্যবসায়।—পৃথিবীতে ভারতই সর্বপ্রধান পাট-দ্রব্য রপ্তানিকারক এবং পাকিস্তান শ্রেষ্ঠ পাট-রপ্তানিকারক দেশ। ভারতের পক্ষে পাট-দ্রব্যই অন্যতম প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য,—বিদেশে ব্যবসায় করিবার জন্য ও অন্য রাজনীতিক সম্পর্ক রাখিবার জন্য যে-মুদ্রা উপার্জন করার প্রয়োজন, তাহা সফল করিবার পক্ষে পাট একটি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। এদেশ হইতে সাধারণতঃ পাটের চট (হেসিয়ান ও মোটা), পাটের থলে, দড়ি, সূতা প্রভৃতি এদেশের কলে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। প্রধান খরিদ্দার—আ. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, আর্জেন্টিনা, চিলি, ক্যানেডা প্রভৃতি।

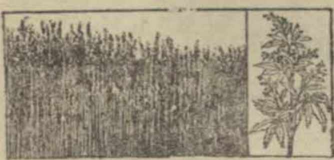
অন্য পাট-আমদানিকারক দেশ—প. জার্মানি, ফ্রান্স, আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালী প্রভৃতি।

কিন্তু পাট ভারতের প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা-দ্রব্য হওয়াতে অন্য-অন্য দেশে পাটের স্থানে অন্য দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। এজন্য এক্ষণে অস্ট্রেলিয়া হইতে কার্পাস কাপড়ের থলিতে ময়দা আসে। ইংলণ্ড ও হলণ্ড হইতে কাগজের ঠোঙায় সিমেন্ট আসে। আ. যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, দ. আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও কাপড়ের বা কাগজের বস্তা ব্যবহার করিতেছে। ভারতের বড় খরিদ্দার ডাণ্ডির কলেও

পাটের সঙ্গে অন্য আঁশ মিশাইবার চেষ্টা হইতেছে। জার্মানিতেও গাছের ছালের আঁশ দিয়া থলি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে।

৩। শণ (Hemp)

শণ।—অনেকপ্রকার তন্তু "শণ" নামে খ্যাত। শণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—প্রথমতঃ আসল শণ, যেমন—(১) ভাঙ্গশণ বা ইন্দ্রশণ, ও (২) ফুলশণ :—দ্বিতীয়তঃ যে-সকল শণের গাছ আসল শণ গাছ হইতে অন্যরূপ, কিন্তু তন্তু আসল শণের মত। এই সকল শণের নামের পাশে শণ" আখ্যা জুড়িয়া দেওয়া হয় :—যেমন,—(৩) ম্যানিলা "শণ", (৪) শিশল "শণ"। শণ হইতে দড়ি, সুতালি, সুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শণ পাট অপেক্ষা শক্ত। জলে পাটের দড়ি শীঘ্র পচিয়া যায়। কিন্তু শণের দড়ি শীঘ্র নষ্ট হয় না।



৫৯নং চিত্র। শণের চাষ ও শণ গাছ।

(১) ভাঙ্গশণ বা ইন্দ্রশণ (Cannabis Sativa বা True Hemp), **(২) ফুলশণ** (Crotalaria Juncea বা Sann Hepm)। এই গাছগুলির ছাল, ডাঁটা, বীজ, পাতা, ফুল, আঠা—সবই কাজে লাগে। ইহার **ছাল** হইতে আঁশ বাহির করিয়া তাহাতে দড়ি, সুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই তন্তু দিয়া স্যাক-ক্লথ (sack-cloth) বা ছালা নামে মোটা থলে প্রস্তুত করা হয়। ইহার **ডাঁটা** পাটকাঠির মত আগুন জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। ইহার **বীজ** মাদকক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য এবং পক্ষী ও দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বীজ হইতে তৈলও প্রস্তুত হয়। এই তৈল জ্বালানি তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং উহা দিয়া রঙ্, পালিশ ও সাবান প্রস্তুত করা হয়। ইহার **পাতা** ও **মুকুল** শুষ্ক করিলে ভাঙ্গ বা সিদ্ধি নামে একপ্রকার মাদক দ্রব্য হয়। ইহার ডালে ও ফুলের ডাঁটায়, ও পাতায় যে-**আঠাল পদার্থ** পাওয়া যায় তাহাকে চরস বলে ;—ইহার স্ত্রী-বৃক্ষের **জটা** শুকাইয়া লইলে তাহাকে গাঁজা বলা হয়।

উৎপাদন-স্থান।—এই শণগাছের প্রধান উৎপত্তি-স্থান দক্ষিণ রুশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গারি, পোলণ্ড ও ইতালী। পৃথিবীতে যত শণ জন্মে তাহার $\frac{1}{10}$ অংশ কেবল রুশিয়াতেই জন্মে। ইউরোপের অন্য-অন্য অংশেও কিছু জন্মে।

ইউরোপ প্রধান উৎপত্তিস্থান ;—তাহার পরেই এশিয়া। এশিয়ার—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যচীন, কোরিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তানে শণ জন্মে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ, এবং পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গে শণ জন্মে।

ব্যবসায়।—শণের প্রধান রপ্তানি-স্থান ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরে ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়া। ভারতে ভাঙ্গশণ অপেক্ষা ফুলশণ বেশী পরিমাণ জন্মে। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহাদের পৃথক্ হিসাব রাখা হয় না। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রধান খরিদ্দার।

(৩) **ম্যানিলা শণ** (Manila *Hemp*)।—ইহার আসল নাম আবাকা (Abaca)। ফিলিপাইনের প্রধান বন্দর ম্যানিলা হইতে ইহা প্রধানতঃ রপ্তানি হয় বলিয়া ইহার নাম ম্যানিলা। ইহার প্রধান উৎপাদন-স্থান—**ফিলিপাইন দ্বীপ**। অন্য উৎপাদন-স্থান—মধ্য আমেরিকায় কোস্টারিকা, গোয়াটেমালা, পানামা ; এশিয়ায়—বৃটিশ উত্তর বোর্নিও। কিন্তু ইহা ফিলিপাইনের একচেটিয়া ধনপ্রসূ ব্যবসায়-দ্রব্য। পৃথিবীর অর্ধেক ম্যানিলা এখানে উৎপন্ন হয়।



৬০নং চিত্র।—ম্যানিলা শণ।

ইহার তন্তু ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহা "শণ"। কিন্তু ইহার আকার কলাগাছের মত। ইহা ৮-১০ ফিট লম্বা হয়।

দড়ি-দড়া প্রস্তুত করার পক্ষে ইহার তন্তু সর্বোৎকৃষ্ট—ইহা অত্যন্ত শক্ত—জলে শীঘ্র পচে না বা ফোলে না। তাই জাহাজ বাঁধিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই দড়ি-দড়া ব্যবহার করিতে-করিতে নষ্ট হইলে তাহা হইতে ম্যানিলা কাগজ প্রস্তুত হয়।

ব্যবসায়।—ইহার প্রধান রপ্তানি-কারক দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইন। পৃথিবীর রপ্তানি-ক্ষেত্রে যত ম্যানিলা আসে (১৯৬০ সালে ১০৬ স. মে. ট.) তাহার ৯৪ শতাংশ (১০০ স. মে. ট.) ম্যানিলা হইতে পাওয়া যায়। অন্য সামান্য রপ্তানি-কারক দেশ—কোস্টারিকা, গোয়াটেমালা, পানামা। কিন্তু ইহাদের রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এক্ষণে ইন্দোনেশিয়া ও উত্তর বোর্নিও কিছু ম্যানিলা রপ্তানি করে। প্রধান আমদানি-কারক—আ. যুক্তরাষ্ট্র (৩২%), তারপর জাপান, তৎপরে যুক্তরাজ্য।

(৪) **শিশল "শণ"** (Hen-e-quen—Sisal *Hemp*)।—শিশল গাছ শণ-জাতীয় নহে, ম্যানিলা-জাতীয়ও নহে। ইহার পাতা হইতে তন্তু পাওয়া যায় তাই ইহাকে "শণ" বলা হয়। আর ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান ইউকাতান-এর একটি বন্দর—শিশল—হইতে অধিকাংশ রপ্তানি হয় বলিয়া ইহার নাম শিশল শণ। শিশল গাছের গা হইতে আনারসের পাতার মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড়, চওড়া ও মোটা পাতা বাহির হয়। এই পাতা কাটিয়া কারখানায় লইয়া গিয়া, যন্ত্রযোগে ইহার আঁশ ছাড়ানো হয়। ঐ আঁশ শেষে শুকাইয়া চালান দেওয়া হয়।



৬১নং চিত্র।—শিশল শণ।

উৎপাদন-স্থান।—ইহার শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান মেক্সিকোর অন্তর্গত **ইউকাতান**। অন্য উৎপাদন-স্থান—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কিউবা ও হেইটি; পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—ইন্দোনেশিয়া; আফ্রিকায়—কেনিয়া, এঙ্গোলা; ও ট্যাঙ্গানাইকা; দক্ষিণ আমেরিকায়—ভেনেজুয়েলা।

ব্যবসায়।—**শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারক স্থান**—ট্যাঙ্গানাইকা;—প্রায় ৩৬ শতাংশ ১৯৬০ সালে এখান হইতে রপ্তানি হয়। **অন্য রপ্তানিকারক স্থান**:—ব্রাজিল, এঙ্গোলা, কেনিয়া, মেক্সিকো, হেইটি, ইন্দোনেশিয়া, মোজাম্বিক, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

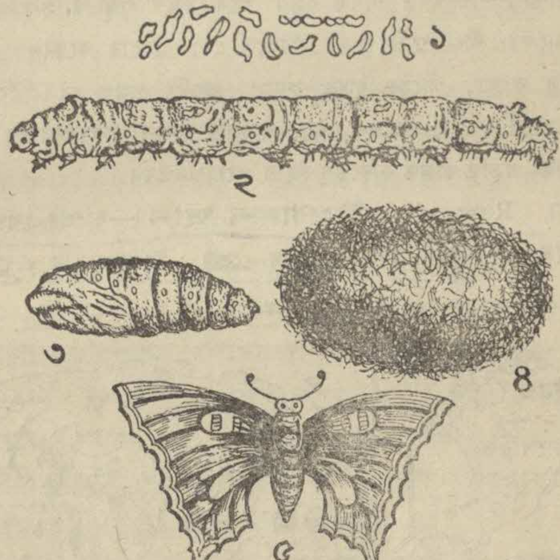
প্রধান আমদানিকারক স্থান।—আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, প. জার্মানি, ফ্রান্স, ক্যানাডা প্রভৃতি। পৃথিবীর ১৭% অংশ আ. যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করে।

৪। রেশম (Silk)

রেশম।—নিরক্ষীয় অঞ্চলে, শীতোষ্ণ অঞ্চলে, ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চলে তুঁতগাছ জন্মে। রেশম-কীট এই তুঁতগাছের পাতা খাইয়া পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং যেখানে তুঁতগাছ জন্মে, সেইখানেই রেশম-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাহা হয় না। শ্রমমূল্য ইহার বিশেষ অন্তরায়। রেশমকীটকে তুঁত-

পাতা খাওয়ান, গুঁটি হইতে সূতা ছাড়ানো প্রভৃতি কার্যের জন্য দক্ষ শ্রমিক দরকার। প্রকৃতপক্ষে রেশমকীট পালনের অনেক কার্য স্ত্রীলোকেরা ও বালক-বালিকাগণ অন্যান্য কার্যের সঙ্গে-সঙ্গে করে। তাহাদের শ্রমমূল্য হিসাবের মধ্যে গণ্য করাই হয় না। তথাপি ইহার শ্রমমূল্য যতদূর ধরা হয়, তাহাতেই রেশম-বস্ত্র মহার্ঘ। সেজন্য শ্রমমূল্য বেশী হইলে এই শিল্প চলে না। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে, দক্ষিণ ব্রাজিলে ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুতে তুঁতগাছ জন্মে। কিন্তু অত্যধিক শ্রমমূল্যের জন্য সেখানে রেশম-শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ **আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র রেশমের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার।** 1963 Comp.

শরীর হইতে এক প্রকার আঠা বাহির করিয়া রেশমকীট নিজ দেহের বাহিরে



৬২নং চিত্র।—রেশমকীটের নানা অবস্থা।

১। রেশমকীটের প্রথম অবস্থা। ২। পরিণত রেশমকীট—ইহা সূতা বাহির করিয়া নিজের চারিদিকে সূতা দিয়া গুঁটি বাঁধে ও নিজে গুঁটির ভিতরে থাকে। ৩। গুঁটির ভিতর রেশমকীট যে-ভাবে থাকে ;— এই কীট বড় হইতে পারিলে গুঁটি কাটিয়া বাহির হয়। ৪। রেশম-গুঁটি। ৫। গুঁটির পোকা বাহির হইতে পারিলে এইরূপ প্রজাপতি হয়।

একটি আবরণের সৃষ্টি করে (৬২নং চিত্রে ৩ ও ৪)। সেই আবরণকেই বলে "গুঁটি"। কিছুদিন পরে রেশমকীট ঐ আবরণ কাটিয়া উড়িয়া বাহির হয়। ঐ কীট আবরণ

কাটিয়া বাহির হইবার পূর্বে রেশমশিল্পীরা আবরণটিকে গরম জলে ফেলিয়া দেয়, ও পরে ঐ সিদ্ধকরা গুঁটি হইতে সূতা বাহির করে। ঐ তন্তুই রেশম-তন্তু।

তুঁতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীট প্রতিপালন করা এবং গুঁটি হইতে রেশম উৎপাদন করাকে ইংরাজিতে বলে Sericulture। ইহা Ser-i-ci-cul-ture (LL. *Sericum* = Silk + L. Cultura = culture) শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার।

গরম জলে সিদ্ধ করিয়া রেশমকীট হত্যা করিতে হয় বলিয়া হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষ এই শিল্প বিশেষভাবে গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা কিছু-কিছু গ্রহণ করিয়াছিল। সেজন্য ভারতবর্ষ তুঁতচাষের উপযুক্ত স্থান হইলেও, এবং এখানে শ্রমমূল্য কম হইলেও, এখানে রেশম-শিল্পের যথোচিত উন্নতি হয় নাই।

ব্যবহার।—রেশমবস্ত্র পবিত্র বস্ত্র। পবিত্রভাবে পূজা-আহ্নিক করিবার সময় অবস্থাপন্ন লোকেরা অন্য সূতী বস্ত্রের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করেন। ইহা হইতে কাপড়, জামার কাপড়, গায়ের চাদর, রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদ্যুৎ-রোধক বস্ত্ররূপে ও অস্ত্রচিকিৎসা ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহৃত হয়। গৃহমুদ্রণযন্ত্রের (type-writer) ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়।

রেশম (Raw silk) **উৎপাদন স্থান**।—সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম-উৎপাদন স্থান—**জাপান**,—তৎপরে **চীন**,—তৎপরে শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান **সোভিয়েট**



৬৩নং চিত্র।—পৃথিবীর রেশম উৎপাদন-স্থান।

রুশিয়া, ভারত, ও **দক্ষিণ ইউরোপ** (প্রধানতঃ ইতালী)। ইউরোপে অন্য উৎপাদন স্থান—যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ও স্পেন। এশিয়ার অন্য

উৎপাদন-স্থান—তুরস্ক, কোরিয়া, সিরিয়া। পৃথিবীর শতকরা ৭৪ ভাগ রেশম উৎপন্ন হয় চীনে ও জাপানে। তন্মধ্যে জাপানে হয় ৫৭% শতাংশ। ভারতের উৎপাদন ৪·৬%। মোটামুটি **পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপ এক্ষণে রেশম উৎপাদনের প্রধান স্থান।**

পৃথিবীর রেশমদ্রব্য উৎপাদন-স্থান।—পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম-দ্রব্য উৎপাদন স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীতে যে-সব দেশ রেশম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত, সে-সব দেশে কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেক রেশম-দ্রব্যেরও সৃষ্টি হয় না। আ. যুক্তরাষ্ট্রে আদৌ রেশম জন্মে না। কিন্তু ইহার পূর্ব পার্শ্বে পৃথিবীর দুই-পঞ্চমাংশ রেশমদ্রব্য উৎপন্ন হয়। আমেরিকা,—চীন, জাপান ও দক্ষিণ ইউরোপ হইতে রেশম আনাইয়া রেশমদ্রব্য উৎপন্ন করে। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেশমের বাজার।

পৃথিবীর অন্য রেশমদ্রব্য উৎপাদন স্থান।—এশিয়ায় জাপান, চীন, সো. রুশিয়া কোরিয়া। ইউরোপে—গ্রেটবৃটেন, দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স, জার্মানির রাইন উপত্যকা, সুইজর্লণ্ড, ও উত্তর ইতালী। **ফ্রান্সের লিয় ও ইতালীর মিলান শ্রেষ্ঠ রেশম বাজার।**

প্রধান রেশম রপ্তানি-কারক দেশ।—জাপান (১৯৬০ খৃ. অব্দে মোটামুটি ৬২%), চীন (২৭%), কোরিয়া (২%), সোভিয়েট রুশিয়া (৫%) প্রভৃতি।

প্রধান রেশম আমদানি-কারক দেশ।—আ. যুক্তরাষ্ট্র, (মোটামুটি ২১%), ইতালী (১৫%), সো. রুশিয়া (১৩%), ফ্রান্স (১১%), সুইজর্লণ্ড (৮%), ব্রহ্মদেশ (৪·৫%), হংকং, যুক্তরাজ্য, জার্মানি প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে রেশমের প্রকারভেদ।—ভারতবর্ষে চারি প্রকারের রেশম উৎপন্ন হয় ;—**রেশম, তসর, মুগা, এণ্ডি।**

রেশম—তুঁতগাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমকীট প্রতিপালন করিয়া সেই কীট হইতে যে-রেশম উৎপাদন করা হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ রেশম। তাহারই নাম সাধারণতঃ রেশম, তাহাকেই বলে Raw-Silk। **উৎপাদন স্থান**—(ক) **পশ্চিমবঙ্গে**—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ও মালদহ জেলা। (খ) **আসামের** নানাস্থান, (গ) **মহীশূরের** বাঙ্গালোর, মহীশূর, তুমকুড় ও কোলার জেলা, (ঘ) **মান্দ্রাজের** কোইম্বাটুর জেলা, (ঙ) **কাশ্মীর ও জম্মু রাষ্ট্র** ও (চ) **মধ্যপ্রদেশ।**

তসর।—তসর-কীট অশ্বত্থ, শিমূল, শাল, সেগুণ, জাম, মাদার, অর্জুন, সজিনা, কুল প্রভৃতি গাছে উৎপন্ন হয়। **তসর-উৎপাদন-স্থান**—(ক) বিহারের

অন্তর্গত ভাগলপুর, পালামৌ ও ছোটনাগপুর;—(খ) উড়িষ্যা, (গ) মধ্যপ্রদেশ, (ঘ) আসাম, (ঙ) উত্তরপ্রদেশ।

মুগা-কীট,—অনেক গাছে জন্মে। ইহার **উৎপাদন-স্থান** একমাত্র আসাম।

এণ্ডি বা এড়ি-**কীট** এরণ্ড বা ভেরেণ্ডা গাছের পাতা খাইয়া বাঁচে। এণ্ডি জন্মে আসামে ও আসাম-সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলায়; প. বঙ্গের পূর্ণিয়া জেলায় ও গুজরাট-এর বরোদা অঞ্চলে।

ভারতের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই কিছু-না-কিছু রেশম জন্মে। তবে রেশম-উৎপাদন হিসাবে ভারতকে এই চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—(১) মহীশূর ও মান্দ্রাজের কোইম্বাটুর লইয়া গঠিত **দক্ষিণ ভারত অঞ্চল**;—(২) মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গ লইয়া গঠিত **পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল**; (৩) **কাশ্মীর ও জম্মু অঞ্চল**, ও (৪) **আসাম অঞ্চল**। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারত-অঞ্চলই শ্রেষ্ঠ, তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল। দক্ষিণ ভারত-অঞ্চলে বৎসরে গুঁটি উৎপন্ন হয় ২৫৫ লক্ষ পাউণ্ড, ও রেশমসূত্র উৎপাদন হয় ১৮ লক্ষ পাউণ্ড;—পশ্চিমবঙ্গে গুঁটি—৬৭ লক্ষ পাউণ্ড, ও রেশম-সূত্র—৪ লক্ষ পাউণ্ড।

৫। রবার (Rubber)

রবার সম্বন্ধে নানাকথা।—রবার একটি বৃক্ষের নির্যাস। যে-বৃক্ষের নির্যাস হইতে রবার প্রস্তুত হয়, তাহার প্রকৃত নাম **কুচুক** (Caoutchouc)। আর যে-নির্যাস হইতে রবার প্রস্তুত হয়, তাহার নাম **কেহচু** (Cahutchu)। এই কেহচু প্রথমে পেনসিলের দাগ মুছিবার (rub) কার্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল **রাবার** (rubber)। এখন ইহার নাম হইয়াছে **রবার**—এবং ইহার গাছকে বলে রবার গাছ।

এই গাছ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনে আপনা-আপনি জন্মে। রবার গাছ নানা প্রকারের হয়। তন্মধ্যে আমাজন-অববাহিকার **হেভিয়া** (Hevea) নামক বৃক্ষের নির্যাস হইতেই প্রধানতঃ রবার প্রস্তুত করা হয়। এই বনের স্বচ্ছন্দবনজাত বৃক্ষের নির্যাস সংগ্রহ করিয়া ব্রাজিলের বন্দর প্যারা হইতে দেশবিদেশে তাহা রপ্তানি করা হইত। এজন্য এই রবারকে **প্যারা রবার** বলিত। এক্ষণে এখানকার গাছের চারা লইয়া অন্য-অন্য দেশে রবারের আবাদ করা হইতেছে। এই রবারকেও প্যারা রবার বলে। পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে যে-রবার আসে তাহার অধিকাংশই প্যারা রবার,—রবারের আবাদে যে-হেভিয়া বৃক্ষের গাছ করা হয়,

ইহা তাহারই নির্যাস হইতে প্রস্তুত। সুতরাং এক্ষণে রবার প্রধানতঃ দুই প্রকার—বন্য ও **প্যারা** রবার বা **আবাদী** রবার।



৬৪নং চিত্র।—আবাদী রবার-ক্ষেত্র।

রবারের চাষ ও নির্যাস-সংগ্রহ।—হেভিয়া বৃক্ষের চারা করিবার প্রথম চেষ্টা হয় ইংলণ্ডের কিউ বাগানে। তাহাতে সফলকাম হইলে দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ুর সহিত ইংরাজের উপনিবেশ সিংহল দ্বীপের জলবায়ুর সাদৃশ্য আছে বলিয়া দ্বিতীয়বার সেখানে চারা পুঁতিয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল সেখানেও শুভ হয়। এক্ষণে সিংহল, মালয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া যে-অঞ্চল—সেখানে রবারের আবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে; এবং এই অঞ্চল **পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবাদী রবার উৎপাদন-স্থান**। আবাদী রবারের চাপে বন্য রবার সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বন্য রবারের অবনতির কারণ।—বন্য রবারের এরূপ দ্রুত অবনতির ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদী রবারের দ্রুত উন্নতির কারণ কি?

আমাজন অঞ্চলে—	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদ অঞ্চলে—
১। শ্রমিক—দুর্মূল্য।	১। শ্রমিক—সুলভ।
২। রবার গাছ দূরে-দূরে জঙ্গলে অবস্থিত।	২। আবাদে একস্থানে অবস্থিত। সুতরাং বেশী কাজ করা যায়।
৩। মানবসমাজ—অবনত।	৩। মানবসমাজ—উন্নত।

আমাজান অঞ্চলে—	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবাদ অঞ্চলে—
৪। চারিদিকে জঙ্গল ও নদী, সুতরাং যাতায়াতের অসুবিধা।	৪। চারিদিকে দ্বীপ, সুতরাং যাতায়াতের সুবিধা।
৫। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত নহে।	৫। বহুদিন হইতে ব্যবসায় চলিতেছে।
৬। টাকা খাটাইবার মহাজন কম।	৬। বৃটিশ-শাসিত অঞ্চল ছিল বলিয়া টাকা খাটাইবার মহাজন বেশী ছিল।
৭। রবারগাছ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত।	৭। রবার-ক্ষেত্র সমুদ্রসন্নিধানে অবস্থিত। সেজন্য ব্যবসায়ের সুবিধা।
৮। রবারগাছ বন্য।	৮। রবারগাছ বৈজ্ঞানিক চাষ দ্বারা উৎপন্ন—সুতরাং বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।
৯। রসসংগ্রহ প্রাচীন প্রথায় হয়।	৯। গাছকাটা ও রসসংগ্রহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে হয়। সুতরাং বেশী রস পাওয়া যায়।

(**নির্যাস-সংগ্রহ**।—রবারের গাছ সাত-আট বছরের হইলে, খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করার মত,—তাহার গায়ে তীক্ষ্ণধার ছুরির অগ্রভাগ দিয়া দুই দিক্ হইতে দুইটি দাগ টানিয়া একস্থানে মিলাইয়া দিয়া ইংরাজি V অক্ষরের মত করিয়া খাদ কাটিয়া দিতে হয়। পরে ঐ দুই দাগের মিলন-স্থলে একটি নালি পুতিয়া দিতে হয়। শেষে ঐ দুই দাগের উপরের ছাল চাঁচিয়া দিলে ঘন দুধের



৬৫নং চিত্র।—রবারের নির্যাস-সংগ্রহ।

মত আঠা বাহির হইয়া আসিয়া ঐ নালি-পথে একটি পাত্রে সংগৃহীত হয়। গাছের গায়ে সকালে ভাঁড় বাঁধিয়া ঘণ্টাখানেকের পরে ভাঁড়ে রবার সংগ্রহ করিতে হয়।)

ব্যবহার।—রবার প্রথমতঃ কেবল পেন্‌সিলের দাগ মুছিবার কাজে ব্যবহৃত হইত। পরে ১৮২৩ সালে একজন স্কচ্‌ রবার দিয়া বর্ষাতি (waterproof) তৈয়ার করিলেন, এবং তাঁহার নাম অনুসারে বর্ষাতির নাম হইল ম্যাকিনটস্‌। কিন্তু এক্ষণে রবার যে কত রকমে ব্যবহৃত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা এখন যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দরকারী জিনিষ। রবার হইতে প্রধান আবশ্যকীয় উৎপন্ন-দ্রব্য—**গাড়ীর চাকা।** কিন্তু আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে যে-দিকে তাকানো যায়, সেই দিকেই রবারের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। বালিশ, দস্তানা, জলাভেদ্য কাপড়, প্যাড, নল, জুতা, খেলনা, পুতুল, গরম জল রাখিবার ব্যাগ, থলে প্রভৃতি সমস্তই রবার দিয়া প্রস্তুত হইতেছে। রবারের বিদ্যুৎ-রোধক শক্তি থাকায় বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় যন্ত্রের নানা অংশ রবার দিয়া প্রস্তুত হইতেছে। রবার কঠিন করিয়া উহা হইতে ভল্‌কানাইট (Volcanite), ইবনাইট (Ebonite) প্রভৃতি গন্ধকধর্মা কঠিনীকৃত রবার প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাহা হইতে রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতিতে ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সহিত ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

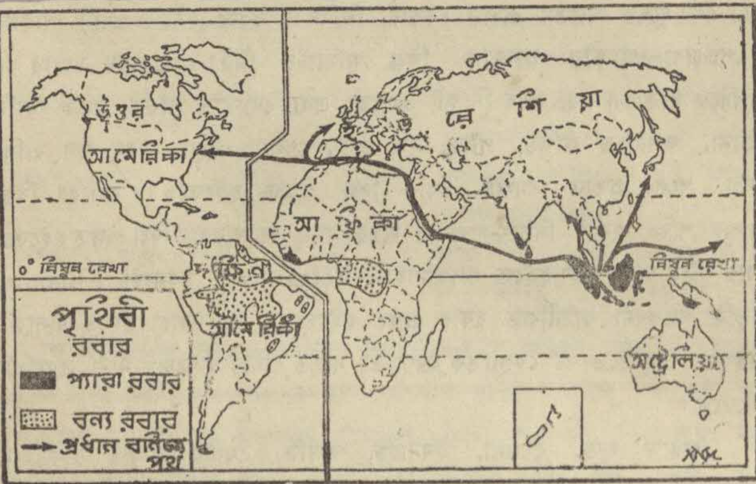
ভারতে জুতা, খেলনা, ইবনাইট, বর্ষাতি, মোটর গাড়ীর চাকা, নল, সাইকেলের টায়ার ও টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। ডানলপ কোং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রবার-দ্রব্য উৎপাদনকারী সমবায়।

উপযোগী অবস্থা।—নিরক্ষীয় অঞ্চলের বন রবারের আদি জন্মভূমি। সুতরাং ইহা সহজেই বলা যায়,—রবার গাছ উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার। প্রকৃতপক্ষে রবার চাষের জন্য উর্বরা, জলনিকাশী অল্প ঢালু জমি, প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮০ ই.), আর্দ্র আবহাওয়া ও প্রচুর উত্তাপ (৮০° ডি. ফা.—৭০° ডিগ্রীর কম নহে) দরকার।

উৎপাদন-স্থান।—পূর্বেই বলিয়াছি রবার দুইপ্রকার—বন্য ও আবাদী। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনে বন্য রবার জন্মে। সুতরাং উত্তর আমেরিকার—মেক্সিকো; —দক্ষিণ আমেরিকার—ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও বলিভিয়া; এবং আফ্রিকার—লাইবিরিয়া, নাইজিরিয়া দেশে ও কঙ্গো অববাহিকায় অবস্থিত দেশগুলিতে বন্য রবার উৎপন্ন হয়।

আবাদী রবার উৎপাদন-স্থান।—**এশিয়া মহাদেশে**—মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র, সারাওয়াক, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও সিংহল। **আফ্রিকায়**—লাইবিরিয়া, নাইজিরিয়া। **দক্ষিণ আমেরিকায়**—ব্রাজিল।

১৯৬০ খৃঃ অব্দে পৃথিবীতে ২০৩০ সহস্র মেট্রিক টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান ছিল মালয় ফেডারেশন (৭১৯.৭ স. মে. ট.—পৃথিবীর ৩৫ শতাংশ), তারপরে দ্বিতীয়—ইন্দোনেশিয়া (৩১.৩%)। এই দুইটি স্থানের মধ্যে যে-কোন একটি প্রতি বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহাদের



৬৬নং চিত্র।—পৃথিবীর রবার উৎপাদন-স্থান।

পরে ক্রমশঃ থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ভিয়েৎনাম, নাইজেরিয়া, সারাওয়াক, লাইবিরিয়া, বেলজীয় কঙ্গো প্রভৃতি। ইহা হইতে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় পৃথিবীর প্রায়



৬৭নং চিত্র।—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার-অঞ্চল।

৯২% রবার উৎপন্ন হয়। কিন্তু রবার উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান বহু নিম্নে

(১%)। ৬৭নং চিত্রে দেখ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূর রবার-উৎপাদন-স্থল।

(**রপ্তানি-কারক দেশ**।—পৃথিবীর সর্বপ্রধান রপ্তানি-কারক দেশ মালয়-সিঙ্গাপুর (৪৫%)। সিঙ্গাপুর গুদাম বন্দর (entrepot),—এ-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য সিঙ্গাপুরে সংগৃহীত হইয়া সেখান হইতে পুনরায় রপ্তানি হয়। সেজন্য সিঙ্গাপুরের রপ্তানি-অঙ্ক খুব বড়। ইহার পরে কয়েকটি রপ্তানি-বন্দর (ক্রমশঃ)—ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, নাইজেরিয়া, সারাওয়াক, লাইবিরিয়া প্রভৃতি। এই হিসাবেও দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রধান রপ্তানি-অঞ্চল। যুক্তরাজ্যও একটি গুদাম-বন্দর,—সিঙ্গাপুরের মত অনেক রবার অন্য দেশ হইতে আনিয়া রপ্তানি করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান রপ্তানিক্ষেত্রে বহু নিম্নে—একেবারে নগণ্য। এখানকার উৎপন্ন রবারে ইহার শিল্পের চাহিদা পূর্ণ হয় না। রবার আমদানি করিতে হয়।

আমদানি-কারক দেশ।—শ্রেষ্ঠ আমদানি কারক দেশ—আ. যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরে মালয়-সিঙ্গাপুর, এবং তৎপরে যুক্তরাজ্য। ইহাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুর গুদাম-বন্দর,—সেইজন্যই আমদানি-অঙ্ক বেশী। আমদানির পর এই দুই স্থান হইতে অন্য দেশে যে-পরিমাণ রবার রপ্তানি হয়, তাহা বাদ দিলে আমদানি-অঙ্ক খুবই কম হয়। সুতরাং আ. যুক্তরাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ রবার আমদানিকারক স্থান (পৃথিবীর মোট রপ্তানির প্রায় ২১%)।

অন্য আমদানি-কারক দেশ।—সোভিয়েট রুশিয়া, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, প্রভৃতি।)

৬। তৈলবীজ (Oilseeds)

ঔষধার্থে, রন্ধনের জন্য, কৃত্রিম মাখন, সাবান, বাতি, রং ও বার্নিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, প্রদীপে জালাইবার জন্য এবং অন্য নানা কার্যে তৈল ব্যবহৃত হয়। আবার বিশেষ-বিশেষ তৈল বিশেষ-বিশেষ কার্যে লাগে। যেমন,—মহুয়ার তৈল হইতে বনস্পতি ঘৃত, জলপাই ও তাল তৈল হইতে সাবান ও বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই সকল তৈল কোন গাছের ফলের শাঁস বা বীজ হইতে পাওয়া যায়। তৈল নিষ্কাশিত করার পরে বীজের যে-অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে বলে খইল;—ইহা পশুখাদ্য ও জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

১। **তিসি বা মসিনা** (Linseed)।—ইহা প্রধানতঃ **আর্জেন্টিনা** ও **আ. যুক্তরাষ্ট্র** হইতে পাওয়া যায়। অন্য উৎপাদন-স্থান **মধ্য রুশিয়া, ভা.**

যুক্তরাষ্ট্র, ও ক্যানাডা। তিসির তেল আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়। সেজন্য **রং ও বার্ণিশের কাজে** ইহা ব্যবহৃত হয়। **ছাপার কালি, তেলা কাপড়** (oil cloth) ও লাইনোলিয়ম প্রভৃতি তৈয়ার করিতে তিসির তেল দরকার। লাইনোলিয়ম (Linoleum) তেলা কাপড়ের মত জল-নিরোধক। কিন্তু নানা রঙে চিত্রিত বলিয়া দেখিতে সুন্দর ও মূল্যবান্। বড় লোকের ঘরের মেঝের ইহা পাতা থাকে। গ্রেট্‌বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হলণ্ড ইহার প্রধান খরিদ্দার। ইহার খইল উৎকৃষ্ট **পশুখাদ্য** ও **জমির সার**। হলণ্ড, মিশর, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, আয়ারলণ্ড ও গ্রেট্‌বৃটেন এই খইলের **প্রধান ক্রেতা**।

পৃথিবীতে যত জমিতে তিসি জন্মে তাহার সিকি অংশ জমিতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে তিসি জন্মে। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে ১৫৮৭ সহস্র হেক্ট এয়র জমিতে তিসি জন্মে। উৎপন্ন তিসির পরিমাণ ৪৩২ সহস্র মেট্রিক টন। সর্বশ্রেষ্ঠ তিসি উৎপাদন-স্থান মধ্যপ্রদেশ। তৎপরে—উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট-মহারাষ্ট্র, বিহার, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি।



৬৮নং চিত্র।—পৃথিবীর প্রধান তৈলবীজ-অঞ্চল। কার্পাস, তিসি, জলপাই, চীনাবাদাম, তাল, সয়াবীন, নারিকেল।

তিসির বীজ—ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ইথিওপিয়া ও হলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে রপ্তানি হয়, এবং যুক্তরাজ্য, হলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জাপান ও ইতালী ইহার প্রধান ক্রেতা।

তিসির তৈল।—(১৯৬০) আর্জেন্টিনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, হলণ্ড, প. জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়ম হইতে রপ্তানি হয়; এবং প. জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, পোলণ্ড, ডেনমার্ক, মিশর ও ফিনলণ্ড ইহার **প্রধান** ক্রেতা।

২। **কার্পাস বীজ** (Cotton Seed)।—কার্পাস বীজ হইতে খোসা ছাড়াইয়া লইয়া পরে ঐ বীজ হইতে **তৈল** ও **খইল** প্রস্তুত হয়। ঐ খোসা ও খইল গোজাতীয় পশুর খাদ্য,—দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য ইহা গাভীকে খাইতে দেওয়া হয়। এইজন্য **গ্রেট্ ব্রিটেন, জাপান, প. জার্মানি, মিশর, ডেনমার্ক** প্রভৃতি দেশে ইহা প্রচুর **আমদানি করা হয়।** রপ্তানি-কারক দেশ—সুদান, নিকারাগুয়া, সিরিয়া, নাইজেরিয়া, চীন, উগাণ্ডা প্রভৃতি। আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের তূলাপ্রধান অঞ্চলে তূলাবীজের তৈল বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভ পাওয়া যায়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম দামে তূলা বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

কার্পাস তৈল অনেক স্থলে অলিভ তেলের (জলপাই তেলের) পরিবর্তে **সাবান, মাখন, বাতি** প্রস্তুত-কার্যে, খনির মধ্যে ব্যবহারের **দীপতৈল**-রূপে ও **স্টিয়ারিন** প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। **কাষ্ঠের ক্ষয়রোগ ও ইস্পাতের দৃঢ়তা-**প্রদানেও (tempering) ইহা ব্যবহৃত হয়।

তূলার বীজ উৎপাদনে **আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। অন্য স্থান**—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন, ব্রাজিল, মিশর, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, পেরু, উগাণ্ডা, সুদান প্রভৃতি তূলা-উৎপাদন-স্থান। যুক্তরাষ্ট্রে ইহা নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া রপ্তানি উৎপাদনের অনুরূপ নহে—অপেক্ষাকৃত কম।

৩। **তিল তৈল** (Sesamum or Sesame বা Gingelly or Jinjili)। ভারতে বহুদিন হইতে ইহা ধর্মকার্যে ও অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা তিন প্রকার,—কৃষ্ণ, শুভ্র ও লোহিত;—আকারেও দুই প্রকার—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। কৃষ্ণ তিল সর্বাপেক্ষা উত্তম,—বিশেষ স্নিগ্ধকর,—নির্যাসও ইহা হইতে বেশী বাহির হয়।

তিলের বিশেষ উৎপাদন-স্থান—চীন, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, সুদান ও মেক্সিকো, ব্রহ্মদেশ, তুরস্ক, পাকিস্তান, ভেনেজুয়েলা, পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্যান্য অনেক স্থলে অল্পবিস্তর তিল জন্মে। ইতালী, জাপান, হংকং, আলজিরিয়া ও মিশর **প্রধান খরিদ্দার। তিলের খইল**ও সিংহল, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশে **রপ্তানি** হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সব দেশেই তিল অল্পবিস্তর জন্মে। তবে তিলের জমি বেশী উত্তরপ্রদেশে। তৎপরে উল্লেখযোগ্য—রাজস্থান, অন্ধ্র, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা রাষ্ট্র। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে তিল উৎপন্ন হইয়াছিল—৩৯৮ স. মে. টন।

ব্যবহার।—প্রদীপ জ্বালাইতে, অলিভ তেলের সহিত ভেজাল মিশাইতে, ধাতব পদার্থের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণ করিতে, এবং অনেক স্থানে রন্ধনকার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করার ইহা প্রধান উপকরণ।

৪। **চীনা বাদাম** (Ground Nut)।—বঙ্গদেশে ইহার নাম চীনা বাদাম। হয়ত অতীত যুগে চীন হইতে বাঙ্গলায় ইহা প্রথম আসিয়াছিল তাই ইহার নাম হইয়াছিল চীনাবাদাম। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ইহাকে বলে "ম্যানিলা কড়াই"—আবার মাটির নীচে জন্মে বলিয়া ইহার অপর নাম "মাটি কড়াই" বা "মাট কড়াই" (ground nut)। ইংলণ্ডে ইহাকে সাধারণতঃ বলে "বাঁদরে কড়াই" (monkey nut)। আমেরিকায় ইহা "মটর কড়াই" (pea nut)।

চীনা বাদাম দুই প্রকারের হয়,—একপ্রকার বাদাম কাঁচা ও ভাজা খাওয়ার জন্য, অপর প্রকার বাদাম তৈল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহার চাষ পৃথিবীতে প্রধানতঃ **৩৭° উ. অক্ষরেখা হইতে ৩০° দ. অক্ষরেখা** পর্যন্ত স্থানে হইয়া থাকে।

উৎপাদন-স্থান।—ইহা সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে** ;—তাহার পর **চীনদেশে** ;—তাহার পরে দক্ষিণ **আ. যুক্তরাষ্ট্রে** ;—তাহার পরে পশ্চিম-আফ্রিকা অঞ্চলে (নাইজেরিয়া, সেনেগাল, মালি, নাইজার প্রভৃতি,—নাইজেরিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ) ; **অন্য উৎপাদন-স্থান**—ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা। দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মেলনেও কিছু বাদাম উৎপন্ন হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক জন্মে অন্ধ্র প্রদেশে (২৮%)। তৎপরে বোম্বাই (২৫%), মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে। দক্ষিণ ভারতই চীনা বাদামের প্রিয় স্থান। বাদাম উৎপাদনে শতকরা ৭৫ অংশ জমি এবং উৎপন্ন বাদামের শতকরা ৮৩ অংশ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়।

ব্যবসায়।—নাইজেরিয়া, সেনেগাল, নাইজার, দ. আফ্রিকা সম্মেলন, সুদান, গেম্বিয়া, পর্তুগীজ গিনি, ও ট্যাঙ্গানাইকা হইতে **চীনা বাদাম রপ্তানি** হয়।

প্রধান খরিদ্দার—ইউরোপের দেশগুলি—ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালী, সুইজর্লণ্ড, প. জার্মানি, বেলজিয়ম, ক্যানাডা। প্রধানতঃ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে এ-সকল দেশে বাদাম আমদানি হয়।

ব্যবহার।—খাদ্য অপেক্ষা তৈলের জন্য চীনা বাদামের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইউরোপে ইহা চর্বি, মাখন ও অলিভ তেলের পরিবর্তে খাদ্যতৈলরূপে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে মার্জারিন (margarine) নামক একপ্রকার মাখনজাতীয় স্নেহ পদার্থের সহিত, এবং আমাদের দেশে ঘৃতের সহিত, বাদাম তৈল ভেজাল দেওয়া থাকে। সাবান প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। তন্তুজাত বস্তুতে রং ধরাইবার জন্য যে "টার্কি রেড্ অয়েল" ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে বাদাম তৈল লাগে। এই "টার্কি রেড অয়েল" দ্বারা প্রস্তুত সাবান দিয়া তন্তুজাত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করা হয়।

উৎপাদন। চীনা বাদামের উৎপাদন ১৯৬০ সালে **পৃথিবীতে** ১৩,৯০০ স. মে. ট.। ১৯৫৯-৬০ সালে ভারত ৬১৯৪ হেক্টএয়র জমিতে চীনা বাদামের চাষ করে। চীনা বাদাম উৎপন্ন হয় ৩৯৮ স. মে. টন।

৫। **জলপাই তৈল** (Olive Oil)।—অলিভ তেলকে সাধারণতঃ জলপাই তেল বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জলপাইর সহিত ইহার পার্থক্য আছে। সুতরাং ইহাকে জলপাই না বলিয়া "অলিভ" বলাই ভাল।

উপযোগী অবস্থা।—অলিভ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশের ফল এবং অলিভের শতকরা ৯০ ভাগ জন্মে ভূমধ্যসাগরতীরস্থ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর স্থানে।

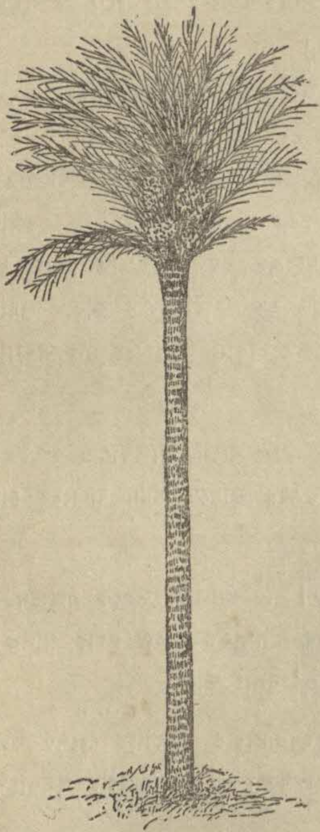
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত তেলই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে রপ্তানি করা হয়।

ভূমধ্যসাগরতীরে অলিভ সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে **স্পেন দেশের দক্ষিণ-পূর্বে।** তাহার পরের স্থান **ইতালীর**, এবং **তৃতীয় স্থান—গ্রীসের**; গ্রীসে মাখনের পরিবর্তে অলিভ তৈল ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গ্রীসে ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশী।

অন্য উৎপাদন-স্থান।—ফ্রান্স, তুরস্ক, তিউনিশ, পর্তুগাল, আলজিরিয়া, সিরিয়া।

ব্যবহার।—অলিভ হইতে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—**তৈল**। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎকৃষ্ট অলিভ তৈল মাখনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার চাহিদা

অত্যন্ত বেশী ত বটেই, তাছাড়া নানা বহু-ব্যবহৃত শিল্পদ্রব্যের ইহা প্রধান উপাদান। অপকৃষ্ট তৈল আলো জ্বালাইতে, গায়ে মাখিতে, এবং সাবান ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, ব্যবহৃত হয়। বিলাতী খানা খাওয়ার সময় প্রধানতঃ অলিভ তৈল কাঁচা শাকসব্জির সহিত "স্যালাড" (salad) তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়। **সর্বোৎকৃষ্ট অলিভ তৈল** পাওয়া যায়—দক্ষিণ ফ্রান্সে ও ইতালী দেশে।



৬৯নং চিত্র—তৈলতাল।

সর্বপ্রধান অলিভ তৈল **রপ্তানিকারক** দেশ—স্পেন, তাহার পরে টিউনিশিয়া, তৎপরে ইতালী ও গ্রীস। সর্বপ্রধান **আমদানিকারক** দেশ—ইতালী, তৎপরে আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

৬। **তৈলতাল** (Oil Palm)—আফ্রিকার বৃষ্টিবহুল বিষুবরৈখিক বন-ভূমিতে বন্য তৈলতাল গাছ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। **মধ্য ও মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকায়** এই গাছের বন আছে। এক্ষণে পৃথিবীর অন্য অংশে মানুষের চেষ্টায় এই গাছ জন্মানো হইতেছে বটে, কিন্তু তৈলতাল-অঞ্চল বলিলে আফ্রিকার এই মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলই মনে পড়ে।

এই তালগাছ কতকটা আমাদের দেশের তালগাছের মত,—শিরে পত্রগুচ্ছ ও তালের কাঁদি। প্রত্যেক কাঁদিতে ৫-৬ শত বা তদধিক ফল হয়। এই ফল জলে সিদ্ধ করিয়া চটকাইলে ফলের গায়ের শাঁস (pulp) হইতে তৈল বাহির হইয়া জলে ভাসিতে থাকে। ইহার বীচি কলে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের শাঁস হইতেও তৈল নিষ্কাশিত করা হয়। বীচির শাঁসের তৈল ফলের শাঁসের তৈল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বীচির তৈল হইতে মার্জারিণ (margarine) প্রভৃতি কৃত্রিম মাখন-জাতীয় খাদ্যদ্রব্য এবং অপকৃষ্ট তৈল হইতে সাবান, বাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং মালয় ফেডা. দেশে রবারের ন্যায় তৈলতালের আবাদী চাষ হইতেছে। আফ্রিকার কঙ্গো দেশেও আবাদী চাষ হইতেছে।

উৎপাদন—তালতৈল উৎপন্ন হয় পৃথিবীতে (১৯৫৯-৬০ সালে) ১১৭০ স. মে. ট.। তন্মধ্যে নাইজেরিয়া প্রথম (৪২৩ স. মে. ট.)। তৎপরে কঙ্গো, (লিওপোল্ডভিল), ইন্দোনেশিয়া, মালয় ফেডা., হস্তিদন্ত উপকূল।

তালশাঁস উৎপন্ন হয়—পৃথিবীতে (১৯৫৯-৬০ সালে) ১০৮০ স. মে. ট.। তন্মধ্যে নাইজেরিয়া প্রথম (৪২৮), কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল ১৫০), সিয়েরা লিওন (৫৬), ইন্দোনেশিয়া (৩৩), মালয় ফেডা. (২৪), ডাহোমে (২৩) ইত্যাদি।

বাণিজ্য—আফ্রিকায় নাইজেরিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ তালশাঁস রপ্তানি-কারক স্থান। ডাহোমে, সিয়েরা লিওন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় ফেডা. কঙ্গো (লিও পোল্ডভিল) অন্য রপ্তানি স্থান।

তালতৈল রপ্তানিকারক প্রধান স্থান—নাইজেরিয়া। তৎপরে ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল), মালয় ফেডা. প্রভৃতি।

মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকা বিশেষতঃ নাইজিরিয়া, কঙ্গো ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও মালয়-সিঙ্গাপুর হইতে **তাল তৈল** অনেকাংশে লিভারপুল ও ঐ অঞ্চলের অন্য ছোট-ছোট বন্দরে প্রেরিত হয়। পরে সেখান হইতে সাবান, বাতি ও মার্জারিনের কারখানায় চলিয়া যায়। দক্ষিণ ওয়েল্‌সের সোয়ান্‌সি অঞ্চলের টিনের কারখানায় অনেক তৈল যায়। পাতলা লোহার চাদরে টিন লাগাইবার পূর্বে তালতৈলের প্রলেপ দিতে হয়। হলণ্ড, প. জার্মানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স ও জাপানে তালতৈল **আমদানি** হয়।

৭। **সয়াবীন** (Soya Bean বা Soy Bean)—কলাই প্রভৃতি যে-সকল শস্যের শিমের ভিতর দানা হয়, তাহাকে ইংরাজীতে বলে বীন (bean)। সয়াবীন কলাইয়ের মত শস্য ;—ইহার গাছকে বলে "সয়াসোজা" (soia soja), এবং গুঁটিকে বলে "সয়াবীন"। কিন্তু শিম-জ্ঞাপক ইংরাজী "বীন" শব্দ ইহার সহিত এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর ছাড়ানো যায় না।

সয়াবীন **এশিয়ার পূর্বভাগের শস্য ;—চীন ইহার প্রধান উৎপাদন-স্থান** ছিল। কিন্তু এক্ষণে আ. যুক্তরাষ্ট্র। ইহা ৩।৪ ফিট্ লম্বা হয়। এক্ষণে অর্ধেকের বেশী (১৯৫৯-৬০ সালে ৫৬%) সয়াবীন আ. যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে। ৩৮% চীনে। এক্ষণে ইহা অর্থপ্রসূ শস্য। **মুকদেনে** সয়াবীন হইতে তৈল বাহির করার কারখানা আছে। **জাপানেও** ইহা জন্মে। এক্ষণে ইউরোপীয় রুশিয়ার **ইউক্রেন** প্রদেশে সয়াবীন উৎপন্ন হয়।

১৯৬০-৬১ সালে সয়াবীন জন্মে **পৃথিবী**-তে ২৭,৩০০ স. মে. ট.। তন্মধ্যে আ. যুক্তরাষ্ট্র—১৫,১১৩, চীন—১০,১৬০, ইন্দোনেশিয়া—৪৩৭, জাপান—৪১৮, ব্রাজিল—২৪৬ স. মে. টন।

ব্যবহার—বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার ময়দা ও তেল চীনারা আহার্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য গমে যতটা প্রতিদ (Protin) আছে সয়াবীনে তাহার তিনগুণ আছে। সয়াবীনের দানা গুঁড়া করিয়া **ময়দা** করা হয় এবং ইহা হইতে চাপিয়া **তেল** বাহির করা হয়। ইহার তেল হইতে **সাবান, কৃত্রিম মাখন, ছাপিবার কালি, বার্ণিশ, গ্লিসিরিন, প্লাষ্টিক** (Plastic) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার **দুগ্ধ** প্রস্তুত হয়। উহা হইতে দধি ও পনীর প্রভৃতি সবই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার খইল গবাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য ও জমির উৎকৃষ্ট সার। ইহার কাঁচা গাছও গবাদির খাদ্য।

আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রধান সয়াবীন রপ্তানিকারক দেশ। চীন ও মাঞ্চুরিয়া হইতে সয়াবীন, সয়াবীন তৈল, সয়াবীন খইল—জাপান, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হয়। ডাইরেন ও ভ্লাডিভস্টক প্রধান বন্দর। প্রধান সয়াবীন তৈল **রপ্তানিকারক** দেশ—আ. যুক্তরাষ্ট্র, হলণ্ড, এবং **আমদানিকারক** দেশ—প. জার্মানি, হলণ্ড, স্পেন, পোলণ্ড, মিশর, মরক্কো প্রভৃতি।

৮। **নারিকেল** (Cocoanut)—তালজাতীয় নারিকেল গাছ প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লবণাক্ত সমুদ্রতীরের বালুকাময় মাটিতে জন্মে। যেখানে বায়ুর আর্দ্রতা বেশী,—বৃষ্টিপাত মোটামুটি ৫০ ই.—সেখানেই নারিকেলের ভাল ফসল হয়। কিন্তু অনুকূল অবস্থায় ইহা সমুদ্রতীর হইতে বহুদূরেও জন্মিয়া থাকে। তবে লবণ পাইলে গাছ ভালই জন্মে।

সমুদ্রতীরেই নারিকেল গাছ বেশী জন্মে। সুতরাং সমুদ্রের জলে ভাসিতে-ভাসিতে উহা বহু দেশে নীত হয় এবং অনুকূল অবস্থা পাইলে নূতন দেশে বাসস্থান করিয়া লয়।

ইহার জন্য চাষের বিশেষ দরকার হয় না,—ফলের কলি বাহির হইলে সেই ফল পুঁতিয়া দিলেই গাছ হয়।

উৎপাদন-স্থান—পৃথিবীতে খুব বেশী নারিকেল গাছ নাই। সৌভাগ্যবান্ **দক্ষিণ-পূর্ব** এশিয়ায় নারিকেল সর্বাপেক্ষা বেশী জন্মে। **ফিলিপাইন**, যবদ্বীপ প্রভৃতি **ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ভারত, সিংহল, আন্দামান** ও **নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ** ও **লাক্ষাদ্বীপ** পৃথিবীর যে-**অংশে** অবস্থিত—তাহা যেমন

নারিকেল জন্মিবার অনুকূল, তেমনি এই অঞ্চলে শ্রমমূল্যও কম। সেজন্য পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে কেহ ইহার সহিত নারিকেল সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

নারিকেল-উৎপাদনের অন্য স্থান—নিউগিনি, মোজাম্বিক, ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্জিবর প্রভৃতি।

বাণিজ্য।—পৃথিবীতে নারিকেল-সংক্রান্ত বহু প্রকারের বাণিজ্য চলে,—**নারিকেলের আবরণ, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস ও তৈল** প্রভৃতি। এগুলি রপ্তানি করা হয়—বলাবাহুল্য—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, তাহার পরে ইউরোপের •দেশগুলি। নারিকেল ও শাঁসের $\frac{৩}{৫}$ অংশ বাণিজ্যক্ষেত্রে আসে। ফিলিপাইনের শাঁস প্রধানতঃ যায় আ. যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ইন্দোনেশিয়ার শাঁস যায় ইউরোপে। নারিকেলের শাঁসের ও তেলের এক-তৃতীয়াংশ আসে ফিলিপাইন, এক-তৃতীয়াংশ ইন্দোনেশিয়া ও অপর তৃতীয়াংশ আসে সিংহল, মালয় ও অন্য-অন্য দ্বীপ হইতে। তৈল উৎপাদনে **ফিলিপাইন সর্বশ্রেষ্ঠ।** ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, সুইডেন, সুইজর্লণ্ড, হলণ্ড ও ইংলণ্ডের কারখানায় নারিকেল তেল হইতে সাবান ও মার্জারিন প্রস্তুত হয়।

ব্যবহার। নারিকেলের প্রতি অঙ্গই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার গুঁড়ি দিয়া ঘরের খুঁটি হইতে পারে। ইহার পাতা আচ্ছাদনের কাজ করে। ইহার জল সুস্বাদু পানীয়। ইহার শাঁস সুস্বাদু খাদ্য। ইহার শুষ্ক শাঁস (Copra) একটি বিশেষ পণ্যদ্রব্য। ইহার শাঁস পিষিলে তৈল প্রস্তুত হয়। সেই তেল হইতে সাবান, বাতি, গ্লিসারিন, ও মার্জারিন নামক কৃত্রিম মাখন তৈয়ার হয়। আবার, এই শাঁস নিংড়াইয়া দুগ্ধ বাহির হয়—এই দুগ্ধ সুমিষ্ট খাদ্য, এবং ইহার দ্বারা নানা খাদ্য প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ফলের খোলা দিয়া হুঁকার খোল, চামচ, লবণ রাখিবার পাত্র, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। ফলের বহিরাবরণ ছোবড়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করা যায়। এই আঁশ দিয়া দড়ি, ম্যাটিং, প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়, এবং ইহা গদি ভরিবার কার্যেও ব্যবহৃত হয়। তৈল বাহির করার পর যে-খইল অবশিষ্ট থাকে, তাহা সার ও পশুখাদ্য হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৯। এরণ্ড বা রেড়ি (Castor Oil)—বাঙ্গালা দেশে এরণ্ড ভেরেণ্ডা নামে পরিচিত। সেখানে ইহার চাষ হয় না,—এখানে-সেখানে দু'একটি দেখিতে পাওয়া যায়।

এরণ্ড বৃক্ষের পাতা গুঁটিপোকায় খায়। সেজন্য এই গাছে রেশমের গুঁটি পালন করা হয়।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে **ব্রাজিল ও ভারতযুক্তরাষ্ট্র** ইহার প্রধান প্রাপ্তিস্থান। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর এরণ্ডের অর্ধেক (১৯৫৫-৫৬ সালে ১২৬ টন) জন্মে,—ব্রাজিল দেশে; এবং অপর অর্ধেক জন্মে,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে,—অন্ধ্র ও মহীশূরে চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশ অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান। ভারতে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৭৭ হেক্টএয়র জমিতে ১১০ স. মে. টন এরণ্ড বীজ জন্মে। আফ্রিকায়,—এঙ্গোলা, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক ;—ইউরোপে—ইতালী ;—ও আমেরিকায়,—মেক্সিকো দেশে অল্প পাওয়া যায়।

এরণ্ড হইতে **প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য ইহার তেল।** এই তেল জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়,—ইহা চক্ষুস্নিগ্ধকর,—ইহা হইতে মাখিবার জন্য সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হয়,—কারণ ইহা মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে। মৃদু জোলাপ দিবার জন্য, যন্ত্রপাতির ক্ষয় নিবারণার্থ উহার গায়ে লাগাইতে, বাতি ও সাবান প্রভৃতি তৈয়ার করিতে, "টার্কি রেড্ অয়েল" তৈয়ারী করিতে রেড়ির তেল উপযোগী। ইহা অত্যন্ত শীতেও জমে না, তাই বিমানপোতের বহু উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের শীতপ্রধান অংশে উঠিতে হয় বলিয়া ইহাতে বিশুদ্ধ রেড়ির তৈল ব্যবহৃত হয়। রেড়ির খইল জমির সার ও পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

১০। সর্ষপ (Rape, Mustard)।—সরিষা নানা প্রকারের হয়। তন্মধ্যে দুই প্রকারের সর্ষপই প্রধান—শ্বেত সরিষা ও লাল সরিষা।

সরিষা কুয়াসা পাইলে ভাল জন্মে। ভারত, চীন, পাকিস্তান, ক্যানাডা, জাপান দেশে প্রচুর সরিষা জন্মে। ভারতই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে উত্তর-প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক সরিষা জন্মে; তাহার পরে পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাব।

ইহা হইতে তৈল ও খইল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই তৈল স্নান ও রন্ধনার্থ ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে শ্বেত সর্ষপের গুঁড়া রন্ধনের একটি প্রধান মশলা।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সরিষার বীজের প্রধান ক্রেতা—জাপান। অন্য খরিদ্দার—ইতালী, ফ্রান্স, আ. যুক্তরাষ্ট্র, হলণ্ড।

১১। জীরা (Cummin)।—জীরা প্রধানতঃ রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল সুরাসার-মিশ্রিত পানীয়ের সহিত মিশাইয়া তাহা সুগন্ধীকৃত করা হয়। ঔষধে ইহার ফল, বীজ ও তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহা বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হইতে সিংহল, মালয় ফেডারেশন ও পূর্ব আফ্রিকায় রপ্তানি করা হয়।

তৈলবীজের ব্যবহার।—নিম্নের তালিকা* হইতে দেখা যাইবে বৎসরে পৃথিবীতে কোন্ তৈলবীজের ব্যবহার বেশী।

তৈলবীজ	প্রতি বৎসরে রপ্তানি-অঙ্ক (স. মে, ট.)			
	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
চীনাবাদাম	১৫৩০	১৩৯৯	১২৭২	১০৬০
নারিকেলের শাঁস	১৮০৪	১৪৯৪	১৩৫৫	১৫৬৯
তাল শাঁস	৭১৩	৭৯৪	৭৬৬	৭৩৮
কার্পাস বীজ	৪১৫	৩১৩	৩৯২	২৯৪
সয়াবীন	৩৪৭৮	৩৩৭৭	৪৮১৭	৫০৯০
তিল	১৩৫	১০৫	১২৭	১৭৫
তিসি	৩০৪	২৪২	২৮০	২৪৬
রেড়ী	১০১	৮৭	৯৫	৯৮
অলিভ	১৫৪	১১০	১৫৬	২১৫

* F. A. O. Trade Yearbook.

QUESTIONS

1. Describe the conditions suitable for the cultivation of cotton. Into how many classes can cotton be divided ? Name the principal producers of cotton and indicate the nature of world trade in cotton. (C. U. '40, '42, '46, '48, '50, '51).

2. Who are the principal buyers of Indian cotton ? What are the chief sources of supply of cotton to the Lancashire Cotton Industry ? Do you think that the British Empire can be self-supporting in the commodity ? (Cal. B. Com. 1934).

3. Into how many classes is Cotton divided ? Give a short account of the chief sources of supply of the principal varieties of Cotton. (Cal. Inter. 1936).

4. What are the important Cotton producing countries of the world ? Which of them has a surplus for export and why ? (Cal. B. Com. 1929, '34, '37).

5. What are the important countries of the world exporting Cotton in considerable quantities ? Describe fully the condition of production and the quantity of Cotton produced in each. (Cal. Inter. 1932).

6. Examine the importance of any four of the following crops in India : (a) cotton, (b) jute, (c) linseed, (d) ground nut, (e) rice, and (f) wheat.

7. What are the three important countries of the world exporting cotton in considerable quantities ? Describe fully the condition of production and the quality of cotton produced in each. (Cal. Inter. 1932).

8. What are the necessary conditions for the production of (a) rubber, (b) beet ? Name the principal countries in which they are produced.

9. Describe the changes both in magnitude and direction in the export of raw jute brought about by the last Great War. What do you think of the prospects of jute being cultivated in other lands, or of substitutes being used in the place ? (Cal. B. Com. 1926).

10. The allied countries are apparently producing enough synthetic rubber to meet the deficiency caused by the loss of supply from the Japanese-occupied regions. What in your opinion will be the position of the industry when normal times return ? (Cal. B. Com. 1944).

11. Describe conditions suitable for the cultivation of jute. Name the chief producers, exporters. and importers of jute. Do you know of any of the substitute for jute ? (Cal. Inter. '48. '52, B. Com. 1953).

12. Discuss the areas of production and trade in silk. Where is it produced ? (Cal. B. Com. 1953).

13. Describe the condition of growth and the areas of production of rubber. Indicate the nature of world-trade in rubber. (Cal. Inter. 1943, '45, '47, '50).

14. Write short notes on the following oilseeds ; (1) linseed, (2) cotton seed, (3) sesamum, (4) ground nut, (5) oil palm, (6) soya bean, (7) cocoanut.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন ও বনজ-পণ্য

(Forest aud Forest Products)

বন।—পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ বনে আবৃত ছিল। কিন্তু এক্ষণে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বন পরিষ্কৃত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখনও পৃথিবীর ⅓ অংশ বনাবৃত। মহাদেশগুলিতে বনের পরিমাণ এইরূপ ;—

মহাদেশ	বনের পরিমাণ হেক্ট এয়র*
এশিয়া	৪৩৯০০০
দ. আমেরিকা	৯০৮০০০
উ. ও মধ্য আমেরিকা	৮২৪০০০
আফ্রিকা	৭২৭০০০
ইউরোপ	১৩৮০০০
সো. রুশিয়া	৮৮০৩১৭
ওশিয়ানিয়া	৫৩০০০
পৃথিবী	৪০৪৬০০০

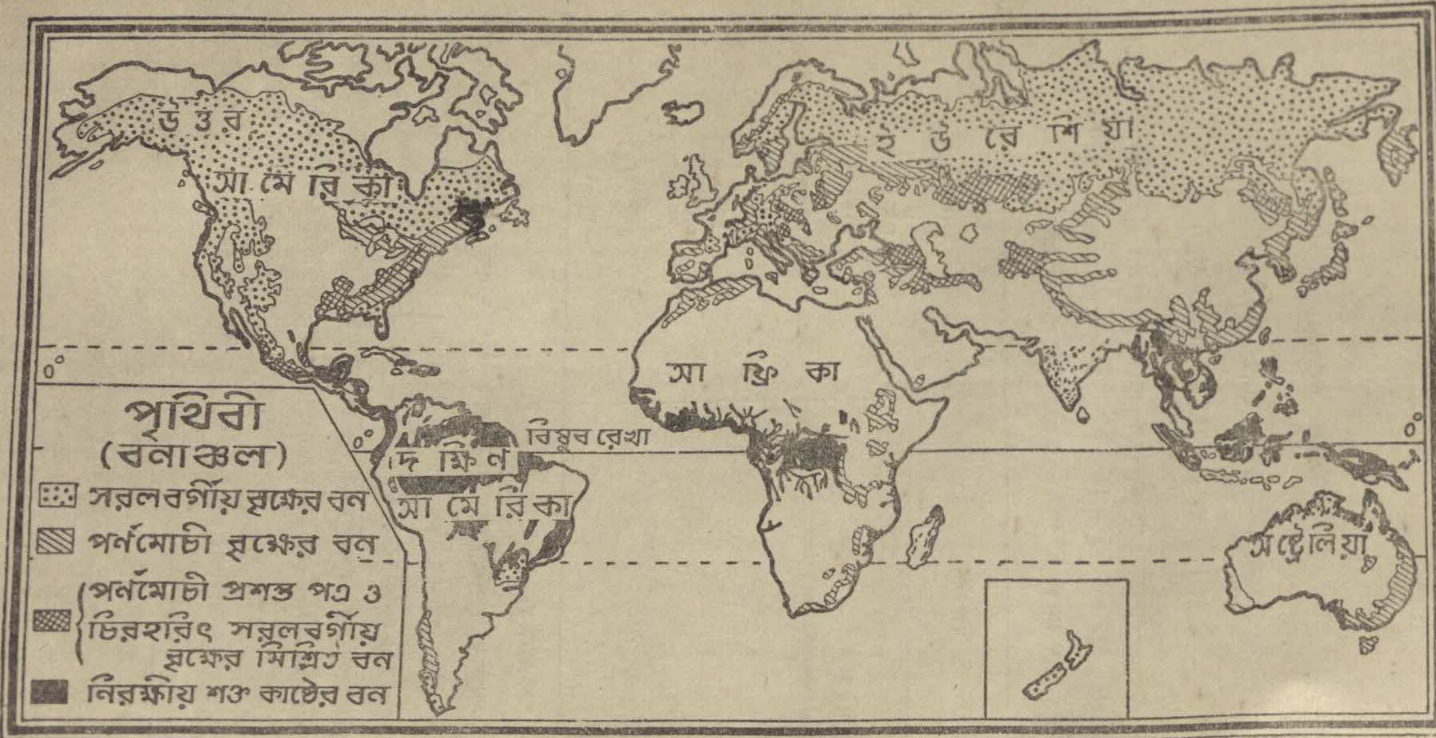
* F. A. O. Yearbook.

বনের শ্রেণীভেদ।—জলবায়ু এবং ভূমির উর্বরতা ও আর্দ্রতাভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের বন জন্মে। এই সকল বনের গাছও ভিন্ন প্রকারের হয়। কোন বনের গাছ সরল, দীর্ঘ, চিরহরিৎ ;—আবার কোথাও বা গাছগুলি বিপুলকায়, প্রশস্তপত্র-বিশিষ্ট ও পর্ণমোচী। কোন বনে হয়ত আলোক-প্রবেশের বাধা নাই, কিন্তু কোন বনের গাছ এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। কোন বনের তলদেশ হয়ত পরিষ্কার, গুল্মবিরহিত, আবার কোনটি বা আগাছার জন্য দুষ্প্রবেশ্য। এই সকল বনের মধ্যে তিন প্রকার বন প্রধান। যেমন,—

(১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন,

(২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বন,

(৩) উষ্ণ অঞ্চলের নিরক্ষীয় বন.



৭০নং চিত্র।—পৃথিবীর বন।

—এই সকল বনের বিবরণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এখানেও সংক্ষেপে কোন-কোন অংশের পুনরুল্লেখ করা হইতেছে।

বিভিন্ন প্রকার বনের অবস্থিতি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—

(১) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন** (১০নং চিত্র)।—এই বন ইউরেশিয়া (৯ নং চিত্র) ও উত্তর আমেরিকায় (৮ নং চিত্র) তুন্দ্রাভূমির নিম্নেই অবস্থিত। **উত্তর আমেরিকায়** ইহা **সমগ্র উত্তরভাগে**—পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং তুন্দ্রাভূমির দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে প্রায় ৪৫° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। **পূর্বভাগে** এই বনভূমি দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নব ইংলণ্ড স্টেটগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। অ্যাপালাশিয়ান পর্বতের উচ্চ অংশে অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান জলবায়ুর স্থানে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। কিন্তু এই পর্বতের নিম্ন অংশে প্রশস্তপত্র বৃক্ষ জন্মে। ইহা পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে উপকূল-পর্বতমালা (Coast Ranges), ক্যাস্‌কেডস্ (Cascades), সিয়েরা নেভাডাস্ (Sierra Nevadas) ও রকি পর্বতমালার উপর দিয়া দক্ষিণে ৩৫° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার সরলবর্গীয় পাইন-জাতীয় গাছ উত্তরের গাছ হইতে বিভিন্ন। এখানে সুবৃহৎ ডগলস্ ফার এবং শ্বেত পাইন (White pine), রক্ত পাইন (Red wood) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।

উত্তর আমেরিকার **দক্ষিণভাগে** পূর্ব টেকসাস হইতে ভার্জিনিয়া পর্যন্তও সরলবর্গীয় পাইন বৃক্ষ জন্মে। এখানকার জমি বালুকাময়, বৃষ্টিপাত বেশী, বাষ্পী-ভবনও বেশী। এখানে জমি বালুকাময় বলিয়া জল শুকাইয়া যায়। সেজন্য পাইন জন্মে। কিন্তু এই পাইন উত্তরের পাইন অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন।

ইউরেশিয়া মহাদেশেও তুন্দ্রাভূমির দক্ষিণ হইতে অরণ্য দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত। এখানেও এশিয়ার পূর্ব অংশে ও মধ্যে ইউরোপের পর্বতের উপর অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে সরলবর্গীয় বৃক্ষ জন্মে। (৪৫ পৃ. দেখ)

দক্ষিণ গোলার্ধে ৩০° দ. অক্ষরেখার দক্ষিণেও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রতীরে সরলবর্গীয় ও প্রশস্তপত্র বৃক্ষের মিশ্রিত বন আছে। কিন্তু এই সকল স্থান সঙ্কীর্ণ, সেজন্য বনভূমিও সঙ্কীর্ণ।

(প্রকৃতপক্ষে তুন্দ্রাভূমির দক্ষিণে যে-বনভূমি আছে, তাহা **সুবিস্তৃত** সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন। ২৫° উ. অক্ষরেখা হইতে ৬৫° উ. অক্ষরেখার মধ্যে পৃথিবীর সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বনের $\frac{4}{5}$ অংশ অবস্থিত।)

এই বনে যে-সকল গাছ আছে তাহাদের মধ্যে পাইন গাছই প্রধান। অন্য গাছ ফার, হেমলক, স্প্রাস, সিডার, সাইপ্রেস, রক্ত কাষ্ঠ, লার্চ, ট্যামারাক প্রভৃতি। এই সকল গাছই নরম কাষ্ঠের গাছ। এই বনে এক-এক রকম গাছ একই স্থানে দলবদ্ধ হইয়া থাকে।

(২) **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের বন।**—এইরূপ বন গ্রেট বৃটেন সহ উত্তর-পশ্চিম **ইউরোপে** সুবিস্তৃতভাবে ছিল। কিন্তু এক্ষণে এই অঞ্চলে লোকবৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এই বন পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি **উত্তর আমেরিকার** পূর্ব ভাগে অ্যাপালাশিয়ান পর্বতের পাদদেশে প্রশস্তপত্র বৃক্ষের বন আছে। সেখানে সেণ্ট লরেন্স নদীর পার্শ্বে ও নব ইংলণ্ড রাষ্ট্রগুলিতে এই বন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বনে শৈত্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রশস্তপত্র ও পর্ণমোচী—দুই :প্রকার বৃক্ষই আছে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগেও স্থানে-স্থানে এইরূপ বন আছে।

পূর্ব এশিয়ায় চীনের উত্তর-পূর্ব (মাঞ্চুরিয়া) অঞ্চলেও এইরূপ মিশ্রিত বন আছে।

এই সকল বনে ওক, মেপল, বীচ, বার্চ, পপলার, হিকোরি, চেস্টনাট, ওয়ালনাট প্রভৃতি শক্ত কাঠের বৃক্ষ আছে।

(৩) **উষ্ণ অঞ্চলের নিরক্ষীয় বন।**—(৮২ পৃঃ এবং ২৭ ও ২৮নং চিত্র দেখ) পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরৈখিক অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য (১) **দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায়,** (২) **আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায়** এবং (৩) **এশিয়ার পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে** এই বন জন্মে। সেগুন, মেহগনি, আবলুস, গোলাপকাষ্ঠ (rosewood), রবার প্রভৃতি এই বনের বৃক্ষ। এখানকার গাছের কাষ্ঠ এরূপ শক্ত যে ভাল কাষ্ঠদ্রব্য প্রস্তুত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। এখানে বহুপ্রকার গাছ জন্মে। কিন্তু সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনের ন্যায় একস্থানে একই প্রকার বৃক্ষ দলবদ্ধ থাকে না,—চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। তাই এখানকার কোন অল্পপরিসর স্থানের মধ্যেই বহুপ্রকার গাছ পাওয়া যায়। সেইজন্য গাছ খুঁজিয়া-খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় এবং গাছ কাটিবার সময় যেখানে-যেখানে আবশ্যকীয় মূল্যবান গাছ আছে, পথ করিয়া আগে সেই সকল স্থান যোগ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সে-পথ অল্প দিনের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়।

আমাজন ও কঙ্গো অঞ্চলের বন অত্যন্ত ঘন এবং গাছের পত্রাদি এরূপ ঘনসন্নিবদ্ধ হইয়া আচ্ছাদনের সৃষ্টি করে যে, তাহার ভিতর দিয়া সূর্যের আলোক

প্রবেশ করিতে পারে না। এখানকার গাছ অতি দীর্ঘ;—এবং এরূপ লতাপাতা-বেষ্টিত যে গাছ কাটিলেও, গাছ মাটিতে পড়ে না। মাটিতে ফেলিতেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় (২৮ নং চিত্র)।

বনজ পণ্য।—শীতোষ্ণ অঞ্চলে ও সন্নিহিত স্থানে,—কাষ্ঠই প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয় বৃক্ষ হইতে **রজন, তার্পিন তৈল, আলকাতরা** ও **কাষ্ঠ সুরাসার** পাওয়া যায়। উষ্ণশীতোষ্ণ অঞ্চলে **ওক, হেমলক** ও **চেস্টনাট গাছের ছাল**—চামড়া রং করিতে ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে ব্যবহৃত হয়। আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে দেশে এক রকম গাছ আছে তাহার নাম **কুঠারভাঙ্গা** (Quebra-cho ;—Quebrar=ভাঙ্গা, hacha=কুঠার)। এই গাছ অতি ভারী ও শক্ত—কাটিতে গেলে কুঠার ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার বড়-বড় ডাল ছোট-ছোট করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ বাহির করিয়া তাহা দিয়া চর্মসংস্কার হয়। স্পেন ও পর্তুগাল অঞ্চলে বোতলের **ছিপি** বা গুঁজি করিবার জন্য গুঁজিগাছ (Cork Oak) হইতে গুঁজি পাওয়া যায়।

নিরক্ষীয় ও সন্নিহিত বন হইতে **গরাণ গাছের ছাল,** দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর, কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে **গাছের ছালের আঁশ, হরীতকী, তাল, নারিকেল** প্রভৃতি ফল, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বন হইতে **সার্সাপেরিলা, কুইনাইন** প্রভৃতি ঔষধ, **রবার** গাছের রস, **কর্পূর, লাক্ষা, মোম, মধু** ও **ডামর** প্রভৃতি পাওয়া যায়। নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপে কৌরি প্রভৃতি গাছ হইতে যে গঁদ মাটিতে পড়িয়া বহুকাল মাটি চাপা পড়িয়া শিলাবৎ হইয়া যায়, তাহাকেই বলে ডামর (Copal)।

বনের উপকারিতা।—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন মানুষের অনেক উপকার করে। যেমন,—(১) ইহা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। (২) গৃহনির্মাণে ও গৃহের নানারূপ আসবাব প্রস্তুত করিতে, শস্যক্ষেত্রাদি রক্ষা করার জন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে, যানবাহনের সম্পূর্ণ বা অংশতঃ নির্মাণ কার্যে এবং এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে বনের কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। (৩) বনের ফল সংগ্রহ করিয়া, ও পশুহনন করিয়া মানুষ এখনও খাদ্য সংগ্রহ করে। (৪) শিল্পদ্রব্য সৃষ্টি করিতে অনেক উপাদান বন হইতে পাওয়া যায়। যেমন, কাগজ তৈয়ারির জন্য কাষ্ঠমণ্ড, কৃত্রিম রেশম বস্ত্র নির্মাণ করিবার জন্য কাঠের আঁশ বন হইতে পাওয়া যায়।

অন্যতঃ (৫) বন থাকিলে শিকড়ের বন্ধনে মাটি আবদ্ধ থাকে, বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতে পারে না। (৬) বন থাকিলে সন্নিহিত নদীতে সহজে জলবৃদ্ধি

হেতু বন্যা হইতে পারে না। কারণ, গাছের শিকড়ে প্রতিহত হইয়া বৃষ্টির জল দ্রুত নদীতে পড়িতে পারে না—নদীর জল চলিয়া যাইবার অবসর পায়। (৭) বনাচ্ছন্ন ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বৃষ্টির জলে সারমাটি ধুইয়া আসিয়া বনমধ্যস্থ বৃক্ষের তলায় বাধিয়া যায়। তাছাড়া গাছের পাতা পড়িয়া পচিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। (৮) দেশের জলবায়ুর উপরও বনের বিশেষ প্রভাব পড়ে। বৃষ্টিগর্ভ বায়ুপথে বন থাকিলে উহাতে বায়ু প্রতিহত হয় ও তজ্জন্য নিকটবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাত হয়। (৯) ঝড়ের পথে বন থাকিলে ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়। ইহাতে বনের বিপরীত পার্শ্বের দেশ ধ্বংস হইতে অব্যাহতি পায়।

(১) কাষ্ঠশিল্প (Lumber* Industry)।—নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চলে নরম ও শক্ত কাঠের বনে কাষ্ঠের ব্যবসায়।—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নরম কাষ্ঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষের, শক্তকাঠের প্রশস্তপত্র বৃক্ষের ও মিশ্রিত বনে নরম ও শক্ত কাষ্ঠের† বৃক্ষের বন হইতে কাষ্ঠের ব্যবসায় চলে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সরলবর্গীয় নরম কাঠের† বনাঞ্চলই বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তর ভাগের বনই কাষ্ঠের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলের কাষ্ঠ-সম্পদ্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

উত্তর আমেরিকা।—ক্যানাডা।—ক্যানাডার ১৩২০ সহস্র বর্গ মা. (ক্যানাডার ৪০%) অংশ বনাবৃত। এই বন পূর্ব-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ৩০০০ মাইল, ও উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ মা. বিস্তৃত। এই বহুবিস্তৃত বনে মোটামুটি পাইনজাতীয় নরম কাঠ, এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নরম ও শক্ত কাঠের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত এই মিশ্রিত বন সম্প্রসারিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগের বনে কাষ্ঠসংগ্রহের কার্য বিশেষভাবে প্রচলিত নহে। ঐ অঞ্চলের কাঠও ভাল নহে। দক্ষিণের কাঠ ভাল, এবং দক্ষিণেই কাঠ সংগ্রহ বিশেষভাবে চলে। কাঠ সংগ্রহের জন্য এইসকল অঞ্চলে কোথাও স্থায়িভাবে, এবং কোথাও অস্থায়িভাবে কাঠুরিয়াগণ তাঁবু ফেলিয়া বা কাঠের ঘর করিয়া বাস করে। শীতকালে এই অঞ্চলে মাটির উপর বরফ জমিয়া গেলে কাঠুরিয়াগণ তখনই

* কাঠের গুঁড়িকে বলে log ;—log হইতে ফাড়িয়া, চিরিয়া, কাটিয়া যে-কাঠ পাওয়া যায়, তাহাকে ক্যানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে বলে lumber, ইংলণ্ডে বলে timber। বনে গাছ কাটা, গাছ কাটিয়া গুঁড়ি বাহির করা, এবং গুড়ি কাটিয়া ও চিরিয়া খণ্ডিত করা প্রভৃতি কাষ্ঠ-সংগ্রহ সম্পর্কীয় ব্যবসায়কে বলে lumbering :

† নরম কাঠ—পাইন, ফার, হেমলক, স্প্রাস, সাইপ্রেস, রক্তকাষ্ঠ, সিডার, লার্চ ও ট্যামার‍্যাক। শক্ত কাষ্ঠ—ওক, মেপ্‌ল্‌, পপলার, চেষ্টনাট, বীচ, বার্চ, এল্‌ম, অ্যাস্‌, হিকোরি, ওয়ালনাট, চেরী প্রভৃতি।

গাছ কাটিয়া তাহার উপর ফেলে, এবং খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া খণ্ডিত গুঁড়িগুলি বরফের উপর একত্র করিয়া ভেলার আকারে বাঁধিয়া ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্র (donkey engine) দ্বারা টানিয়া বরফাচ্ছন্ন নদীর উপর আনিয়া রাখে। পরে বসন্তের আগমনে নদীর উপরিস্থিত বরফ গলিয়া গেলে নদীর জলে ভাসাইয়া ঐ সকল কাঠ নদীতীরস্থ কাঠের কলে লয়, এবং সেখানে ফাড়িয়া চিরিয়া বিদেশে রপ্তানি করে।) এক্ষণে এইরূপ অনেক কাষ্ঠসংগ্রহের স্থানে রেলগাড়ীতে গুঁড়িগুলি করাত-ঘরে পৌঁছে।(দক্ষিণের হ্রদপথে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া এবং এখানকার রেলযোগে কাঠ রপ্তানি হয়। ক্যানাডার দক্ষিণের ও দক্ষিণ-পূর্বের বন অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছে। তথাপি এখনও পূর্বভাগের রাষ্ট্র কয়টি হইতে ক্যানাডার রপ্তানি কাষ্ঠের অর্ধেক পাওয়া যায়। ক্যানাডা কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদনে ইহার স্থান প্রথম, খবরের কাগজের কাগজ উৎপাদনেও প্রথম এবং সাধারণ কাগজ উৎপাদনে ইহার স্থান বহু নিম্নে—৮ম। ১৯৬০ খৃ. অব্দে পৃথিবীর খবরের কাগজের ৮৫% কাগজ এখান হইতে পাওয়া যায়।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের কাষ্ঠ-সম্পদ্।—আ. যুক্তরাষ্ট্রের কাষ্ঠ-সম্পদ্ হিসাবে নিম্নলিখিত ছয়টি অঞ্চলই প্রধান,—(১) উত্তরের হ্রদ-অঞ্চলের বন,—(২) উত্তর-পূর্বের নব ইংলণ্ড অঞ্চলের বন,—(৩) পূর্বদিকের অ্যাপালাশিয়ান পর্বত অঞ্চলের বন,—(৪) দক্ষিণের পাইন বন,—(৫) প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূলের বন, এবং আ. যুক্তরাষ্ট্রের (৬) মধ্যভাগের শক্ত কাঠের বন।)

(১) উত্তরের হ্রদ-অঞ্চলের বন।—সুপিরিয়র প্রভৃতি আমেরিকার পঞ্চহ্রদের দক্ষিণেই এই বন ছিল। শ্বেত পাইন ছিল ইহার প্রধান বৃক্ষ। এই বন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এইস্থানের স্টেটগুলিতে কাষ্ঠ আমদানি করা হয়।

(২) উত্তর-পূর্বের নব ইংলণ্ড অঞ্চলের বন।—পূর্বেই বলিয়াছি, ক্যানাডার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মিশ্রিত বন আ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। (এই বনেই আ. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কাষ্ঠ-সংগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছিল।) এখানে পাইন, স্প্রাস প্রভৃতি নরম কাঠের এবং ওক, বীচ, মেপ্‌ল প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছ ছিল। (এই বন প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এখনও এখান হইতে কাগজের কলের জন্য নরম কাঠ সংগৃহীত হয়।)

(৩) পূর্বদিকের অ্যাপালাশিয়ান পর্বত অঞ্চলের বন।—উত্তরে নিউইয়র্ক স্টেট হইতে দক্ষিণে জর্জিয়া ও এলাবামার উত্তরভাগে কতকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতের উপরে পাইন, ফার, হেমলক, সিডার প্রভৃতি এখানকার বৃক্ষ।

(৪) দক্ষিণের পাইন বন।—~~আরও~~ দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর ও আটলাণ্টিক তীরে নানাপ্রকার পাইন-জাতীয় বৃক্ষ আছে। এই অঞ্চলে সাইপ্রেস

ও ওক প্রভৃতি প্রশস্তপত্র শক্তকাঠও আছে। এই স্থানে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের জন্য বৃক্ষগুলি এরূপ রসসঞ্চয় করিতে পারে যে, শীতকালেও ইহারা পর্ণ-মোচন করে না। এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চল বলিয়া এখানে বারমাসই কাষ্ঠ-সংগ্রহ চলে। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সমতল বালুকাময় ভূমি। সেজন্য এই অঞ্চলে কাষ্ঠ-সংগ্রহ সহজসাধ্য। রেলগাড়ী করিয়া নিকটবর্তী করাত-ঘরে কাঠ সহজেই লইয়া যাওয়া যায়।

(৫) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের বন**।—এই বন দক্ষিণে ৩৫° উ. অক্ষরেখা হইতে আরম্ভ করিয়া কোস্ট রেঞ্জ, সিয়েরা নেভাদা, কাস্কেড ও ইহাদের পূর্ব পার্শ্বের রকি পর্বতের উপর দিয়া এবং পূর্বের ও পশ্চিমের সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলির উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া,—ক্যানাডার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া,—উত্তরে আলাস্কার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। **এই বন হইতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক কাষ্ঠ পাওয়া যায়**। ইহার উত্তর ভাগে বিপুলকায় ডগলাস ফার ও দক্ষিণ ভাগে বিশালকায় ("big tree" নামে পরিচিত) রোজউড (গোলাপ কাষ্ঠ—শিশু) বৃক্ষ বিখ্যাত। এই নরম কাঠের বনভূমির ন্যায় মূল্যবান্, সুবৃহৎ, অত্যাবশ্যকীয় ও সুবৃহৎ বৃক্ষপূর্ণ বন পৃথিবীতে আর নাই। রকি পর্বতের উপরও এই সকল বৃক্ষ আছে। ডগলাস ফার প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ হয়। ইহার গুঁড়ির ব্যাস ৬।৭ ফিট্ হইয়া থাকে। এই বনের অন্য বৃক্ষ—লার্চ, পীত পাইন, রক্ত সিডার, শ্বেত পাইন, হেমলক, স্প্রাস, কালিফোর্ণিয়ার রক্তকাষ্ঠ বৃক্ষ প্রভৃতি। বনে এই সকল গাছ কাটিয়া ছোট-ছোট বাষ্পীয় যন্ত্রের (donkey engine) সাহায্যে, অথবা মালবাহী গাড়ীতে করিয়া, কিংবা অস্থায়ী রেলগাড়ীতে নিকটবর্তী করাতঘরে লইয়া সেখানে চেরাই করা ও কাষ্ঠদ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

(৬) **মধ্যভাগের শক্ত কাঠের বন**।—পূর্বে যে অ্যাপালাশিয়ান পর্বতের উপরিস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকের নরম কাঠের বনের কথা বলা হইয়াছে, এই বন তাহার পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষিণে লুইসিয়ানা স্টেট হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হ্রদ-অঞ্চল পর্যন্ত যে-স্টেটগুলি আছে, এই বন মোটামুটি সেই পর্যন্ত বিস্তৃত। ওক, হিকোরি, টিউলিপ, ওয়ালনাট প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছ এই বন হইতে পাওয়া যায়।

ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বন।—উষ্ণমণ্ডলে ইউরোপের কোন অংশ নাই। ইহার **উত্তর প্রান্ত হইতে মধ্যভাগের দেশগুলি পর্যন্ত**, এবং **পশ্চিমে ইংলণ্ড হইতে** উত্তর ফ্রান্সের ভিতর দিয়া **ইউরাল**

পর্বত পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বন আছে। ইউরোপের **শ্রেষ্ঠ বনভূমি—নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌লণ্ড ও রুশিয়া;**—তাহার পরে উল্লেখযোগ্য—**রোমানিয়া, পোলণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও অষ্ট্রিয়া**,—এই আটটি মাত্র দেশ হইতে কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। অন্য-অন্য দেশগুলির কাঠ নিজ-নিজ ব্যবহারেই লাগে।

নরওয়ের চতুর্থাংশ ও **সুইডেনের** অর্ধাংশ বনাচ্ছন্ন। নরওয়ে হইতে কাষ্ঠ-শিল্পের কাষ্ঠ বিদেশে চালান যায়, কিন্তু সুইডেন হইতে **খণ্ডকাষ্ঠ** ও কাষ্ঠ-দ্রব্যই রপ্তানি হয়। এখান হইতে **কাগজ** ও **কাগজ তৈয়ারের মণ্ড**ও চালান যায়।

ফিন্‌লণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ বনাবৃত;—**ইউরোপের কোন দেশেরই এত অংশ বনাবৃত নহে**। এখান হইতে প্রচুর **খণ্ডকাষ্ঠ** ও **কাষ্ঠদ্রব্য** রপ্তানি হয়। এবং কাষ্ঠ-রপ্তানিতে **পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়**—ক্যানাডা প্রথম। তদ্ব্যতীত, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ, ও খবরের কাগজের কাগজ এখান হইতে প্রচুর রপ্তানি হয়।

ইউরোপীয় রুশিয়ার ৬০° উ. অক্ষরেখার উত্তরে এক বিশাল বনভূমি আছে—ফিন্‌লণ্ডের বনের প্রায় ৯ গুণ,—কিন্তু ইউরোপীয় রুশিয়ার শতকরা ৩৮ অংশ মাত্র। হিমোষ্ণমণ্ডলের পাইন প্রভৃতি নরম কাঠই এই বনে আছে,—তবে বার্চ প্রভৃতি শক্ত কাঠের গাছও কিছু-কিছু আছে। উত্তরে আর্কাঞ্জেল উপসাগরই রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ-রপ্তানি-অঞ্চল। এই বনে দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ বন পরিষ্কৃত হইতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কিয়েভ হইতে উত্তর-পূর্বের কাজান পর্যন্ত রেখা টানিলে উহাই এই বনের দক্ষিণ সীমা। এই সীমার দক্ষিণে পর্ণমোচী বৃক্ষের শক্ত কাঠের বন ছিল। তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে ও সেখানে কৃষিকার্য হইতেছে।

এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ বন।—এশিয়ার **হিমোষ্ণমণ্ডলের** কাষ্ঠ এই মহাদেশে প্রধানতঃ পাওয়া যায়,—(১) **সাইবেরিয়া**, (২) **উত্তর-পূর্ব চীন** (মাঞ্চুরিয়া), (৩) **কোরিয়া**, (৪) **উত্তর-চীন**, (৫) **জাপান** দেশ হইতে। সমগ্র পৃথিবীতে যত বন আছে মোটামুটি তাহার $\frac{১}{৫}$ অংশ ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্গত সোভিয়েট রুশিয়ার উত্তর ভাগে অবস্থিত, এবং এই বনের $\frac{৪}{৫}$ অংশ কেবল এশিয়া মহাদেশে রহিয়াছে। ইহা পাইন, ফার, স্প্রাস প্রভৃতি নরম কাঠের বন, এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে নরম ও শক্ত কাঠের (১৯২ পৃঃ) মিশ্রিত বন আছে। উত্তর-পূর্ব চীন (মাঞ্চুরিয়া) ও কোরিয়া দেশেও বিশাল বন আছে,—উহা এই বনেরই সম্প্রসারণ।

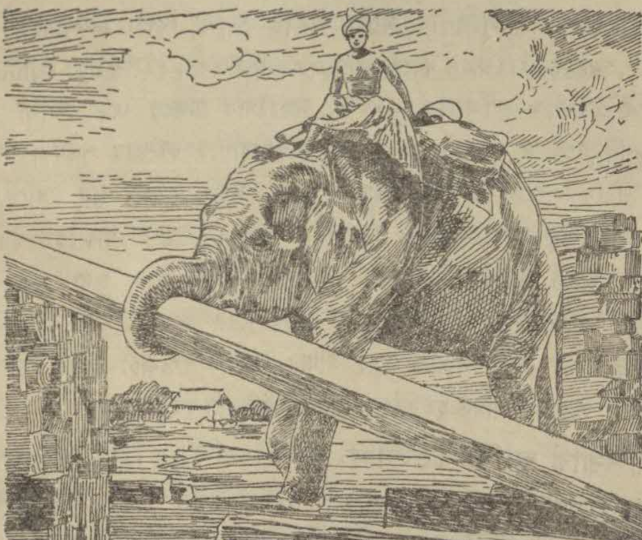
জাপানে বৃষ্টিপাত বেশী,—তাই এখানে সর্বত্রই স্বাভাবিক বনভূমি। এখানে পর্বতের উপরিভাগে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। অনেকাংশে সেই কারণে নরম ও শক্ত দুই প্রকারের কাঠই পাওয়া যায়। জাপানে কয়লা নাই—তাই

গৃহ-নির্মাণে ও অগ্নি-উৎপাদনে জাপানে কাঠের দরকার খুব বেশী। সেজন্য আমেরিকা হইতে তাহাদের কাঠ আনাইতে হয়।

চীনদেশের পর্বতের উপরে কিছু বৃক্ষ আছে। নতুবা সব বনই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে।

নিরক্ষীয় বনে কাষ্ঠ-ব্যবসায়।—পূর্বে ১৯০ পৃষ্ঠায় নিরক্ষীয় বনের কথা বলা হইয়াছে।

এশিয়ার উষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ।—ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত যে-অঞ্চল, সেখানে উষ্ণমণ্ডলের শাল, সেগুণ, চন্দন, বট, অশ্বথ, বাঁশ প্রভৃতি **শক্ত কাঠ** পাওয়া যায়। প্রধান কাঠ **সেগুণ,**—ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে এই কাঠ প্রচুর রপ্তানি হয় ও গৃহের আসবাবপত্রাদি



৭১ নং চিত্র।—হাতীর সাহায্যে কাষ্ঠ বহন।

প্রস্তুত করিতে ও জাহাজ নির্মাণ করিতে ব্যবহৃত হয়। এই সকল স্থানে হস্তীকে কাষ্ঠ বহনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন প্রায় পরিষ্কৃত হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে বহু কাষ্ঠ পাওয়া যায়, এবং এখান হইতে সরলবর্গীয় পাইনজাতীয় বৃক্ষের কাঠও বহু রপ্তানি হয়।

আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার নিরক্ষীয় বন।—আফ্রিকার গিনি উপকূলে ও কঙ্গো নদীর অববাহিকায় এক বিশাল বন আছে। এই বনের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই বন হইতে মেহগনি, স্পেনীয় সিডার, গোলাপ

কাষ্ঠ প্রভৃতি মূল্যবান্ কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত এই বনে শিল্পসৃষ্টির উপযোগী রবার ও তৈলতাল প্রভৃতি গাছ আছে।

উত্তর আমেরিকায়—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে **নিরক্ষীয় বন নাই।**

মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন নিরক্ষীয় বনের ন্যায় ঘন, আগাছাপূর্ণ ;—এবং গাছগুলি পরগাছা ও লতা-বেষ্টিত। এই বন হইতে বাঁশ, ওক, মেহগনি, স্পেনীয় সিডার কাঠ পাওয়া যায়। স্পেনীয় সিডার দিয়া চুরুটের বাক্স ও পেনসিলের কাঠ প্রভৃতি হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা।—ইহার **উত্তরে** গায়েনা অঞ্চলে বন আছে। ফরাসী গায়েনার প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ বনাবৃত। মধ্যে আমাজন-তীরে সেল্‌ভা নামক বন নানাজাতীয় ঘন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই বনের কাঠ এত শক্ত যে, পেরেক ফুটানো যায় না এবং সেজন্য উহা কাঠ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান নহে, এবং এই জন্যই এই বনের অভ্যন্তরে যখন ম্যানাওস্ সহর গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য কাঠ বিদেশ হইতে আনানো হইয়াছিল। তবে শিল্পকার্যে মূলদ্রব্যরূপে অনেক গাছ এখান হইতে রপ্তানি করা হয়। **আন্দিজ পর্বতের উপরেও** নানাপ্রকার বৃক্ষের বন আছে। **দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে** ও ৪০° দ. অক্ষরেখার দক্ষিণে চিলি দেশে নরম কাঠের বন আছে। কিন্তু ইহা রপ্তানিযোগ্য মূল্যবান্ নহে। এই বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর। কারণ, এই বন এত ঘন এবং অত্যধিক বৃষ্টির জন্য ইহার জমি এত নরম ও আর্দ্র যে, গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে না। বর্ষায় এই বনের তল জলমগ্ন হইলে সেই জলে অপেক্ষাকৃত হাল্কা কাষ্ঠ ভাসাইয়া নিকটবর্তী নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু ভারী কাঠ ভাসাইয়া লওয়া যায় না। তাহা অত্যন্ত কষ্টে নানা উপায়ে টানিয়া বনের বাহির করিতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া।—ইহার **দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে** ও তাসমানিয়া দ্বীপে শক্ত কাষ্ঠের বন আছে। ইহার "জারা" ও "কারি" নামক দুই শক্ত কাঠ জগদ্বিখ্যাত,—ইহা উই-এ খায় না, জলে শীঘ্র পচে না। রেলের ও রাস্তার সেতুর পাড়ন ও জাহাজ-ঘাটার কাঠ নামান-উঠানর মঞ্চের জন্য কারি-কাঠ ব্যবহৃত হয় ও দেশ-বিদেশে চালান হয়।

নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে শক্ত ও নরম—দুই রকম কাঠই পাওয়া যায়।

(২) কাগজের মণ্ডশিল্প।—কাষ্ঠ হইতে এক্ষণে প্রধান শিল্পদ্রব্য—**কাগজ**। পূর্বে তূলা, জীর্ণবস্ত্র, জীর্ণ রেশমী কাপড়, ঘাস, খড় প্রভৃতি দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে কাষ্ঠমণ্ডই কাগজের প্রধান উপকরণ।

পাইন জাতীয় নরম কাঠের গাছই কাগজের প্রধান উপকরণ। নরম গাছ

পেষণযন্ত্রে পিষ্ট করিয়া কাগজের জন্য একপ্রকার মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে বলা হয় **যান্ত্রিক মণ্ড** (mechanical pulp)। আবার কাঠ টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য যোগে তাহা হইতে কাগজ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ সেলুলোজ (cellulose) আঁশ ব্যতীত কাষ্ঠের অন্য সকল অংশ বাদ দিয়া তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। বৃক্ষের কঠিন অংশের সারভাগ-উৎপাদক অজৈব পদার্থকে বলে সেলুলোজ। এই সেলুলোজই কাগজের প্রধান উপকরণ। এই সেলুলোজ-আঁশ হইতে যে-মণ্ড প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বলে **রাসায়নিক মণ্ড** (Chemical pulp)। এক্ষণে ভাল-ভাল সকল রকম **কাগজই** কাঠের মণ্ড হইতে প্রস্তুত করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে কাগজের $\frac{৯}{১০}$ অংশ এই সেলুলোজ-যোগেই প্রস্তুত হয়। স্প্রাস, হেমলক ও পীতপাইন কাগজের বিশেষ উপযোগী। কোন দেশের যে-অঞ্চলে এই গাছগুলি জন্মে, প্রধানতঃ সেই অঞ্চলেই কাগজের কল স্থাপিত হয়। অবশ্য এক্ষণে আরও অনেক প্রকারের গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে। **খবরের কাগজের কাগজও** কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়।

উৎপাদন-স্থল।—পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ সরলবর্গীয় বৃক্ষে আবৃত এবং এখান হইতে পৃথিবীর অধিকাংশ নরম কাঠ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে **উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা ও আ. যুক্তরাষ্ট্র** এবং **ইউরোশিয়ার নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌লণ্ড ও রুশিয়া কাষ্ঠ শিল্প দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত**। এশিয়া মহাদেশে **জাপানই** প্রধান কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের (১) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নব ইংলণ্ড রাজ্যগুলি ও তৎসন্নিহিত স্থানে, (২) হ্রদঅঞ্চলের স্টেটগুলিতে, (৩) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্টেটগুলিতে প্রধানতঃ কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই সকল স্থানেই স্প্রাস ও হেমলক গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এখানকার কাগজের জন্য বিদেশ হইতেও. বিশেষতঃ সুইডেন, ফিন্‌লণ্ড ও নরওয়ে হইতে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করিতে হয়। ১৯৬০ সালের হিসাবে পৃথিবীতে যত কাষ্ঠ মণ্ড (যান্ত্রিক ১৭৮৭৫ স. মে. টন ও রাসায়নিক ৪০৩১৫ স. মে. টন) প্রস্তুত হয়, তাহার ২৮% যান্ত্রিক, ৪৬.৫% রাসায়নিক মণ্ড। ৩৭% সাধারণ কাগজ ও ১৩% খবরের কাগজ এখান হইতে পাওয়া যায়।

ক্যানাডার বনসম্পদ্ অতুলনীয়। সেজন্য ক্যানাডা,—এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা কাষ্ঠমণ্ডের জন্য বিখ্যাত। এখান হইতে ৪৪% খবরের কাগজ, ২০% সাধারণ কাগজ, ৩০% যান্ত্রিক ও ১২% রাসায়নিক মণ্ড পাওয়া যায়। খবর ছাপার কাগজ এখানে আ. যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়।

ইউরোপের সুইডেন, নরওয়ে ও ফিন্‌লণ্ডের অন্যতম প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—

কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ। ইউরোপের সকল দেশেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানি করে। ফিন্‌লণ্ড হইতে ইউরোপের সর্বত্র ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাষ্ঠমণ্ড পাওয়া যায়।

জাপানের কাগজ যদিও যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, ইহার কাগজশিল্প এখনও অনেকাংশে গৃহশিল্প। কাগজের কলে ইহার উত্তর দিকের দ্বীপ হইতে কাষ্ঠমণ্ড পাওয়া যায়।

আ. যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রধান রাসায়নিক কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন রাসায়নিক কাষ্ঠ দ্রব্যের ৪৬% উৎপন্ন হয় আ. যুক্তরাষ্ট্রে। অন্য রাসায়নিক কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ—ক্যানাডা, সুইডেন, ফিন্‌লণ্ড, জাপান, সো. রুশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি। পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদক দেশ**—ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফিন্‌লণ্ড, সুইডেন, সো. রুশিয়া, জাপান, নরওয়ে, জার্মানি প্রভৃতি। পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ কাগজ উৎপাদক দেশ**—আ. যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে প. জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালী, ক্যানাডা প্রভৃতি। **সর্বশ্রেষ্ঠ খবর ছাপার কাগজের দেশ**—ক্যানাডা। তৎপরে আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফিন্‌লণ্ড, জাপান, সুইডেন প্রভৃতি দেশ।

ভারতের বনসম্পদ্ ও তাহার ব্যবহার

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিমাণফল ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৮ শত বর্গ কিলোমিটর। ইহার ২৪ শতাংশ অর্থাৎ ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৭২৪ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত স্থান বনাচ্ছন্ন। প্রত্যেক স্টেটে বনের পরিমাণ এইরূপ—

স্টেট	পরিমাণফল বর্গ কিলোমিটর	স্টেট	পরিমাণফল বর্গ কিলোমিটর
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৮১১৯	মধ্যপ্রদেশ	১৭০,৭৩৮
আসাম	৪৫১৫৪	মহীশূর	৩৮৯৩৪
উত্তর প্রদেশ	৩৯৬৮৭	মান্দ্রাজ	২১,৩৭৮
উড়িষ্যা	৬৫৬১৮	রাজস্থান	৪৩,৯৮৩
কেরল	১৪৭১৪	**ইউনিয়ন টেরিটরিজ**	
জম্মু ও কাশ্মীর	২৮৬৪০	দিল্লী	২৬
পশ্চিমবঙ্গ	১২২৪৬	ত্রিপুরা	৮,৯৫৬
পাঞ্জাব	১৪২৭৬	হিমাচল প্রদেশ	১০,৫১৫
বিহার	৩৩৫০৪	মণিপুর	৬,০২২
বোম্বাই	৮৪৬৮৮	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৬৪৭৫
		ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৭১০,৭২৪

উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা অধিক

বনাচ্ছন্ন। তৎপরে আসাম, তাহার পর ক্রমশঃ বোম্বাই, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি।

পৃথিবীতে ভারতের বনভূমির স্থান।—পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়া দেশেই বনের পরিমাণ বেশী। তাহার পরে ক্রমশঃ ব্রাজিল, ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ। কিন্তু এই কয়টি দেশের মধ্যে দেশের বনাচ্ছন্ন শতাংশ ব্রাজিলেই বেশী (৫৬.৫%)। বনের পরিমাণ হিসাবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান—পঞ্চদশ।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিচয়

ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ ২.৭৫ লক্ষ বর্গমাইল;—অর্থাৎ ভারতের ২৪ শতাংশ ভূমি বনাচ্ছন্ন।

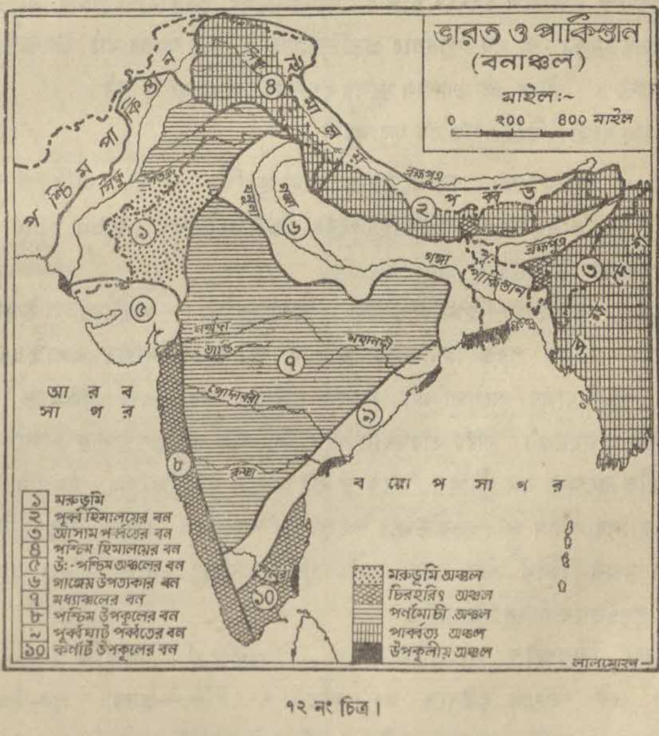
১। **মরুভূমি।**—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম ভাগে থার মরু অবস্থিত। এখানে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া খর্বাকার বৃক্ষের ঝোপই এখানকার উদ্ভিজ্জ। এই বনকে মরুভূমির বন বলা উচিত নহে। এখানে সাধারণ মরুভূমির অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী (২০") বৃষ্টি হয় বলিয়া এই বন প্রকৃত মরুভূমি-উদ্ভিজ্জ নহে—বৃষ্টিবিরল স্থানের উদ্ভিজ্জ। **খয়ের** এখানকার একটি বৃক্ষ।

২। **পূর্ব-হিমালয়ের বন।**—(৭৩নং চিত্র দেখ) নেপালের পশ্চিম-প্রান্ত হইতে আসামের শেষ পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অংশকে **পূর্ব-হিমালয়** বলিয়া এস্থলে গ্রহণ করা হইল। হিমালয়ের পাদদেশে যে তরাই ও পাহাড়-অঞ্চল আছে, তাহাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইল। পৃথিবীর উষ্ণতম নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত অংশের যেমন উত্তাপ ক্রমশঃ কমিতে-কমিতে হিমমণ্ডলে সর্বাপেক্ষা কম হইয়াছে ও সেজন্য সে-স্থান চির-বরফাচ্ছন্ন হইয়াছে, হিমালয়াদি উচ্চ পর্বতেরও সেইরূপ পাদদেশ হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ উত্তাপ কমিতে থাকে, এবং তাহার উচ্চতম প্রদেশে চিরতুষার বিরাজ করে। ভারতবর্ষ মোটামুটি নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত,—সেজন্য ইহার পাদদেশের বনভূমিকে নিরক্ষীয় বনভূমি বলা হয়। এজন্য হিমালয়ের পাদদেশ হইতে উচ্চ চূড়া পর্যন্ত বনগুলিকে উত্তাপভেদে নানাভাগে ভাগ করা যায়; যেমন,—(ক) **নিরক্ষীয়** বা গ্রীষ্মদেশীয় (Tropical) বনভূমি, (খ) **নিরক্ষ-প্রান্তীয়** (Sub-tropical) বনভূমি, (গ) **নাতিশীতোষ্ণ** (Temperate) বনভূমি, (ঘ) **পর্বতের উচ্চদেশীয়** (Alpine) বনভূমি। ইহার উপরে তুষারভূমি।

(ক) **নিরক্ষীয় বনভূমি** (৩০০০ ফিট্ পর্যন্ত)—ইহার দক্ষিণ ভাগে

অস্বাস্থ্যকর তেরাই (Terai) অঞ্চল, এবং উত্তর অংশে হিমালয়ের সন্নিকটে পাহাড়বহুল উচ্চভূমি। জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং, কালিম্পং, উত্তর-আসাম এই অংশে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত পূর্বভাগে মোটামুটি ১০০ ই.। এই অঞ্চলে **ঘাস** আছে বটে, কিন্তু **চিরহরিৎ-প্রায়** (Semi-evergreen) **বনভূমি** আছে। পাহাড়ের গাত্র বনাচ্ছন্ন, এবং **শালই সেখানে প্রধান বৃক্ষ।**

(খ) **নিরক্ষপ্রান্তীয়** (Sub-tropical) **বনভূমি** (৩০০০-৬০০০ ফিট্)।—উষ্ণমণ্ডলের প্রান্তভাগে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রথমভাগে এই বনভূমি অবস্থিত। এই অংশে চিরহরিৎ ওক ও চেষ্টনাট,—এবং উত্তরভাগে অল্ডার ও বার্চ (ভূর্জপত্র) প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বৃক্ষ জন্মে। এখানে গর্জন গাছও আছে, এবং যেখানে বালুকাময় শুষ্কভূমি সেখানেই মাত্র অল্প পাইন-জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পাইন-অঞ্চল আরও উচ্চে। এখানকার বন ঘন ও বৃক্ষগুলিও একশত-দেড়শত ফিট উচ্চ।



১২ নং চিত্র।

দ্রষ্টব্য। পুস্তকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনগুলির পরিচয় অংশে সংখ্যায় দ্বারা যে-যে অঞ্চলের বর্ণনা করা হইয়াছে, চিত্রের ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি অনুরূপ অঞ্চলজ্ঞাপক।

(গ) **নাতিশীতোষ্ণ** (Temperate) **বনভূমি** (৬০০০-৯০০০ ফিট্)।—নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পর্বতপ্রদেশের উচ্চাংশে চিরহরিৎ, ওক ও চেষ্টনাট বৃক্ষের ঘন বন দেখিতে পাওয়া যায়। মেপ্‌ল, এল্‌ম্, প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) **পর্বতের উচ্চদেশীয়** (Alpine) **বনভূমি** (৯০০০-১৬০০০ ফিট)।—এই বিভাগের দক্ষিণ অংশে—মোটামুটি ১২০০০ ফিট্ পর্যন্ত অল্প **নীল-পাইন** (Blue pine), **রৌপ্য পাইন** (Silver pine), **জুনিপার** প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ (Conifers) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে,—**সরলবর্গীয় বৃক্ষের প্রাদুর্ভাব হিমালয়েই বেশী,—এবং এখানে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত খর্বাকার**। এই মণ্ডল হইতে গাছগুলি খর্ব হইতে-হইতে ১৬০০০ ফিট্ পর্যন্ত গিয়া লোপ পাইয়াছে। **খর্ব বার্চ, রোডোডেনড্রন ও সরলবর্গীয় বৃক্ষাদি** মিলিয়া এখানে ঘন বনের সৃষ্টি করিয়াছে।

পর্বতের উচ্চদেশে ১২০০০ হাজার ফিটের উপর তৃণভূমি,—তাহার মধ্যে-মধ্যে খর্ব রোডোডেনড্রন ও খর্ব জুনিপার প্রভৃতির গাছ। এই ঘাসের মাঠ **উৎকৃষ্ট পশু-চারণ-ক্ষেত্র**। গ্রীষ্মে এই তৃণাঞ্চল ফুলের শোভায় বিচিত্র হইয়া উঠে।

ষোল হাজার ফিটের উত্তরেই তুষারভূমি।

৩। **আসাম পর্বতের বনভূমি**।—নাগা, খাসি ও মণিপুর পাহাড়ে ৩০০০ ফিটের উর্ধ্বে পশ্চিম-হিমালয়ের **চির্‌পাইনের** (Chir pine) ন্যায় খাসিয়া পাইনের বন আছে।

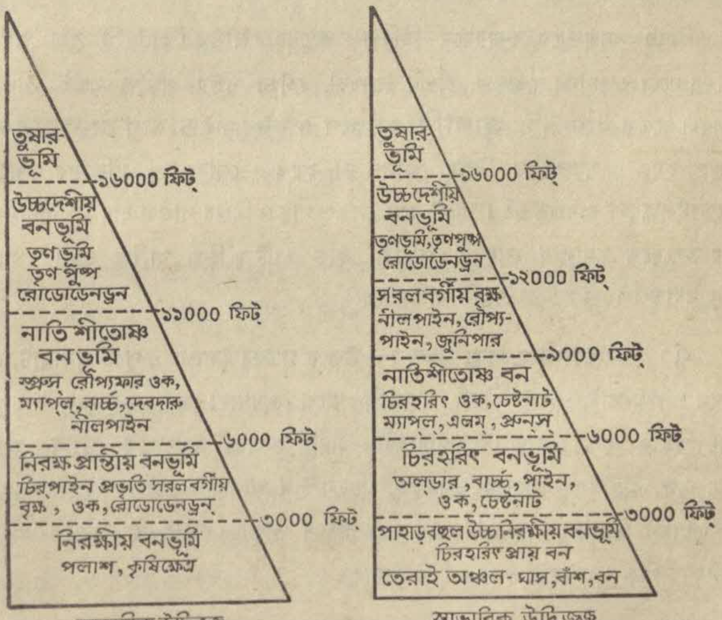
৪। **পশ্চিম-হিমালয়ের বনভূমি**।—কাশ্মীরের উত্তর-প্রান্ত হইতে পশ্চিম-নেপাল পর্যন্ত হিমালয়ের অংশকে **পশ্চিম-হিমালয়** বলা হয় (৭২নং চিত্র)। পূর্ব-হিমালয় অপেক্ষা এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম,—এবং বৃষ্টিপাত পশ্চিমে ক্রমশঃ কম হইয়াছে। বৃষ্টির তারতম্যানুসারে এই অঞ্চলে **প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী** ও **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন** আছে। একে ত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, তদুপরি কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের অঞ্চল অধিকতর উত্তরে উচ্চভূমিতে অবস্থিত। সেজন্য উচ্চতা-অনুসারে বনভূমির মণ্ডল-বিভাগ সহজ নহে,—এবং পূর্ব-হিমালয়ের মণ্ডলের সহিত এখানকার মণ্ডলের সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যও নাই।

(ক) **নিরক্ষীয় বা গ্রীষ্মদেশীয়** (Tropical) **বনভূমি** (৩০০০ ফিট্ পর্যন্ত)। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি,—সুতরাং পূর্ব-হিমালয়ের অঞ্চলের ন্যায় এখানে ঘন বন নাই। পশ্চিম-হিমালয়ের এই অঞ্চলে কতকগুলি সহরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলে **পলাশ** প্রধান বৃক্ষ;—ফুল ফুটিলে ইহার

বনক্ষেত্র যেন অগ্নিক্ষেত্র বলিয়া অনুমিত হয়। পলাশ ও এই অঞ্চলের অন্য-অন্য গাছের কাঠ প্রধানতঃ **জ্বালানী** কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **নিরক্ষপ্রান্তীয় (Sub-tropical) বনভূমি** (৩০০০-৬০০০ ফিট্)।—চির্-পাইন-শ্রেণীর সরলবর্গীয় বৃক্ষ এখানকার প্রধান বৃক্ষ। **ওক ও রোডোডেনড্রন** বৃক্ষও এই বনে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) **নাতিশীতোষ্ণ (Temperate) বনভূমি** (৬০০০-১১০০০ ফিট)।—দক্ষিণের পাইন-জাতীয় বন এই বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে, এবং চির্-পাইনের পরিবর্তে **দেবদারু ও পরতাল** (Blue pine) বৃক্ষের ও এই বিভাগের উত্তর অংশে স্প্রাস, রৌপ্য-ফার (Silver fir) প্রভৃতির মিশ্রিত বিস্তৃত বন আছে। কোথাও একই বৃক্ষের পৃথক্ বনও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলই নরম কাঠের গাছ।



স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পশ্চিম হিমালয়

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পূর্ব্ব হিমালয়

১৩ নং চিত্র।

কিন্তু **কোথাও-কোথাও চিরহরিৎ ওক, মেপল, বার্চ ও এল্‌ম** প্রভৃতি প্রশস্তপত্র ও শক্তকাঠের বৃক্ষও এই বিভাগের বনে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) **পর্বতের উচ্চদেশীয় (Alpine) বনভূমি** (১১০০০-১৬০০০ ফিট)। —পূর্ব-হিমালয়ের এই বিভাগের বনভূমির তুল্য।

এই বিভাগের উত্তরেই চিরতুষারভূমি।

৫। **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বন**।—কচ্ছ, গুজরাট, পশ্চিম-রাজপুতানা, প্রভৃতির স্থান মরুপ্রায়ভূমি,—এখানকার জমিও লবণযুক্ত। **শিমুল, পপিতা, খয়ের, বাবলা, শাল, ঝাউ** প্রভৃতির অতি-পাতলা বন এই অঞ্চলে আছে। এখানে গাছগুলি খর্ব হইয়া যায়।

৬। **গাঙ্গেয় উপত্যকার বন**।—গাঙ্গেয় উপত্যকা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কৃষিভূমি, এবং এখানে লোকবসতিও বিশেষ ঘন। সেজন্য এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নাই বলিলেই চলে। এক সময়ে যে **ইহা শালবনে আবৃত ছিল** তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে **সুন্দরবন** নামক বনে আবৃত ইহার ব-দ্বীপ অংশেই মাত্র গভীর বন আছে।

ইহার সমুদ্রতীরে সুন্দরবনে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতজ (tidal) বৃক্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ওড়চাকা, কেওড়া, গরাণ, সুন্দরী, গেঁও, পশুর প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এইসকল বৃক্ষের কতকগুলি **জ্বালানি** কাঠরূপে ও কতকগুলি **চামড়া রং করার জন্য** ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরে বিস্তর গোলপাতা হয়। গোলপাতা দরিদ্রের **ঘরের আচ্ছাদনরূপে** ব্যবহৃত হয়। এই বনে সেগুণ-গাছও বিস্তর পাওয়া যায়। এখানকার বনের তলদেশে সোলার ন্যায় একপ্রকার কোঁড় মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হয়। গাছের মাটির মধ্যস্থ শিকড় হইতে এগুলি বাহির হয়।

৭। **মধ্যাঞ্চলের বন**।—উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা, পূর্বে পূর্ব-ঘাট, এবং পশ্চিমে পশ্চিম-ঘাট,—এই সীমার মধ্যবর্তী অংশ প্রধানতঃ পর্ণমোচী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সেগুণ ইহার সর্বত্র জন্মে। গোদাবরী নদী হইতে উত্তরাংশে **শাল** জন্মে। সাটিন বৃক্ষ, মহীশূর অঞ্চলের চন্দনবৃক্ষ, চিক্রাশী (আসাম প্রদেশে ইহার নাম—বোগাপোমা), পত্রাঙ্গ (Soymida), তুন, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষই এই অঞ্চলে প্রধান। এখানকার গাছ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ হয়।

৮। **পশ্চিম-উপকূলের বন**।—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী। সেজন্য এখানে যেরূপ চিরহরিৎ বৃহৎ বৃক্ষের বন আছে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র কোথাও এরূপ বন নাই। ইহার উপকূলে বালুকাময় স্থানে **নারিকেল**, নদীর পার্শ্বে **সুপারি বন, গর্জন, মেস্তুয়া, চিক্রাশী, শিশু, ছোপিয়া, তুন, পুন, বিশপ** প্রভৃতি প্রধান বৃক্ষ। পর্বতের পূর্বভাগে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে

প্রধানতঃ মহীশূরের মধ্যে চন্দনবৃক্ষ জন্মে। নিকৃষ্ট দারুচিনি ও এলাচির গাছও এই বনে জন্মে।

৯। **পূর্বঘাট প্রদেশ**।—এখানে গর্জন, পিয়াশাল, বাবলা, পলাশ, অর্জুন ও সেগুন গাছের বন আছে। কিন্তু এই বন পশ্চিম-ঘাটের বনের মত ঘন নহে। ইহার মধ্যে-মধ্যে **তালজাতীয় বৃক্ষ** আছে। উত্তর ভাগে কুঁচেলা ও **আবলুস্ গাছ** জন্মে।

১০। **কর্ণাট উপকূল**।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলের দক্ষিণ অংশে কর্ণাট উপকূলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে যে-বৃষ্টিপাত হয়, তাহা পশ্চিম-উপকূলের বৃষ্টিপাত অপেক্ষা কম। সেজন্য এখানে প্রধানতঃ পশ্চিম উপকূলের বৃক্ষাদি জন্মিলেও তাহা আকারে ছোট হয়। তেঁতুল, নিম, আবলুস প্রভৃতি এই বনের প্রধান বৃক্ষ। এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার নদীমুখেও বন আছে।

বনরক্ষণ হিসাবে বনের শ্রেণীভেদ।—(১) **খাসবন** (Reserved Forest)—এই বনে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত বনরক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কেহ গাছ কাটিতে বা পশুচারণ করিতে পারে না। (২) **রক্ষিত বন** (Protected Forest)—এই বনে স্থানীয় লোকের জ্বালানি কাঠ ও পশুখাদ্য সংগ্রহের ও পশুচারণের অধিকার আছে। (৩) **শ্রেণীহীন বন** (Unclassified Forest)—এই বনে কাষ্ঠাদি সংগ্রহের বা পশুচারণের কোন বাধা নাই। এখানে কোন তত্ত্বাবধায়ক থাকে না।

বৃক্ষের শ্রেণীভেদ।—উপরে যে-বনগুলির উল্লেখ করা হইল, তাহাদের বৃক্ষাদি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) চিরহরিৎ, (২) পর্ণমোচী, (৩) সরলবর্গীয়, ও (৪) স্রোতজ।

(১) **চিরহরিৎ বৃক্ষ**।—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে, কর্ণাট উপকূলে, আসামের উত্তরাংশে, ও পূর্ব হিমাচল অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। গর্জন, হোপিয়া, চিক্রাশী, পুন, তুন, শিশু, বিশপ, লাকুচ, আবলুস প্রভৃতি বৃক্ষ চিরহরিৎ। বাঁশও এই চিরহরিৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। পর্বতের উচ্চ অংশে বৃষ্টিবহুল স্থানে অনেক পর্ণমোচী বৃক্ষ চিরহরিৎ হইয়া যায়।

(২) **পর্ণমোচী বৃক্ষ**।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মালভূমি অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। শাল, সেগুন, পিয়াশাল, পাদাউক, চন্দন, অর্জুন, জারুল, পত্রাঙ্গ (Soymida), শিরীষ, বাবলা, নিম, তেঁতুল, আবলুস প্রভৃতিই প্রধান পর্ণমোচী বৃক্ষ।

(৩) **সরলবর্গীয় বৃক্ষ।**—সরলবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে পাইন জাতীয় বৃক্ষই প্রধান। গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরেও হিমালয়ের পার্বত্য অংশে ইহা জন্মে।

(৪) **স্রোতজ বৃক্ষ।**—ইহা সাধারণতঃ নদীর ব-দ্বীপে জন্মে। সুন্দরী, পশুর, গুড়চাকা প্রভৃতি বৃক্ষ ও গোলপাতা প্রভৃতি তাল জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান স্রোতজ বৃক্ষ। ইহা লবণজলপূর্ণ নদী ও সমুদ্র-তীরে জন্মে।

এই সকল বৃক্ষে গঠিত বনভূমির ইহাদের নামেই নামকরণ হয়। যেমন,—চিরহরিৎ বৃক্ষের বন, সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন ইত্যাদি।

কাষ্ঠের ব্যবহার (Utilisation)।—বনজ প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য (ক) **কাষ্ঠ** ও (খ) **জ্বালানি কাষ্ঠ।** বৎসরে গড়ে ষোল কোটি বর্গফুট কাঠ ও দুই কোটি বর্গফুট কয়লার কাষ্ঠ ও ৩৬ কোটি বর্গফুট জ্বালানি কাষ্ঠ বন হইতে পাওয়া যায়। বনজ অন্য অপ্রধান (minor) দ্রব্য—গাছের ছালের **আঁশ, ফল, বেত, মধু, মোম, আঠা, ধুনা, ছাল, লাক্ষা** প্রভৃতি।

কাষ্ঠ হইতে নৌকা, জাহাজ, গাড়ীর কাঠাম, গাড়ীর চক্রনাভি, গাড়ীর পাখী (spokes), বাড়ীর দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতি, নানাপ্রকার আসবাব-পত্র, কৃষিযন্ত্র, হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম, সেতার, ভায়োলিন প্রভৃতি বাজনা, প্যাক করিবার বাক্স, পেনসিলের কাঠ, দেশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি, রেলওয়ে পাড়ন ও রেলগাড়ীর অভ্যন্তরস্থ আসবাব, মাকু, তবক কাঠ (ply wood) প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়াও কাগজের মণ্ড, সেলুলোজ, তামাকের পাইপ, তাঁবুর খুঁটি, ছবির ফ্রেম, ছাপার ছাঁচ, ইলেক্‌ট্রিক তারের খুঁটি, তেলের কূপ, জুতার ফর্মা (last), কাঠ কয়লা প্রভৃতি বহু দ্রব্য কাষ্ঠ হইতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত বনজ অন্য দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। যেমন,—বাঁশ হইতে গৃহনির্মাণ, বেড়াবাঁধা,—বেত হইতে নানা আসবাবপত্র—তালপাতা ও খেজুরপাতা হইতে ঝাঁটা প্রভৃতি,—মোম হইতে বাতি প্রভৃতি,—বাবলা প্রভৃতি গাছ হইতে কাগজাদি জুড়িবার আঠা এবং হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রভৃতি হইতে চামড়া রং করার উপাদান,—চন্দন বৃক্ষ হইতে তৈল ও সুগন্ধি দেবভোগ্য কাঠ,—গাছ হইতে লাক্ষা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। বিদেশ হইতে এদেশের ব্যবহার্য কাষ্ঠ দ্রব্য ও কাষ্ঠ আমদানি করা হয়।

ভারত হইতে কাষ্ঠের আমদানি ও রপ্তানি—১৯৬০

	আমদানি সহস্র (টাকা)	রপ্তানী সহস্র (টাকা)
জালানি কাঠ ও কয়লা	৭৫	১৫৩
চেরাই কাঠ	১৭৪৩৩	২৩৩২২
কাষ্ঠে প্রস্তুত দ্রব্য	৩৬০৭২	৪৫৩
কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি	৬৮৬৪৭	৩৮৯০৫
উৎকৃষ্ট কাঠের পাতলা ফলক দ্বারা মণ্ডিত অপকৃষ্ট কাঠ, ভেঁ-পিস কাঠ	২২৯৮	৩৭৯
কাষ্ঠদ্রব্য	৬১৫	৭০৪

QUFSTIONS

1. What is the most important timber-producing country of the world? Which is of Europe and which is of Asia?

2. What are the principal tropical forest regions of the world? Compare and contrast them as to their commercial importance. What are the important commercial commodities obtanined from Africa?

3. State the utility of forests. Describe the different forest regions of the world, and discuss the nature of their economic exploitations.

4. Divide India into the chief forest regions. Mention important Indian forest products and the cheif industries dependent upon them. (Cal. B. Com. 1925, 31).

5. On a sketch map of India show the regions with important timber resources. How are these utilised at present?

6. Give an account of the forest products of India and state where they are found. (Cal., Inter 1942).

7. Is India rich in forest products? Mention the regions where these are available and also give their principal uses. (Cal., Inter., 1946).

8. What are the principal areas from which paper pulp is obtained?

9. Describe the characteristics of different types of forest. Divide the world according to these types.

10. What are the chief types of forest? Describe the distinguishing features of the types.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পশুপালন

(Pastoral Industries)

(১)

জীবসম্পদ্‌ :—ইহার আবশ্যকতা—খাদ্য, পরিবহন ও শক্তি,—কাঁচা মাল,—বস্ত্রাদি।
প্রধান-প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহাদের ব্যবহার,—পশম, চর্ম ও বরফে রাখা মাংস।
গো-মহিষাদি ও মেষ ব্যবসায়ের জন্য, পালনের জন্য প্রধান-প্রধান অঞ্চল।

জন্তুর আবশ্যকতা।—মানুষের জীবন যাপনের জন্য জীবজন্তু নানা প্রকারে প্রয়োজনীয়। খাদ্যের জন্য মাংস, দুগ্ধ, নানাবিধ শিল্পসৃষ্টির জন্য চর্ম, হাড়, শিং, ক্ষুর, চবি, দুগ্ধ ও পশম প্রভৃতি দ্রব্য প্রাণী হইতে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্য কখনও প্রাণী হইতে সাক্ষাৎভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে পাই। আবার কোন-কোন প্রাণী হয়ত ব্যবহার্য ও শিল্পোপযোগী—দুই প্রকার দ্রব্যই আমাদের প্রদান করে। তদ্ভিন্ন কোন-কোন জন্তু ভারবহনের জন্য কিংবা শকটাদি চালাইবার শক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে যে-সকল জন্তু আছে, তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, অশ্ব, শূকর প্রধান গৃহপালিত পশু। এইসকল পশু প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণভূমিতেই এই সকল পশু প্রতিপালিত হয়। ইহাতে পশুপালন মানুষের অন্যতম উপজীবিকা হইয়াছে।

পরিবহনের জন্তু।—হস্তী, অশ্ব, গরু, মহিষ, উষ্ট্র প্রধান ভারবাহী পশু। মানুষ এই সকল জন্তু প্রতিপালন করিয়া নানাপ্রকার ভারবহনের কার্যে নিযুক্ত করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রহ্মদেশে এবং আফ্রিকার কোন-কোন অংশে হস্তী ভারবহনে নিযুক্ত হয়। ভারত ও ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে সেগুণ কাঠ বহন করিতে ও সাজাইয়া রাখিতে হস্তী বিশেষ সাহায্য করে (৭১নং চিত্র)। অশ্বও ভার বহন করিয়া থাকে, এবং অশ্বের পিঠে উঠিয়া মানুষ দূরদূরান্তরে যায়। মরুভূমিতে ভারবহনের জন্য উষ্ট্র প্রধান অবলম্বন। ইহা জল ও খাদ্য ব্যতীত কিছু দিন বাঁচিতে পারে। মরুভূমিতে বালুর ঝড় উঠিবার পূর্বেই উষ্ট্র বুঝিতে পারে; সেজন্য মরুভূমির মধ্যে যাতায়াত করিতে উষ্ট্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় জন্তু। গরুমহিষও

ভারবহনের কার্যে নিযুক্ত হয়। পৃথিবীর উত্তর ভাগে তুন্দ্রাভূমিতে **বল্গা হরিণ** ও **কুকুর** ভার বহন করিয়া থাকে। তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে **ইয়াক** একটি ভারবাহী পশু। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে **লামা** ভার বহন করিয়া থাকে। বোঝা লইয়া পর্বতের উপর দিয়া বিশেষতঃ পর্বতের ঢালু স্থানের উপর দিয়া চলিতে তাহার মত জন্তু বিরল।

পশুশক্তি।—বর্তমান যুগে জলশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, তৈলশক্তি ও বাষ্পশক্তি-বলে মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, এবং নানাপ্রকার যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু পূর্বকালে কেবলমাত্র গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদ্বারাই গাড়ি, লাঙ্গল ও যন্ত্রাদি পরিচালিত হইত, এবং এখনও কোন-কোন স্থলে পশুশক্তি বলেই যন্ত্রাদি পরিচালনা করা হয়। এখন, তেলের ঘানি গরুতেও টানে, বিদ্যুৎশক্তিতেও চালানো হয়।

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে পশুর ব্যবহার।—গরু, শূকর, ছাগল ও ভেড়ার মাংস ও গো মহিষের দুগ্ধ সাধারণতঃ খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ছাগল ও ভেড়া হইতেও অল্প দুধ পাওয়া যায় ও তাহা বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এইসকল জীবজন্তু প্রধানতঃ তৃণ-অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়। উষ্ট্রের দুগ্ধ ও মাংসও কোথাও-কোথাও খায়।

নিম্নে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান ব্যবসায়ার্থিক পশুচারণ ক্ষেত্রের পরিচয় দেওয়া হইল :—

ব্যবসায়ার্থিক পশুচারণ ক্ষেত্র
(Commercial Grazing)

গো-মেষাদি পশু পৃথিবীর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে (ক) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণক্ষেত্র** এবং (খ) উষ্ণ বা ক্রান্তীয় মণ্ডলের উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের বা **স্যাভানা অঞ্চলের** (৭২ পৃঃ.) **তৃণভূমিই** প্রধান পশুচারণ ক্ষেত্র। এই সকল ক্ষেত্রে যেখানে বৃষ্টিপাত ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চি, গ্রীষ্মের উত্তাপ ৭৫° ডি. ফা. অপেক্ষা বেশী হয় না,—সুতরাং যেখানে ছোট-ছোট ঘাস জন্মে,—সেখানে মেষ প্রতিপালিত হয়। আর, যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী, উত্তাপও বেশী,—সুতরাং যেখানে বড়-বড় ঘাস জন্মে, সেখানে গো-পালন হয়। ঘাস ছোট হইলে মেষেরা ছোট মুখে ধরিতে পারে, কিন্তু গরু তাহার বড় মুখে ধরিতে পারে না। সেজন্য ছোট ঘাসযুক্ত তৃণক্ষেত্রে মেষ-পালন হইয়া থাকে।

(ক) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে—

(১) **উত্তর আমেরিকার** ১০০° প. দ্রাঘিমারেখার পশ্চিমে অবস্থিত সমভূমি, মালভূমি ও পার্বত্যভূমির উপরিস্থিত তৃণক্ষেত্র অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ার্থিক সবিশেষ উন্নত পশুচারণ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশ পশুচারণ ক্ষেত্র।

এই অঞ্চলে গরু ও মেষ প্রধানতঃ যথাক্রমে মাংসের ও পশমের প্রয়োজনে প্রতিপালিত হয়। তাছাড়া টেকসাস্ অঙ্গরাজ্যে এঙ্গোরা ছাগলও প্রতিপালিত হয়। **মাংসার্থক গরু, মেষশাবক, পশম ও চর্ম প্রভৃতি** পশুজাত দ্রব্য এই অঞ্চল হইতে প্রচুর রপ্তানি হয়।

এই অঞ্চলে রকি পর্বতের সানুদেশে, উচ্চ ও ঢালু অংশে **উচ্চ সমতল** বা বিশাল সমতলভূমি (Great plains)-তে কৃষিকার্য হয় না—পশুচারণ হয়। এখানে **অনেক মাংসার্থক গরু** পাওয়া যায়।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত দক্ষিণ ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার সুবৃহৎ তৃণক্ষেত্রও অন্যতম প্রধান পশুচারণ ক্ষেত্র। ইহার "পাম্পা" নামক তৃণক্ষেত্র এবং প্যারানা ও উরুগুয়ে নদীর মধ্যবর্তী তৃণভূমিতে উচ্চ শ্রেণীর **মেষ ও গরু** প্রতিপালিত হয়।

এই অঞ্চলেই উত্তর প্যাটাগোনিয়া—**গরু, ঘোড়া, অশ্বতর ও ছাগল** প্রভৃতি, এবং দক্ষিণ প্যাটাগোনিয়া, টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো ও ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ **মেষ** পালনের বিশেষ উপযোগী স্থান।

(৩) **অস্ট্রেলিয়ার** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি পৃথিবীর অন্যতম ব্যবসায়ার্থিক পশুচারণ ক্ষেত্র। এখানে গরু ও মেষ (১৭ নং চিত্র দেখ)—উভয় পশুই প্রতিপালিত হয়। তবে **মেষপালনই এখানকার প্রধান উপজীবিকা।** আ. যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে—এই তিন দেশে যত মেষ আছে, এখানে তাহা অপেক্ষা অধিক মেষ আছে। পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে যত পশম আসে তাহার এক-তৃতীয়াংশ, এখান হইতে পাওয়া যায়। এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে কুইন্সলণ্ড স্টেটের মধ্যভাগ হইতে মারে অববাহিকা পর্যন্ত বৃষ্টিবিরল স্থানে, ও (২) বৃষ্টিবিরল দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে মেষপালন হয়।

(৪) **নিউজিলণ্ডের** তৃণক্ষেত্রও একটি প্রধান পশুপালন ক্ষেত্র। নিউজিলণ্ডে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা যে-পর্বত-শ্রেণী আছে, তাহার উপর বৃষ্টিপাত কম। সেজন্য সেখানে প্রধানতঃ **মেষ-পালন** হয়, পূর্বে গো-পালন হইত। কিন্তু ইহার **উত্তর দ্বীপই প্রকৃষ্ট গো-পালন স্থান।**

(৫) **দক্ষিণ আফ্রিকায়** ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের পশ্চিমের বৃষ্টিবিরল, কর্কশ ও রুক্ষ স্থানে কৃষিকার্য হয় না। প্রধানতঃ **মেষপালন** হয়। গরু এবং ছাগলও প্রতিপালিত হয়। এখানকার জমি প্রায় ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফিট্ উচ্চ। সেজন্য এখানে শীতকালে বরফপাত হয়। ইহাতে পশুপালনের প্রতিবন্ধকতা হয়। এখানে উচ্চশ্রেণীর **মেরুণো মেষই** প্রতিপালিত হয়। বৃষ্টিবহুল স্থানে অল্প গো-পালনও হয়।

(৬) **হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলে**—উত্তর গোলার্দ্ধে—**উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ পশুপালন স্থান—ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌**। এখানকার পার্বত্য প্রদেশেই প্রধানতঃ মেষপালন হয়। মূল ইউরোপে মেষপালন কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে আয়র্লণ্ডে, বৃষ্টিবহুল পশ্চিম ইংলণ্ডে, জার্মানির পার্বত্যভূমিতে, হাঙ্গারি. পোলণ্ড ও রুশিয়া দেশের তৃণভূমিতে গো-পালন হয়।

(খ) **স্যাভানা অঞ্চলের তৃণভূমিতে**—পশুপালন হয়। কিন্তু এই অঞ্চলে পশুচারণ-ব্যবসায় বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। কারণ,—এখানে ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, এবং এখানকার উত্তাপ এত বেশী যে, এখানে ভাল তৃণ জন্মিতে পারে না। বৃষ্টিপাত অনুসারে ইহার কোথাও জন্মে মোটা ঘাস, কোথাও জন্মে গুল্ম। আবার মধ্যে-মধ্যে গাছ জন্মে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাবে এই ঘাসও শুকাইয়া যায়। আবার, উত্তাপবহুল এই অঞ্চলে সেট্‌সি-মাছি ও অন্যান্য বিষাক্ত পোকার অত্যাচার বেশী, এবং গরু প্রভৃতির নানাপ্রকার পীড়া হয়। তথাপি এই অঞ্চলে পশুপালন হয়। **স্যাভানা তৃণভূমির মধ্যে**—

(১) **আফ্রিকার** "স্যাভানা" নামে খ্যাত অঞ্চলে অর্থাৎ নাইজেরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, নিয়াসাল্যাণ্ড, এঙ্গোলা ও উ. রোডেশিয়া লইয়া গঠিত উষ্ণমণ্ডলের সুদান আদর্শের জলবায়ুর দেশে **গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল, জিরাফ, জেব্রা, প্রভৃতি পশু** প্রতিপালিত হয়। তন্মধ্যে গরুই বিস্তৃতভাবে পালিত হয়। কারণ, ইহাদের মধ্যে গরুই অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। আবার, এই অঞ্চলে যেমন তৃণভোজী পশু আছে, সেইরূপ এইসকল পশুভোজী সিংহ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও বাস করে। এইসকল হিংস্র জন্তুর নিকট হইতে একমাত্র গরুই কতক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে এখানকার গো-পালন লাভজনক নহে।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকার** উত্তর-পশ্চিম অংশে (ক) কলম্বিয়া দেশের উত্তর অংশের নিম্নভূমির "বলিভার স্যাভানা" নামে পরিচিত অঞ্চল, (খ) ভেনেজুয়েলা দেশে ওরিনকো নদীর অববাহিকায় "ল্যানোস্‌" নামে পরিচিত তৃণভূমি, (গ) ব্রাজিলের অন্তর্গত "ক্যাম্পোস" নামে তৃণভূমি, ও (ঘ) আর্জেন্টিনার উত্তর-পশ্চিমে ও প্যারাগুয়ে-র পশ্চিমে অবস্থিত "চাকো" নামক তৃণভূমিই—দক্ষিণ আমেরিকার "স্যাভানা"-অঞ্চল। এই অঞ্চলে চারণার্থ যে, সকল পশু আছে, তাহাদের মধ্যে গরুই প্রধান। এখানকার গরুও নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত। এখানকার চাকো-অঞ্চলের গরু প্রধানতঃ মাংসের নির্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৩) **অস্ট্রেলিয়ায়,**—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে, এবং উত্তর টেরিটরি ও কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশের উত্তর ভাগে যে-তৃণভূমি আছে, ইহাই অস্ট্রেলিয়ার "স্তাভানা"-তৃণভূমি। এখানে **উচ্চশ্রেণীর মাংসের গরু** প্রতিপালিত হয়। কারণ এখানে বৃষ্টিপাত ২০" অপেক্ষা বেশী,—এখানে গভর্ণমেন্ট নলকূপ স্থাপন করিয়া আরও জলের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—যাহাতে এখানকার খরগোসে তৃণ নষ্ট না করিতে পারে ও বন্য কুকুর গবাদি পশুর অনিষ্ট না করিতে পারে, সেজন্য গবর্ণমেন্ট এই তৃণাঞ্চলগুলি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছেন। তাছাড়া, ইহার অনেকাংশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া মাংস বিদেশে রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হয়।

তৃণাঞ্চলের পশুগণ ও পশুজাত দ্রব্য

গরু (Cattle)।—(**পণ্যদ্রব্য—দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, হাড়, চর্ম, মাখন, পনীর, চর্বি প্রভৃতি**)। **গরু-উৎপাদনে** প্রথম স্থান অধিকার করে,—ভারতবর্ষ। তাহার পরে—আ. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চীন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, প. জার্মানি ও তুরস্ক প্রভৃতি।

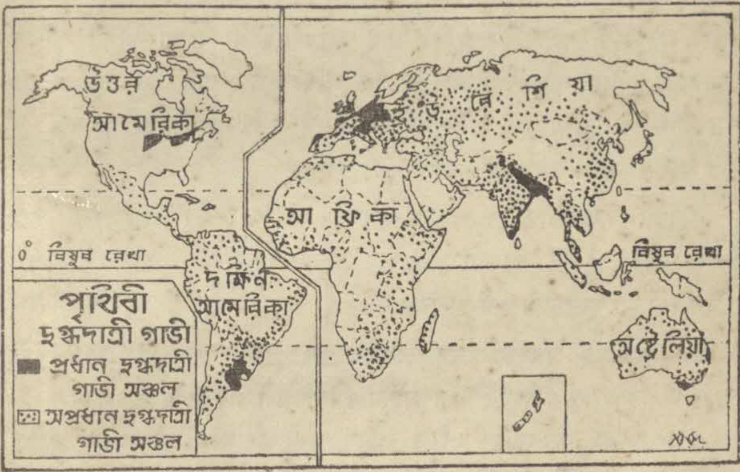
পূর্বে দুগ্ধ ও মাংসের জন্য আলাদাভাবে গো-পালন হইত না। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গরু পালিত হয়। তবে কখনও-কখনও একই গরু দুই উদ্দেশ্যেও (dual purpose) ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু **গোমাংস-উৎপাদনে প্রথম স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্রের**। অন্য মাংস-উৎপাদক স্থান—আর্জেন্টিনা, প. জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ক্যানাডা, ইতালী ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।

সর্বাপেক্ষা অধিক গোমাংস **রপ্তানি** হয় আর্জেন্টিনা হইতে। তাহার পরে রপ্তানি-কারক দেশ—অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, নিউজিলণ্ড, ডেনমার্ক, আ. যুক্তরাষ্ট্র ও উরুগুয়ে প্রভৃতি।

ভারত গো-বধ করে না। তাই মাংস-রপ্তানি-ক্ষেত্রে তাহার নাম নাই। **আ. যুক্তরাষ্ট্রের** মাংসের দরকার বেশী। সেজন্য তাহার রপ্তানি কম। **আর্জেণ্টিনার** ব্যবসায়ার্থিক তৃণক্ষেত্রে (২১১ পৃ.) প্রচুর উচ্চশ্রেণীর গরু প্রতিপালিত হয়। সেজন্য সেখান হইতে প্রায় পৃথিবীর মোট রপ্তানি-করা মাংসের এক-তৃতীয়াংশ (১৯৬০ সালে পৃথিবীর রপ্তানি-মাংস ৯২৭ স. মে. ট., আর্জেন্টিনার—২৮০) পাওয়া যায়। **উরুগুয়ের** তৃণাঞ্চল বহুবিস্তৃত এবং গো-পালন ও গো-সংক্রান্ত শিল্পের জন্য

বিখ্যাত। **অস্ট্রেলিয়ার** দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, পূর্ব উপকূলে ও উত্তর-অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া সেখানে গো-পালন হয়। মাংসের গরু প্রতিপালিত হয় প্রধানতঃ কুইন্সল্যাণ্ডে ও উত্তর টেরিটরিতে (২১২ পৃ.)। উত্তর টেরিটরিতে উহা প্রধান শিল্প। কুইন্সল্যাণ্ডে—টাউন্সভিল, রকহম্পটন, গ্লাডস্টোন, ব্রিজবেন



৭৪নং চিত্র।—পৃথিবীর প্রধান দুগ্ধদাত্রী-গাভী-অঞ্চল।

প্রভৃতি স্থানে মাংসের কারখানা আছে। অস্ট্রেলিয়ার গরুর ¾ অংশ মাংসের জন্য এবং ¼ অংশ দুগ্ধের জন্য প্রতিপালিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে দুগ্ধ-সম্বন্ধীয় কারখানা বেশী। এক্ষণে জাহাজে হিম-প্রকোষ্ঠ হইয়াছে। সেজন্য এখানকার ও নিউজিলণ্ডের গোমাংস ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয়।

ইউরোপের **মধ্য-পশ্চিম** অঞ্চলে আয়র্লণ্ড, বৃষ্টিবহুল পশ্চিম-ইংলণ্ড, উচ্চতর দক্ষিণ-জার্মানি, হাঙ্গারি, পোলণ্ড ও রুশিয়া দেশে মাংসের জন্য গো-পালন হয়। তথাপি আ. যুক্তরাষ্ট্রের ও আর্জেন্টিনার মোট রপ্তানি-করা মাংসের অধিক ভাগ ইউরোপে আসে।

সর্বপ্রধান আমদানি-কারক দেশ—যুক্তরাজ্য (১৯৬০ সালের হিসাবে পৃথিবীতে মোট আমদানি ৯১১ স. মে. ট.-এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে যায় ৩৫৮), তৎপরে আ. যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, প. জার্মানি, রুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স। (১৯৬০ সালে মোট আমদানির মধ্যে ৬৫৮ স. মে. ট. পশ্চিম ইউরোপ আমদানি করিয়াছিল)।

গোদুগ্ধ।—গোদুগ্ধ-উৎপাদনে ইউরোপই সর্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে উত্তর আমেরিকা। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ (১৯৬০) গোদুগ্ধ-উৎপাদক দেশ—ফ্রান্স, প. জার্মানি, যুক্তরাজ্য।

উত্তর আমেরিকায় আ. যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে—ক্যানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড। আ. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বপ্রধান দুগ্ধ-উৎপাদক দেশ।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দুগ্ধ-সংক্রান্ত ব্যবসায়-স্থান রহিয়াছে। এই অঞ্চলে দুগ্ধ-সংক্রান্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ে **প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে জার্মানি।** তৎপরে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, হলণ্ড, ডেনমার্ক। এতদ্ব্যতীত বেলজিয়ম, সুইজর্লণ্ড, ও পশ্চিম রুশিয়া এই ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য স্থান। ইতালীর পো-উপত্যকা পনীরের জন্য বিখ্যাত। উত্তর ইতালীর গরগনজোলা (Gorgonzola) ও পারমেশান (Parmesan) সহরের নিজ-নিজ নামের পনীর সুবিখ্যাত। কিন্তু এখান হইতে যত রপ্তানি হয়, আমদানিও প্রায় তত হয়।

ইউরোপে **ডেনমার্ক** দুগ্ধ-সংক্রান্ত ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ দেশ। এখানকার সমবায়-সমিতি দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায় এরূপ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করে যে, পৃথিবীতে ইহা বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

আ. যুক্তরাষ্ট্রে "বিশাল সমতলভূমি"তে (২১০ পৃ.) অল্প কিছু-কিছু দুগ্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে উইসকন্‌সিন্ দুগ্ধপণ্যদ্রব্য ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ স্থান।

ক্যানাডার হিউরন হ্রদ হইতে কুইবেক সহর পর্যন্ত সেণ্ট লরেন্স নদীতীরে কৃষিকার্য ভাল হয় না বটে, কিন্তু দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য এ-অঞ্চল বিখ্যাত।

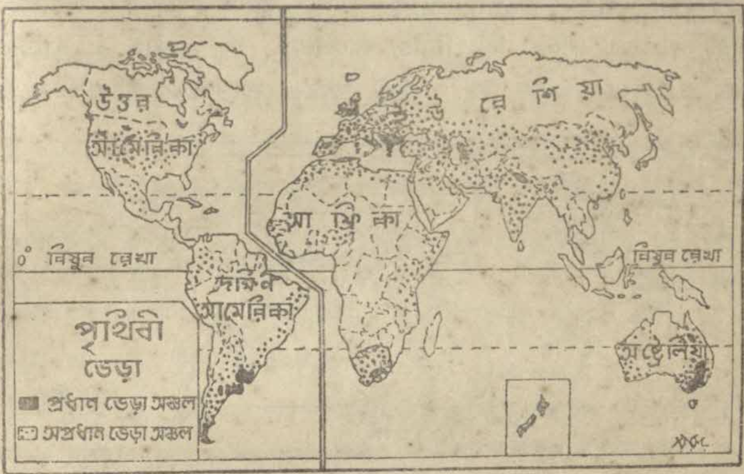
মাখন বেশী উৎপন্ন হয় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে। তৎপরে প. জার্মানি, ফ্রান্স, নিউজিলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানে। কিন্তু রপ্তানিকারক প্রধান দেশ নিউ জিলণ্ড ও ডেনমার্ক। আমদানিকারক প্রধান দেশ যুক্তরাজ্য।

পনীর-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ দেশ—আ. যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে ইতালী, ফ্রান্স, প. জার্মানি প্রভৃতি।

ছাগল (Goat)।—(**পণ্যদ্রব্য—চর্ম**)—প্রধান প্রতিপালন স্থান—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সো. রুশিয়া, তুরস্ক, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, স্পেন, গ্রীস, ট্যাঙ্গানাইকা প্রভৃতি।

ছাগলের দুগ্ধ, চর্ম ও লোম মানুষের ব্যবহারে লাগে। কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ছাগদুগ্ধের বা ছাগমাংসের স্থান নাই। ছাগলের **চর্মই** বাণিজ্য-ক্ষেত্রে মূল্যবান্। ভারত, পারস্য, পাকিস্তান, মোঙ্গোলিয়া ও চীন দেশ হইতে ইহার রপ্তানি হয়। কিন্তু এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত এঙ্গোরা অঞ্চলের "মোহের" জাতীয় ছাগলের লোম কোমল ও উজ্জ্বল—এজন্য উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। আ. যুক্তরাষ্ট্রের টেক্‌সাস অঙ্গরাজ্যের এড্‌ওয়ার্ড মালভূমিতে এই ছাগল প্রতিপালিত হয়।

ভেড়া (Sheep)।—(পণ্যদ্রব্য—মাংস, পশম, চর্ম, মাখন, পনীর, বসা)। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মেষপালন-স্থান অস্ট্রেলিয়া। পৃথিবীর সমগ্র মেষের



৭৫নং চিত্র।—পৃথিবীর প্রধান মেষ-উৎপাদন-স্থান।

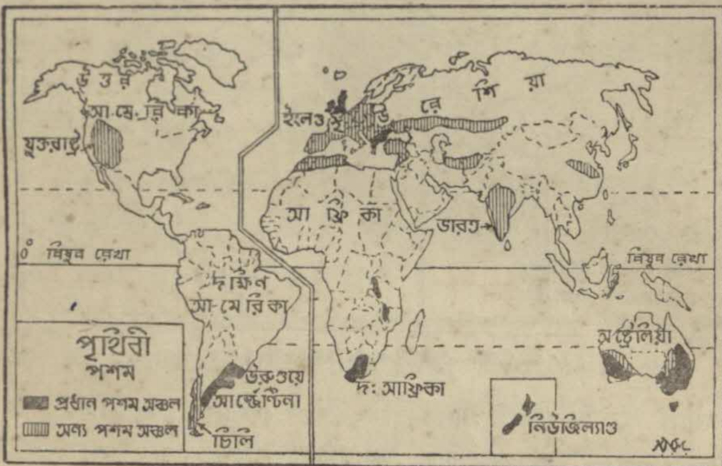
এক-ষষ্ঠাংশ অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিপালিত হয়। অন্য মেষপালন-স্থান (১৯৬০ সালের ক্রমানুসারে)—সো. রুশিয়া, চীন, আর্জেন্টিনা, নিউজিলণ্ড, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, আ. যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে প্রভৃতি।

পূর্বেই বলিয়াছি (২০৯ পৃ.), যেখানে বৃষ্টিপাত কম, ছোট-ছোট ঘাস জন্মে এবং গ্রীষ্মের উত্তাপও বেশী হয় না সেখানেই মেষপালন হয়। যে-সকল তৃণক্ষেত্রে ব্যবসায়ের জন্য মেষপালন হয়, তাহারও পরিচয় পূর্বে (২১০ পৃ.) দিয়াছি। উপরি-উক্ত দেশগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই সেই সকল তৃণাঞ্চল অবস্থিত। মেষপালন ও মেষসংক্রান্ত ব্যবসায় হিসাবে তিনটি অঞ্চল প্রসিদ্ধ—(১) **অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিলণ্ড লইয়া ওশিয়ানিয়া-অঞ্চল**, (২) **দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দক্ষিণ-আমেরিকা**, (৩) **দক্ষিণ আফ্রিকা-অঞ্চল**। তাহা হইলে **দক্ষিণ গোলার্ধেই অধিকসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত** হয়। ইহাই **মেষমাংস ও মেষের লোম রপ্তানির প্রধান অঞ্চল**।

মেষমাংস—অধিক রপ্তানি হয় **নিউ জিলণ্ড, আর্জেন্টিনা, ও অস্ট্রেলিয়া** হইতে। ইহার প্রধান খরিদ্দার **যুক্তরাজ্য**। এত বড় খরিদ্দার পৃথিবীতে আর নাই—সমস্ত আমদানি করা মাংসের প্রায় ৯৪ শতাংশ এখানে যায়। নিউ জিলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া পশুপালনে ও পশুব্যবসায়ে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

পৃথিবীর এক-দশমাংশ মাংস ও ৪৪% পশম অস্ট্রেলিয়া হইতে, এবং তিন-চতুর্থাংশের বেশী মাংস ও ন্যূনাধিক ১৭% পশম নিউ জিলণ্ড হইতে রপ্তানি হয়।

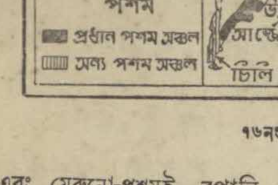
পশম।—পশম উৎপাদন-স্থান (১৯৬০ সালের হিসাব মত ক্রমান্বয়ে) —অস্ট্রেলিয়া, সো. রুশিয়া, নিউ জিলণ্ড, আর্জেন্টিনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, দ. আফ্রিকা সম্মেলন ও উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ। নিউ জিলণ্ডে মেরুনো মেষ প্রতিপালিত হয়



১৬নং চিত্র—পৃথিবীর পশম-উৎপাদন-স্থান।

এবং মেরুনো-পশমই রপ্তানি করা হয়। পশম সর্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানি হয়—অস্ট্রেলিয়া, সো. রুশিয়া, নিউ জিলণ্ড, আর্জেন্টিনা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ও উরুগুয়ে হইতে। আমদানিকারক দেশ—গ্রেট বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, আ. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, প. জার্মানি প্রভৃতি।

পশম হইতে শিল্পদ্রব্য—প্রধানতঃ ইউরোপেই প্রস্তুত করা হয়। প্রধান শিল্পসৃষ্টির স্থান—ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি, ইতালী প্রভৃতি। উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা ও আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রধান শিল্পদ্রব্য সৃষ্টির স্থান। দক্ষিণে শ্রেষ্ঠ পশম-উৎপাদন স্থানে পশমের শিল্পদ্রব্যের সৃষ্টি হয় না।



১৭নং চিত্র—লামা।

লামা, ভাইকুনা, আলপাকা।—এই তিনটি কতকাংশে ছাগ, কতকাংশে উষ্ট্রবৎ জন্তু। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু ও চিলি দেশে, আন্দিজ পর্বতের উচ্চ অংশে

ইহারা বাস করে। ইহাদের মধ্যে ভাইকুনা বন্য ও অন্য দুইটি গৃহপালিত পশু। ভাইকুনা ও আলপাকার লোম উৎকৃষ্ট ও অল্প পরিমাণে রপ্তানি হয়। লামার পশম মোটা ও অমসৃণ এবং সাধারণতঃ মোটা কাপড় প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পশুচর্ম (Hides and Skins)।—বাঙ্গালায় Hides ও Skins—এই দুই শব্দেরই অর্থ চর্ম। চর্মের কোন শ্রেণী বুঝাইতে হইলে উপযুক্ত বিশেষণ দ্বারা তাহা বুঝাইতে হয়। কিন্তু ইংরাজীতে গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি বড়-বড় জন্তুর অপরিষ্কৃত কাঁচা চামড়াকে Hides বলে ;—এবং ভেড়া, ছাগল, ও অন্য ছোট-ছোট জন্তুর চামড়াকে Skins বলে। কিন্তু মানুষের চামড়াকেও Skins বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে গো-চর্মের যে-গুলি কাঁচা অবস্থায় ২৫ পাউণ্ড, ও শুষ্ক অবস্থায় ১২ পাউণ্ড, এবং শুষ্ক ও লবণাক্ত অবস্থায় ওজনে ১৫ পাউণ্ড ও তদূর্ধ্ব, তাহাকে Hides বলে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গো-চর্ম ও মহিষ-চর্মের নাম buff.

সাধারণতঃ গরু, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়ার চর্মই বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রধান। কিন্তু কুম্ভীর, হাঙ্গর, খেঁকশিয়ালী, সীল, বানর, সাপ, প্রভৃতির চামড়াও বাণিজ্যক্ষেত্রে আসে। বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী চামড়া আসে গরু ও মহিষের। প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, ব্রাজিল ও মেক্সিকো হইতে ছাগলের চামড়া, এবং আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে গবাদির চামড়া পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় চামড়ার ব্যবসায় চলে। তবে যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, ব্রাজিল, হলণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, বেলজিয়ম, অস্ট্রেলিয়া, আয়র্লণ্ড, সুইজর্লণ্ড, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, নিউ জিলণ্ড, প্রধান কাঁচা চামড়ার উৎপাদন-স্থান। ইহাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিলণ্ড, গ্রীস, আয়র্লণ্ড, স্পেন ও আর্জেন্টিনায় ভেড়ার চামড়ার অংশই বেশী।

শূকর (Pig)।—(**পণ্য—মাংস ও চর্বি**)।—পৃথিবীর হিসাবে শূকরের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী চীন দেশে। তার পরে শূকর-প্রতিপালন-স্থান—আ. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, পোলণ্ড, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানি, মেক্সিকো প্রভৃতি।

গৃহপালিত শূকরের এক অংশ কৃষিক্ষেত্র-বাটিকায় থাকে,—এবং কৃষিক্ষেত্রের ও গৃহের, বিশেষতঃ রান্নাঘরের নানা পরিত্যক্ত দ্রব্য খাইয়া সন্তুষ্ট হয়। যেগুলি চর্বির জন্য প্রতিপালিত হয় ভুট্টা তাহাদের প্রধান খাদ্য,—ভুট্টা খাইয়া তাহাদের দেহ তৈলাক্ত ও মাংসে পরিপুষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ভুট্টার জন্য বিখ্যাত। সুতরাং সেখানকার ভুট্টাক্ষেত্র, বিশেষতঃ আইওয়া ও মিসৌরি রাষ্ট্রদ্বয়ে প্রচুর শূকর প্রতিপালিত হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা-অঞ্চল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শূকরের চর্বি, ও লবণ-

শোধিত পক্ষর ও পৃষ্ঠের মাংস (bacon) রপ্তানির স্থল। ইউরোপের শূকর মাংসের জন্য প্রতিপালিত হয়। ঐ অঞ্চলে দুগ্ধ সুলভ। সেজন্য শূকর কৃষি-বাটিকার পরিত্যক্ত মাখন-তোলা দুধ প্রচুর খাইতে পায়। এই অঞ্চলের আলু ও বার্লি



৭৮নং চিত্র।—শূকর-প্রতিপালন-স্থান।

তাহারা খাইয়া থাকে। কিন্তু বার্লি দামী শস্য। সেজন্য ইহাদের ক্লোভার (clover) নামক একপ্রকার ত্রিপত্র তৃণ খাওয়ানো হয়। ইউরোপে আয়র্লণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স,—যব-উৎপাদক দেশ পোলণ্ড ও রুশিয়া,—এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গম-উৎপাদক হাঙ্গারি, রোমানিয়া ও দক্ষিণ-রুশিয়া প্রধান শূকর-পালন-স্থান।

শূকরের **মাংসের** (pork) প্রধান **রপ্তানির স্থান**—আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি। **আমদানি**-স্থান—পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

কুক্কুটাদি পক্ষিপালন (Poultry)।—(**পণ্য—মাংস, ডিম, পালক ও পক্ষী**)। **নানাকথা**—মাংস, ডিম, পালকের **জন্য** পাতিহাঁস, রাজহাঁস, মুরগী ও পেরু (Turkey) নামক মুরগী জাতীয় পক্ষী প্রতিপালিত হয়। কিন্তু সব পক্ষী হইতে সব পণ্য পাওয়া যায় না। রাজহাঁস, পাতিহাঁস, ও পেরু প্রতিপালিত করা হয় প্রধানতঃ **মাংসের জন্য;—মাংস ও ডিম উভয়ের জন্য** প্রতিপালন করা হয়—মুরগী। হাঁসের ডিমও ব্যবহৃত হয়। আবার এই সকল পক্ষী হইতে, নানাস্থানে নানা সঙ্কর পক্ষী সৃষ্টি করিয়া উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা গিয়াছে।

প্রতিপালন-স্থান।—ইউরোপে,—যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হলণ্ড, পোলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশ**, এবং **স্পেন** ও **রুশিয়া**,—উত্তর আমেরিকার **ক্যানাডা** ও **আ. যুক্তরাষ্ট্র**,—এশিয়ার **চীন** ও **জাপান**.—**ডিমের জন্য** বিখ্যাত।

মুরগী বেশী উৎপন্ন হয় ইউরোপে,—রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালী. প. জার্মানি, হলণ্ড, ডেনমার্ক ও **বেলজিয়ম** দেশে ও **বলকান রাজ্যে**। উত্তর আমেরিকার আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা ; দক্ষিণ আমেরিকার—ব্রাজিল ; এশিয়ার ভারত ও জাপান ও ফিলিপাইন হইতেও মুরগী রপ্তানি করা হয়।

উত্তর আমেরিকার **ক্যানাডা** ও **আ. যুক্তরাষ্ট্র**,—দক্ষিণ আমেরিকার **আর্জেন্টিনা** ;—এশিয়ার **তুরস্ক, চীন, জাপান ও ফিলিপাইন**, ও—আফ্রিকার **মোরক্কো** হইতে **মুরগী সম্বন্ধীয় পণ্য** রপ্তানি হয়।

১৯৬০ সালের হিসাবে পৃথিবীর **রপ্তানি ক্ষেত্রে ২২৫১ স. মেট্রিক টন মাংস আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ৪৩% ই গো-মাংস। মেষ মাংস ২২%, ৯% শূকর** মাংস, ১০% **কুক্কুট-মাংস** এবং **অন্যান্য ১৬ শতাংশ**।

পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ ডিম-উৎপাদন-স্থান ডেনমার্ক**। ডেনমার্কের ডিমের প্রধান খরিদ্দার গ্রেট্‌বৃটেন,—**পৃথিবীর অর্ধেক ডিমই এখানে বিক্রয় হয়**।

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে চারিটি অঞ্চল পক্ষিপালনের জন্য বিখ্যাত। ভুট্টাক্ষেত্রেই পক্ষিপালন সুলভে হয়। সেজন্য এখানে পক্ষিপালনের (১) **শ্রেষ্ঠ অঞ্চল**—ভুট্টা-অঞ্চল ও তাহার সন্নিহিত স্থান। যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক পক্ষী এখানে প্রতিপালিত হয়। (২) **দ্বিতীয় অঞ্চল—কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে**—সান্ ফ্রান্‌সিস্কো উপ-সাগরের উত্তরে সোনোমা কাউন্টি ও দক্ষিণে লস্ এঞ্জেলেস্ কাউন্টি মুরগী পালনের কেন্দ্রস্থল। (৩) **তৃতীয় অঞ্চল—পেন্‌সিলভানিয়া ও নিকটবর্তী রাষ্ট্র-সকল**। এখান হইতে ইউরোপে ডিম চালান দেওয়ার সুবিধা। প্রধানতঃ সেকারণেই এখানে পক্ষিপালন উন্নতি লাভ করিয়াছে। (৪) **চতুর্থ অঞ্চল—চেসাপিক্ উপসাগর ও ডেলাওয়ার উপসাগরের মধ্যবর্তী উপদ্বীপ।** এতদ্ব্যতীত, **যুক্তরাষ্ট্রের** সর্বত্রই ন্যূনাধিক মুরগী ও হাঁস প্রতিপালিত হয় ও হাঁসের পালক বিক্রীত হয়।

চীনের ডিম নিকৃষ্ট। কিন্তু এখান হইতে বিস্তর ডিম, ডিমের কুসুম ও ডিমের শুকানো ও গুঁড়া-করা শ্বেতাংশ এবং জমানো ও খোসা-ছাড়ানো কতক ডিম রপ্তানি করা হয়।

এইবার এই স্থানে পৃথিবীর কয়েকটি জন্তুর হিসাব দেওয়া হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে কোন্ জন্তুর আধিক্য বেশী—

পৃথিবীর কয়েকটি জীবজন্তুর সংখ্যা ১৯৫৯-৬০

মহাদেশ	অশ্ব (লক্ষ)	অশ্বতর (লক্ষ)	গাধা (লক্ষ)	গরু (লক্ষ)	শূকর (লক্ষ)	ভেড়া (লক্ষ)	ছাগল (লক্ষ)	মহিষ (লক্ষ)
ইউরোপ (রুশিয়া বাদে)	১২৯	২০	২৭	১১৩০	১০৫১	১৩৪০	১৬৩	৫
সো.-রুশিয়া	১১০	×	×	৭৪০	৫৩৪	১৩৬০	৭৯	
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা	৯৮	৪১	৩৭	১৪২০	৮০৫	৪২০	১৬৯	
দক্ষিণ আমেরিকা	১৭০	৫৩	৪০	১৫৮০	৫৯৫	১২০০	২৫২	
এশিয়া (চীন ব্যতীত)	৬৪	১২	৭৩	২৩৩০	৩৫৬	১৫৫০	১২৭৫	৭০৭
চীন	৭৬			৪৪০	১৮০০	৬১০		২০৯
আফ্রিকা	৩৩	১৮	১০৫	১১১০	৪৩	১৩৮০	৯৪৫	
ওশিয়ানিয়া	৮			২৩০	২৩	২০২০	২	
পৃথিবী	৬৮৮	১৬১	৪০১	৮৯৯০	৫২০৭	৯৮৮০	৩৩৯৯	

(২)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জীবজন্তু

ভারতের কয়েকটি জীবজন্তুর সংখ্যা ১৯৫৬*

(সহস্র সংখ্যক)

স্টেট্‌স—

অঙ্গরাজ্য	অশ্ব	গরু	মহিষ	ভেড়া	ছাগল	অন্যান্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	৯৬	১০৯৪৮	৫৭৪৩	৭৪২৮	৩৮০১	৭০৮
আসাম	১৬	৫২৪৭	৪৭৮	৩২	১১০৩	৩০৬
উত্তরপ্রদেশ	৫৫২	২২৯৩৮	৯৭৮১	১৯০৩	৬১৫৮	১৪১৬
উড়িষ্যা	৬	৮০৩৬	৮৮৪	৬১৯	১৯২৪	১১৪
কেরল	২	২৫৩৬	৫১৫	১০০	৯১৮	১২৫
জম্মু ও কাশ্মীর	৯৬	১৭৫৭	৩৭৪	১৪৬৫	৮১৪	২
প. বঙ্গ	৩০	১১৫৮৭	৭৭২	৬৬৭	৫২৯৮	৩৪৫
পাঞ্জাব	১০০	৫৯৪৩	৩৮৫২	১১৬৪	১৮৭১	৪৪৫
বিহার	১১৯	১৪৩৩১	৩৩৮৭	৯৯০	৬৪২২	৭০৯
বোম্বাই (বর্তমান গুজরাট ও মহারাষ্ট্র)	২৪৫	২০২৩১	৫৪২৭	৪০০০	৭১৫৫	৪০৭
মধ্যপ্রদেশ	২৫৩	২২৫৬০	৪৯৯৫	৮৯৮	৫২২০	৪২৫
মহীশূর	৪২	৮৯৯৭	২৬৪২	৪১৫১	২৬০৬	২৫৪
মাদ্রাজ	১৯	৯৮৫৯	২০৬৬	৭১৭৩	৩৯৬৫	৫৬৯
রাজস্থান	১১৩	১২১২৭	৩৪৫২	৭৩৭৩	৮৭৩৪	৭০০

ইউনিয়ন টেরিটরিজ—

অঙ্গরাজ্য	অশ্ব	গরু	মহিষ	ভেড়া	ছাগল	অন্যান্য
আন্দামান ও নিকোবর	×	৫	৬	×	৪	১৪
ত্রিপুরা	১	৩১৭	৪১	৩	১০৯	৪১
দিল্লী	৭	১২০	১১৫	৭	২২	৩৫
মণিপুর	১	১৪৩	১৭	×	৬	৩৬
লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদি	×	×	×	×	×	
হিমাচল প্রদেশ	৫	১১৭৯	২১৯	৬৩৩	৫৯৮	৬
	১৫০৩	১৫৮৮৬৩	৪৪৭৬৬	৩৮৬৬৬	৫৬৬২৮	*৬৬৫৭

* Times of India Directory & Yearbook 1960-61.

ভারতের জীবজন্তু পালনের সমস্যা।—পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ গরু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পশুগণনায় ভারতে ১৫ কোটি ৮৮ লক্ষ গোরু, ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ মহিষ, ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ভেড়া ও ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ছাগল ছিল। কিন্তু ভারতের গরু নিকৃষ্ট। কৃষিকার্যে ও দুগ্ধ-প্রয়োজনে ইহা অপরিহার্য। সেজন্য ভারতবর্ষে গোজাতি হিন্দুর নিকট পূজনীয় ছিল এবং এদেশে গো-পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু গো-সেবায় ভারতীয় হিন্দুর স্থান অতি নিম্নে। ইউরোপে ও নিউ জিলণ্ড প্রভৃতি স্থানে গরুর যেরূপ সেবাযত্ন হয়, ভারতে তাহার সামান্য অংশও হয় না। ভারতের গরু অন্য দেশের গরুর তুলনায় ক্ষীণকায় ও দুর্বল, এবং দুগ্ধদানে নিকৃষ্ট।

সমস্যা।—(১) গবাদির খাদ্যবস্তুর জন্য এদেশে ভাল ব্যবস্থা নাই। গ্রাম-অঞ্চলে গরু প্রায় ছাড়াই থাকে। মাঠে চরিয়াই তাহাদের অধিকাংশ খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। (২) পূর্বে প্রত্যেক গ্রামেই গোচারণের মাঠ ছিল। সেইস্থানে সর্বসাধারণের গরু চরিয়া বেড়াইত। কিন্তু ভারতে **লোকবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এইসকল গোচারণের মাঠও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।** যখন ক্ষেত্রে শস্য থাকে তখন গরুর চরিবার কোন স্থানই থাকে না। (৩) এদেশে গরুর জন্য **কিছু ঘাস-খড় দেওয়া হয় বটে, তাহাও অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর।** ভারতের সর্বত্র গরু আছে, কিন্তু ঘাস নাই। **(৪) এদেশে আলাদা ভাবে পশুখাদ্য উৎপাদন করাও হয় না।** (৫) তাছাড়া **গোশালা প্রভৃতিও স্বাস্থ্যকর নহে।**

(৬) **গো-প্রজনন-ব্যবস্থা এদেশে ভাল নহে।** হিন্দুদিগের যে "ধর্মের ষাঁড়" ছাড়িবার প্রথা ছিল, ঐ ষাঁড় উচ্চজাতির না হইলে ক্ষতি হয়। এখন এই ষাঁড় ছাড়ার প্রথাও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্বে যে আবশ্যকত ষাঁড় পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতেও ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ ষাঁড়-প্রতিপালন-ক্ষেত্রে ষাঁড়ের সংখ্যা বেশী নহে। উপযুক্ত ষাঁড়ের অভাবে এদেশে গো-বংশের অবনতি ঘটিতেছে। ভারতে বোম্বাই, মহীশূর, গুজরাট, মধ্যভারত অঞ্চলে প্রজনন-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

গরুর সংখ্যা উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার ও রাজস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রে বেশী এবং অনেক স্থলে কম। লোকসংখ্যার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই।

(৭) **গো-চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নাই।** গ্রাম-অঞ্চলে কোথাও-কোথাও কোন গো-চিকিৎসকও নাই। ছোট-ছোট সহরেও ইহা সহজপ্রাপ্য নহে।

ভারতে চর্মশিল্প (Hide, Skin, Leather)

Hide ও Skin প্রভৃতি শব্দের অর্থ ২১৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। এইসকল চামড়া কতকগুলি বৃক্ষের ও ফলের রস দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইলে তাহার নাম হয় Leather.

পশ্চিম-পৃথিবীতে চামড়ার রং ও সংস্কার করা হয় ওক ও হেমলক প্রভৃতি গাছের ছালের রসে। **ভারতবর্ষে চর্মশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়**—(১) বাবলা, আভারাম, দিবিদিবি, ওয়াটল্ (wattle), গরাণ, গর্জন, সোনালি প্রভৃতি গাছের ছাল ও হরীতকী ফলের কষায় রস, অথবা (২) কতকগুলি লবণ-পদার্থ ও রাসায়নিক দ্রব্য। যে ক্রোম-চামড়া বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্রোমিয়ম সল্ট (Chromium salt) নামক লবণ-দ্রব্য যোগে প্রস্তুত হয়।

চামড়ার প্রাপ্তিস্থান।—চামড়া সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় মাদ্রাজ হইতে। কারণ এখানকার গবাদি পশুর মৃত্যুর হার বেশী। এই কারণে বঙ্গদেশ হইতেও বেশী চামড়া পাওয়া যাইত। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এখানকার চামড়ার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের পরে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রভৃতির স্থান। পশ্চিম-ভারতে গোরুর মৃত্যুর হার কম। সেইজন্য গোরুর সংখ্যা বেশী হইলেও চামড়া কম পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে গোবধ নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধপ্রায়। পাঞ্জাব হইতে বেশী চামড়া পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহার প্রায় অর্ধেক এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা চামড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়;—সাধারণতঃ ভারতে প্রতি বৎসর ৬ কোটি নূতন চামড়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৬২ লক্ষ গোচর্ম, ৫৫ লক্ষ মহিষচর্ম, ২৩২ লক্ষ ছাগচর্ম, ১৫১ লক্ষ ভেড়ার চর্ম প্রতিবৎসর পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে ভারতবর্ষে ক্রোম চামড়া—৮ লক্ষ, গোচর্ম ২১ লক্ষ, চামড়ার থান (leather cloth) ৫৮ লক্ষ মিটর এবং চামড়ার জুতা ৯২ লক্ষ জোড়া প্রস্তুত * হইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার যে,—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চামড়ার শতকরা ৮০ ভাগ মৃত গোরুর চামড়া। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কসাইখানায় নিহত গোরুর চামড়াই উৎকৃষ্ট। ছাগল, ভেড়া প্রত্যহই অধিক পরিমাণে কসাইখানায় বধ করা হয়। সেজন্য ইহাদের নিহত প্রাণীর চামড়ার সংখ্যাই বেশী। হিসাবমত দেখা যায়,—সর্বাপেক্ষা অধিক গোচর্ম পাওয়া যায়,—পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজ হইতে;—সর্বাপেক্ষা অধিক মহিষের চামড়া ও ভেড়ার চামড়া পাওয়া যায় মাদ্রাজ হইতে, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ছাগলের চামড়া পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশ হইতে।

চর্মশিল্পের কেন্দ্রভূমি।—চর্মশিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) চর্মসংস্কার (tanning), ও (২) চর্মদ্রব্য-নির্মাণ (shoe-making etc.)।

কতক পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে চর্মসংস্কার ও চর্মদ্রব্য-নির্মাণের জন্য এদেশে ১৯৫৬ খৃ. অব্দে প্রায় সাতশত ছিয়াত্তরটি কারখানা ছিল বটে, কিন্তু এখনও এই

* Statistical Abstract of the Indian Union 1961.

দুইটি শিল্পই দেশের চামার শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে। তাহারা প্রাচীন দেশীয় মতেই এখনও চর্ম সংস্কার করে এবং কুটীর-শিল্প-হিসাবে চামড়া রং করে ও চর্মদ্রব্য প্রস্তুত করে। সেইজন্য এই ব্যবসা কেন্দ্রীভূত হয় নাই;—সর্ব রাষ্ট্রের সকল অংশেই ছড়ানো রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে চর্মসংস্কার ও চর্মদ্রব্য প্রস্তুত করার বড় কারখানা সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১১৭টি আছে, তন্মধ্যে যাহারা গবর্ণমেন্টের কাছে হিসাব দেয় সেরূপ ৮৬টি মাত্র আছে। এগুলি মান্দ্রাজ, উত্তর-প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উপরি-উক্ত কারখানাগুলির মধ্যে মাত্র ১০টিতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত হয়। একখান মহিষের চামড়া দুইখান গরুর চামড়ার সমান ধরিয়া হিসাব ধরিলে সমগ্র ভারতে বৎসরে ৪৪ লক্ষ দেশীয় ফল বা গাছের ছাল দিয়া প্রাচীন মতে,—এবং ১৫ লক্ষ ক্রোম ট্যানারি প্রথায় সংস্কৃত চর্ম উৎপন্ন হইতে পারে।

চর্মসংস্কার-হিসাবে দক্ষিণ-ভারতই শ্রেষ্ঠ। কারণ—(ক) দক্ষিণ-ভারতে—বিশেষতঃ মান্দ্রাজে, চামড়া পাওয়া যায় বেশী,—ছোট জন্তুর চামড়া (skin) এখানে ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়। (খ) চর্মসংস্কারের উপযোগী কষায়-দ্রব্যের মধ্যে আভারাম এখানে প্রচুর পাওয়া যায়;—হরীতকীও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং শ্রেষ্ঠ বিদেশী কষায়িন ওয়াট্‌ল্‌ পূর্ব ও দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-ভারতের বন্দরে বেশী আসে। সেইজন্য দক্ষিণ-ভারতে উহা সহজেই ব্যবহার করিতে পারা যায়। আবার, (গ) মহীশূরে ও হায়দারাবাদে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক জাতি বাস করে,—চামড়া রং করাই তাহাদের পেশা। (ঘ) পণ্ডিচেরীর একজন ফরাসী মরিশস দ্বীপ হইতে উন্নত প্রণালীতে চামড়ার সংস্কার-শিল্প শিখিয়া আসিয়া মান্দ্রাজের নানাস্থানে কারখানা করেন। ইহাতে শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারত চর্মসংস্কারে পটুতা লাভ করে। (ঙ) দক্ষিণ-ভারতে চর্মসংস্কার অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বড় জন্তুর পাকা চামড়ার (fiinished leather) চাহিদা কম। সেইজন্য ভারতের অর্ধ সংস্কৃত (half-tanned) বড় জন্তুর মোট চামড়ার (hides) তিন চতুর্থাংশ অপেক্ষা বেশী এ-অঞ্চলে তৈয়ারি হয়, ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পূর্ণসংস্কৃত চামড়া উত্তর-অঞ্চলে বিশেষতঃ কানপুরে বেশী। কিন্তু পূর্ণসংস্কৃত ছোট জন্তুর চামড়া মান্দ্রাজেই বেশী জন্মে।

উত্তর-ভারতে চর্মসংস্কার-শিল্পে উত্তরপ্রদেশ ও বঙ্গদেশই শ্রেষ্ঠ। সৈন্যাবাসের প্রয়োজনে ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় কানপুরে পশমীদ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হয়। এই সৈন্যগণের প্রয়োজনেই এখানে গবর্ণমেণ্ট অশ্বসজ্জা-প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করেন, এবং ক্রমশঃ এখানে ইউরোপীয়গণের চেষ্টায় জুতা-প্রস্তুত কারখানাও স্থাপিত হয়। চামড়া-শিল্পের পক্ষে এস্থান উপযোগীও ছিল।—কারণ—(১) চারিদিক

হইতে এখানে চামড়া সংগ্রহ করার সুবিধা ছিল ; (২) এই অঞ্চলে প্রচুর বাবলার গাছ ছিল ; তাহার ছালের কষায় রস চামড়া রং করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; (৩) কানপুর উত্তর-ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত,—সুতরাং এখান হইতে শিল্পদ্রব্য চালান করার বিশেষ সুবিধা ; (৪) সৈন্যাবাস স্থাপিত হওয়ায় এখানে চর্মদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাও বাড়িয়া যায় এবং ইউরোপীয়গণ ও গবর্ণমেণ্ট অগ্রণী হওয়ার জন্যও এই শিল্প এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। উত্তর ভারতে চর্মশিল্পের অন্য স্থান—আগ্রা।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চর্ম-উৎপাদক স্থান ছিল। কষায়িন বাবলা গাছ এবং হরীতকী এই অঞ্চলে কিছু-কিছু মিলিলেও ব্যবসায়ের পক্ষে প্রচুর নহে। কিন্তু কলিকাতা একটি বড় বন্দর,—বঙ্গদেশের চামড়া-রপ্তানির শ্রেষ্ঠ স্থান, এবং কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া, এ-অঞ্চলে চামড়া, ও চর্মদ্রব্যের চাহিদা বেশী ছিল। এইজন্য এ-অঞ্চলে চর্মসংস্কার-শিল্প বহুদিন পূর্বে আরম্ভ হয়। এদেশ হইতে বাবলা ও হরীতকী পাওয়া যায়, এবং বিদেশ হইতে ওয়াট্‌ল্ বা ওয়াটল্-নির্যাস আনাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেমিক্যাল-যোগে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করা তদপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া এখানে এইরূপ চর্মসংস্কারের প্রথার প্রচলন বেশী। দিল্লীও একটি চর্ম শিল্পের কেন্দ্রস্থল।

চর্মসংস্কারের সর্বপ্রধান স্থান বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ, এবং অন্ধ্র ও মহীশূর লইয়া গঠিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে সমগ্র ভারতের ৬০ শতাংশ সংস্কৃত চামড়া উৎপন্ন হয়। এখানে ভারতের ১৯৬০ সালের উৎপন্ন চামড়ার হিসাব দেওয়া হইল—

সংস্কৃত চামড়া*	ক্রোম—৭·৯৪ লক্ষ খণ্ড
	অন্য—২৬·৭৯ লক্ষ খণ্ড
	লেদার—৫৮·৪৭ মিটর
চামড়ার জুতা*	৯০ লক্ষ জোড়া

* Statistical Abstract of the Indian Union 1961.

আমদানি ও রপ্তানি।—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে চর্মশিল্পের স্থান বহু উচ্চে। পৃথিবীর বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে ইহা কখনও-কখনও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ১৯৬০ খৃ. অব্দে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার অসংস্কৃত নানাবিধ চর্ম আমদানি করা হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে অসংস্কৃত চর্ম ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার, সংস্কৃত চর্ম ৬ লক্ষ টাকার, এবং চর্মদ্রব্য ১০ লক্ষ টাকার আমদানি হইয়াছিল। পাকিস্তান প্রধান রপ্তানি-কারক দেশ।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঐ ১৯৬০ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকার অসংস্কৃত চামড়া রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে অসংস্কৃত চামড়া ৮ কোটি টাকার, সংস্কৃত চর্ম ২৫ কোটি টাকার ও চর্মদ্রব্য ১২ লক্ষ টাকার রপ্তানি হইয়াছিল।

যুক্তরাজ্য, সো. রুশিয়া, সুইডেন, জার্মানি ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সর্বপ্রধান খরিদ্দার।

QUESTIONS

1. Describe the principal grazing grounds of the world and mention which animals are principally raised in the grounds.

2. Name the principal wool producing countries of the world and indicate the nature of the wool trade.

3. Describe the distribution of sheep in N. America., S. America, Australia and New Zealand. Under what conditions does the animal thrive best ?

4. Name the countries which supply Great Britain with wool and state the natural advantages they enjoy in regard to the production of this article.

5. What geographical factors determine the distribution of mutton-sheep and wool-sheep? Describe the principal sheep areas of the world. (Cal. B. Com. 1929)

6. Describe the position of Indian Republic as a producer of cattle and also her position in the beef trade of the world.

7. Explain the terms—hide, skin, leather, buff. Which countries of the world are important for hide and skin trade ? Describe the position of India in the trade of hide and skin. How has the partition of India brought about a change in the hide and skin trade of India.

8. Describe the importance of the livestock as sources of power. Name some of the important transport animals and the areas of the world they work.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খনিজ দ্রব্য ও শক্তির উৎস

১

ধাতব ও অ-ধাতু খনিজ পদার্থ

খনিজ উত্তোলন কার্য,—তাহার প্রকৃতি,—প্রধান-প্রধান খনিজ দ্রব্য ;—তাহাদের ব্যবহার ; (i) ধাতুদ্রব্য ;—লৌহ, তাম্র, সীসা, টিন, এ্যালুমিনিয়ম ;—(ii) অধাতু-দ্রব্য :— কয়লা, পেট্রোলিয়ম, লবণ, অভ্র, গৃহনির্মাণ দ্রব্য :—খনিজের প্রধান-প্রধান উৎপাদন-ক্ষেত্র ও খনিজের পরিমাণ,—প্রধান খনিজ-শিল্প।

খনি।—পৃথিবীর ভূ-ত্বক্ শিলা (rock)-ময়। শিলা বলিলে আমরা পাথর বা সেইরূপ কঠিন পদার্থকে বুঝি। কিন্তু ভূ-বিদ্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি, কাদা-মাটি, এমনকি বালুকারও সাধারণ নাম **শিলা**। এই শিলাগুলি সর্বদা না হইলেও অনেক সময় বিভিন্ন খনিজ পদার্থে গঠিত। ভূ-বিদ্যার সাহায্যে খনিজ দ্রব্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলে ভূ-ত্বক্ খনন করিয়া তাহা উত্তোলন করা হয়।

কিন্তু **খনিজ দ্রব্য কাহাকে বলে?**—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, জল,—এই সমস্তগুলিকেই ইংরাজি mineral পর্যায়ে ধরা যায়। Mineral শব্দের বাঙালা প্রতিশব্দ "খনিজ",—যাহা খনি হইতে উদ্ভূত তাহাই খনিজ। কিন্তু খনিজ পদার্থ এরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে যে, খুব সহজে ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। জল ও কাদা, খনি হইতে উদ্ভূত নহে, কিন্তু বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ইহারা খনিজ-পদার্থ-ভুক্ত।

খনিজ পদার্থ সাধারণভাবে **অজৈব** (inorganic) বস্তু। এজন্য কাষ্ঠ ও হাড় —যথাক্রমে উদ্ভিজ্জ ও জীব-সম্ভূত বলিয়া—খনিজ নহে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ হইতে কালধর্মে উৎপন্ন কয়লা, কিংবা হাড় হইতে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন খড়ি খনিজ পদার্থ। সুতরাং খনিজ পদার্থের সহিত যে জৈব পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বলা যায় না।

আবার, **অজৈব বস্তুর** মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক **প্রক্রিয়াবশে** অবস্থা-বিশেষে **কেলাসিত** (crystallised) হয়, অর্থাৎ মিছরির দানার মত জ্যামিতিক আকার প্রাপ্ত হয়। স্ফটিক, অভ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর খনিজ পদার্থ।

সুতরাং স্বভাবতঃ একই উপাদানে গঠিত বা সামান্য পরিবর্তিত যে-সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া-সম্ভূত যৌগিক পদার্থ শিলামধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই **খনিজ পদার্থ** (mineral)।

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের সহিত খনিজ পদার্থের বিশেষ পার্থক্য আছে,—

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ	খনিজ পদার্থ
১। তাহার উৎপত্তি, পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য তাহা জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে।	১। তাহার উৎপত্তির জন্য নির্ভর করে শিলার গঠনের উপর,—জলবায়ু ও মৃত্তিকার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।
২। মৃত্তিকার গুণ বদলাইয়া, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ নূতন কোন স্থানে উৎপন্ন করা সম্ভব।	২। খনিজ পদার্থ স্থানান্তরে উৎপাদন করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।
৩। বর্ষে-বর্ষে যুগে-যুগে একই স্থানে একই প্রকার প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে।	৩। কোন খনি হইতে খনিজ পদার্থ সম্পূর্ণ উত্তোলিত হইলে সেখানে আর নূতন করিয়া সে-পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব নহে।

প্রধান-প্রধান খনিজ দ্রব্য।—খনিজ পদার্থ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—(ক) **ধাতব** বা ধাতু-দ্রব্য (metallic) ও (খ) **অ-ধাতু** দ্রব্য (non-metallic)। **ধাতব খনিজ**—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, লৌহ, তাম্র, এ্যালুমিনিয়ম, সীসা, দস্তা, রাং (টিন), নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। **অধাতব খনিজ পদার্থ**—কয়লা, পেট্রোলিয়ম, লবণ, অভ্র প্রভৃতি এবং গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত—সিমেণ্ট, চূণ, এস্‌বেস্‌টস্‌, জিপসাম, কর্দম, বালি, প্রস্তর প্রভৃতি।

(ক) ধাতব খনিজ দ্রব্য (Metals)

১। লৌহ (Iron)

লৌহ হীনমূল্য বটে, কিন্তু অমূল্য। মানুষের নিত্য প্রয়োজনে ইহার স্থান বহু উর্ধ্বে।

স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ ধাতুরূপে লৌহ বিরল। মাত্র উল্কাদিতে বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। অথচ পৃথিবীতে বোধহয় এমন শিলা নাই যাহার সহিত লৌহের সংমিশ্রণ নাই। কিন্তু প্রায়শঃই শিলাদিতে লৌহের পরিমাণ এত কম যে, তাহা হইতে লৌহ বাহির করিয়া ব্যবহার করা খুব লাভজনক নহে। যে-সকল খনিজ আকরিক পদার্থে $\frac{৩}{১০}$ অংশের কম লৌহ থাকে সে-সকল খনিতে কাজ হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন প্রস্তর আছে, যাহাতে লৌহের পরিমাণ অধিক এবং যাহা হইতে লৌহ উদ্ধার করা সম্ভব, এবং যাহা হইতে লৌহ উদ্ধার করা হইতেছে। এই সকল লৌহপ্রস্তর চারিভাগে বিভক্ত,—(১) **হিমাটাইট** (Hæmatite)—এই লৌহ-প্রস্তরে লৌহের অংশ শতকরা ৭০ ভাগ,—ইহার রং লালচে,—

এবং ইহা বহুল-ব্যবহৃত লৌহপ্রস্তর ; —(২) **ম্যাগনেটাইট** (Magnetite)—এই প্রস্তরে ৭২ শতাংশ বা তদধিক লৌহ পাওয়া যায় ;—ইহার রং কাল, প্রকৃতপক্ষে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট আকরিক বিমিশ্র পদার্থ ; (৩) **লিমোনাইট** (Limonite), (৪) **সিডেরাইট** (Siderite).

লৌহের ব্যবহার।—খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর নাই। কি সাংসারিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কি বৃহৎ-বৃহৎ যন্ত্রপাতি নির্মাণে, কি গৃহাদি নির্মাণে, কি যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রাদি-নির্মাণে লৌহের তুল্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বিরল। লৌহে কার্বন ও অন্যান্য খাদ মিশাইয়া শক্ত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। এক্ষণে পৃথিবীতে শক্ত, ঘাতসহ কিংবা ভারসহ কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কঠিন দ্রব্য নির্মাণ করিতে হইলে ইস্পাতের প্রয়োজন। বড়-বড় কল, বড়-বড় জাহাজ, রেলপথ, রেল-ইঞ্জিন, সেতু, ব্যোমযান প্রভৃতির, এমন কি ইস্পাত-নির্মাণ-যন্ত্র নির্মাণেও প্রধান উপাদান ইস্পাত। গৃহের আসবাব, গৃহের দরজা-জানালা, সংসারে রন্ধনের সরঞ্জাম প্রভৃতি সকল দ্রব্যের নির্মাণ-কার্যেই লৌহের প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে লৌহসংস্রবহীন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া জীবনযাপন নিতান্ত অসম্ভব। বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণেও লৌহের প্রয়োজন অপরিহার্য। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্রাদি, রেডিও, মোটর, ডাইনামো প্রভৃতি নির্মাণ কার্যেও লৌহের বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে লৌহ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য।

পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার (Reserves)।—পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী লৌহ আছে। যতদূর জানা গিয়াছে পৃথিবীর সঞ্চিত লৌহ-ভাণ্ডারের পরিমাণ এইরূপ—

পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার*

সমগ্র পৃথিবী—৫৭,৮১২ মিলিয়ন টন

স্থান	মিলিয়ন টন	স্থান	মিলিয়ন টন
১। আমেরিকা	১০,৪৫২	৯। সো. রুশিয়া	২,০৫৭
২। ফ্রান্স	৮,১৬৫	১০। জার্মানি	১,৩ ৭
৩। ব্রাজিল	৭,০০০	১১। লুক্সেমবুর্গ	২৭০
৪। ইংলণ্ড	৫,৯৭০	১২। জাপান	৮৫
৫। নিউফাউণ্ডলণ্ড	৪,০০০	১৩। বেলজিয়ম	৭০
৬। ভারতবর্ষ	৩,২২৬	১৪। ইতালী	১৮
৭। কিউবা	৩,১৫৯	১৫। অন্যান্য	৮৮২৩
৮। সুইডেন	২,২০৩		

* World Resources and Indurstries ;—E. W. Zimmerman.

পৃথিবীর উৎপাদন-ক্ষেত্র।—সো. রুশিয়া, ও উত্তর আমেরিকায়—আ. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর **সর্বপ্রধান লৌহ-প্রস্তর উৎপাদন স্থান।** এই দুই স্থান হইতে বৎসরে মোটামুটি ৫০ শতাংশ লৌহ উত্তোলিত হয়। মোটামুটি পৃথিবীর সর্বত্রই মাটিতে লৌহ আছে বটে, কিন্তু মাত্র ৪৫টি দেশে লৌহ-উৎপাদনের কার্য হয়;—তাহারও মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, গ্রেটবৃটেন, জার্মানি, বেলজিয়ম এবং লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ৮৫% লৌহ উৎখাদিত হয়। নিম্নে সর্বপ্রধান কয়েকটি স্থানের লৌহ-উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া হইল।

আকরিক লৌহ উৎপাদন ১৯৬০*
পৃথিবী ২২৬৩০০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	আনুমানিক লোহের পরিমাণ %	লৌহ-আকর উৎপাদন (সহস্র মে. ট.)	পৃথিবীর উৎপন্ন লোহের শতকরা অংশ
১। রুশিয়া	৬০	৬১৭৭০	২৭.২৫
২। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৫০	৪৭৯৬১	২১.১৮
৩। ফ্রান্স	৩৫	২১৭৪৫	৯.৬০
৪। সুইডেন	৬০	১৩২০২	৫.৮৩
৫। ভেনেজুয়েলা	...	১২৪৭৪	৫.৫১
৬। ক্যানাডা	৫৫	১০৭৩১	৪.৭৪
৭। ভারত	৬৫	৬৫০০	২.৮৭
৮। যুক্তরাজ্য	৩০	৪৬৮৭	২.০৭
৯। জার্মানি (প.)	৩০	৪৫৫৮	২.০১
১০। ব্রাজিল	৭০	৩৫৭৩	১.৫৭

দ্রষ্টব্য।—আ. যুক্তরাষ্ট ও সো. রুশিয়া হইতেই ৪৯ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়।

* U. N. O. Statistical Yearbook, 1961.

উত্তর আমেরিকার লৌহক্ষেত্র। (ক) **আ. যুক্তরাষ্ট্র।**—পূর্বেই বলিয়াছি, আ. যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-উৎপাদন-স্থান। এখানে ১০৪৫ কোটি টন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর ১৮.৭ শতাংশ লৌহের ভাণ্ডার আছে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীতে যত লৌহ উত্তোলিত হয়, তাহারও প্রায় ২৫ শতাংশ এখান হইতে পাওয়া যায়। ইহার শ্রেষ্ঠ লৌহক্ষেত্র দুইটি—(১) **সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের ক্ষেত্র** এবং (২) **আলাবামা-বার্মিংহাম অঞ্চলের ক্ষেত্র।**



৭৯ নং চিত্র—পৃথিবীর লৌহ-খনি।

(১) সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের লৌহক্ষেত্র—আ. যুক্তরাষ্ট্রের ত বটেই,—**পৃথিবীর—সর্ববৃহৎ লৌহক্ষেত্র।** সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম ও দক্ষিণের মিনেসোটা, উইস্‌কন্‌সিন্‌ ও মিচিগন রাষ্ট্রে অবস্থিত ছয়টি পর্বতশ্রেণীতে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে হিমাটাইট লৌহ পাওয়া যায়।



৮০নং চিত্র—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ-খনি।

ইহাদের মধ্যে আবার মিনেসোটা রাষ্ট্রে অবস্থিত মেসাবি পর্বত হইতেই আ. যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ শতাংশ, কখনও-কখনও তদধিক, লৌহ পাওয়া যায়।

(২) আলাবামা-বার্মিংহাম অঞ্চলের ক্ষেত্র—আ. যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান লৌহ-ক্ষেত্র। ইহা টেনেসি রাষ্ট্রে ও আলাবামার অন্তর্গত বার্মিংহাম অঞ্চলে অবস্থিত। আ. যুক্তরাষ্ট্রের $\frac{1}{10}$ অংশ লৌহ এখানে উৎপাদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আ. যুক্তরাষ্ট্রে আরও কয়েকটি ছোট-ছোট লৌহ-ক্ষেত্র আছে। যথা,—

(৩) নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের এডিরনডাক ক্ষেত্র।

(৪) পেনসিলভ্যানিয়া রাষ্ট্রের কর্নওয়াল ক্ষেত্র।

(৫) উত্তর নিউ জার্সি ক্ষেত্র।

(৬) দক্ষিণ-পূর্ব নিউ ইয়র্ক ক্ষেত্র।

এই কয়টি ক্ষেত্র হইতে প্রধানতঃ ম্যাগ্‌নেটাইট লৌহ পাওয়া যায়।

(৭) আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে রকি পর্বত অঞ্চলের উইওমিং, ইউটা, নিউ মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্ণিয়া রাষ্ট্রগুলির লৌহক্ষেত্র। এই খনিগুলি হইতে বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যায়।

(খ) **ক্যানাডা**-র নোভাস্কোসিয়া প্রদেশে এবং নিউফাউণ্ডল্যণ্ডের দক্ষিণে লৌহ উৎপন্ন হয়।

ইউরোপের লৌহক্ষেত্র।—(১) **সোভিয়েট রুশিয়া**—এই দেশের লৌহসঞ্চয় বোধ হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা বেশী। এক্ষণে লৌহ-উৎপাদনে ইহার স্থান প্রথম। ইহার ইউরোপীয় অংশে ইউক্রেনে **ক্রিভয়রগ, মুরমান্স্ক** উপদ্বীপ, মস্কোর দক্ষিণে **কুরস্ক,** ইউরালঅঞ্চলে **ওর্‌স্ক,** ও **ম্যাগনিটোগোর্‌স্ক,** এবং এশিয়ায় ইনিসি নদীর দক্ষিণে কুজবাস-অঞ্চলে **টেলবেস্‌** প্রধান লৌহ-খনিজ উৎপাদন-স্থান। ইহাদের মধ্যে ক্রিভয়রগ-ক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ।

(২) **ফ্রান্স-বেলজিয়ম-লুক্সেমবুর্গ লৌহক্ষেত্র** ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সোভিয়েট রুশিয়া ও আ. যুক্তরাষ্ট্রের পরে পৃথিবীর তৃতীয় খনি। **লোরেন খনির** কিছু অংশ ফ্রান্সে, কিছু অংশ বেলজিয়মে, এবং কিছু অংশ লুক্সেমবুর্গে অবস্থিত। ফ্রান্সের ৯৭% খনিজ লৌহ পাওয়া যায় এই খনি হইতে, এবং অবশিষ্ট ৩% পাওয়া যায় নর্মাণ্ডি ও ব্রিটেনি অঞ্চলদ্বয় হইতে।

(৩) **সুইডেন**-এর উত্তর ভাগের **কিরুনা** খনি সুবৃহৎ। এখান হইতে হিমাটাইট ও ম্যাগনেটাইট লৌহ পাওয়া যায়। সুইডেনে কোক কয়লা নাই,—তাই উল্লেখযোগ্য লৌহশিল্প নাই—তাই এখানকার লৌহ প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে কাঠ-কয়লা দিয়া যে-ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়, তাহা পরিমাণে কম কিন্তু গুণে উৎকৃষ্ট।

(৪) **যুক্তরাজ্য**—এখান হইতে পৃথিবীর ২½ শতাংশ মাত্র লৌহ পাওয়া যায়। এখানকার-লৌহ কমিয়া গিয়াছে : এখানকার ইয়র্কশিয়ার, ক্লীভল্যাণ্ড, লিন্‌কলন্‌শিয়ার, নর্দাম্পটন-শিয়ার ও অক্সফোর্ড শিয়ারের খনি হইতে লৌহ পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত ইউরোপে উত্তর স্পেনের ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বত-অঞ্চলে, **পোলণ্ডের** সাইলিশিয়া প্রদেশে, ইতালীর এল্‌বা দ্বীপে অল্প লৌহ পাওয়া যায়। এবং—

এশিয়া মহাদেশের ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, মালয় উপদ্বীপ, চীন ও জাপান হইতে কিছু লৌহ পাওয়া যায়। **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের** উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বিখ্যাত হিমাটাইট লৌহের খনি আছে (ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইল)। **চীনদেশে** সান্‌টুং উপদ্বীপ ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকায় ভাল ও বড় লৌহখনি আছে। **জাপানে** হন্‌সু ও হোক্‌কাইডো দ্বীপে লৌহখনি আছে বটে, কিন্তু জাপানের লৌহশিল্পের তুলনায় সেখানে লৌহ কম পাওয়া যায়।—এবং

আফ্রিকায়—মরক্কো, আল্‌জিরিয়া ও টিউনিশিয়া হইতে লৌহ ইউরোপে চালান যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মেলন হইতেও কিছু লৌহ পাওয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ প্রদেশ ও **দক্ষিণ আমেরিকার** ব্রাজিল ও চিলি দেশেও বড় লৌহখনি আছে।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে দক্ষিণ গোলার্ধ লৌহসম্পদে বড়ই দীন—সেখান হইতে মাত্র ২% খনিজ লৌহ উত্তোলিত হয়।

লৌহ-সম্পদ।—এক্ষণে দেশের সকল সমৃদ্ধি, ও সকল সৌভাগ্যের উপাদান লৌহ। কিন্তু কেবল লৌহ-প্রস্তর থাকিলেই দেশের সমৃদ্ধি হয় না, লৌহ-প্রস্তর হইতে পিগ-লৌহ এবং ইস্পাত প্রস্তুত করার শক্তি না থাকিলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

বাণিজ্য।—খনিজ লৌহের সর্বপ্রধান **রপ্তানিকারক দেশ—সুইডেন ও ফ্রান্স**। এখান হইতে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ খনিজ লৌহ আসে। অবশিষ্ট লৌহ পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ হইতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যত খনিজ লৌহ আসে তাহার ৮০ শতাংশের **আমদানিকারক দেশ**—গ্রেটবৃটেন, বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ, জার্মানি। **লৌহদ্রব্যের শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারক দেশ**—বেলজিয়ম-লুক্সেমবুর্গ, জার্মানি, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। গ্রেটবৃটেনের জিনিষ রপ্তানি হয় তাহার কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশে। জাপানের দ্রব্য যায় পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের **খরিদ্দার**—দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি, ক্যানাডা, গ্রেট বৃটেন ও জাপান। অবশিষ্ট দেশগুলির বিক্রয়স্থল ইউরোপের দেশগুলি।

২। তাম্র (Copper)

ধাতু-হিসাবে লৌহের পরেই তাম্র মূল্যবান। তাম্র কখনও-কখনও অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত না থাকিয়া অবিমিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুব কম আকর হইতেই বিশুদ্ধ তাম্র পাওয়া যায়। সোনা, রূপা, নিকেল, দস্তা, রাং প্রভৃতি ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে; এবং তামার খনিজ প্রস্তর হইতে তখন তাহাদের উদ্ধার করা হয়। কখনও-কখনও তামার পরিমাণ কম থাকে, অন্য ধাতুই বেশী থাকে। ক্যানাডায় নিকেলের সঙ্গেই তামা পাওয়া যায়,—সেখানে নিকেলের অংশই বেশী, তামার অংশ কম।

তাম্রের ব্যবহার।—তাম্রযুগে তৈজসপত্র, অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সবই তাম্রে প্রস্তুত হইত। এক্ষণে তাম্রে নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হয়, জাহাজের আবরণ প্রস্তুত হয় এবং ইহা অন্য ধাতুর সহিত খাদ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;—তামা ও টিন গিশাইলে ব্রঞ্জ, তামা ও দস্তা মিশাইলে পিত্তল, এবং সোনা ও তামা মিশাইলে গিনিসোনা হয়। আবার ইহার বিদ্যুৎ-পরিচালনশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

তাম্রখনিজ-উৎপাদন ১৯৬১
পৃথিবীর—৩৬৮০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবীর যত শতাংশ	দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবীর যত শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	১০৯৫	২৯'৮	৫। জার্মানি (প.)	২৩২	৬'৩
২। উত্তর রোডেশিয়া	৫৬৭	১৫'৪	৬। জাপান	২০২	৫'৫
৩। চিলি	৪৯৯	১৩'৬	৭। বেলজীয় কঙ্গো	*	
৪। ক্যানাডা	৩৬৮	১০'০			

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে মিচিগন, ও পশ্চিম আরিজোনা, ইউটা, মন্‌টানা, নেভাদা, ও কলোরেডো প্রধান তামা-উৎপাদক (পৃথিবীর ৩৩'৪ শতাংশ) অঙ্গরাজ্য। ইহাদের মধ্যে আরিজোনা—প্রথম, দেশের ⅓ ভাগ এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক-কালে মিচিগন শ্রেষ্ঠ ছিল—দেশের ৭৫% তামা উৎপাদন করিত;—এখন ৫% করে। ইউটা—দ্বিতীয়, মনটানা—তৃতীয়। আরিজোনার তাম্রখনিই মেক্সিকোতে সম্প্রসারিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে তাম্র উৎপন্ন হয়, এবং পূর্বভাগে ইহা

* বেলজীয় কঙ্গোর এখন নাম হইয়াছে কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল)। আরও একটি কঙ্গো আছে তাহার নাম কঙ্গো (ব্রাজাভিল)। প্রথমোক্ত কঙ্গোতে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। সেজন্য তাহার উৎপাদন-পরিমাণ জানা যায় নাই। তবে কঙ্গো একটি বিখ্যাত তাম্র-উৎপাদক দেশ।

বিশুদ্ধীকৃত ও তাম্রদ্রব্যে পরিণত হয়। এখানে অর্ধেক তামা বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত দ্রব্য নির্মাণেই ব্যয়িত হয়; যুক্তরাষ্ট্রের মূলধনে অন্য দেশেও তামা উৎপাদন হয়। সেজন্য পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তাম্র যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রহিয়াছে।



৮১ নং চিত্র।—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের তাম্রখনি।

যুক্তরাষ্ট্র যেমন **পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক তামা উৎপাদন করে**, তেমনি **সর্বাপেক্ষা বেশী খরচও করে**। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ তামা এখানকার শিল্পে ব্যয়িত হয়। আবার এখান হইতে তামা বিভিন্ন দেশে রপ্তানিও হয়।

চিলির আটাকামা মরুতে ও দক্ষিণে সেন্টিয়াগোর নিকট তাম্রখনি আছে। চিলি সর্বশ্রেষ্ঠ তামা-রপ্তানিকারক দেশ।

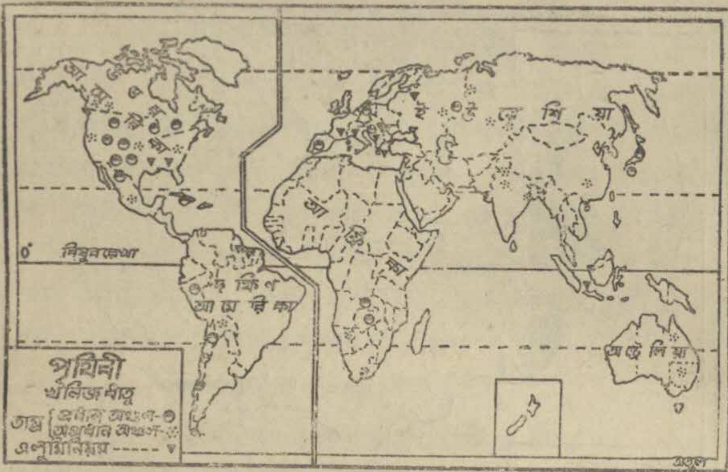
ক্যানাডায় সাড্‌বেরি প্রধান উৎপাদন-স্থান; পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে নিকেলের সঙ্গে তামা পাওয়া যায়। অন্যস্থান—কুইবেক ও রকি অঞ্চল। **বেলজীয় কঙ্গোর** কাটাঙ্গা প্রদেশে প্রচুর তাম্র উৎপাদন হইত। সেই খনি উত্তর রোডেশিয়ার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট রুশিয়ায় বলকান হ্রদের নিকটস্থ খনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য খনি ইউরাল অঞ্চলে, মধ্যভল্গা-অঞ্চলে ও উত্তরপূর্ব কোলা উপদ্বীপে অবস্থিত।

জাপানে হন্‌সু ও শিকোকু দ্বীপে তাম্র পাওয়া যায়। তাম্রশোধন স্থান—ওসাকা।

ভারতের তাম্র-উৎপাদন স্থান—বিহারের অন্তর্গত সিংভূম-ধলভূম অঞ্চল।

* বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বৎসরই উৎপাদন অবস্থা সমান থাকে না।



৮২নং চিত্র—পৃথিবীর তাম্র ও এ্যালুমিনিয়ম খনি।

তাম্র বিশুদ্ধ করিতে পূর্বে প্রধানতঃ আ. যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হইত। * যে-স্থান সমুদ্রতীরবর্তী, যাহার নিকটে বিক্রয়-স্থান আছে, যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তি সুলভ ও সহজলভ্য, সেই স্থানই তাম্র বিশুদ্ধ করার উপযুক্ত স্থান। এইজন্য আ. যুক্তরাষ্ট্রে যত তাম্র বিশুদ্ধীকরণের স্থান আছে তাহার ৭০ শতাংশ আ. যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে নিউ ইয়র্ক ও বাল্টিমোর-এর মধ্যে অবস্থিত। জার্মানিও তাম্রশুদ্ধীকরণের অন্য একটি প্রধান স্থান। কিন্তু এক্ষণে প্রায় সমস্ত বড়-বড় তাম্র-উৎপাদক দেশ তাম্র নিজেরাই বিশুদ্ধ করিতেছে।

৩। এ্যালুমিনিয়ম (Aluminium)

ভূ-পৃষ্ঠে যত মাটি ও পাথর আছে, তাহার একটি উপাদান **এ্যালিউমিনা।** কিন্তু **বক্সাইট** একমাত্র পদার্থ যাহা হইতে এ্যালিউমিনা বাহির করিলে খরচ পোষায়। বক্সাইট হইতে **প্রথম প্রস্তুত** করা **হয়,—এ্যালিউমিনা; তাহার পর** তপ্ত গলিত অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা উহা হইতে প্রস্তুত হয়,—

এ্যালুমিনিয়ম। দক্ষিণ ফ্রান্সের বক্স (Baux) সহরে এই ধাতু প্রচুর আছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে বক্সাইট। বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়ম তৈয়ার করিতে ক্রিয়লাইট নামক আর একটি ধাতুর সাহায্য লাগে। বক্সাইট বহুদেশে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রিয়লাইট গ্রীনলণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেজন্য কৃত্রিম ক্রিয়লাইটের সাহায্যে এ্যালুমিনিয়ম তৈয়ারী হয়।

এ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার।—এ্যালুমিনিয়ম অত্যন্ত হাল্কা অথচ শক্ত। আবার তাম্রের মতনই বিদ্যুৎ-পরিচলন-শক্তিও ইহার বেশী,—এবং অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রণের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইস্পাতের সহিত মিশাইলে ইহা খুব শক্ত হয় এবং লোহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তাই, এ্যালুমিনিয়মের প্রচলন খুব বেশীই হইয়াছে। গৃহস্থালীর প্রায় সকল বস্তুই ইহা হইতে প্রস্তুত করা হয়। তা ছাড়া আকাশযান, মোটরগাড়ী, নৌকা, জাহাজ, বাড়ীর কাঠাম, সেতুর পাড়ন, ইলেকট্রিক-সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রভৃতি নির্মাণেও ইহার ব্যবহার খুব বেশী।

ফ্রান্স ১৯৩৯ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বক্সাইট-উৎপাদক দেশ ছিল। এক্ষণে (১৯৬০)

বক্সাইট উৎপাদন ১৯৬০

পৃথিবী ২৪,৮০—সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবীর যত শতাংশ	দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবীর যত শতাংশ
১। জ্যামেকা	৫৮৭২	২৪·৩	৬। গিনি	১৩৭৮	৫·৭
২। সো. রুশিয়া	৩৫০০	১৪·৫	৭। চীন	১৩৬০	৫·৬
৩। ডাচ গায়ানা (সুরিনাম)	৩৪৫৫	১৪·৩	৮। হাঙ্গারি	১১৮৯	৪·৯
৪। বৃ. গায়ানা	২৫১১	১০·৪	৯। যুগোশ্লাভিয়া	১০২৫	৪·২
৫। আ. যুক্তরাষ্ট্র	২৪৪৮	১০·৬	১০। গ্রীস	৯৩০	৩·৮

বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত করিতে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহের দরকার। ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেজন্য যে-সকল দেশে কয়লা বা জল সুলভপ্রাপ্য বলিয়া সুলভে প্রচুর বিদ্যুৎপ্রবাহ-উৎপাদন সম্ভব, সে-সকল দেশেই স্বদেশের বা আমদানি-করা বক্সাইট হইতে **এ্যালুমিনিয়ম** প্রস্তুত করা হয়। এক্ষণে ধাতুদ্রব্য হইতে স্টীম উৎপাদক যন্ত্র চালাইয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাও এলুমিনিয়ম উৎপাদন করা হয়।

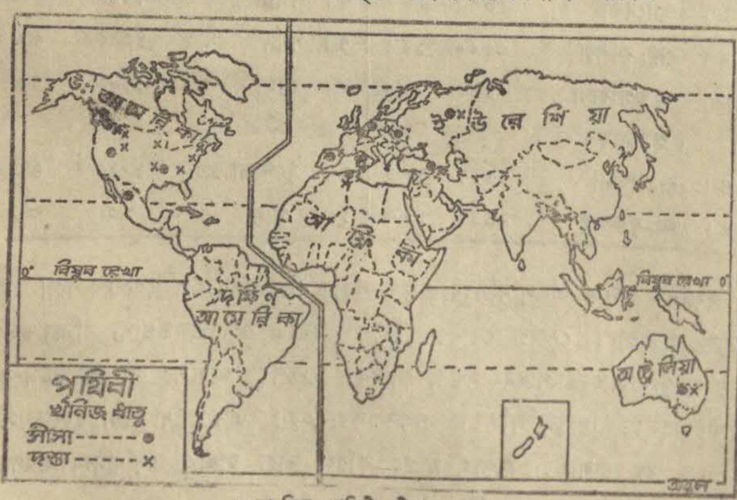
এ্যালুমিনিয়ম-উৎপাদন স্থান (১৯৬০)—**আ. যুক্তরাষ্ট্র** (৫৬·২৪%), কিন্তু এখানে বক্সাইট উৎপন্ন হয় মাত্র ১০%।

এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদন ১৯৬০
পৃথিবী—৩৭৮০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. টন	পৃথিবীর মত শতাংশ	দেশ	উৎপাদন স. মে, টন	পৃথিবীর মত শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	২১২৬	৫৬·২৪	৬। যুক্তরাজ্য	১৪০	৩·৭০
২। ক্যানাডা	৬৯০	১৮·২৫	৭। অষ্ট্রেলিয়া	৯০	২·৩৮
৩। জার্মানি (প.)	৩০২	৭·৯৮	৮। ইতালী	৮৪	২·২২
৪। ফ্রান্স	২৭৯	৭·৩৮	৯। হাঙ্গারি	৫০	১·৩২
৫। জাপান	১৮১	৪·৭৮	১০। কেমেরুনস্	৪০	১·১৬

৪। **সীসা** (Lead)।—**সীসার ব্যবহার** ;—প্রয়োজনীয়তা হিসাবে লৌহের পরেই সীসার স্থান বলিতে হয়। সীসা কম উত্তাপে গলে,—সীসা সহজেই বাঁকানো যায়, এসিডে ইহা নষ্ট হয় না, ইহা দামে সস্তা,—ইহা বহুল ব্যবহৃত হয়। মোটরশিল্প, বিমানশিল্প, মুদ্রণশিল্প, গ্যাস প্রভৃতি পরিচালনের নল-নির্মাণ, বন্দুকের গুলি প্রস্তুত করা, রং তৈয়ারী প্রভৃতি কার্যে সীসা ব্যবহৃত হয়।

সীসা,—রৌপ্য-সীসা-গন্ধকযুক্ত গ্যালেনা (galena) নামক খনিজ হইতে সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সীসার খনিতে সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্য দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ইহার সহিত সোনা, এন্টিমণি, তামা প্রভৃতি অল্পপরিমাণে মিশ্রিত থাকে।



৮৩নং চিত্র—পৃথিবীর সীসা ও দস্তা।

সীসা উৎপাদন ১৯৬১

পৃথিবী—১৯৩০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. টন	পৃথিবীর যত শতাংশ	দেশ	উৎপাদন স. মে টন	পৃথিবীর যত শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৪৪১	২২·৮৪	৬। যুগোশ্লাভিয়া	৯০	৪·৬৬
২। অষ্ট্রেলিয়া	২১৩	১১·০৩	৭। যুক্তরাজ্য	৮৭	৪·৫০
৩। মেক্সিকো	১৭৮	৯·২২	৮। পেরু	৭৬	৩·৯৩
৪। ক্যানাডা	১৫৫	৮·০৩	৯। স্পেন	৬৬	৩·৪১
৫। জার্মানি (প.)	১৪০	৭·২৫	১০। মরক্কো	২৪	১·২৪

প্রথম চারিটি একত্রে প্রায় পৃথিবীর ½ অংশ উৎপাদন করে।

সীসা উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়ার (নিউ সাউথ ওয়েল্‌স) নাম ছিল সর্বপ্রথম, এক্ষণে আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি স্টেটেই **পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সীসকখনি** অবস্থিত—এখানকার এই সীসার সহিত অন্য কোন ধাতু মিশ্রিত নাই। ইহার সন্নিকটে ওক্‌লাহোমা ও ক্যান্‌সাস, এবং রকি-অঞ্চলে আইডাহো, কলরেডো, আরিজোনা, মনটানা, ইউটা প্রভৃতি স্টেটগুলিতেও সীসার খনি আছে।

ক্যানাডায় ঐ দেশের ৯৫ শতাংশ সীসা পাওয়া যায় বৃটিশ কলম্বিয়ায়। অবশিষ্ট পাওয়া যায় অন্টারিও ও নোভাস্কোসিয়া হইতে। স্পেনের সিয়ারা মোরেনা পর্বতাঞ্চলেও সীসার খনি আছে।

৫। **রাং** (Tin)।—**রাংএর প্রয়োজনীয়তা**;—রাং-এর উপর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার আধিপত্য নাই বলিলেই চলে। এজন্য লোহা ও ইস্পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিলে লোহা নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না। ঘরের আচ্ছাদন করিবার জন্য আমাদের দেশে যে তরঙ্গায়িত টিন ব্যবহার করা হয়, উহা লোহার পাতের উপর রাং-এর প্রলেপ দিয়া প্রস্তুত করা হয়। এই লোহার পাতকেই আমরা টিন বলি, এবং ইহা হইতে ধারণা—টিন শক্ত জিনিষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিন নরম জিনিষ। রাং-এর উপর টক রসের, বিশেষতঃ ফল বা তরকারির রসের, কোন ক্রিয়া হয় না। সেজন্য টিনের অর্থাৎ টিন লাগানো ধাতুপাত্রে ফল সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে পাঠানো হয়। 'পান' ঝালিতেও টিনের দরকার হয়। টিনের সহিত তামা মিশাইলে ব্রঞ্জ ও পিতল মিশ্রিত করিলে কাঁসা প্রস্তুত হয়। যুদ্ধকালে ইহার দরকারের সীমা নাই। যুদ্ধ জাহাজ,

আকাশযান, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক (Tank) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা অত্যাবশ্যক। সৈন্যদের আহার গ্রহণের পাত্র—সেটিও টিনে প্রস্তুত।

টিনের একটি মোটামুটি বিশেষত্ব আছে ;—যে-দেশে টিনের সর্জন-শিল্পের প্রচলন, সে-দেশে টিন নাই। যেখানে টিন আছে, সেখানে টিনজাত দ্রব্য নাই। তিন অঞ্চল হইতে টিন প্রধানতঃ পাওয়া যায়—(১) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া,** (২) **বলিভিয়া** ও (৩) **মধ্য আফ্রিকা।**

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় ফেডারেশনের অন্তর্গত **সেলাঙ্গর, নেগ্রি সেম্বিলান** ও **পেরাক রাজ্য,**—ও ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত—**বাঙ্কা, বেল্লিটন** ও **সিংকেপ** প্রধান টিন উৎপাদক স্থান। এই টিন-অঞ্চল শ্যাম দেশ, ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর প্রায় ৫৫% টিন এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে উৎপন্ন হয় ; চীনের টিন পাওয়া যায় দক্ষিণ ইউনান হইতে। বলিভিয়া হইতে পাওয়া যায় মোটামুটি ২০% টিন,—কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) হইতে ৭%। অবশিষ্ট টিন পাওয়া যায় নাইজেরিয়া হইতে। এশিয়াধীন রুশিয়ার কারাগাণ্ডা ও আলতাই হইতেও টিন পাওয়া যাইতেছে। এশিয়ার মধ্যে আবার টিন উৎপাদনের প্রধান স্থান মালয় ফেডারেশন (৩৩%)। তৎপরে দ্বিতীয় স্থান লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে ইন্দোনেশিয়া ও বলিভিয়ার মধ্যে। ১৯৫৯ সালে টিন খনিজ উৎপাদনে বলিভিয়া ছিল দ্বিতীয়, কিন্তু ১৯৬০ সালে ইন্দোনেশিয়া ছিল দ্বিতীয়।

টিন খনিজ যখন খনি হইতে পাওয়া যায়, তখন তাহা বিশুদ্ধ টিন নহে। খনি হইতে প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ টিন ঘন করিয়া এমন তাল করা হয়, যাহাতে ৫০%—৬০%—৭০% অপেক্ষা বেশী বিশুদ্ধ টিন না থাকে। এই তালকে বলা হয় ঘনীকৃত টিন (Tin Concentrate)। এই অপরিষ্কার টিন নিকটবর্তী বা দূরবর্তী ধাতু পরিশোধন স্থানে লইয়া বিশুদ্ধ করা হয়। মালয়, আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে টিন পরিশোধিত হয়।

অবিশুদ্ধ টিন ১৯৬০

পৃথিবী – ১৬২২০০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপন্ন স. মে, টন	পৃথিবীর যত শতাংশ	দেশ	উৎপন্ন স. মে. টন	পৃথিবীর যত শতাংশ
১। মালয় ফেডা.	৫২৮১৩	৩৩	৫। বলিভিয়া	১৯৭১৮	১২
২। চীন	২৪৪০০	১৫	৬। কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল)	৯০০০	৬
৩। ইন্দোনেশিয়া	২২৯৭০	১৪			
৪। থাইল্যাণ্ড	১২২৭৪	৮	৭। নাইজিরিয়া	৭৭৯৮	৪

বিশুদ্ধ টিন ১৯৬০

পৃথিবী—১৭৩৪০০ মে. টন

দেশ	উৎপন্ন খনিজ টিন	পৃথিবীর টিনের যত শতাংশ	দেশ	উৎপন্ন খনিজ টিন	পৃথিবীর টিনের যত শতাংশ
১। মালয় ফেডা	৭৭৩৫২	৪৫	৫। বেলজিয়ম	৮০৭৫	৪
২। যুক্তরাজ্য	২৭৮৪৪	১৬	৬। হলণ্ড	৬৪৯৬	৩
৩। চীন	২৪৪০০	১৪	৭। কঙ্গো* (লিওপোল্ডভিল)	৩৫৫০	২
৪। আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৩৭০০	৮			

* আফ্রিকাতে এখন দুইটি স্বাধীন কঙ্গো দেশ আছে। পৃথকভাবে বুঝাইবার জন্য তাহাদের নামের সঙ্গে রাজধানীর নাম থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খনিজ টিন **সংস্কৃত হয়** সিঙ্গাপুরে। কিন্তু সেখানে সর্জন-শিল্পের কোন উপায় নাই। বাটাভিয়া ও যবদ্বীপেও টিন-সংস্কার হয়। এ-সব টিন যায় ইংলণ্ডে, জার্মানিতে ও ইউরোপের অন্য-অন্য দেশে। বলিভিয়া-টিন সংশোধিত হয় জার্মানিতে ও ইংলণ্ডে। দক্ষিণ ওয়েল্‌সে কয়লা সুলভ ;—সেজন্য সেখানেও বিদেশী—বিশেষতঃ মালয় উপদ্বীপের,—টিন সংস্কৃত হয়। ইংলণ্ড হইতে সংশোধিত টিন আমেরিকায় যায়। টিনের সর্জন-শিল্পে আমেরিকা—প্রথম ; গ্রেটবৃটেন—দ্বিতীয়। কিন্তু এই শিল্পে সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপান ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে। শ্রেষ্ঠ লৌহ-উৎপাদক দেশই শ্রেষ্ঠ টিন-দ্রব্য উৎপাদক দেশ।

(খ) অ-ধাতু খনিজ দ্রব্য (Non-Metallic Minerals)

নানাকথা।—অ-ধাতু দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়ম, স্বভাব গ্যাস—শক্তির উৎস। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কয়লা হইতে নিষ্কাশিত বাষ্পের শক্তি দ্বারা বা ইহার দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া (carbo-electricity) যন্ত্রাদি পরিচালিত হয়। পেট্রোলিয়ম নামক মূল অপরিষ্কৃত তৈল পরিষ্কার করিয়া পেট্রল ও অন্য কয়েক প্রকার তৈল উৎপন্ন করা যায়। ইহার দ্বারা যন্ত্র পরিচালনা হয়। শক্তির অন্য উৎস—প্রবহমান জল,—ইহার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ও তাহার শক্তিতে শিল্প-যন্ত্রাদি চালানো হয়।

এই তিন শক্তির মধ্যে কয়লা- ও তৈল-খনি কিছুদিন পরেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন সে-খনিতে আর নূতন কয়লা ও তেলের সমাবেশ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু জলের শক্তির শেষ নাই,—ঋতুবিশেষে ইহা কমিয়া গেলেও ইহা আবার যথাসময়ে পূর্ণবেগে প্রবাহিত হয়।

১। কয়লা (Coal)

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর সৃষ্টির পর জল ও স্থলভাগের সমাবেশ হইলে বায়ুমণ্ডলের তাপ ও আর্দ্রতা অনুসারে নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ ও জীবের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল উদ্ভিদ্ শৈবাল জাতীয় হইতে বৃহৎ বৃক্ষ পর্যন্ত নানা প্রকারের ছিল। এক্ষণে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া এই সকল কর্দমপূর্ণ জলাশয়ের মধ্যেই জমিয়া ছিল এবং কোথাও বা নদীবাহিত হইয়া হ্রদাদি জলাশয়ে জলমগ্ন ও সঞ্চিত হইয়া সেখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত



৮৪নং চিত্র। পৃথিবীর প্রাচীনকালে যে-উদ্ভিদ্ হইতে কয়লা হইয়াছিল, অধুনালুপ্ত সেই সকল উদ্ভিদের আকৃতি।

হইয়াছিল। কালক্রমে এই সকল উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের উপর কর্দম, চূণ ও বালুকার পলি পড়িতে লাগিল, এবং উত্তাপ ও উপরের চাপ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার ফলে ঐ সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে জল ও গ্যাস প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া ও উহা ক্রমশঃ পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়া।

উদ্ভিদ্গুলি যখন অল্পমাত্র রূপান্তরিত হয়, তখন তাহাকে বলে **পীট** (Peat)। পরের স্তরে ইহার নাম **লিগ নাইট** (Lignite), এবং ক্রমশঃ ইহা **বিটুমিনাস্** (Bituminous) ও **এন্থ্রাসাইট** (Anthracite) কয়লায় পরিণত হয়।

এইবার **বিভিন্ন কয়লার ব্যবহার** সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

(১) **পীট** (Peat)।—ইহার রঙ বাদামী। উদ্ভিদ্ হইতে কয়লা জন্মিবার ইহা প্রথম স্তর। প্রধানতঃ ইহা শেওলা প্রভৃতি জলজ ও জলাভূমিজাত উদ্ভিদের রূপান্তর। জলজ উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া প্রথমে কোন জলাশয় ঢাকিয়া ফেলে,—শেষে উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদ্ জন্মিতে থাকে। নীচের উদ্ভিদ্গুলি ক্রমশঃ মরিয়া পচিতে থাকে। এই পীট দাহ্য পদার্থ,—আয়র্লণ্ড প্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহা রন্ধনাদির কার্যে ব্যবহৃত হয়।

(২) **লিগ্নাইট (Lignite) বা বাদামী কয়লা**।—পীটের পরে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ যে-অবস্থায় আসে, তাহাকে বলে লিগ্নাইট। ইহাও দেখিতে বাদামী। ইহা সহজ-দাহ্য। কিন্তু ইহাতে জলীয় ভাগ বেশী থাকে বলিয়া ইহার তাপ প্রদানের ক্ষমতা কম। ৯ টন লিগ্নাইট কয়লা ২ টন বিটুমিনাস কয়লার সমান।



৮৫নং চিত্র।—মৃত্তিকা ও বালুকা-স্তরের নিম্নস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত,—কিছু অংশ কয়লায় পরিণত,—গাছের গোড়ার আকার এখনও বুঝা যাইতেছে।

(৩) **বিটুমিনাস (Bituminous) কয়লা**।—ইহা কাল কয়লা। ইহাই গৃহস্থেরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে, এবং ইহা হইতে বাষ্প (স্টীম—steam) বাহির করা হয় এবং তাহা রেলওয়ে ও বড়-বড় কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই কয়লা জ্বালাইলে ধোঁয়া হয় ও শিখা বাহির হয়। এই কয়লা চোঁয়াইলে ইহা হইতে আলকাতরা ও গ্যাস বাহির হয়, এবং কয়লার যে-অবশেষ পড়িয়া থাকে তাহার নাম কোক (coke)। অনেকে কাঁচা কয়লা পোড়াইয়া ইহা কোকে পরিণত করে। ইহা নরমও হয়, শক্তও হয়।

(৪) **এন্থ্রাসাইট** (Anthracite) খুব শক্ত কয়লা।—ইহাতে উদ্বায়ী দ্রব্য থাকে না,—ইহা শীঘ্র নিবে না, এবং অত্যন্ত বেশী উত্তাপ প্রদান করে।

পৃথিবীর কয়লা-ভাণ্ডার

পৃথিবীর কোথায় কত কয়লা সঞ্চিত আছে, পৃথিবীতে মোট কত কয়লাই বা সঞ্চিত আছে, দেশের ভবিষ্যতের জন্য তাহার জনসমাজের সে-জ্ঞান থাকা নিতান্তই উচিত। কিন্তু এতাবৎ কাল পর্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা যে-অনুমান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে, কোন অনুমানই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই কার্যে অভিজ্ঞ লোকের বা যন্ত্রপাতির সংখ্যা এত কম, অন্যতঃ এই কার্য এরূপ কঠিন ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ যে, কোন সিদ্ধান্তই নির্ভুল বলিয়া নির্ভর করা যায় না। যাহা হউক, কয়লা ভাণ্ডার সম্বন্ধে যে-পরিমাণফল সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়, তাহা এস্থানে প্রদত্ত হইল,—

পৃথিবীর কয়লা-ভাণ্ডার*

(১৯৫৩ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত ফল অনুসারে)

মহাদেশ	মোট কয়লা (মিলিয়ন মে. টন)	পৃথিবীর মোট পরিমাণের যত শতাংশ
এশিয়া	২৩০০,৮৩০	৪৬·০
উ. আমেরিকা	১৯১০,৪৭৪	৩৮·২
ইউরোপ	৬৫৯,৯৩৫	১৩·১
আফ্রিকা	৬৯.৯৪৪	১·৪
অস্ট্রেলেশিয়া	৫৩,৬৪৬	১·১
দ. ও মধ্য আমেরিকা	১৩,৭৩৭	০·২
পৃথিবী	৫০০৮,৫৬৬	১০০

এইস্থানে কয়েকটি প্রধান দেশেরও কয়লা-ভাণ্ডারের উল্লেখ করা হইল।*

	এনথ্রাসাইট, বিটুমিনাস, ও হীন বিটুমিনাস	লিগনাইট ও ব্রাউন	মোট	পৃথিবীর যত শতাংশ
সো. রুশিয়া	৯৯৮,০০০	২০২,০০০	১,২০০,০০০	২৪%
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১,৩০৩,০৬৬	৪২০,৩৫০	১,৭২৩,৪১৬	৩৪·৪%
চীন	১,০১১,০০০	৬০০	১,০১১,৬০০	২০·২%
ভারত	৬২,১৪৩	২,৮৩৩	৬৪,৯৭৬	১·৩%

* Industrial and Commercial Geography by J. Russel Smith, M. O. Phillips and Thomas R. Smith.

১৯৬০ সালের কয়লা-উৎপাদনের হিসাব এইরূপ—

কয়লা-উৎপাদন—১৯৬০*

পৃথিবী—১৯,৮৮,৩০০ স. মে. টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবী শতাংশ
১। চীন	৪২০,০০০	২১.১
২। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩৯১৫২৬	১৯.৭
৩। সোভিয়েট রুশিয়া	৩৭৪৯৩৩	১৮.৯
৪। যুক্তরাজ্য	১৯৬৮১৫	১১.৩
৫। জার্মানি (সমগ্র)	১৪৩২০৫	৭.২
৬। পোলণ্ড	১০৪৪৩৮	৫.৩
৭। ফ্রান্স	৫৫৯৬৫	২.৯
৮। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৫২৬৭৭	২.৬
৯। জাপান	৫১০৬৭	২.৬
১০। দক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মেলন	৩৮২০৮	১.৯
১১। চেকোশ্লোভাকিয়া	২৬২১৪	১.৩

* U. N. O. Statistical Yearbook 1961.

উৎপাদন স্থান।—**চীনের** কয়লা সম্পদের বিবরণ ২৫১ পৃষ্ঠায় এশিয়ার মধ্যে দেখ। (১) **উত্তর আমেরিকায়—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে** প্রধানতঃ **চারিটি অঞ্চলে** বিশেষভাবে কয়লা উত্তোলিত হয়—

(ক) **অ্যাপালাশিয়ান কয়লাক্ষেত্র—ইহা** যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান কয়লা ক্ষেত্র—ইহা পেন্‌সিলভ্যানিয়া স্টেট হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রের উত্তর-পূর্বভাগে উত্তর-পূর্ব পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ এন্‌থ্রাসাইট** কয়লার খনি অবস্থিত, এবং পশ্চিম-পেন্‌সিলভ্যানিয়া হইতে আলাবামা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের **বিটুমিনাস কয়লার খনি** আছে।

উপরি-উক্ত এনথ্রাসাইট কয়লা আ. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা, এবং ঐ খনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কয়লার খনি। রেলগাড়ীতে ব্যবহারের জন্য এবং আট্‌লান্টিক-তীরস্থ সহরগুলির ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম এখানকার খনি হইতে উহা উত্তোলিত ও সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভাল জিনিষ পাইলে তাহাই ব্যবহার করা মানুষের

অভাব। সেজন্য এই খনি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইতে লাগিল, এবং ইতিমধ্যে ইহার প্রায় ১/২ অংশ নিঃশেষিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিটুমিনাস কয়লা-খনি অ্যাপালাশিয়ান অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার **উত্তর ভাগে** ওহাইও-তীরে, পেনসিলভ্যানিয়া স্টেটের পশ্চিম ভাগে, উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লার খনি অবস্থিত। এই কয়লা কোক কয়লায় রূপান্তরিত হইবার বিশেষ উপযোগী;—নদীবাহিত হইয়া এখানকার কয়লা চারিদিকে প্রেরিত হয়। আবার কয়লা-স্তরগুলি প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত এবং স্থানে-স্থানে নদীর উপত্যকায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইহা স্বল্পব্যয়ে উত্তোলন করা যায়। সেইজন্যই এখানকার কয়লা সুলভ, এবং সেইজন্যই এই কয়লা বিশেষভাবে উত্তোলিত হয় ও এই অঞ্চলে বড়-বড় শিল্পপ্রধান সহর সৃষ্ট হইয়াছে। **পৃথিবীর সর্বপ্রধান লৌহশিল্পের সহর পিট্‌সবার্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত।**

এই অ্যাপালাশিয়ান অঞ্চলের সুবৃহৎ খনির **মধ্যভাগ** টেনিসি ও পশ্চিম ভার্জিনিয়া স্টেটে, কেন্টাকির পূর্বভাগে, ও ভার্জিনিয়ার কতক অংশে অবস্থিত। এই অঞ্চলে যাতায়াত অসুবিধাজনক এবং রেলপথও বিশেষ নাই। সেজন্য এখানকার খনিগুলির বহুদিন কোন উন্নতি হয় নাই। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম ভার্জিনিয়া কতকটা সুগম্য। সেজন্য এখান হইতে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লা উৎখাতন করা হয়।

এই খনির আলাবামা স্টেটে অবস্থিত **দক্ষিণের অংশ** হইতে ঐ ষ্টেটে অবস্থিত বার্মিংহাম প্রভৃতি শিল্পপ্রধান স্থানে কয়লা প্রেরিত হয়।

(খ) **মধ্য-পূর্ব অঞ্চলে,**—উপরি-উক্ত খনির পশ্চিমে,—ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়েস ও পশ্চিম কেন্টাকি স্টেটে—যে-বিটুমিনাস কয়লার খনিগুলি অবস্থিত, তাহার কয়লা অ্যাপালাশিয়ান কয়লা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে ইণ্ডিয়ানার ও ইলিনয়েস স্টেটের চিকাগো ও সেন্টলুই প্রভৃতি শিল্পপ্রধান সহরগুলির পক্ষে এখানকার কয়লার উপর নির্ভর করা সুবিধাজনক। সেজন্য এখানকার খনিতে প্রচুর কার্য হইয়া থাকে। এই খনি-অঞ্চলের পশ্চিমেই,—

(গ) **মধ্য-পশ্চিম খনি অঞ্চল** আইও-আ হইতে টেক্‌সাস্ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার কয়লা আরও নিকৃষ্ট। সুতরাং খনির কার্য ভাল হয় না। ইহারও পশ্চিমে—

(ঘ) **রকি কয়লা-খনি অঞ্চল,**—ক্যানাডার সীমান্ত হইতে মেক্সিকোর সীমান্ত পর্যন্ত অংশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে এই কয়লাক্ষেত্র আছে। এখানকার কয়লা আরও নিকৃষ্ট, এবং এ-অঞ্চলে লিগ্‌নাইট কয়লাই বেশী।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব হইতে পশ্চিমে কয়লা ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর।



৮৩নং চিত্র।—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা-ক্ষেত্র।

(ঙ) **আলাস্কার কয়লা-খনি**—খুব গভীর, এবং এখানকার কয়লাসম্পদও বেশী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এখনও খনির কার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই।

ক্যানাডার পশ্চিমে **এলবার্টা ও বৃটিশ কলম্বিয়া** প্রদেশে প্রধানতঃ লিগ্‌নাইট কয়লা আছে। কিন্তু বিটুমিনাস কয়লাও পাওয়া যায়। এই খনি দক্ষিণে যুক্তরাষ্ট্রের মণ্টানা রাষ্ট্রের খনির সম্প্রসারণ। নোভাস্কোসিয়ার কয়লা, ও নিউফাউণ্ডলণ্ডের লৌহ লইয়া কেপ বৃটনের সিড্‌নীতে লৌহশিল্প চলে। ক্যানাডার শিল্পপ্রধান অঞ্চল ইহার মধ্যভাগে—অণ্টারিও ও কুইবেক প্রদেশে। কিন্তু কয়লাঞ্চল হইতে এই অঞ্চল বহুদূরে অবস্থিত। সেজন্য ইহাদিগকে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপর কয়লার জন্য নির্ভর করিতে হয়।

(২) **ইউরোপে** প্রধান কয়লাক্ষেত্রের শ্রেণী, গ্রেট্ বৃটেন হইতে চেকো শ্লোভাকিয়া পর্যন্ত, ইহার মধ্যভাগের নবশিলা-গঠিত সমতলক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্ত ও দক্ষিণের প্রাচীনশিলা-গঠিত পার্বত্য প্রদেশের উত্তর প্রান্তের মিলন-স্থান বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং **গ্রেট্ বৃটেন, উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়ম, দক্ষিণ হলণ্ড, জার্মানি (সায়ল্যাণ্ড সমেত), পোলণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া** ও

রুশিয়া দেশে এই কয়লাক্ষেত্রশ্রেণী অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন, রোমানিয়া ও দক্ষিণ রুশিয়ায় কয়লাক্ষেত্র আছে।

জার্মানির শ্রেষ্ঠ কয়লাখনি—রূঢ়ক্ষেত্র ;—এখানে কোক হইবার উপযোগী কয়লা আছে। দেশের শতকরা ৭০ অংশ কয়লা এখান হইতে উত্তোলিত হইত। এতদ্ব্যতীত সাইলেশিয়া অঞ্চলেও বড় খনি ছিল। বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলনে



৮৭নং চিত্র—ইউরোপের কয়লা-ক্ষেত্র।

জার্মানির স্থান ছিল পৃথিবীতে দ্বিতীয়, লিগ্‌নাইট-উৎপাদনে প্রথম। কয়লা-রপ্তানিকার্যে গ্রেট্ বৃটেন ছিল প্রথম,—জার্মানি ছিল দ্বিতীয়। অবশ্য, জার্মানির সে-সৌভাগ্য আর নাই।

রুশিয়ার সর্বপ্রধান কয়লা-খনি দক্ষিণ ইউরোপীয় রুশিয়ার **ডোনেৎস** উপত্যকায় অবস্থিত,—দেশের উৎপন্ন কয়লার ⅓ অংশ এখান হইতে পাওয়া যায়। অন্য খনির মধ্যে মস্কোর নিকটবর্তী **তুলা** খনি, পশ্চিম সাইবিরিয়ার নবসিবিরিস্ক-এর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত **কুজনেৎস্ক্** খনি, তুর্কিস্তানের **কারাগাণ্ডা** খনি, এবং ইউরাল পর্বতের **স্ভার্ডলভ্‌স্ক্** ও **চেলিয়াবিন্‌স্ক্** অঞ্চলের খনি প্রভৃতি প্রধান। তুলা-খনি হইতে কেবল লিগ্‌নাইট কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে এই কয়লা দ্বারা ভাল ফল পাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির হওয়াতে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশিয়ার উৎপন্ন কয়লার ¾ অংশ বিটুমিনাস ; এবং এনথ্রাসাইট উৎপাদনে রুশিয়ার স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয়। এশিয়াধীন

রুশিয়ায় ইনিসি নদী, আমুর নদী ও লেনা নদীর উপত্যকায় এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থলেও নূতন-নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রেট্ বৃটেনের প্রধান-প্রধান খনিগুলির এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে,—

কয়লা **স্কটলণ্ডে** পাওয়া যায়—পূর্বেই বলিয়াছি মধ্যভাগের নিম্ন উপত্যকা ভূমিতে। এই স্থানে **চারিটি কয়লা-খনি** আছে—

১। পশ্চিমে আয়ার খনি,
২। মধ্যভাগে ক্লাইড-অববাহিকায় লানার্কশিয়ার খনি,
৩। পূর্বভাগে—ফাইফ শিয়ার খনি,
৪। ও লোথীয় খনি।



৮৮নং চিত্র।—স্কটলণ্ডের মধ্যভাগের নিম্নভূমি ও কয়লা-খনি।

ইংলণ্ডে পেনাইন পর্বতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেই প্রধানতঃ কয়লার খনি আছে। যেমন—

পেনাইন পর্বতের পশ্চিম-দিকের খনি

১। কাম্বারল্যাণ্ড খনি।
২। দক্ষিণ লাঙ্কাশিয়ার।
৩। উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ার।

পেনাইন পর্বত

পেনাইন পর্বতের পূর্ব-দিকের খনি

৪। নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম খনি।
৫। ইয়র্কশিয়ার, ডাবিশিয়ার ও নটিংহামশিয়ার খনি।

পেনাইন পর্বতের দক্ষিণদিকের খনি

৬। দক্ষিণ স্টাফোর্ডশিয়ার।
৭। ওয়ারউইকশিয়ার।
৮। লীস্টারশিয়ার।



৮৯নং চিত্র—গ্রেট বৃটেনের কয়লা ও লৌহ খনি।

উত্তর ওয়েল্‌সের ডি নদীর মুখে যে-কয়লা-খনি আছে, তাহা তেমন বড় নহে। কিন্তু **দক্ষিণ ওয়েলসের** কয়লা-খনি বিখ্যাত। এইখানে বিটুমিনাস ও এন্‌থ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে ইহার শ্রেষ্ঠ কয়লাখনি ভ্যালেঁসিয়েন (Valenciennes) হইতে লাঁস (Lens) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং এই খনিই উত্তর বেলজিয়ম, জার্মানি ও দক্ষিণ হলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। ফ্রান্সের যা কিছু শিল্পোন্নতি, তাহা এই কয়লা-খনির জন্যই হইয়াছে। ফ্রান্সের মধ্যভাগে ও পশ্চিমে অল্প কিছু কয়লা আছে।

পোলণ্ডের সাইলেশিয়া খনিই বিখ্যাত। এককালে এই খনি জার্মানির ছিল। ইহারই এক অংশ চেকোশ্লোভাকিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

(৩) **এশিয়া মহাদেশে—চীন, জাপান, ফরাসী ইন্দোচীন ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র** উল্লেখযোগ্য কয়লা-উৎপাদক দেশ। ইহাদের মধ্যে চীনের খনিতে যে-কয়লা সঞ্চিত আছে, তাহা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ত বটেই,—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় এত কয়লা কোন দেশেই নাই ;—কিন্তু ইহা খনিজ জিনিষ,—খনিতেই থাকে, ইহা তুলিয়া সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা কৃষকপ্রধান চীনের এখনও করা হয় নাই। চীনের সকল প্রদেশেই অল্পবিস্তর কয়লা আছে। কিন্তু সান্সি, সেন্সি, হোনান ও কান্সু অঞ্চলের উচ্চভূমিতে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা সঞ্চিত আছে। ইহাদের মধ্যে আবার সান্সির এন্থ্রাসাইট কয়লার খনি সর্ববৃহৎ।

জাপানের কয়লা প্রধানতঃ পাওয়া যায় কিউসিউ ও হক্কাইডো দ্বীপ হইতে। কিন্তু এই কয়লা ভালও নহে, প্রচুরও নহে। সেজন্য ফরাসী ইন্দোচীন, চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা আনাইয়া জাপানের শিল্পযন্ত্র চালাইতে হয়।

ফরাসী ইন্দোচীন—বিশেষতঃ উত্তর টংকিং—হইতে প্রচুর এনথ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায় ;—এশিয়ার আর কোন স্থান হইতে এত পাওয়া যায় না।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে পাওয়া যায়।

(৪) **আফ্রিকা মহাদেশ** কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকা-সম্মেলনের অন্তর্গত ট্রান্সভাল ও নাতাল হইতে কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা-সম্পদে আফ্রিকা অত্যন্ত দরিদ্র।

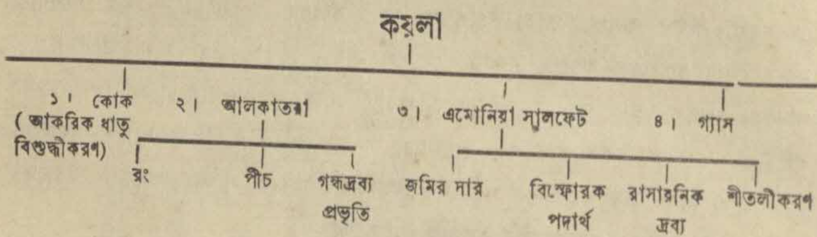
(৫) **অষ্ট্রেলিয়ার** সর্বত্রই কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ অঞ্চল হইতে।

(৬) **নিউ জিলণ্ডের** কয়লা-খনিও উল্লেখযোগ্য।

(৭) **দক্ষিণ আমেরিকার** কয়লা-সম্পদ্ অত্যন্ত কম। এই মহাদেশে চিলি ও ব্রাজিল নগণ্য উৎপাদন-স্থান।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় দক্ষিণ গোলার্ধ কয়লা-সম্পদে অতি দরিদ্র —পৃথিবীর মাত্র ২% কয়লা এখান হইতে পাওয়া যায়।

কয়লার ব্যবহার।—বর্তমান শিল্প-জগতে কয়লার উপকারিতার আর শেষ নাই। রেলগাড়ী, জাহাজ-স্টীমার, কিংবা কারখানার ইঞ্জিন চালাইতে কয়লা প্রধানতঃ দরকার। পাতন-যন্ত্রে কয়লা চোঁয়াইলে তাহা হইতে মানবসমাজের হিতকর নানাদ্রব্য প্রস্তুত হয়। নিম্নের তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, পাতন-যন্ত্রে কয়লা চোঁয়াইলে তাহা হইতে মানবহিতকর কত দ্রব্য সাক্ষাৎভাবে ও আনুষঙ্গিকভাবে পাওয়া যায়ঃ—



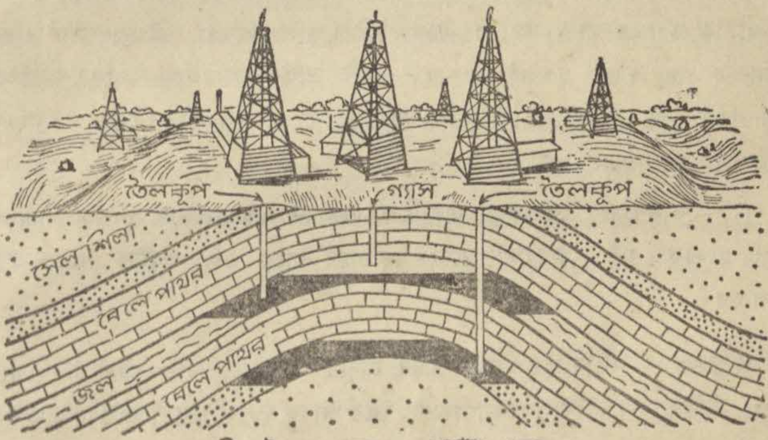
কোক আকরিক ধাতুগুলি বিশুদ্ধীকরণ-কার্যে ব্যবহৃত হয়। খনিজ লৌহের সহিত কোক ও চুণাপাথর মিশাইয়া অধিক তাপে ঢালাই লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হয়। কীটক্ষত হইতে কাষ্ঠাদি ত্রাণ করিবার জন্য **আলকাতরার** প্রচলন সর্বজনবিদিত। **পীচ** পাকারাস্তা-নির্মাণে অপরিহার্য। আলকাতরা হইতে প্রস্তুত **সাকারিন** এক্ষণে চিনির স্থলাভিষিক্ত। আলকাতরার রং ও সুগন্ধিদ্রব্য প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

আবার কয়লা কাটিবার সময় খনিতে কিছু কয়লা গুঁড়া হইয়া যায়। ঐ গুঁড়া বহুদিন কেবল ইটের পাজা পুড়াইতে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কোন আঠালো দ্রব্য বা খনিজ তৈলের সহিত উহা মিশাইয়া ঢেলা পাকাইয়া ও উহা ছাঁচে ফেলিয়া চাপ দিয়া ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা হয়। ইহা সাধারণতঃ উনানে পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Briquettes।

কয়লা হইতে যে **কোল গ্যাস** বহির্গত হয় তাহা বড়-বড় সহরে রাস্তায় আলো দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। রন্ধনকার্যে ও বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারিতেও এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

২। পেট্রোলিয়ম (Petroleum)

উৎপত্তি—পেট্রোলিয়মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবল মতভেদ আছে ;—কেহ বলেন ইহা উদ্ভিদ্ হইতে, কেহ বলেন প্রাণী হইতে, উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু কোন্ বস্তু হইতে অথবা কি প্রণালীতে যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আজও সন্তোষজনকরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। তথাপি ইহা খনিজ তৈল এবং শিলা-মধ্যে সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইহাকে বলা হয় পেট্রোলিয়ম (**Petra = rock**) বা শিলা তৈল (**rock oil**, **mineral oil**)।



৯০ নং চিত্র।—ভূস্তরে তৈল ও গ্যাসের অবস্থিতি। তৈল ও গ্যাস উত্তোলন।

পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে কতকগুলি কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য :—

(১) ইহা **পাললিক শিলাস্তরেই** (Sedimentary rock), বিশেষতঃ **চূণাপাথর ও বেলেপাথর স্তরেই**, পাওয়া যায়। স্পঞ্জের ভিতর যেমন জল থাকে, এই দুই শিলার অন্তরে-অন্তরে তেমনি পেট্রোলিয়ম থাকে।

(২) পেট্রোলিয়মের সঙ্গে **আরও দুইটি জিনিষ থাকিবেই,** (ক) **জল** ও (খ) **গ্যাস**। গ্যাস পেট্রোলিয়ম অপেক্ষা হাল্কা,—তাই গ্যাস থাকে সকলের উপরে। জল সকলের চেয়ে ভারী,—তাই জল থাকে সকলের নীচে। পেট্রোলিয়মের স্থান এই দুইটির মধ্যভাগে।

(৩) যে-স্তরে পেট্রোলিয়ম ও তাহার দুই সহচর—জল ও গ্যাস,—থাকে, তাহার উপরে থাকে **কর্দম**, বা **সেল,** বা অন্য কোন শিলাগঠিত **অপ্রবেশ্য** স্তর।

এই স্তর সাধারণতঃ খুবই গভীর হয়, এবং ইহা অপ্রবেশ্য বলিয়া ইহার ভিতর দিয়া গ্যাস বা তৈল উড়িয়া যাইতে পারে না।

(৪) যে প্রবেশ্য **বেলেপাথর বা চূণাপাথরের স্তরে পেট্রোলিয়ম পাওয়া** যায়, সেই **স্তরের** সর্বস্থান ব্যাপিয়াই যে পেট্রোলিয়ম থাকিবে,—তাহা নহে। ঐ স্তর তরঙ্গায়িত হইলে উহার ঊর্ধ্বভঙ্গ (anticline) যে গম্বুজের আকারে ভাঁজ সৃষ্টি করে, তাহারই উপরের অংশে প্রধানতঃ এই তৈল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সকলেই জানে যে, জল সর্বদা ভূ-ত্বকের সহিত সমান্তরতা রক্ষা করে। এই স্তর তরঙ্গায়িত হইলে এই সঙ্গে যে-জল থাকে, তাহা ভূ-ত্বকের সহিত সমান্তরতা রক্ষা করিয়া আপন স্থান করিয়া লয় এবং তলভাগ হইতে চাপ দিয়া উপরিস্থিত তেল ও গ্যাসকে ঐ গম্বুজাকার ভাঁজের মধ্যে উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধরে। এই তরঙ্গায়িত ভঙ্গিল তৈল-স্তর অল্প ভঙ্গিল হওয়াই দরকার ;—বেশী ভঙ্গিল হইলে ইহার উপরের অপ্রবেশ্য শিলাস্তরও বেশী ভঙ্গিল হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে তৈল ও গ্যাসের উড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হয়।

(৫) কোন-কোন তৈলক্ষেত্রে একাধিক তৈলগর্ভ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়,—এবং প্রত্যেক দুই তৈলবাহী স্তরের মধ্যভাগে থাকে এক **গভীর অপ্রবেশ্য** শিলাস্তর।

সৃষ্টিতত্ত্ব।—অতীব ক্ষুদ্র জীব বা উদ্ভিদ, সামুদ্রিক তলছাটের বা জমাটির (deposit) সহিত মিশিয়া কোন বালু বা চূণাপাথরের স্তরে আবদ্ধ হইলে, **চাপে ও তাপে** কার্বন (Carbon) ও উদজান-বাষ্প (Hydrogen)-সংপৃক্ত এক তরল বা বায়বীয় দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। ইহাই **পেট্রোলিয়ম**।

রূপ ও রূপান্তর—এই পেট্রোলিয়ম তরল বা পাঁকের মত,—ইহার রং কাল, ব্রাউন বা সবুজাভ ব্রাউন। ইহা চোঁয়াইলে ইহা হইতে বহু পদার্থ (২৫৪-৫৫ পৃ. দ্রষ্টব্য) নিষ্কাশিত হয়।

তেলের ব্যবহার—খনি হইতে প্রাপ্ত খনিজ গাঢ় তৈলের সহিত হাইড্রো-কার্বন (উদ্‌জান-অঙ্গারক) জটিলভাবে মিশ্রিত থাকে। ইহা উত্তাপ-প্রয়োগে শোধন করা হয়। এই তৈল শোধনকালে এক-একটি পদার্থ বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়, এবং সেই বাষ্প ধরিয়া ঘনীভূত করিলে নানাদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে প্রথমে বাহির হয় গ্যাস, ন্যাপথা, **গ্যাসোলিন** (পেট্রোল),—আরও উত্তাপ-প্রয়োগে পাওয়া যায়—**কেরোসিন, লুব্রিকেটিং** বা পিচ্ছিলকারী **তৈল** প্রভৃতি, সর্বশেষে পাওয়া যায় **প্যারাফিন** বা **মোম**, এবং **এ্যাসফ্যাল্ট** বা **পীচ** অথবা উভয়ই। এই-সকল দ্রব্য পুনরায় চোঁয়াইয়া

পৃথক করিলে আরও অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। এইরূপে পেট্রোলিয়ম হইতে শত-শত প্রকার দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সকলের মধ্যে গ্যাসোলিন ও লুব্রিকেটিং তৈলই প্রধান প্রয়োজনীয়। এই দুইটি দ্রব্য হইতে তৈল-শোধনের প্রায় সমস্ত খরচই উঠিয়া যায়। "পেট্রোল"-কে আমেরিকায় "গ্যাসোলিন" বলে।

গ্যাস প্রধানতঃ (১) গার্হস্থ্য ইন্ধন (২) গৃহের উত্তাপবর্ধন ও (৩) শিল্পকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শিল্পযন্ত্রের শক্তিরূপেই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫% গ্যাস শিল্পযন্ত্রে, ২০% গার্হস্থ্য ইন্ধনের জন্য এবং ৫% মাত্র গৃহের উত্তাপ বর্ধনের জন্য ব্যয়িত হয়। পেট্রোল প্রস্তুতকরণ ও খনি হইতে পেট্রোলিয়ম উত্তোলন কার্যে, সিমেন্ট কারখানায় ও ইলেক্ট্রিক প্রজনন কারখানায় এই গ্যাস ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে কৃষ্ণ অঙ্গার (carbon black) প্রস্তুত হয়—তাহা হইতে কালি, রং প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

কেরোসিন ধনী ও দরিদ্র—সকলেরই পরিচিত। গৃহে আলো দিতে, এবং কলকব্জার ময়লা পরিষ্কার করিতে ইহা সর্বদা ব্যবহৃত হয়। আবার, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য স্থানে রেলগাড়ী চালাইতে এবং জাহাজে নানা কার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মোটর গাড়ী, কলের লাঙ্গল, আকাশযান প্রভৃতি চালাইতে খনিজ তৈল নানারূপে ব্যবহৃত হয়।

আকাশযান ও মোটরগাড়ীর প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে পেট্রোলিয়ম হইতে উৎকৃষ্ট গ্যাসোলিন তৈয়ার করা হইতেছে—এই তৈলকে বলে Aviation Spirit।



৯১নং চিত্র।—পৃথিবীর খনিজ তৈল।

পৃথিবীতে ১৯৫৩ সালের হিসাব মত নিম্নলিখিতরূপ পেট্রোলিয়ম তৈল আছে—

পৃথিবীর
পেট্রোলিয়ম ভাণ্ডার ১৯৫৩
(মিলিয়ন ব্যারেল)

দেশ	সঞ্চিত তৈল	দেশ	সঞ্চিত তৈল
আ. যুক্তরাষ্ট্র	২৯,০৪৪	ইন্দোনেশিয়া	২,৪৫০
সাউদি আরব	২৮,০০০	ক্যানাডা	১,৯৫০
কুওয়েট	২০,০০০	মেক্সিকো	১,৭২৫
ইরান	১৫,০০০	কোয়াটার	১,৫০০
ইরাক	১৩,০০০	কলম্বো	৫৫০
ভেনেজুয়েলা	৯,৯০০	অন্যান্য	৩,১৪০
সো. রুশিয়া	৯,০০০	মোট	১,৩৫,২৫৯

পৃথিবীতে প্রায় ৫০টি দেশ হইতে তৈল পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালের প্রথম দশটি প্রধান তৈল উৎপাদক দেশের হিসাব এইরূপ :—

পেট্রোলিয়ম উৎপাদন—১৯৬০*
পৃথিবী (সোভিয়েট রুশিয়া সমেত) ১০৫৬৮০০ সহস্র মে. টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. ট.	পৃথিবীর শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৭৯৭৫	৩২.৯
২। ভেনেজুয়েলা	১৫২৩৬৪	১৪.৪
৩। সোভিয়েট রুশিয়া	১৪৭৮৫৯	১৪.০
৪। কুওয়েট	৮১৮৬৩	৮.০
৫। সাউদি আরব	৬২০৬৮	৫.৮
৬। ইরাণ	৫২২০০	৪.৯
৭। ইরাক	৪৭৪৫৯	৪.৫
৮। কানাডা	২৫৯৮৮	২.৫
৯। ইন্দোনেশিয়া	২০৫৯৬	১.৯
১০। মেক্সিকো	১৪৩৫৪	১.৪

* U. N. O. Yearbook. 1961

তৈল উৎপাদন-স্থান।—পৃথিবীর মধ্যে **আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র** সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল-উৎপাদক দেশ। ইহার আটটি তৈলখনি প্রধান। যথা ;—(১) মধ্যভাগের খনি,



৯২ নং চিত্র—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ তৈল।

(২) ক্যালিফোর্নিয়া খনি, (৩) মেক্সিকো উপসাগর তীরস্থ খনি, (৪) ইলিনয়েস-ইণ্ডিয়ানা খনি, (৫) ওহাইও-ইণ্ডিয়ানা খনি, (৬) অ্যাপালাশিয়ান খনি, (৭) রকি অঞ্চলের খনি, (৮) মিচিগান খনি। তৈল উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে ইহাদের বিবরণ—

(১) **মধ্যভাগের খনি**—সম্পূর্ণ ওক্‌লাহোমা রাষ্ট্র, এবং কান্‌সাস, মিসৌরী, আরকান্‌সাস্, লুইসিয়ানা, টেকসাস্ ও নব মেক্সিকো রাষ্ট্রের কতকাংশে এই সুবৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তৈলখনি অবস্থিত। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের অর্ধেকের বেশী এই খনি হইতে পাওয়া যায় ; এবং এই খনি হইতে উৎপন্ন তৈলের দুই-তৃতীয়াংশ টেক্‌সাস ও ওক্‌লাহোমা হইতে পাওয়া যায়।

(২) **ক্যালিফোর্নিয়া খনি**—এক্ষণে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় তৈল-উৎপাদক খনি। গড়ে ১৭% শতাংশ তৈল এখানে উত্তোলিত হয়, এবং ইহার তিন-চতুর্থাংশ পাওয়া যায় লস্ এঞ্জেলেস্ অঞ্চল হইতে।

(৩) **মেক্সিকো উপসাগর তীরস্থ খনি**—দ্বিতীয় অঞ্চল টেক্‌সাস্ ও লুইসিয়ানা রাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এখানে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ গড়ে ২০·৫% শতাংশ।

(৪) **ইলিনয়েস-ইণ্ডিয়ানা খনি**—দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয়েস রাষ্ট্রের কতকাংশে অবস্থিত। গড়ে ৩·৫% শতাংশ তৈল এই খনি হইতে পাওয়া যায়।

(৫) **ওহাইও-ইণ্ডিয়ানা খনি**—ওহাইও-র উত্তর-পশ্চিম এবং ইণ্ডিয়ানার উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত। এই ছোট খনিটি বহু পুরাতন। লিমা ইহার কেন্দ্র। এক্ষণে ইহা হইতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানার তৈল -পরিমাণের পূর্বে এই খনির সহিত হিসাব হইত। ১৯২১ সাল হইতে ইলিনয়েস খনির সহিত হইতেছে।

(৬) **অ্যাপালাশিয়ান খনি**—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা পুরাতন খনি। এক্ষণে ইহা নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ওহাইও, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ভার্জিনিয়া, টেনেসি ও এলাবামা স্টেটের উপর অবস্থিত। এককালে ইহা এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল-উৎপাদক খনি ছিল ; কিন্তু ১৯৫১-৫৩ সালে এই খনি হইতে গড়ে মাত্র ২½ শতাংশ তৈল পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আরও কমিয়া গিয়াছে। এই তৈলখনির জন্য এই অঞ্চল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, এবং সেজন্য বহু সহরের সৃষ্টি হইয়াছে। পিট্স্‌বর্গ, ক্লীভল্যাণ্ড প্রভৃতি এই অঞ্চলের বড়-বড় তৈলশোধক সহরের অন্যতম। কিন্তু এই খনির তৈল উৎকৃষ্ট এবং ইহার দাম বেশী।

(৭) **রকি অঞ্চলের খনি**—নব মেক্সিকো, কলোরেডো, ওয়াইওমিং, নেব্রাস্কা, দ. ডাকোটা, মণ্টানা ও ইউটা রাষ্ট্রে অবস্থিত। কিন্তু ইহার তৈলসম্পদ বেশী নহে, গড়ে মোটামুটি ৪% এবং ছোট-ছোট খনি ইহার বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত।

(৮) **মিচিগান খনি**—১৯২০ সালে সর্বশেষে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইহার উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

ভেনেজুয়েলার তৈল সম্পদ্ পৃথিবীর **অন্যতম শ্রেষ্ঠ তৈল-সঞ্চয়**। বার্ষিক উৎপন্ন তৈলের $\frac{4}{5}$ অংশ মেরেকাইবো হ্রদের সন্নিকটেই পাওয়া যায়। এই দেশে ওরিনকো নদীর উপত্যকায়ও নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তৈলই এই দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সম্পদ।

ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত ট্রান্স্ ককেশিয়ার মধ্যবর্তী ককেশস্ পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত কাস্পিয়ান হ্রদ-তীরস্থ **বাকু তৈলখনি** এই দেশের শ্রেষ্ঠ খনি ও বহুদিন হইতে এখানে তৈল উৎপন্ন হইতেছে। এই খনি নলপথ দ্বারা কৃষ্ণসাগর তীরস্থ বাটুম বন্দরের সহিত সংযুক্ত। ককেশস্-এর পূর্বদিকেই আরও উত্তরে অবস্থিত **গ্রজনি ও মাইকপ** খনি কৃষ্ণসাগর-তীরস্থ তুয়াপ সে বন্দরের সহিত নলপথ দ্বারা যুক্ত। এই দুই বন্দর হইতে খনিজ তৈল দক্ষিণ রুশিয়ার বন্দরে ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত হয়। আবার, এই সকল তৈল-খনির তৈল কাস্পিয়ান

হ্রদের ও পরে ভল্গা নদীর উপর দিয়া এবং অবশেষে রেলযোগে রুশিয়ার অভ্যন্তরস্থ অঞ্চলে প্রেরিত হয়। এই খনিগুলি হইতেই রুশিয়ার ৯৫ শতাংশের অধিক তৈল পাওয়া যায়।

রুশিয়ার অন্য খনি,—(১) কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত **এম্বা খনি**; (২) কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে অবস্থিত **নেফ্‌টেডাগ খনি**; (৩) ভল্গাতীরের **কুইবিশেভ খনি**; (৪) ইউরাল পর্বতের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত **উখ্‌তা হইতে স্টেরলিটাম্যাক পর্যন্ত তৈলখনিসমূহ**; ইউরাল পর্বত ও ভল্গা নদীর মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। দেশের $\frac{1}{3}$ অংশ তৈল এখান হইতে পাওয়া যায়। তাই এই অঞ্চলকে "দ্বিতীয় বাকু" অঞ্চল বলে। পের্‌ম্ (মলোটোভ) এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থ খনি; (৫) **উত্তর সাখালীন তৈলখনি।**

মধ্য প্রাচ্যে—কুওয়েট, সাউদি আরব, ইরাণ, ইরাক, বেহ্‌রিন লইয়া যে-অঞ্চল, তাহা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ তৈল উৎপাদন-স্থান। ১৯৫৬ সালে এই অঞ্চল হইতে প্রায় পৃথিবীর $\frac{1}{5}$ অংশ তৈল উৎখাদিত হয়। এই অঞ্চলে ৬৫৭ কোটি মে. ট. তৈল মজুত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিদেশী তৈল কোম্পানিই এখানকার খনি হইতে তৈল উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করেন। কুওয়েট খনিতে ইঙ্গ-আমেরিকীয়, ও বেহ্‌রিন খনিতে আমেরিকীয় কোম্পানি কর্তৃক তৈল উত্তোলিত হয়।

ইরাণ তৈলখনিও খুব বড় ও পারস্য উপসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এ্যাংলো-ইরাণ তৈল কোম্পানিই ইহার তৈল উত্তোলন করে, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রধান ভাগীদার ছিল। কিন্তু ১৯৫১-৫৩ সালে ইরাণ সরকার তৈল ব্যবসায় জাতীয় ব্যবসায় করিতে চান বলিয়া গোলমালের সৃষ্টি হয়। তৈল উত্তোলনের কার্য বন্ধ হয়, এবং ১৯৫৩ সালে মাত্র ৯ বিলিয়ন ব্যারেল তৈল উত্তোলিত হয়। শেষে বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে এক্ষণে ইরাণ খনি—আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফরাসী ও ডাচ অর্থে ও লোকবলে চালিত হইতেছে।

ইরাক খনি কুর্দিস্তান পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে **মোসল** ও **কিরকুকের** নিকট অবস্থিত। এখান হইতে নলপথে ৬১৭ মাইল দূরে ইস্রায়েলের অন্তর্গত হাইফা বন্দরে এবং ৫৩১ মা. দূরে লেবাননের অন্তর্গত ত্রিপোলি বন্দরে তৈল প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত লেবাননে সিডন আরও একটি নলসংযুক্ত তৈলবাহী বন্দর। এতদ্ব্যতীত,—

ইন্দোনেশিয়া তৈলখনি সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে অবস্থিত। সুমাত্রার পালেম্বাং ও বোর্ণিওর বালিক-পাপন নগরে তৈল পরিস্রুত হয়।

মেক্সিকোর তৈলখনি এক সময়ে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় খনি ছিল। ট্যামপিকো, টাক্সপান ও ভেরাক্রুজ ক্যারিবিয়ান সমুদ্রতটে তৈলখনি।

রোমানিয়া খনি—ইউরোপে রুশিয়ার পরে এইটি একমাত্র উল্লেখযোগ্য খনি। এককালে ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনি ছিল। নলপথ দ্বারা ইহা দানিয়ুব তীরস্থ গিউরগিউ বন্দরের সহিত সংযুক্ত,—সেখান হইতে নদীপথে মধ্য ইউরোপে তৈল প্রেরিত হয়, এবং কৃষ্ণসমুদ্র তীরস্থ কন্‌স্টান্‌টা বন্দরের সহিত সংযুক্ত, সেখান হইতে তৈল উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত হয়।

কোলোম্বিয়া খনি মাগ্‌ডালেনা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত এবং নলপথে ইহার তৈল কার্থাজেনা বন্দর দিয়া অন্যত্র প্রেরিত হয়।

আর্জেণ্টিনায় দুইটি তৈলখনি আছে। একটি উত্তর প্যাটাগোনিয়ায় এবং অপরটি আন্দিজের পূর্ব পার্শ্বে। বুয়েনোস্ আইরেসে তৈল পরিস্কৃত হয়।

জাপানের শ্রেষ্ঠ খনি হন্‌সু দ্বীপে আকিতা ও নিগাতা। এখানে অতি অল্পই তৈল পাওয়া যায়।

ব্যবসায়।—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়া যেমন পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ, তেমনি দুইটি শ্রেষ্ঠ আমদানিকারক দেশ। অন্য আমদানিকারক দেশ—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ। পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ অপরিশুদ্ধ ঘন তৈল রপ্তানি-কারক দেশ**—ভেনেজুয়েলা, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, সাউদি আরব, কুওয়েট, কোলোম্বিয়া, পেরু, মেক্সিকো ও ইরাণ;—এই সকল দেশের প্রায় সকলগুলির নিজদেশে বিক্রয়-স্থান নাই।

পৃথিবীর **পরিশুদ্ধ তৈল-রপ্তানিকারক দেশ**—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ডাচদ্বীপ, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া, ত্রিনিদাদ ও মেক্সিকো।

আমেরিকার পেট্রোলিয়ম-নির্গত কেরোসিন পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রীত হয়।

লবণ (Salt)

লবণ অর্থাৎ সোডিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাওয়ার লবণ তিন উপায়ে পাওয়া যায়;—(১) সমুদ্র-জল শুকাইয়া (evaporated) (২) লবণাক্ত হ্রদ প্রভৃতির ভূমি পরিষ্কার করিয়া বা ভূমির উপরের জমানি লইয়া (brine) ও (৩) খনি হইতে পাথরের মত শক্ত জমাট লবণ (rock salt) তুলিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতে সামুদ্রিক লবণের নাম **করকচ**, ও খনির লবণের নাম **সৈন্ধব**। সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ পাওয়া যায় আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে (১৯৬০ সালে ২১,৬৩৫ স. মে. ট.)।

তৎপরে লবণ-উৎপাদক দেশ—১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্য (৫৮৬১ স. মে. ট.), পশ্চিম জার্মানি (৩৯৬৯), ভারত (৩৪৩৩), ফ্রান্স (৩৯২৬), ক্যানাডা (২৯০৯), সো-রুশিয়া (৬৭০০) প্রভৃতি। ভারতবর্ষে এখন সমুদ্রতীরে লবণ উৎপাদন করা হইতেছে। পাকিস্তানে ৪৩১ স. মে. টন লবণ উৎপন্ন হয়। ইহার অধিকাংশ খনিজ লবণ।

অভ্র (Mica)

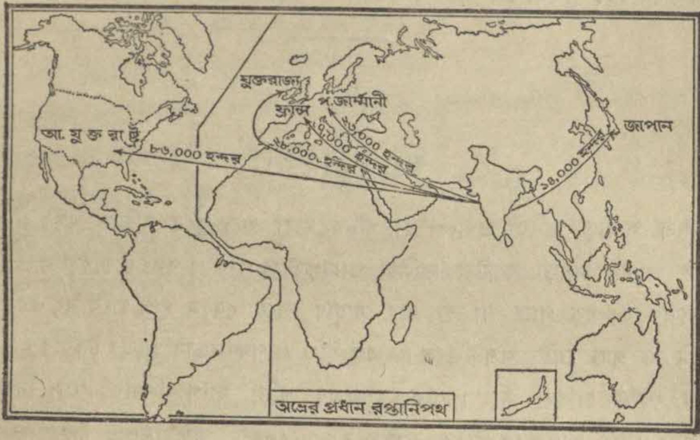
অভ্র অ-ধাতু খনিজ দ্রব্য—ইহা খনির মধ্যে স্তরে-স্তরে সজ্জিত থাকে। খনি হইতে অভ্রের চাপড়া কাটিয়া তুলিয়া তাহা হইতে পাতলা পাত ছাড়াইয়া লওয়া হয়। যে-অভ্রের বড়-বড় পাত পাওয়া যায়, যাহার গায়ে কোন দাগ থাকে না, এবং যাহা বর্ণহীন ও স্বচ্ছ সেই অভ্রই ভাল। এক ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট অভ্রের টুক্‌রার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কোন চাহিদা নাই। কিন্তু অভ্রের গুঁড়া ম্যাগ্‌নেশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া বয়লারের গায়ে লাগাইলে তাপ রক্ষিত হয়। সেজন্য আমেরিকায় টুক্‌রা ও গুঁড়া অভ্রের চাহিদা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে টুক্‌রা অভ্র নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে অভ্রের গুঁড়া হইতে কলিকাতায় Central Glass and Ceramics Research Institute এ **সামিকা** নামে কৃত্রিম **অভ্রখণ্ড** প্রস্তুত করা হইতেছে। সেজন্য ব্যবসায়িগণ অভ্রের ছাঁট রপ্তানি না করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্র-উৎপাদন স্থল। পৃথিবী অভ্রের ৬০ শতাংশ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৯ খৃ. অব্দে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ২৮,৮৪৬ টন অভ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে ২৯১৮২ টন। ১৯৫৯ সালে অভ্র বেচিয়া মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ;—১৯৬০ সালে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

ভারতের অভ্র সর্বোৎকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট অভ্রের নাম **মাস্কোভাইট** (muscovite)। অন্য অভ্র ফ্লোগোপাইট (phlogopite)। ভারতে মাস্কোভাইট অভ্রই বেশী পাওয়া যায়। বিহার, রাজস্থান ও অন্ধ্র প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র। বিহারের হাজারিবাগ, মুঙ্গের, গয়া ও মানভূম জেলা, এবং মাদ্রাজের নেলোর-এ অভ্র-অঞ্চল অবস্থিত। ফ্লোগোপাইট অভ্র মাদ্রাজ ও কেরল প্রদেশে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

ব্রাজিল, রুশিয়া, মাদাগাস্কার, ক্যানাডা, আর্জেণ্টাইন, ট্যাঙ্গানাইকা ও দ. রোডেশিয়া দেশেও অভ্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু "বেঙ্গল রুবি" নামে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পরিচিত বিহার প্রদেশের হাজারিবাগ জেলার অভ্রই অত্যুৎকৃষ্ট।

আ. যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। ভারতবর্ষের রপ্তানি-করা অভ্রের ৬০-৭০ শতাংশ আ. যুক্তরাষ্ট্রই লইয়া থাকে। অন্য খরিদ্দার—যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালী, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, হলণ্ড, ক্যানাডা, জাপান, পোলণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি।



৯৩ নং চিত্র—ভারতের অভ্রের প্রধান-প্রধান রপ্তানি-পথ।

অভ্রের ব্যবহার।—অভ্রের প্রধান গুণ এই যে, ইহা **স্বচ্ছ ও তাপসহ**। এই জন্য চুল্লী, কেরোসিনের উনান প্রভৃতিতে গরম হইলে তৎসংলগ্ন কাচ ফাটিয়া যায় বলিয়া তাহাতে কাচের বদলে অভ্র লাগানো হয়। ইহা **তাপ-অপরিবাহী**—ইহার ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলে না। সেজন্য ডাইনামো প্রভৃতি যন্ত্রে বিদ্যুৎ-পরিবহন রোধ করিতে অভ্র বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট-ছোট অভ্রের টুক্‌রা গালা দিয়া উপরি-উপরি জুড়িয়া এবং কখনও-কখনও উহা কাগজ বা কাপড়ের উপর রাখিয়া চাপ দিয়া, মাইকানাইট (micanite) নামক বস্তু প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে মাইকানাইট বোর্ড, কাপড় মাইকানাইট বা কাগজ মাইকানাইট বলে। ইহা পাতলা, বা মোটা নানা আকারের চাদর বা নল বা ব্লক আকারে পাওয়া যায়, ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে এই ব্যবসায় লাভজনক নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, অভ্রের প্রধান ব্যবহার—বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণে। আমাদের দেশে বহুদিন হইতে প্রতিমার সাজ-নির্মাণ করিতে, এবং বিবাহাদির শোভাযাত্রাকালে যে-সকল ঝাড়-লণ্ঠন ব্যবহার করা হয় তাহার বাতি বসাইবার গেলাস তৈয়ার করিতে, অভ্র ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্রের গেলাস লাগানো ঝাড়-লণ্ঠন এখন কমিয়া গিয়াছে। অভ্রের এই সকল গেলাসকে "খাস গেলাস" বলে।

গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত অ-ধাতু দ্রব্য

গৃহনির্মাণে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য—(১) **মাটি** ও (২) **বালি**। মাটি ও বালি পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতেই মাটি দিয়া দেওয়াল গাঁথিয়া বাড়ী তৈয়ার করা হইতেছে। তবে সহরে ও বড়-বড় গ্রামে মাটি হইতে ইট, টালি ও খোলা তৈয়ার করিয়া গৃহের শ্রীসম্পাদন করা হয়।

বালি ও কাচশিল্পঃ—গৃহ-নির্মাণে বালুকারও প্রয়োজন খুব বেশী। সিমেণ্টের সহিত মিশাইয়া বা চুনের সহিত মিশাইয়া গাঁথনির কাজে বালির প্রয়োজন হয়। আবার, বালুকার প্রধান উপকরণ **সিলিকা** (সিলিকন ডাইঅক্সাইড্—Silicon di-oxide)। এই সিলিকনই কাচের প্রধান উপকরণ। বালুকার সাহায্যে প্রস্তুত কাচ গৃহের জানালা-দরজায় লাগাইবার জন্য দরকার হয়।

পৃথিবীর **শ্রেষ্ঠ কাচ-উৎপাদন স্থান—আ. যুক্তরাষ্ট্র**। কাচশিল্পে দ্বিতীয় স্থান **জার্মানি**-র। পূর্ব জার্মানির জেনা নগরের জাইস্ কারখানায় প্রস্তুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ও চশমার কাচ বিখ্যাত। বেলজিয়ম, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেও কাচশিল্প বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেলজিয়ম কাচ—বিশেষতঃ জানালার কাচ, বিখ্যাত।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সব দেশেই কয়লা-খনি অঞ্চলেই কাচশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ কাচ-নির্মাণে আগুনের প্রয়োজন খুব বেশী।

ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে কাচের চুড়ি প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার সহিত গৃহনির্মাণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এক্ষণে ভারতে কাচের চাদর (Glass sheet) উৎপন্ন হইতেছে। গৃহনির্মাণে নানাভাবে ইহার প্রয়োজন হয়।

(৩) **সিমেণ্ট**ঃ—আজকাল উচ্চ ধরণের গৃহনির্মাণে বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য সিমেণ্ট। এক্ষণে গৃহের দেওয়াল গাঁথিতে, মেঝে প্রস্তুত করিতে—সব বিষয়েই সিমেণ্টের দরকার। ছাদও এখন সিমেণ্ট জমাইয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। সিমেণ্ট প্রস্তুত করার উপাদান—চুনাপাথর, জিপসাম, কয়লা ও মাটি। কয়লার প্রয়োজন দুই প্রকার। কয়লা সিমেণ্টের একটি উপাদান। এতদ্ব্যতীত যন্ত্র পরিচালন করিতেও কয়লার বা জলবিদ্যুতের দরকার হয়। চুনাপাথরের গুঁড়ার সহিত কর্দম ও অন্যান্য উপাদান মিশাইয়া ২৮০০° ফা. উত্তাপে পোড়াইলে সিমেণ্ট হয়। প্রায় ৮০টি দেশে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ সিমেণ্ট প্রস্তুত করে। তাহার ১৭.৮৫ শতাংশ (১৯৬০ সালে) উৎপন্ন হয় আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে। তৎপরে প্রধান স্থান—সো. রুশিয়া (১৪.৫%), প. জার্মানি (৭.৮৬%), জাপান (৭.১৭%),

যুক্তরাজ্য (৪.২৯%), ফ্রান্স (৪.৫৬%), ইতালী (৫%) প্রভৃতি। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ২.৫০ শতাংশ উৎপন্ন হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এখন (১৯৬০) ৩৪টি সিমেন্টের কারখানা আছে।

(৪) **প্রস্তর :**—(ক) **চুনাপাথর,** (খ) **গ্রানাইট,** (গ) **বেলেপাথর,** (ঘ) **ব্যাসাল্ট,** (ঙ) **মার্বেল,** (চ) **শ্লেট**—এই কয় শ্রেণীর পাথর সাধারণতঃ গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

(ক) **চুনাপাথর** (Limestone) :—মাছ, ঝিনুক, শাঁক, প্রবাল প্রভৃতি যে-সকল জীবের দেহে প্রচুর ক্যালসিয়ম কার্বনেট আছে, তাহা সমুদ্রতলে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত হইয়া চুনাপাথর সৃষ্টি করে এবং কালক্রমে এই-সকল পাথর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমুদ্রগর্ভ হইতে উন্নীত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠে চুনাপাথরের পাহাড় সৃষ্টি করে। ক্যালসিয়ম কার্বনেট চূনের মূল পদার্থ এবং এই পাথরেরও উপাদানস্বরূপ। অন্যান্য ব্যবহার ব্যতীতও ইহা রাস্তা ও প্রাসাদ নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। এই পাথর সর্বদেশে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবসায়ক্ষেত্রে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধান,—এবং ইহার ইণ্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্য হইতেই প্রধানতঃ গৃহনির্মাণের পাথর পাওয়া যায়।

(খ) **গ্রানাইট** (Granite) আগ্নেয় পাথর। এই পাথর খুব শক্ত এবং লাল, কাল, গোলাপী নানা রং-এর হয়। ইহাকে ইচ্ছামত আকারে কাটা যায় ও বেশ পালিশ করা যায়। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই পাথরের খুব খ্যাতি আছে। প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণে ইহার ব্যবহার বেশী। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রধান উৎপাদন-স্থান। উত্তর-পূর্ব আমেরিকার ভারমণ্ট (বারি—Barre—সহরে), মিনেসোটা ও জর্জিয়া প্রধান উৎপাদক রাষ্ট্র। ইউরোপে সুইজর্লণ্ড প্রধান উৎপাদন-স্থান।

(গ) **বেলেপাথর** (Sandstone) :—প্রাসাদ নির্মাণে বেলে পাথরের অর্থাৎ বালি-সংযুক্ত পাথরের ব্যবহার খুব বেশী। ইহাতে লৌহের পরিমাণ বেশী থাকিলে রং রক্তাভ হয়। সুতরাং সে-পাথরের প্রাসাদ দেখিতে ভাল হয়। আগ্রায় আকবরের কেল্লা এই পাথরে গড়া। ইহার অন্য রংও হয়। সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই পাথর পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ওহাই-ও ও পেনসিল-ভ্যানিয়া স্টেটে বেশী পাওয়া যায়।

(ঘ) **ব্যাসাল্ট** (Basalt)—আগ্নেয় শিলা। গলিত লাভা ঠাণ্ডা হইলে জমিয়া যায়, এবং উহাতে ব্যাসাল্টের উৎপত্তি হয়। এই পাথর খুব শক্ত, সহজে ভাঙ্গে না—তাই রাস্তা পাকা করার জন্য ইহার ব্যবহার বেশী। ইহার রং পোড়া ঝামার মত কাল বলিয়া গৃহ-নির্মাণে ইহার ব্যবহার কম। ইহাও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ভাগে নিউ জার্সি ও কনেক্টিকাট প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচুর পাওয়া যায়।

(ঙ) **মার্বেল** (Marble):—চুনাপাথর চাপে ও তাপে রূপান্তরিত হইয়া মার্বেল হয়। ইহার রং সাদা, কিন্তু অন্য পদার্থের মিশ্রণে নানা রঙের হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মার্বেল **ব্যবসায়-স্থল** আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভারমণ্ট স্টেট। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া, টেনেসি, কলোরেডো প্রভৃতি স্টেটে ও হ্রদ-অঞ্চলে মার্বেল পাথর পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মার্বেল-উৎপাদন স্থল ইতালীর লেগ্‌হর্ণ বন্দরের নিকট,—এখানে ক্যাব়্রারা সহরের মার্বেল শ্বেতবর্ণের জন্য বিখ্যাত। এইজন্য খুব সাদা কাগজকে ক্যারারা-বর্ণের (Carrara-White) কাগজ বলে। যুগ-যুগ ধরিয়া এখানে মর্মর প্রস্তরের মূর্তি প্রস্তুত হইতেছে, এবং এখান হইতে শ্বেত মর্মর সৌধের জন্য প্রস্তর চালান যাইতেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ভাল ও বিচিত্র মার্বেল পাওয়া যায়।

(চ) **শ্লেট** (Slate):—ইহাও রূপান্তরিত শিলা। কর্দমজাত শিলা রূপান্তরিত হইয়া শ্লেট হয়। ইহা খুব শক্ত নহে। আঁচড় দিলে ইহার গায়ে দাগ পড়ে। সেজন্য শ্লেট পাথরে লিখিবার বোর্ড প্রস্তুত করা হয়, এবং অপেক্ষাকৃত নরম-নরম শ্লেটে পেন্‌সিল প্রস্তুত করিয়া উহার দ্বারা শ্লেট-বোর্ডের উপর লেখা হয়। ইহার দ্বারা ছাদের ও মেঝের জন্য টালি প্রস্তুত করা হয়। ইহাও আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে পেন্‌সিল-ভ্যানিয়া, ভারমণ্ট, নিউ ইয়র্ক, মেইন প্রভৃতি স্টেট হইতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত-প্রদেশেও শ্লেট পাওয়া যায়।

(ছ) **এস্‌বেস্‌টস্** (Asbestos)।—এস্‌বেস্‌টস্ দেখিতে জমাট কতকগুলি আঁশের গুচ্ছ। এই আঁশ পৃথক্ করা যায়। ভাল এসবেস্‌টসের আঁশ তূলার মত নরম, ইহার দ্বারা কাপড় বোনা যায়। সিমেণ্টের সঙ্গে এস্‌বেস্‌টস্ মিশাইয়া ঢেউখেলানো বা সমতল চাদর প্রস্তুত হয়। এই চাদর বেশী গরম হয় না বা ইহাতে মরিচা পড়ে না। এজন্য টিনের ঢেউখেলানো চাদরের পরিবর্তে ঘরের আচ্ছাদন দিবার জন্য ইহার ব্যবহার খুব বাড়িতেছে। এস্‌বেস্‌টস্ অদাহ্য। সেইজন্য ইহার আঁশের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিভয় দূর করা হয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এস্‌বেস্‌টস্ উৎপাদন-স্থল ক্যানাডার অন্তর্গত **দক্ষিণ কুইবেক**। পৃথিবীর (১৯৬০ সালে ১৫৪০ স. মে. টন) অর্ধেকের বেশী (১৯৬০ সালে ৬৭·২%) এস্‌বেস্‌টস্ এখানে উৎপন্ন হয়। তৎপরে দ. আফ্রিকা সম্মেলন (১৯৬০ সালে ১০·৪%), দক্ষিণ রোডেশিয়া (৮%)। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা অত্যন্ত কম পরিমাণে (·০০১%) উৎপন্ন হয়।

এতদ্ব্যতীত, চুন, এস্‌ফাল্ট প্রভৃতি অধাতু দ্রব্যও গৃহনির্মাণে দরকার হয়।

Questions

1. Write notes on the uses of any four of the following minerals and state the sources of their supply :—Mica, Copper, Aluminium, Tin, Asbestos.

2. Name the most important producers of iron having surplus for export. What is India's position as a supplier of this commodity in the world market ? (Cal. B.Com. 1938)

3. Examine the influence of geographical factors on the location of iron and steel industry of the U. S. A. (Cal. B.Com. 1931)

4. Discuss the commercial and industrial uses of the following non-ferrous metals indicating thc countries where each may be found :—(a) Copper, (C. U. '42, '53), Tin. (C. U. '42), Lead.

5. Discuss critically the coal resources of the world. (B.Com. '49).

6. Briefly describe the world distribution of coal and iron with special reference to their economic importance.

7. Examine the coal resources of U.S.A. (Cal. Inter. 1932).

8. Compare coal and petroleum as sources of power and give their world-distribution. (I. I. B. 1941).

9. Describe the eight principal British coal-fields and their connection with the British manufactures.

10. What are the most important uses of Petroleum ? (Cal. Inter. 1927).

11. What are the liquid fuel-producing countries ? (B.Com. 1940).

12. What are the chief sources of industrial power ? Examine the sources.

13. Write an account of the world distribution of coal (Cal. Inter. 1954)

(২)

জলবিদ্যুৎ (Hydro electricity)

জলশক্তি ও জলবিদ্যুৎ-শক্তি।—সর্বপ্রথম শিল্পযন্ত্র চালাইতে জলশক্তি ব্যবহার করা হইত। তখন জলের স্রোতের তাড়নায় চাকা ঘুরাইয়া যন্ত্র পরিচালন করা হইত। মধ্য ইংলণ্ডে, ইউরোপের অন্য-অন্য অংশে, আ.-যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ড স্টেট-অঞ্চলে ও অন্যান্য অংশে এই জলশক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। পরে কয়লা হইতে উৎপন্ন বাষ্পে যন্ত্রচালনা আরম্ভ হইলে যতই সুলভে বাষ্প উৎপাদন করা সম্ভব হইল, ততই জলশক্তির ব্যবহার কমিতে লাগিল। তৎপরে জলবিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হইলে তাহারই প্রচলন আরম্ভ হইল এবং কয়লা-বাষ্পের প্রচলন কমিতে লাগিল। কিন্তু এখনও কয়লা-বাষ্পের ব্যবহার অপেক্ষা ইহার ব্যবহার বেশী হয় নাই। পৃথিবীতে শক্তি-প্রয়োগে যে-সকল কার্য সাধিত হয় তাহার $\frac{১}{১০}$ অংশ মাত্র জলবিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

জলবিদ্যুৎ-শক্তি—তাহার উপযোগিতা—সুবিধা ও অসুবিধা:—পূর্বেই বলিয়াছি—জলের তাড়নায় যন্ত্রের চাকা ঘুরাইয়া যে-শক্তি বলে যন্ত্র পরিচালনা করা যায় তাহাকে বলা হয় জলশক্তি। কিন্তু পর্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে নিম্নগামী বেগবতী স্রোতস্বতীর কিংবা উচ্চ হইতে বেগে পতনশীল জলপ্রপাতের, জলস্রোতের দ্বারা ডাইনামো (dynamo) ঘুরাইয়া যে-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহাকে বলে **জলবিদ্যুৎ-শক্তি**।

জলবিদ্যুৎ-শক্তির নানাপ্রকার সুবিধাবশতঃ ইহার প্রচলন বাড়িতেছে। কিন্তু ইহার কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন—

(১) পূর্বে কয়লা, খনিজ তৈল, ও খনিজ গ্যাস হইতে উৎপন্ন শক্তির কথা বলিয়াছি। ঐ সকল শক্তি কালক্রমে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু জলসম্ভূত শক্তি চিরস্থায়ী। জল যখন সমুদ্রে পড়িতেছে তখন উহা সূর্যোত্তাপে বাষ্পে পরিণত হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ঐ বাষ্প পুনরায় জলে পরিবর্তিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িতেছে। বাষ্প, বৃষ্টি ও জলের এই পর্যায়, যতদিন পৃথিবীতে সূর্য থাকিবে, ততদিন অব্যাহত থাকিবে। সূর্যের চিরস্থিতি সম্বন্ধে এখনও আমাদের বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমরা জলশক্তি—সূর্য যাহার প্রকৃতপক্ষে উৎস-স্বরূপ—তৎসম্বন্ধেও বিশ্বাস করিতে পারি যে, ইহা চিরস্থায়ী।

(২) জলশক্তি-উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ বাষ্পশক্তি-উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু অন্য শক্তি অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ শক্তি সস্তা। আবার,

(৩) জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য যে-স্থানে জলযন্ত্র স্থাপিত করা সম্ভব, সেই স্থানেই

তাহা স্থাপন করিতে হয়, এবং সেখান হইতে চারিদিকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি লওয়া যায়। তাহার বেশী দূরে ইহা কার্যকরী নহে। কিন্তু কয়লা বা পেট্রোলিয়াম, খনি হইতে তুলিয়া যে-কোন স্থানে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় লইয়া সেখানেই বাষ্প-উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়।

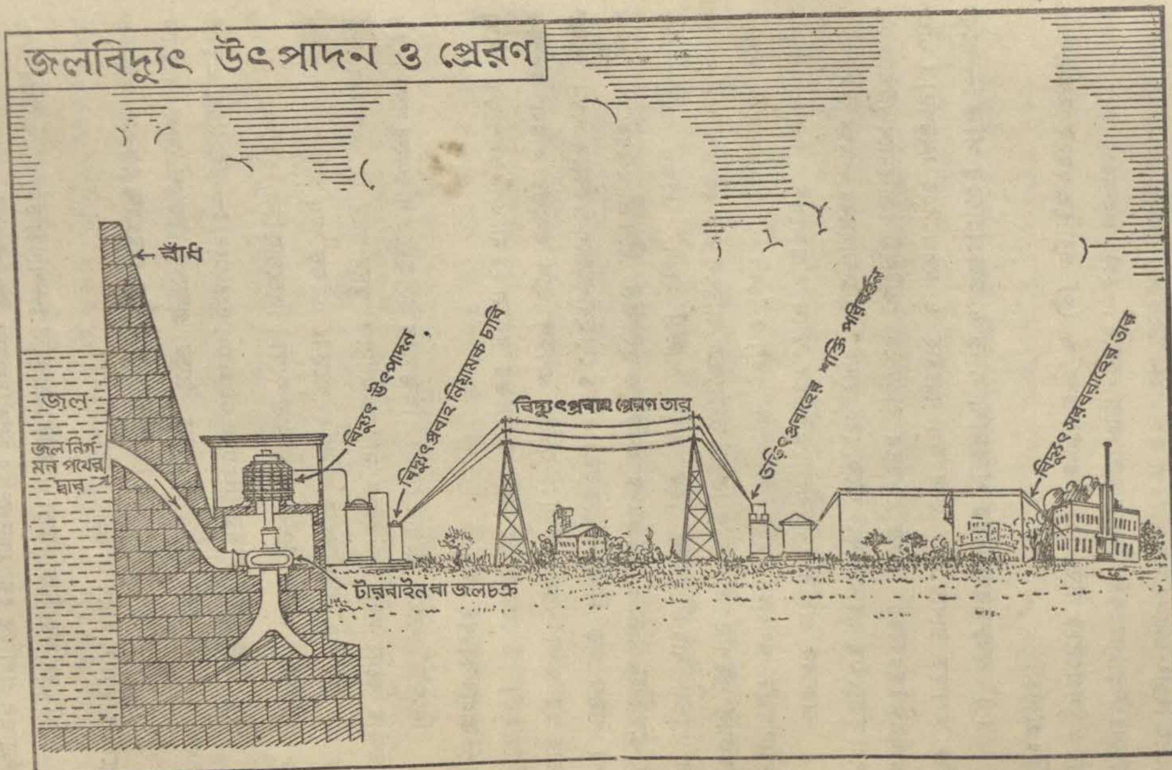
(৪) যেখানে কয়লা বা খনিজ তৈলের খনি নাই, সেখানে অন্য দেশ হইতে কয়লা ও তৈল আনাইয়া যন্ত্র-পরিচালনা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়লা ও খনির তৈল-হীন দেশে জলবিদ্যুৎ-শক্তি যোগে শিল্প-উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

(৫) জলবিদ্যুতের শক্তি প্রচণ্ড;—এজন্য কৃত্রিম সার উৎপাদনে, এ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশনে বা অন্যান্য স্থলে যেখানে অধিক শক্তির প্রয়োজন, সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি অপরিহার্য।

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন ঃ—জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কার্যে তিনটি জিনিষ প্রধানতঃ দরকার :—১। **বাঁধ**।—কোনও-কোনও স্থানে এইরূপ হইতে পারে যে, বর্ষাকালে নদীপ্রবাহ প্রবল হয়, এবং অন্য ঋতুতে নদীর স্রোত শুকাইয়া যায়। লৌহে সিমেণ্ট জমাইয়া উহার দ্বারা নদীতে বাঁধ দিয়া এক্ষণে জলাধার (reservoir) প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহাতে বৃষ্টির সময় জল সঞ্চয় করিয়া শুষ্ক ঋতুতে সেই জল ব্যবহার করার সুবিধা ত হয়ই অধিকন্তু ইচ্ছামত স্থানে ইহা নির্মাণ করিয়া জলের পতন-স্থানের উচ্চতা বৃদ্ধি করা যায়। সমতল ক্ষেত্রেও এইরূপ বাঁধ বাঁধিয়া জল-সঞ্চয় ও জলের বেগ বর্ধন করা যায়।

২। **টারবাইন (Turbine) বা জলচক্র**।—নদীপ্রবাহের পতনজনিত চাপ দ্বারা ইহা চালিত হয়। উচ্চস্থান হইতে টারবাইনের উপর জলনিক্ষিপ্ত হইলে টারবাইন বেগে ঘুরিতে থাকে ও বিদ্যুৎপাদনের সহায়তা করে। এক্ষণে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে সমতলের নদীগুলিও বাঁধের দ্বারা টারবাইন ঘুরাইতে ব্যবহৃত হয়। বাঁধ দিলে জলের উচ্চতা যে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, তাহার দ্বারাই জল-প্রবাহ টারবাইন ঘুরাইবার শক্তি অর্জন করে।

৩। **ডাইনামো**—(Dynamo)—বিদ্যুৎ-উৎপাদনের যন্ত্র। টারবাইনের সংযোগে ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়। এই বিদ্যুৎ বহু দূরেও যন্ত্র পরিচালনা করে। ইহাতে নদীতীরে জলবিদ্যুৎ-জননাগারের পার্শ্বেই শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার দরকার হয় না। আবার, ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক শিল্পকারখানা যদি নিজ-নিজ বিদ্যুৎ-আগার নির্মাণ করে বা কোন এক সাধারণ আগার হইতে বিদ্যুৎগ্রহণ করে, তবে অল্পমূল্যে কাজ চালাইতে পারে।



১৪ নং চিত্র—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রেরণ-প্রণালী।

জল-বিদ্যুৎ-আগার স্থাপনের স্থান নির্ণয় :—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যুৎ-জননের জন্য জলের শক্তিই প্রধান উপকরণ। সুতরাং জল-বিদ্যুৎ-আগার স্থাপনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার ;—(১) জল-সরবরাহের পরিমাণ, সময় ও জলপ্রবাহের গতি, (২) উত্তাপের প্রসর, ও (৩) প্রবাহিত স্থানের উচ্চাবচতা ও মাটির প্রকৃতি।

(১) **জল-সরবরাহের পরিমাণ, সময় ও জলপ্রবাহের গতি :**—জলের শক্তি অব্যাহত রাখার জন্য প্রচুর জল সরবরাহ ও জলপ্রবাহের সমরূপতা (uniformity) দরকার। এজন্য যে-স্থানে বারমাসই মোটামুটি সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, অথবা তুষারক্ষেত্র যাহার নিকটে থাকে, সেই স্থানই বিদ্যুৎ-আগারের উপযুক্ত স্থান।

ভারতবর্ষ প্রভৃতি মৌসুমী-বায়ু-প্রবাহিত স্থানে গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত বেশী ;—ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত বেশী। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত না হইলে নিকটে তুষারক্ষেত্র থাকিলে তাহা হইতে গলিত তুষারের জল পাওয়া যায়। সেজন্য কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। এইজন্য আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, কিংবা ইউরোপের ইতালী ও সুইজর্লণ্ড দেশে গ্রীষ্মে বরফগলা জলের উপর শক্তির জন্য নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মৌসুমী-অঞ্চলে শীতকালে যখন জলের অভাব হয় তখন বরফ গলে না। সুতরাং এসকল স্থলে জলাধার করিয়া জলসঞ্চয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে যে সহজে জলশক্তির ব্যবস্থা হয় না, এবং জলশক্তির ব্যবস্থা কম,—তাহার কারণই এই।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী। কিন্তু সর্বত্র ইহা হইতে শক্তিসঞ্চয় সম্ভব নহে। আফ্রিকার কঙ্গো নদী উঁচু হইতে নামিতে-নামিতে স্থানে-স্থানে যে প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয়ের সুবিধা হইয়াছে। এইজন্য সমস্ত আফ্রিকা হইতে যত শক্তি সংগৃহীত হয়, তাহার অর্ধেক হয় একমাত্র কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) হইতে।

(২) **উত্তাপের প্রসর** (Range of temperature) :—সাইবেরিয়া প্রভৃতি যে-সকল স্থান বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শীতের প্রাবল্যে বরফাবৃত, সে-সকল স্থানে নদী হইতে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভব নহে। আবার অত্যধিক গ্রীষ্মপ্রধান শুষ্ক দেশ হইতেও বৎসরের অধিকাংশ সময়ে জলস্রোত পাওয়া যায় না।

(৩) **জমির উচ্চাবচতা ও মাটির প্রকৃতি :**—পার্বত্য ঢালু জমির উপর দিয়া যত শীঘ্র জল প্রবাহিত হয়, সমতলভূমির উপর দিয়া তত শীঘ্র হইতে পারে না। সেইজন্য একই অঞ্চলে সমতলভূমির নদীর জলের গতিবেগ পার্বত্য নদীর জলের গতিবেগ অপেক্ষা কম।

নদীর অববাহিকার জমি যদি প্রবেশ্য হয়, কিংবা নদীপথে জলাভূমি থাকে, তবে জল বহুদিন সঞ্চিত থাকিতে পারে।

কিন্তু বাঁধ দিয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক প্রাকৃতিক বাধা বিদূরিত করা হইতেছে।

(৪) বিদ্যুৎজননাগার কোন স্থানে স্থাপনের সময় আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ভবিষ্যতে সেই অঞ্চলে **শিল্প সমৃদ্ধি** কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, এবং বিদ্যুৎ ভিন্ন অন্য **শক্তি উৎপাদনের** সম্ভাবনাই বা কত।

(৫) **যানবাহনের সুপ্রতুলতা** :—বিদ্যুৎ জননাগার হইতে নিকটবর্তী শিল্প-বহুল ও জনবহুল স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা থাকা দরকার। ইহাতে উৎপন্ন বিদ্যুতের উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে ও ইহা লাভজনক হইতে পারে।

বিভিন্ন দেশে জলবিদ্যুৎ-সৃষ্টি।—যেখানে শিল্প-সমৃদ্ধি বেশী এবং কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাব, অথবা আবশ্যকীয় শিল্প-শক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না, —যেখানে লোকবসতি ঘন, সেখানেই জলবিদ্যুৎ-সৃষ্টির আবশ্যকতা বেশী। পৃথিবীতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ জলবিদ্যুৎ-সৃষ্টিতে বেশী উন্নতি করিয়াছে। তাহার পরে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা।

উত্তর আমেরিকা :—পৃথিবীতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির প্রায় ৪৫% এখানে উৎপন্ন হয়। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের (১) উত্তর পূর্ব অংশে নিউ ইংলণ্ড স্টেট অঞ্চলে, (২) মধ্য আট্‌লান্টিক স্টেটগুলিতে, (৩) মধ্যভাগের উত্তর-পূর্ব দিকের স্টেটগুলিতে, (৪) হ্রদ অঞ্চলে ও (৫) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ স্টেটগুলিতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।

(১) নিউ ইংলণ্ড স্টেটগুলিতে কয়লার অভাব, এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম যখন এই অঞ্চলে শিল্পসৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন জলবিদ্যুৎ-শক্তিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সেজন্য এই অঞ্চলে এক্ষণে জলবিদ্যুৎ শক্তিই প্রধান শক্তি। (২) ও (৩) মধ্য-আট্‌লান্টিক ও মধ্যভাগের উত্তর-পূর্ব স্টেটগুলিতে কয়লার অভাব ঘটে নাই বটে, কিন্তু শিল্পশক্তির আবশ্যকতা এত বেশী যে, জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিয়া সে-দরকার মিটাইতে হয়। (৪) হ্রদ-অঞ্চলে ক্যানাডায় কুইবেক ও অন্টারিও শিল্পপ্রধান স্থান, কিন্তু সেখানে কয়লার অভাব। সুতরাং জলবিদ্যুৎ-শক্তি প্রধান অবলম্বন। ক্যানাডায় প্রেইরি-অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্র অল্পবিস্তর জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। তবে হ্রদ-অঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে বেশী। (৫) প্রশান্ত মহাসাগর-তীরস্থ স্টেটগুলিতে কয়লার সুবিধা নাই, তবে ক্যালিফোর্নিয়াতে খনিজ তৈল আছে। কিন্তু বহুকাল হইতে পার্বত্য নদীতে বাঁধ দিয়া এখানে জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন চলিতেছে। সেইজন্য এ-অঞ্চলে ক্যালিফোর্নিয়া, ওরিগণ ও ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্টেটে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন চলিতেছে। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ-শক্তির

চতুর্থাংশ এখানেই উৎপন্ন হয়। ১৯৬০ সালে আ. যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ ৮৪০৯৪৬ মিলিয়ন kwh. তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ ১৪৯০৬৬ kwh.

ইউরোপ ঃ—পশ্চিম ভাগের গ্রেট্‌বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, এবং এক্ষণে রুশিয়া শিল্প-প্রধান স্থান। কিন্তু এই-সকল স্থানে কয়লা এরূপ সহজপ্রাপ্য যে, জলশক্তির বিশেষ দরকার হয় না।

ইহাদের মধ্যে আবার গ্রেট বৃটেনের জলবিদ্যুৎ-জননের সুবিধা কম। জার্মানি অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশ ; সুতরাং সেখানে সকল রকম শক্তিরই আবশ্যক হয়। ফ্রান্সে কয়লা কম, তেলও নাই। সেজন্য জলবিদ্যুৎশক্তির দরকার বেশী। রুশিয়ার খনিজ শক্তি-সম্পদ্ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তাহার শিল্প-সম্পদ্ নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এক্ষণে সে জলবিদ্যুৎ-শক্তি সমেত সকল শক্তিরই ব্যবহার করিতেছে।

নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌লণ্ড, সুইজর্লণ্ড ও ইতালীর শিল্প-সম্পদ্ আছে। সেজন্য শক্তির আবশ্যকতাও বেশী, কিন্তু খনিজ শক্তি নাই। সেজন্য জলবিদ্যুৎশক্তিই সেখানকার প্রধান অবলম্বন। ইহারা একত্রে ইউরোপের অর্ধেক জলবিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করে।

জার্মানির শিল্প বিশেষ উন্নত। সেখানে কয়লাও আছে, কিন্তু তেল নাই। সেখানে জলবিদ্যুতের ব্যবহার খুব বেশী।

নিম্নে ইউরোপের কয়েকটি দেশের গবর্ণমেণ্ট ও শিল্পপতিগণের দ্বারা কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎশক্তির একটি হিসাব দেওয়া হইল।

১৯৬০ সালে—

	উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি (মিলিয়ন kwh)	তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি (মি. kwh)
প. জার্মানি	১১৬১১৮	১২৯৯৩
নরওয়ে	৩১৩৩৫	৩১১১০
সুইডেন	৩৪৭৯৫	৩১০৯০
ফিন্‌লণ্ড	৮৬০৫	৫২৬৯
সুইজর্লণ্ড	১৯০৭২	১৮৮২৬
ইতালী	৫৬২৪০	৪৬১০৬
যুক্তরাজ্য	১৩৬৬৬৬	৩১৩৩

এশিয়ায় ঃ—জাপানই শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ। কিন্তু তাহার খনিজ শক্তি নাই। সেজন্য জলবিদ্যুৎ-শক্তির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কয়লার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক্ষণে জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ও ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে।

এশিয়ায় চীন ও এশিয়াধীন রুশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়াও বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করিতেছে।

১৯৬০ সালে এশিয়া মহাদেশে—**ভারতবর্ষে** মোট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল—১৯৬৫৮ মিলিয়ন kwh, তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি ৭৭৫৪ মি. kwh; **জাপানে** বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ১১৫৪৮৯ মিলিয়ন kwh, তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি ৫৮৪৭৪ মিলিয়ন kwh.

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে ক্রমশঃ শিল্প-সম্পদ বাড়িতেছে। তাই জলশক্তির ব্যবহারও বাড়িতেছে। এখানকার অর্ধেক প্রচ্ছন্ন শক্তি ব্রাজিলেই আছে।

১৯৬০ সালে—দক্ষিণ আমেরিকায়

	উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি (মি. kwh)	তন্মধ্যে জলবিদ্যুৎশক্তি (মি. kwh)
ব্রাজিল	২১১০৮	১৭৮৬৯
আর্জেন্টিনা	১০৩৭২	৭৮৪৭
চিলি	৪৪২৭	২৯৪৩

আফ্রিকার প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ-শক্তি অত্যন্ত বেশী—পৃথিবীর ৪০%। কিন্তু ইহা বনাচ্ছন্ন লোকবিরল স্থান। সেজন্য এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। কেবল ইউরোপীয় শক্তি-অধিকৃত স্থানে অতি অল্প পরিমাণে ইহা উৎপন্ন হইতেছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রচ্ছন্ন শক্তি পৃথিবীর অর্ধেক (৫২%)। কিন্তু উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি মাত্র ২%।

পৃথিবীর প্রচ্ছন্ন জলশক্তি ও উৎপন্নশক্তি :—পৃথিবীতে যে জলবিদ্যুৎ-শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা মোটামুটি ৬৭ **কোটি অশ্বশক্তির* সমান** বলিয়া অনুমিত হয়। নিম্নের হিসাবে দেখা যাইবে তাহার অল্পমাত্র উৎপন্ন করা হয়:—

মহাদেশ	পৃথিবীর মোট প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ-শক্তির যত শতাংশ**		পৃথিবীর বাৎসরিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (বিলিয়ন kwh†১৯৫০)
১। এশিয়া	২২·৩	...	৪৭
২। ইউরোপ‡	১০·৪	...	১১২
৩। আফ্রিকা	৪০·৩	...	১
৪। উ. আমেরিকা	১২·০	...	১৪৫
৫। দ. আমেরিকা	১২·০	...	১০
৬। ওশিয়ানিয়া	৩·০	...	৪·৫
পৃথিবী‡ (রুশিয়াসমেত)	১০০	...	**৩২২**

* ১ কিলোওয়াট=১·৩৪১১ অশ্বশক্তি।

** Industrial and Commercial Geography J. Russel Smith.

† kwh=kilowatt-hour=A unit of energy equal to that done by one kilowatt acting for one hour=১.৩৪ horse power hour.—Webster.

‡ সো. রুশিয়ার প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তি ১৯৫০ সালে ৭৮·০ মিলিয়ন অশ্বশক্তি। জলশক্তি উৎপাদন ০·০৪ বিলিয়ন kwh.

উপরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে আফ্রিকায় প্রচ্ছন্ন শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু উৎপন্ন শক্তি সর্বাপেক্ষা কম। আফ্রিকায় যে-অংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেই অংশেই কঙ্গো প্রভৃতি বড়-বড় নদী আছে। এই-সকল নদী হইতে পৃথিবীর অধিক পরিমাণ জলবিদ্যুৎশক্তি সংগৃহীত হইতে পারে।

বিদ্যুৎ।—এই স্থানে একটি কথা বলা দরকার যে, শিল্প-যন্ত্রের জন্য যে-বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহা যে সকল ক্ষেত্রেই জল সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি তাহা নহে। পৃথিবীতে যত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ প্রধানতঃ কয়লা দ্বারা এবং এক-তৃতীয়াংশ মাত্র জলের শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়। তাপ, খনিজ তৈল ও প্রাকৃত গ্যাস দ্বারাও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। তবে তাহার পরিমাণ বেশী নহে।

বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধা :—বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের **সুবিধা এই যে,** (১) কয়েকটি মাত্র চাবি দ্বারা ইহার গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা যায় ;—(২) বিদ্যুৎ-জনন-স্থান হইতে ৩০০ মাইল দূর পর্যন্ত প্রবাহ লইয়া কল চালানো যায়। কিন্তু ইহার **অসুবিধা এই যে,** (১) ৩০০ মাইলের বেশী দূর লওয়া যায় না ; (২) বেশী দূর লইলে তেজের লঘুতা হয়, এবং (৩) ইহা অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় না।

ভারতবর্ষের জলশক্তি :—উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হয় নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষি হইতেই তাহার অধিবাসীদের অন্নসংস্থান হইত। ক্রমে লোকবৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু শিল্পের কোন চেষ্টা হইল না। তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও এই দেশকে কাঁচামাল উৎপাদক দেশ,—ও তাহাদের মাতৃভূমিতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বাজার-স্বরূপ রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৯০২ খৃঃ অব্দে কোলার স্বর্ণখনির প্রয়োজনে কাবেরী নদীতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইল। অবশেষে জনমতের চাপে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে এদেশে জলবিদ্যুৎ-সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইল। ১৯২১ খৃঃ অব্দে ঐ অনুসন্ধানের ফল বাহির হইলে জানা গেল, এদেশে ১২৬ লক্ষ কিলোওয়াট (kw.) বিদ্যুৎশক্তি-জননের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাজনীতিক কারণে এই প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে গবর্ণমেণ্টের এ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়া বোম্বাই প্রদেশে ১৯১৫ খৃঃ অব্দে টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং খপোলীতে, ১৯২২ খৃঃ অব্দে অন্ধ্রভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং ভিবপুরিতে, এবং ১৯২৭ খৃঃ অব্দে টাটা পাওয়ার কোং ভিরাতে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপিত করেন। এই তিনটি জামসেদ টাটার-ই কোম্পানি। এই তিনটি কোম্পানি ১৯২৯ খৃঃ অব্দে মিলিত লইয়া টাটা

হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সি নাম গ্রহণ করে। ১৯৪২ খৃঃ অব্দের হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষে (ভারত ও পাকিস্তানে) প্রচ্ছন্ন জলশক্তি-সম্পদ্ আনুমানিক ৪৫ লক্ষ কিলোওয়াট ছিল। কিন্তু এই অনুমান সকলে গ্রহণ করেন না। কাহারও-কাহারও মতে এক্ষণে ভারতে ৪০০ লক্ষ কিলোওয়াট (kw) প্রচ্ছন্ন জলশক্তি আছে। কিন্তু ন্যূনাধিক ১০ লক্ষ (kw) বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতবর্ষে ১৩০০ কোটি কি. ও. ঘ. বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে ১৫০৩ কোটি। ভারতবর্ষে মাথা পিছু বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল ১৯৫৬ সালে ১৯'৬৫ কি. ও। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ খৃ. অব্দে ৩২'৬৪ kw, (ক্যানাডা—৫১৬০ kw, সুইডেন—৩৬০২, আ. যুক্তরাষ্ট্র—৪১১৭ ও নরওয়ে ৭০৬৮)।

জলবিদ্যুৎশক্তি-জননে পৃথিবীতে ভারতের স্থান:—জলবিদ্যুৎশক্তি-প্রজননে ভারতের স্থান অতি নিম্নে। নিম্নের হিসাব দেখিলে ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বুঝা যাইবে—

দেশ	বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৯৬০ (কোটি kwh)
সুইজর্লণ্ড	১৮৮২
ক্যানাডা	৯৭০৪ (১৯৫৯)
সুইডেন	৩১০৯
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৪৯০৬
নরওয়ে	৩১১১
যুক্তরাজ্য	৩১৩*
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৭৭৫*

সুতরাং জলবিদ্যুৎশক্তি-জননে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের স্থান নগণ্য।

*জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ একত্রে যুক্তরাজ্য—১৩৬,৬৬৬, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮৫ মিলিয়ন kwh।

ভারতে সর্বপ্রকার বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নিম্নের বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে—

১৯৫৫ সালে…৮৫৯২ মিলিয়ন kwh
১৯৫৬ „ ‥ ৯৬৬২ „
১৯৫৭-৫৮ „ …১১৩৬৯ „
১৯৫৮-৫৯ সালে…১২৯৯৪ মিলিয়ন kwh
১৯৫৯-৬০ „ …১৫০৩৩ „

Questions

1. What is Hydro-electricity ? How does this power differ from other forms of power ?

2. Name any four countries where water-power is principally used. Explain the special circumstances on each country favouring its use in preference to other forms of power. (Cal. Inter. 1933)

3. Is water-power a free gift of nature ? Write a brief account of the water-power resources of Asia, indicating the advantages and disadvantages of this continent for water-power development.

4. What are the geographical factors affecting hydel power development ? Give a brief review of the potential and developed hydro-electric power in India.

5. What are the favourable circumstances under which hydel power can be generated ?

৩

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খনিজ সম্পদ ও তাহার সমস্যা

ভারতের খনিজ সম্পদ।—বহু প্রাচীন কালে বর্তমান যুগের আফ্রিকা, আরব সাগর, দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া একত্রে **গণ্ডোয়ানা দেশ** (Gondwana land) নামে একটি মহাদেশ ছিল। কালক্রমে ইহার কোন-কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সেজন্য এখন ইহার অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত এই গণ্ডোয়ানা দেশের এক অংশ। ইহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বর্তমানকালে উত্তর-প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, বিহারের দক্ষিণ ভাগে ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগে যে পার্বত্য-প্রদেশ আছে তাহা এই গণ্ডোয়ানা দেশেরই অন্তর্গত। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অংশ দক্ষিণ ভারত—এবং ইহার উপরিস্থিত পর্বতগুলি প্রাচীনতম। এই দক্ষিণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল স্থান অতি প্রাচীনকালের আগ্নেয়-পর্বত-নিঃসৃত গলিত লাভায় আচ্ছন্ন আছে। ইহার নাম ব্যাসাল্ট (basalt বা trap)। ইহা এখানে প্রায় দুই-তিন হাজার ফিট্ গভীর।

ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম অংশই খনিজ পদার্থের আকর স্থান। ভারতের খনিজ সম্পদের $\frac{3}{4}$ অংশ বিহার প্রদেশে অবস্থিত। ইহারই পূর্বভাগ ও তৎসংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমভাগ সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লা উৎপাদন স্থান। এই অঞ্চলেই—বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনস্থানে—লোহাপাথরের বিপুল ভাণ্ডার। তাছাড়া বিহারের এই অঞ্চল অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তাম্র, কেওলিন, এস্‌বেস্‌টস্ প্রভৃতি বহু খনিজ দ্রব্যের আকর-স্থান। মোটামুটিভাবে পেট্রোলিয়ম ও গন্ধক ব্যতীত ভারতের সকল খনিজ দ্রব্যই এই দক্ষিণ ভারতে ও সন্নিহিত স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতানা, কেরল, বোম্বাই, মহীশূর ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে, পাওয়া যায়।

বিভিন্ন খনিজদ্রব্য উৎপাদনে ভারতের স্থানঃ—**অভ্র, ইল্‌মেনাইট** ও **মনাজাইট** উৎপাদনে ইহার স্থান পৃথিবীতে **সর্বপ্রধান**। **ম্যাঙ্গানিজ** উৎপাদনে রুশিয়ার পরেই ইহার স্থান **দ্বিতীয়**। কিন্তু এই দুই স্থানের উৎপাদনের পরিমাণের পার্থক্য অত্যধিক ;—রুশিয়ার (১৯৬০)—২৬০০ স. মে.

টন, ভারতের ৪৯১। বর্তমান যুগের শিল্পার্থে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় লৌহভাণ্ডার এখানে বিপুল বটে, কিন্তু **লৌহউৎখাতে** ভারতের স্থান **বহু নিম্নে**—রুশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, ভেনেজুয়েলা, ও ক্যানাডার পরে **৭ম; কয়লা-উৎখাতে** ভারতের স্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, পোলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের পরে **অষ্টম; পেট্রোলিয়ম** এখানে অতি অল্প;—রৌপ্য, তাম্র, সীসক ও দস্তা প্রভৃতির পরিমাণ নিতান্ত কম, এবং নিকেল, পারদ, রাং, টাংস্টেন ও গন্ধক ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একেবারেই নাই বলা যাইতে পারে।

ভারতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যগুলির প্রাচুর্য অনুসারে এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহাদের চাহিদা অনুসারে ইহার খনিজ সম্পদ্‌কে চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

১। যে-সকল খনিজ দ্রব্য **ভারতের দরকারের তুলনায় প্রচুর এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়**—লৌহ প্রস্তর, ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর, ম্যাগ্‌নেসাইট, বক্সাইট, টিটানিয়াম প্রস্তর, অভ্র, স্টীয়াটাইট, সিলিকা, মনাজাইট, ইলমেনাইট, কয়লা প্রভৃতি।

২। যে-সকল খনিজ দ্রব্য **ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অভাব মোচন করে, কিন্তু রপ্তানি করার মত উৎপন্ন হয় না**—ব্যারাইটস, ফেলস্‌পার, ক্রোমাইট, স্বর্ণ, জিপসাম, লবণ, চীনামাটি প্রভৃতি।

৩। যে-সকল খনিজ দ্রব্য ভারতে প্রচুর উৎপন্ন হইলেও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। যেমন,—এলুমিনিয়ম।

৪। যে-সকল খনিজ দ্রব্য **দরকারের তুলনায় অপ্রচুর এবং যাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়**—নিকেল, তাম্র, সীসা, পেট্রোলিয়ম, গন্ধক, পারদ, টিন, দস্তা প্রভৃতি।

ভারতে **গন্ধক** নাই। ভারত-বিভাগের পূর্বে বেলুচিস্তানে ছিল। এখন আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালী হইতে আনাইতে হয়।

সীসা-র জন্য ভারতের আ. যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রহ্মদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

নিকেলের জন্য ভারতের ক্যানাডার মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

টিন ভারতে নাই বলিলেই হয়। ইহা মালয়, ইন্দোনেশিয়া হইতে আনাইতে হয়।

দস্তা ভারতে রাজস্থান ও কাশ্মীরে অল্প পাওয়া যায়, এবং রোডেশিয়া, আ. যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও লিওপোল্ডভিল কঙ্গো প্রভৃতি দেশ হইতে দস্তা-দ্রব্য আনাইতে হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ-দ্রব্যের মোট মূল্যের গতি

(লক্ষ টাকা)

বৎসর	কয়লা	ধাতু দ্রব্য	অ-ধাতু দ্রব্য	গৃহ নির্মাণ দ্রব্য	মোট
১৯৫৪	৫৩৯০	২৩৩০	৭৯০	৪১০	৮৯২০
১৯৫৫	৫৬০০	২৩৯০	১০৮০	৩৬০	৯৪৩০
১৯৫৬	৬৫১০	২৮০	৯৩০	৪৫০	১০৬৯০
১৯৫৭	৮১৪০	২৮৭০	১১৮০	৭৪০	১২৯৩০
১৯৫৮	৮৯৯০	২৬২০	১৩২০	৮০০	১৩৭৩০
১৯৫৯	৯৪৯০	২৫০০	১০৭০	৯৮০	১৪১২০
১৯৬০	১০৮৯৫	২৮৪০	১১০৬	১৪৮৯	১৬৩২০

ভারতে উৎপন্ন কয়েকটি খনিজ--দ্রব্য ১৯৫৯ ও ১৯৬০

খনিজ দ্রব্য	১৯৫৯		১৯৬০	
	উৎপাদন	মূল্য (সহস্র টাকা)	উৎপাদন	মূল্য (সহস্র টাকা)
অভ্র (মে. টন)*	২৮,১৪৬	২৪,৩৭৬	২৯,০০৩	২৪,৫৭১
ইল্‌মেনাইট (মে. টন)	৩০৩,০২২	১৭,৮৪১	২৪৯,৭৫১	১৪,৬৯৫
এস্‌বেস্‌টস্‌ (মে. টন)	১,৩৬৬	৪০৫	১,৭১১	২০১
কয়লা (সহস্র মে. টন)	৪৭,৮২৯	৯৪৮,৭৭৮	৫২,৬৩৯	১০৮,৯৫০০
ক্রোমাইট (মে. টন)	৯৫,৫৯৬	৫,৩৬৪	১০০,১১২	৫,৭৩৩
জিপসাম (মে. টন)	৮৫৯,৭১৭	৬,২৪৭	৯৯৭,৪৪৩	৬,২৫২
তাম্র—অবিশুদ্ধ (মে. টন)	৪০৩,৭১১	২১,৩৯৭	৪৪৭,৮৮২	২৩,৭৩৬
দস্তা (মে. টন)	৯,৯৭৮	২,৫৯৪	৯৭,৮৬	২,৫৪৪
বক্সাইট (মে. টন)	২১,৭৯৯১	২,২১২	৩৮৩,৫২৭	৪,১৫০
ম্যাগ্‌নেসাইট (মে. টন)	১৫,৭৯৬৭	২,৪৩৫	১৫৬,৩৩১	২,৬৮৩
ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর (সহস্র মে. টন)	১,১৭৮	৯১,৬১৫	১১,৮২	৮১,৭৮৯
রৌপ্য (কিলোগ্রাম)	৩,৮৮১	৬৬১	৪,১২৮	৭৮০
লৌহপ্রস্তর (সহস্র মে. টন)	৭,৯৮১	৫৭,৪৬১	১০৬৮৩	৭৭০০৫
সীসা (মে. টন)	৬৪৮৮	২৩১৮	৬২৪৫	২২৩১
স্বর্ণ (কিলোগ্রাম)	৫১৪৪	৫৩৬০৪	৪৯৯৫	৫৬৬৭৪
হীরক (ক্যারাট)	৬৮২	২২৫	১১৫৯	৫২৯

* অসংস্কৃত অভ্র। মূল্যের অঙ্ক = রপ্তানি মূল্য। কিন্তু ১৯৬০ সালের অঙ্ক খনিমুখে বিক্রীত অভ্রের মূল্যাঙ্ক।

সমস্যা।—(১) ভারতের খনিজ সম্পদ্ প্রচুর বটে, কিন্তু ইহার আকার ও লোকসংখ্যার তুলনায় ইহাকে সুপ্রচুর বলা যায় না। বিশেষতঃ পেট্রোলিয়ম, গন্ধক নিকেল, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এদেশে বিশেষ উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহাদের জন্য তাহার পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

(২) ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। কিন্তু ইহার খনিজ সম্পদ অধিকাংশ উত্তর ভারতেই উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ শিল্পসৃষ্টির প্রধান উপাদান কয়লা ও লৌহ উত্তর ভারতেই প্রচুর পাওয়া যায়। সেজন্য ভারতের সকল অংশে শিল্পসৃষ্টির অসুবিধা ঘটে।

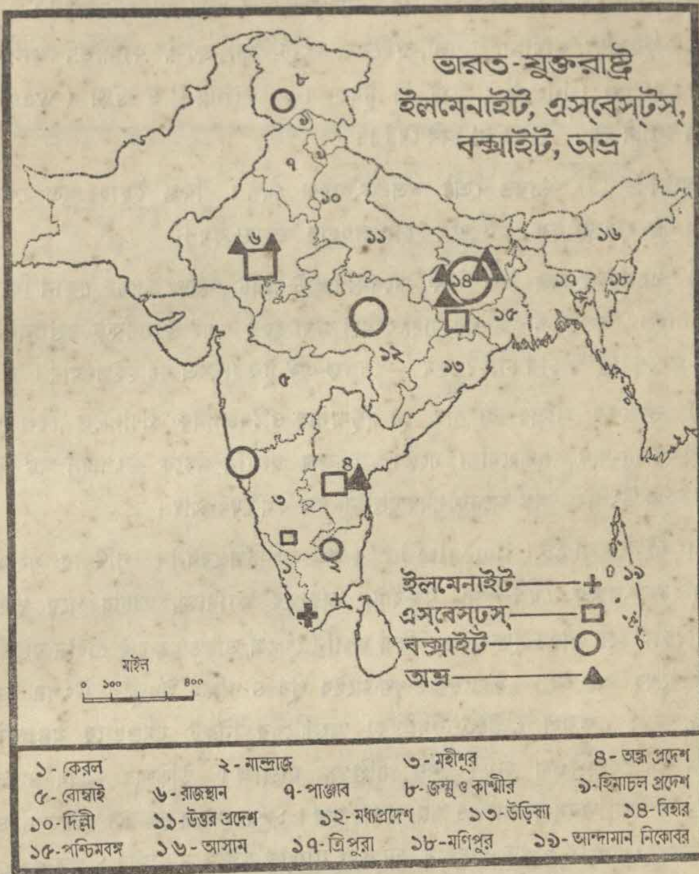
(৩) ভারতবর্ষে যেরূপ খনিজ দ্রব্য আছে, তদনুসারে তাহার শিল্প সৃষ্টি হয় নাই। সেজন্য এই সকল খনিজ দ্রব্য তাহার অনেকাংশে রপ্তানি করিতে হয়। বিশেষতঃ অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, ইলমেনাইট, মনাজাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতি উৎপাদনে তাহার স্থান বহু উর্ধ্বে।—কোন-কোন ক্ষেত্রে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ এই-সকল শিল্পক্ষেত্রে মহামূল্যবান্ খনিজ দ্রব্য তাহার কেবল রপ্তানি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এরূপভাবে বেশী দিন চলিলে এই-সকল খনিজ দ্রব্য ফুরাইয়া যাইবে, অথচ তাহার কোন লাভ হইবে না।

(৪) এদেশে যানবাহনের ও রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতাবশতঃ খনিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমস্যা

১। **অভ্র** (Mica) (২৬১ পৃ. দেখ)।—পৃথিবীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্র-উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর তিন-পঞ্চমাংশ অভ্র এখানে পাওয়া যায়। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-অভ্র সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায় তাহার নাম **মস্কোভাইট** (muscovite) অভ্র ;—ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয়। আর একপ্রকার অভ্র আছে। তাহার নাম **ফ্লোগোপাইট** (phlogopite)—ইহা এদেশে অতি অল্প পাওয়া যায়।

উৎপাদন স্থান—(১) **বিহার** প্রদেশের অভ্রবলয় বা অভ্র-অঞ্চল **হাজারিবাগ, মুঙ্গের** ও **গয়া** জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত। এখানকার অভ্র শ্রেষ্ঠ—ইহার ব্যবসার নাম "বেঙ্গল রুবি (ruby)" অভ্র। ইহারই চাহিদা বেশী। **অন্ধ্র প্রদেশের** পূর্ব উপকূলে **নেলোর**-অঞ্চলেও অভ্র-অঞ্চল অবস্থিত। এখানকার অভ্রও ভাল, তবে বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (৩) **রাজস্থানের**—আজমীর-মারবারা, জয়পুর ও উদয়পুর হইতেও কিছু এবং (৪) মহীশূরের হাসান-জেলা হইতে অল্প নিকৃষ্ট অভ্র পাওয়া যায়।



৯৫নং চিত্র

অভ্র উৎপাদন ১৯৬০

স্টেট	পরিমাণ মে. টন	মূল্য (সহস্র টাকা)
অন্ধ্র	৬৯৭৩	৩৭৩৭
বিহার	১৪৫৩৭	১৫৪৩৯
কেরালা	৯৫	২৯
মান্দ্রাজ	১১৪	১৩০
মহীশূর	×	×
রাজস্থান	৭২৮২	৫২৪৪
মোট	২৯০০৩	২৪৫৭১

রপ্তানি :—অভ্রের প্রধান খরিদ্দার—আ. যুক্তরাষ্ট্র (৬০% অপেক্ষা বেশী)। অন্য খরিদ্দার—যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালী, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ক্যানাডা, জাপান। অভ্র পাত বা খণ্ড (block), ছাট বা টুক্‌রা (splitting) ও গুঁড়া (waste) আকারে রপ্তানি হয়। (৯৩ নং ছবি দেখ)।

সমস্যা :—(১) ভারত শ্রেষ্ঠ অভ্র-উৎপাদক দেশ। কিন্তু ইহার অভ্র কেবল রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত হয়। এদেশে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত কম।

(২) ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট-ছোট অভ্রের ছাটের কোন বিশেষ চাহিদা নাই। এগুলি খনির ধারে গাদা করিয়া রাখা হয়। এই গুঁড়া কিছু রপ্তানি করা হয়। এদেশে এই গুঁড়ার চাহিদা কম। সেজন্য এই টুকরা-অভ্র নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) ভারতের অভ্রের ব্যবসায় খুব সুশৃঙ্খলায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলে না। ইহার উৎপাদন-অঙ্ক নির্ভরযোগ্য নহে। সেজন্য রপ্তানি-অঙ্ককে উৎপাদন-অঙ্ক ধরা হয়। ইহার উৎপাদন-অঙ্ক অনেক সময় রপ্তানি-অঙ্ক কম দেখা যায়।

২। **ইলমেনাইট** (Ilmenite)। (৯৫ নং চিত্র দেখ)। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইলমেনাইট উৎপাদক দেশ—আ. যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে ক্যানাডা, তাহার পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু রপ্তানি-ক্ষেত্রে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রপ্তানি-কারক দেশের অন্যতম। ইহা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রধানতঃ **কেরল স্টেটে** কুমারিকা অন্তরীপের নিকট সমুদ্রতীরে মনাজাইট বালুকার সঙ্গে ইহা পাওয়া যায়। অন্য প্রাপ্তিস্থান মান্দ্রাজ। উড়িষ্যার গঞ্জাম ও অন্ধ্র-প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ জেলাতেও অল্প পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে **কেরল** হইতে পাওয়া যায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৬ শত এক মে. টন এবং মান্দ্রাজ হইতে ৯ হাজার ১ শত ৫০ মে. টন, মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত ৫১ মে. টন। মোট মূল্য ১ কো. ৪৬ ল. ৭৫ সহস্র টাকা।

রপ্তানি :—ভারতে ইলমেনাইটের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার আ. যুক্তরাষ্ট্র, তৎপরে যুক্তরাজ্য। লোহা প্রভৃতিতে যে সাদা রং দিয়া কলঙ্ক নিবারণের জন্য আচ্ছাদন দেওয়া হয়, সেই সাদা রং (টিটেনিয়ম ডাই-অক্সাইড) এই ইলমেনাইট হইতে পাওয়া যায়।

সমস্যা :—ত্রিভান্দ্রমে টিটেনিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করার কারখানা আছে। কিন্তু সালফিউরিক এসিডের অভাবে প্রয়োজনমত টিটেনিয়ম প্রস্তুত করা যায় না। নতুবা এই কারখানা হইতে এদেশের প্রয়োজনীয় টিটেনিয়ম অক্সাইডের সমস্ত অভাব মিটিত।

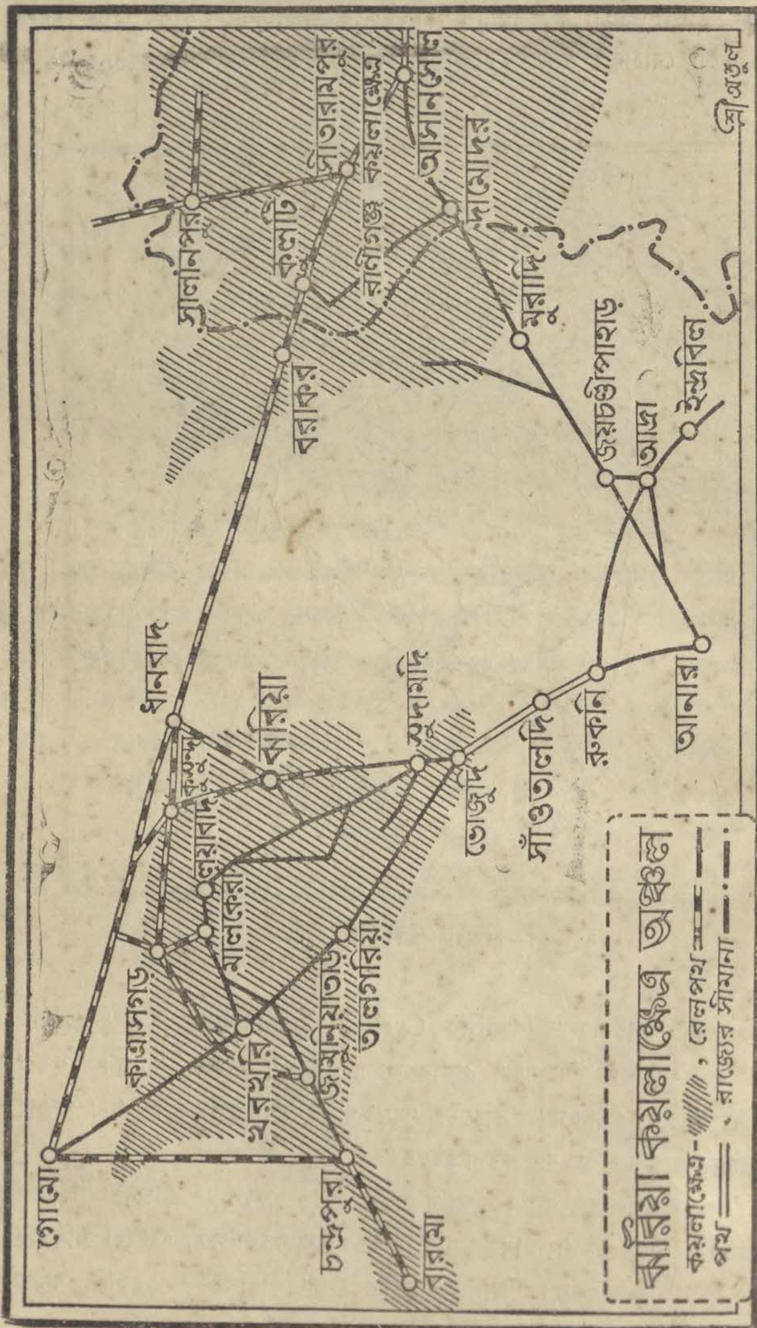
৩। **কয়লা (Coal)**।—অনুমান করা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফিটের মধ্যে মোটামুটি ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত কোটি মে. টন কয়লা আছে।



৯৬ নং চিত্র।—গণ্ডোয়ানা ও টার্সিয়ারী কয়লাক্ষেত্র।

তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানিক Cyril S. Fox সাহেবের মতে ভারতবর্ষের ভূগর্ভে ৬০০০ কোটি টন সকল প্রকার কয়লার ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে। কয়লা উৎপাদনে ভারতের স্থান ৮ম। ভারতের সমস্ত খনিজ দ্রব্য হইতে যত মূল্য পাওয়া যায়, তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যায় কয়লা হইতে।

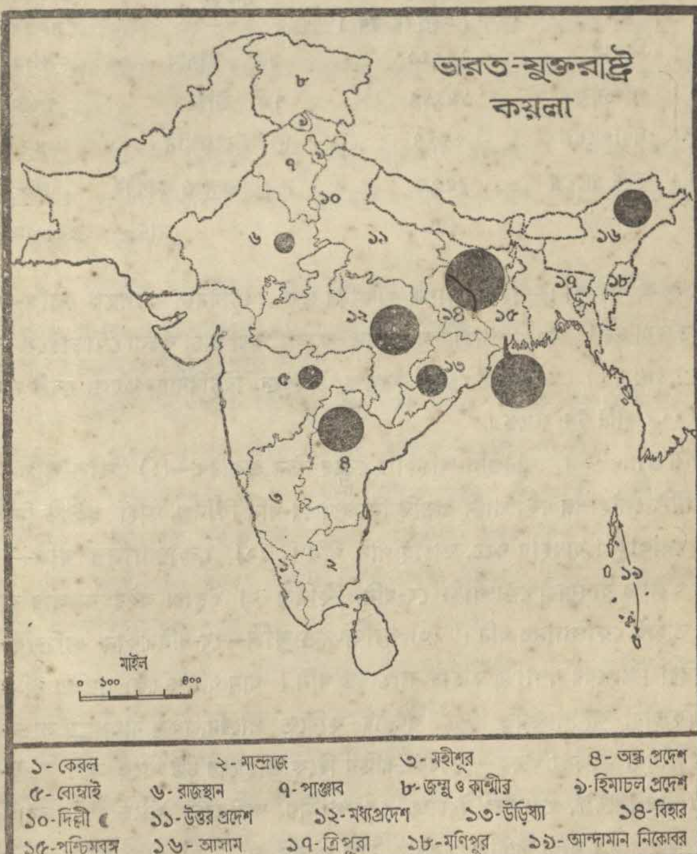
ভারতের কয়লাক্ষেত্র ঃ—ভূ-তাত্ত্বিকগণের মতে কয়লার প্রাচীনতা হিসাবে ভারতের কয়লাক্ষেত্র দুই ভাগে বিভক্ত—(১) গণ্ডোয়ানা কয়লাক্ষেত্র, এবং (২) টার্সিয়ারি (Tertiary) কয়লাক্ষেত্র। টার্সিয়ারি যুগের কয়লা আধুনিক—৬ কোটি বৎসর পুরাতন ;—গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের কয়লা অতি প্রাচীন—২০ কোটি বৎসর পূর্বের।



৬৭ নং চিত্র।—ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র-অঞ্চল।

উৎপাদন-স্থান।—গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের কয়লার প্রাপ্তিস্থান—(১) **পশ্চিমবঙ্গে** রাণীগঞ্জ ও দার্জিলিং।

(২) **বিহারে**—(ক) ঝরিয়া বলয় (৯৬ নং চিত্র দেখ)।—ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো, করণপুরা ; (খ) গিরিডি (হাজারিবাগ) ; (গ) রাজমহল পাহাড়।



৯৮ নং চিত্র।

(৩) **উড়িষ্যায়**—তালচের ও রামপুর (রায়গড় হিঙ্গির)।

(৪) **মধ্যপ্রদেশ**—সোহাগপুর (রেওয়া), উমারিয়া ;—সাতপুরা উপত্যকায় মোহপানি, সাপুর, পেঞ্চ উপত্যকা প্রভৃতি, ও ছত্রিশগড়।

(৫) **অন্ধ্র প্রদেশ**—সিঙ্গারেনী, তন্দুর প্রভৃতি টার্সিয়ারি যুগের কয়লা পাওয়া যায় —**আসামে**—খাসি, জয়ন্তিয়া, নাগা, মাকুম, লখিমপুর;—রাজস্থানে ও কাশ্মীরে (লিগ্‌নাইট কয়লা)।

১৯৬০ সালে কয়লার উৎপাদন

স্টেট	উৎপাদন (সহস্র মে. টন.)	স্টেট	উৎপাদন (সহস্র মে. টন)
১। বিহার	২৫০৫১	৬। আসাম	৬৬৩
২। পশ্চিমবঙ্গ	১৬৪৬৭	৭। উড়িষ্যা	৭৭৬
৩। মধ্যপ্রদেশ	৬৩০৭	৮। রাজস্থান	৪২
৪। অন্ধ্র প্রদেশ	২৫১৭	৯। জম্মু ও কাশ্মীর	২৮
৫। মহারাষ্ট্র	৭৮৮	মোট—	৫২৬৩৯

কোক কয়লা।—ধাতু-নিষ্কাশন কার্যাদির জন্য বিটুমিনাস কয়লাকে কোক-কয়লায় পরিণত করা হয়। কাঠ পোড়াইলে যেমন কয়লা হয়, কাঁচা কয়লা পোড়াইলে তেমনি কোক কয়লা হয়। ভারতের কোক-কয়লার উপযুক্ত বিটুমিনাস কয়লা বেশী নাই,—মাত্র ২০০ কোটি টন আছে।

সমস্যা।—১। খনিগুলি অধিকারি ভেদে তিন প্রকার :—(১) **খাস খনি**—রেল কোম্পানি, লৌহশিল্প কোম্পানি প্রভৃতি নিজেরা যে-খনি কিনিয়া, তাহা হইতে নিজেরাই কয়লা তোলাইয়া ব্যবহার করে, তাহাই খাস খনি। (২) **কোম্পানির খনি**—কোন কোন কয়লার ব্যবসায়ী কোম্পানি যে-খনি কিনিয়া বা ইজারা লইয়া কয়লার ব্যবসায় করে, তাহাই কোম্পানির খনি। (৩) **ব্যক্তিগত খনি**—যে-খনি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা পরিবারবিশেষের সম্পত্তি, তাহাই ব্যক্তিগত খনি। খাস খনি ও কোম্পানির খনির জন্য স্বত্বাধিকারীরা আবশ্যকমত প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে—খাদের উন্নতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। এই-সকল খনি এখনও বিদেশী, প্রধানতঃ ইংরাজ, কোম্পানির অধিকারে আছে। সুতরাং খনির উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা তাঁহারা দরকার মনে করেন না। ব্যক্তিগত খনির অধিকারীরা খনির জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না, উপযুক্ত লোক রাখিতে পারেন না, নিজেও কতক অনভিজ্ঞতার জন্য, কতক অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য, খনির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। এই সকল কারণে খনির কার্যে নানারূপ ব্যাঘাত ঘটে।

২। পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। সুতরাং যাঁহার জমিদারীতে খনি থাকিত, তিনিই সেই খনির অধিকারী হইতেন, এবং উপযুক্ত সেলামী

লইয়া কোন সর্তে খনি ইজারা দিতেন। কিন্তু অন্য প্রদেশে খনিগুলি গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ছিল। সকল প্রদেশেই খনি হইতে যে-কয়লা উত্তোলিত হইত, তাহার টন প্রতি একটা মূল্য গবর্ণমেণ্ট পাইতেন। জমিদারগণ যে ইজারাদারগণকে খনি ইজারা দিতেন সেই ইজারাকাল সর্বদা সমান হইত না। কেহ-কেহ চল্লিশ, কেহ পঞ্চাশ, কেহ বা তদ্রূপ কোন কালের জন্য ইজারা লইত। ইজারাদারগণ জমিদারকে যে-সেলামী দিত, তাহারও পরিমাণ বিভিন্ন হইত। গবর্ণমেণ্ট যে-হারে তাহাদের প্রাপ্য পাইতেন, তাহার মধ্যেও সামঞ্জস্য ছিল না। এই-সকল কারণে অধিকারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। নিজ-নিজ দেয় টাকার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা খনির কার্য চালাইত—খনির মঙ্গল কেহ দেখিত না।

এক্ষণে এই-সকল বিষয়ের কিছু-কিছু প্রতিকার হইয়াছে। খনির অধিকারিগণের অনেকেরই এখনও ইজারাকাল শেষ হয় নাই। তাহারা অনেক বিষয়ে পূর্বের সর্তানুসারেই খনি চালাইতেছে।

৩। কয়লার ব্যবসায়ের আর-এক অন্তরায় যানবাহন। যানবাহনের সুবিধা না থাকিলে খনির কার্য বাড়িবে না। রেলপথ বিস্তৃত হইলে ও রেলের মাশুল কমিলে কয়লার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

৪। ১৯২০ খৃঃ অব্দে মিস্টার টি. রীজ খনির উন্নতির জন্য বলিয়াছিলেন—(১) কয়লার ব্যয় সংরক্ষণ দরকার, (২) কয়লার অপচয় নিবারণ দরকার, (৩) আবশ্যকমত মালগাড়ীর সরবরাহ দরকার, (৪) খনি হইতে কয়লা অপসারিত হইলেই খনির খালি অংশ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া (stowing) দরকার।

এক্ষণে এই-সকল বিষয়ে কতক বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এই সকল ব্যবস্থার উন্নতি দরকার।

৫। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এখনও কয়লা হইতে উপদ্রব্য (by-products) প্রস্তুত করার বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই। কয়লার উপদ্রব্যের সংখ্যা অতি-প্রচুর। এদেশে আলকাতরা, পীচ, বেনজল, এমোনিয়া, ন্যাপথলিন, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি উপদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও বহু উপদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

৬। ভারতে খনির কার্যে যন্ত্রের ব্যবহার কম। যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িলে শ্রমিকের বেকার অবস্থা বাড়িবে ও তাহাতে অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবে,—এইজন্য যন্ত্রের ব্যবহার এদেশে বিশেষভাবে হয় নাই। কিন্তু সেজন্য উৎপাদন বাড়িতেছে না। এক্ষণে অল্পই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

৭। ভারতের কয়লার খনির শ্রমিকগণ বিশেষ কর্মদক্ষ নহে। সেজন্য শ্রমিকের মাথা পিছু উৎপাদনের হার খুবই কম। গ্রেটবৃটেনে মাথা পিছু বার্ষিক উৎপাদন

গড়ে খনির ভিতরে ৩০০ টন, খনির উপরে ২৯০ টন; ভারতে খনির ভিতরে ১৮০ টন, উপরে ১৩০ টন।

৮। খনির শ্রমিকেরা সারা বৎসর খনিতে কাজ করে না; ফসল কাটার সময় হইলেই দেশে চলিয়া যায়।

৯। কলিকাতা বন্দরে মাল আমদানি-রপ্তানির কার্যে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে, জাহাজও দরকারমত সর্বদা মিলে না, খনি হইতে বন্দরে কয়লা আনিতেও মালগাড়ীর অভাবে দেরী হয়। সেজন্য রপ্তানি-কার্যে ক্ষতি হয়।

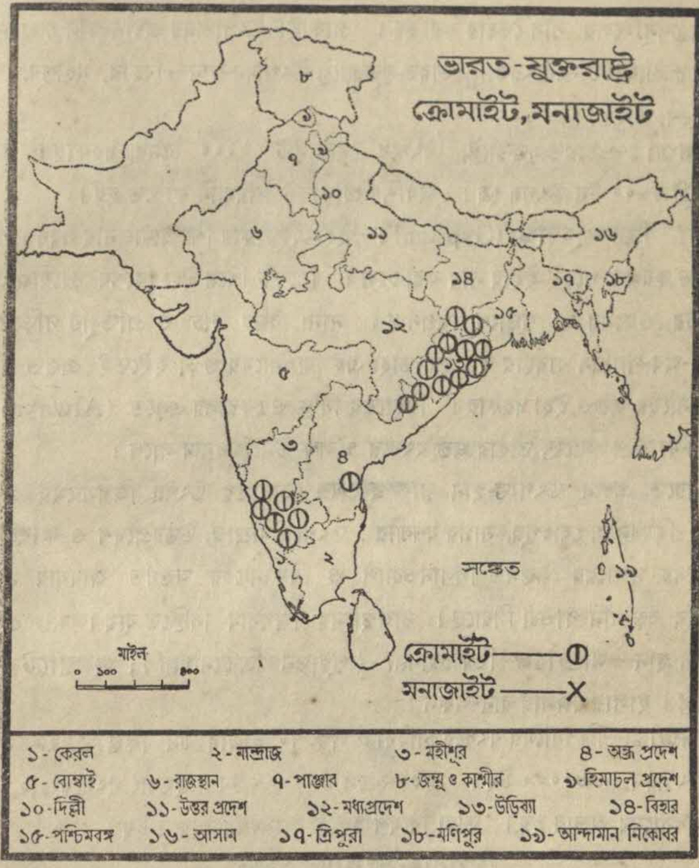
৪। **এস্‌বেস্‌টস্‌** (Asbestos)—(৯৫ নং চিত্র দেখ)।—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এস্‌বেস্‌টস্ উৎপাদক স্থান—ক্যানাডা, পৃথিবীর ৬০—৬৫ শতাংশ এখানে উৎপন্ন হয়। এখানকার প্রধান খনি কুইবেক সহরের নিকট অবস্থিত। ভারতে এই খনিজ প্রধানতঃ রাজস্থান, অন্ধ্র, মহীশূর ও বিহার প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এস্‌বেস্‌টস্-সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয়। ইহা দিয়া চাদর তৈয়ারী করিয়া গৃহের আচ্ছাদন করা হয়। ইহা তাপ নিবারক। ১৯৬০ খৃ. অব্দে ১৭১১ মে. টন এস্‌বেস্‌টস্ পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১০৩৩ মে. টন রাজস্থান হইতে, ১২১ মে. টন অন্ধ্র হইতে, ২৬৭ মে. টন বিহার হইতে, ২৮৮ মে. টন মহীশূর হইতে এবং ২ মে. টন মধ্যপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। এস্‌বেটসের সর্বপ্রধান খরিদ্দার উত্তর রোডেশিয়া—অর্দ্ধেকের বেশী।

সমস্যা।—এদেশে এস্‌বেস্‌টস্-সিমেণ্ট প্রস্তুত করার কারখানা আছে। কিন্তু যে-এস্‌বেস্‌টস্ দিয়া এই সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এদেশে পাওয়া যায় না। মেক্সিকো ও রোডেশিয়া হইতে আনাইতে হয়। এদেশে প্রয়োজনের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র এস্‌বেস্‌টস্ পাওয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে এস্‌বেস্‌টস্ আমদানি করিতে হয়। যদি আবশ্যকমত এস্‌বেস্‌টস্ একত্রে পাওয়া যায়, এবং যন্ত্রপাতি আনানো যায়, তবে এস্‌বেস্‌টস্ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

৫। **ক্রোমাইট** (Chrome Ore)—(৯৯ নং চিত্র দেখ) লৌহ ও নিকেল প্রভৃতির প্রয়োজনমত অংশের সহিত ক্রোমাইট মিশাইলে উহাকে প্রয়োজনমত শক্ত ও ঘাতসহ করা যায়। ক্রোমাইটের ইট খুব তাপসহ বলিয়া চুল্লী গাঁথিতে ইহা উৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা চামড়া রং করিয়া ক্রোম চামড়া করা হয়। বয়নশিল্পে বাই-ক্রোমেট অব সোডা-ও ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

ক্রোম-প্রস্তরের সর্বপ্রধান উৎপত্তিস্থান (১৯৬০) দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন (২৪%), তৎপরে ফিলিপাইন (২৩%), রোডেশিয়া নিয়াসাল্যাণ্ড ফেডা. (২০%) ও তৎপরে তুরস্ক (১৫%)। কিন্তু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় ৩·২ শতাংশ।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে মহীশূর প্রধান উৎপাদন-স্থান ছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালে উড়িষ্যা প্রথম স্থান অধিকার করে; ৯৩ হাজার ৮৫৪। এক্ষণে (১৯৬০) ক্রোমাইট উৎপাদক স্থান ক্রমান্বয়ে—উড়িষ্যা (কেওনঝর ও কটক জেলা), বিহার (সিংহভূম জেলা), ও



৯৯ নং চিত্র

মহীশূর (হাসান ও মহীশূর জেলা)। বোম্বাই প্রদেশেও কখনও-কখনও পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে ১০০,১১২ মে. টন ক্রোমাইট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে

উড়িষ্যা—৯৩৮৫৪ মে. টন

বিহার—৪৪৩৬ মে. টন

মহীশূর—৫৯৪ মে. টন

মহারাষ্ট্র—১২২৮ মে. টন

মোট—১০০,১১২ মে. টন।

রপ্তানি।—ভারতের ক্রোমাইটের প্রধান খরিদ্দার—জাপান। অন্য খরিদ্দার আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়ম, ইতালী।

৬। **গ্রাফাইট** (Graphite) :—ইহা তাপ- ও তড়িৎ-প্রবাহী ও অত্যন্ত তাপসহ। ইহার রং কাল—সীসার মত। গ্রাফাইট ও চীনামাটি পুড়াইয়া দরকারমত শক্ত বা নরম করিয়া পেন্সিলের সীস তৈয়ার করা হয়। গ্রাফাইট উৎপাদনের প্রধান স্থান কোরিয়া। সিংহলের গ্রাফাইট সর্বোৎকৃষ্ট। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন-স্থান—বিহার, মহীশূর, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা।

সমস্যা :—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে, বৎসরে মোটামুটি ২০০০ টনের দরকার। কিন্তু মোটামুটি ১৬০০ টন উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট গ্রাফাইট আমদানি করিতে হয়।

৭। **জিপ্সাম** (Gypsum) :—ইহা একপ্রকার শিল্পপ্রয়োজনীয় লবণ। লবণ, লোহা ও কয়লার পরেই ইহার নাম করা চলে। সিমেন্ট শিল্পে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সিমেন্টের ওজনের ৩ শতাংশ জিপসাম। নানা বস্তুর ছাঁচ ও প্রতিমূর্তি গড়িতে যে প্লাস্টার-অব-প্যারিস ব্যবহার করা হয়, তাহা এই জিপসামের গুঁড়া হইতেই প্রস্তুত হয়। জমির সারের জন্যও ইহা দরকার। বিহারের সিন্ধ্রি ও কেরলের এলুভে (Alwaya)-তে যে-সার-ফ্যাক্টরি আছে, তাহার জন্য বৎসরে ৭ লক্ষ টন জিপসাম লাগে।

ভারতে প্রধান উৎপত্তি-স্থান **রাজস্থানের** (ভারতের উৎপন্ন জিপসামের ৯০%) অন্তর্গত বিকানীর, যোধপুর, নাগর যশল্মীর। তৎপরে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও **কাশ্মীর**। রাজস্থানের নাগরের অন্তর্গত পিলানওয়াসি ও বিকানীরের অন্তর্গত জামসার নামক স্থানে খুব বড় খনি পাওয়া গিয়াছে। রাজস্থানের জিপসাম সিন্ধ্রিতে যায়। অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান—**মাদ্রাজে** তিরুচিরাপল্লী (পুরাতন ত্রিচিনোপল্লী); **গুজরাটের**-এর (সৌরাষ্ট্র) হালার জেলায় রান-অঞ্চল।

সমস্যা :—জিপসামের বৎসরে চাহিদা ৮ লক্ষ ১০ হাজার টন কিন্তু ১৯৫৯ সালে মোট উৎপাদন—৮৭৫০০০ টন। ১৯৬০ সালে ৯৭১০০০ টন। সুতরাং বৎসরে ১,২,০০০ টন জিপসামের অভাব হয়। তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

জিপসাম-উৎপাদন ১৯৬০

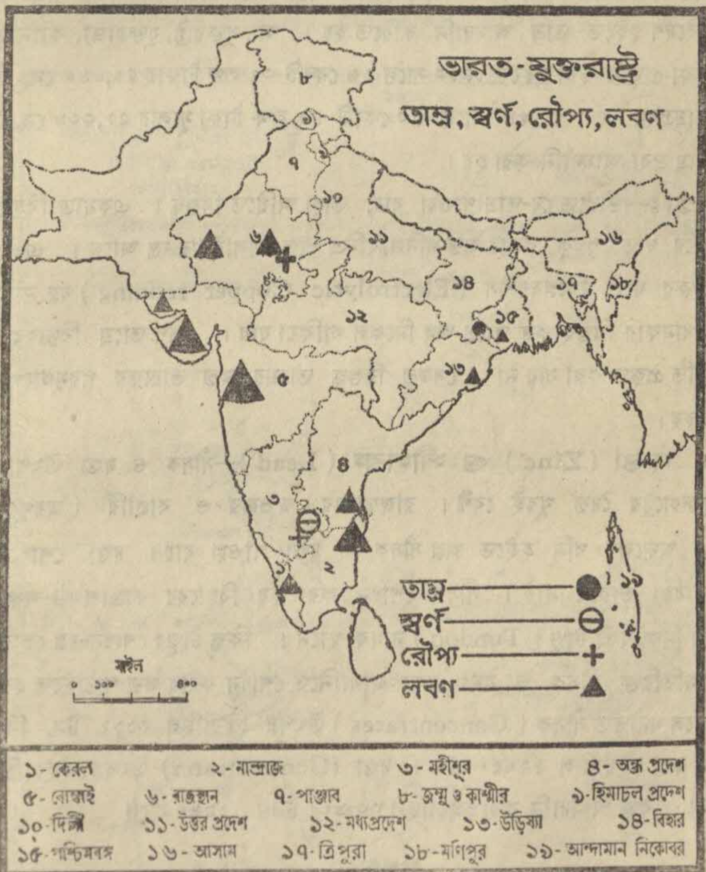
স্টেট	উৎপাদন (মে. টন)	মূল্য (সহস্র টাকা)
রাজস্থান	৯১৪৭২৮	৫৩২৬
মাদ্রাজ	৮২২৪৭	৯২০
উত্তর প্রদেশ	৪২১	৪
মহারাষ্ট্র	৩২	×
জম্মু ও কাশ্মীর	১৫	২
মোট	৯৯৭৪৪৩	৬২৫২

পৃথিবীর উৎপাদন-স্থান।—আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রধান (প্রায় ⅓ অংশ) উৎপাদন-স্থান। অন্য উৎপাদন-স্থান—যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, প. জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।

১৯৬০ সালে ৯৯৭ স. মে. টন জিপসাম ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মূল্য ছিল ৬৩ লক্ষ টাকা।

৮। তাম্র (Copper)

তামা—কপার পাইরাইট (Copper Pyrite) নামক খনিজ প্রস্তর হইতে পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ, জয়পুর, কাংড়া উপত্যকা, অন্ধ্র, বিহারের অন্তর্গত সিংহভূম ও সিকিম



১০০নং চিত্র

স্টেটে ইহার খনি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু একমাত্র সিংহভূম অঞ্চলের খনি

হইতে প্রাপ্ত খনিজ দ্বারা তামা প্রস্তুত হয়। এই খনিজ লৌহ-তাম্র-গন্ধক মিশ্রিত। ইহা হইতে বিশুদ্ধ তামা বাহির করিয়া লইতে হয়। সিংহভূম অঞ্চলের মোসাবনি, ঘাটশিলা ও ধোবানি ইহার উৎপাদন-কেন্দ্র। ১৯৫৯ সালে সিংহভূম-অঞ্চল হইতে ৪০৩,৭১১ মে, টন খনিজ পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কিন্তু মাত্র ৭৬৭৪ মে. টন বিশুদ্ধ তাম্র নিষ্কাশিত হয়। ইহার মূল্য ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ১৯৬০ সালে ৪৪৮ সহস্র মে. টন।

এখানে তামা দিয়া গৃহস্থালীর ব্যবহারদ্রব্য, উনান (stove) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তামার পাত প্রস্তুত হয়, এবং তামার সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতল প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এখানকার তামা নিকেল-মিশ্রিত। তাই ইহাতে বিদ্যুৎবাহী তার নির্মাণ করা যায় না। সেজন্য বিদেশ হইতে তাম্র আমদানি করিতে হয়। আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান হইতে ১৯৫৯ সালে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায় ৫০,৮৪০ মে. টন বিশুদ্ধ তাম্রদ্রব্য, এবং ১০৫৮ সালে ১৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫২,৩৩৬ মে. টন বিশুদ্ধ তাম্র দ্রব্য আমদানি করা হয়।

সমস্যা :—ভারতে যে-তাম্র পাওয়া যায়, তাহা অগ্নিতে বিশুদ্ধ। একমাত্র বিহারে মৌ বন্দরে ধাতু পৃথক্ করার জন্য খনিজবিমিশ্র ধাতু গলাইবার যন্ত্র আছে। এখানে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা বিশ্লেষণশীল (Electrolytic Copper refining) যন্ত্র নাই। সেজন্য এখানকার বিশুদ্ধীকৃত তাম্রে অল্প নিকেল থাকিয়া যায়। এরূপ তাম্রে বিদ্যুৎবাহী তার প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় না। সেজন্য বিশুদ্ধ তাম্রের জন্য ভারতের পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।

৯। দস্তা (Zinc) ও সীসক (Lead)—সীসক ও দস্তা উৎপাদন ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দৈন্য খুবই বেশী। রাজস্থানের জওয়ার ও বাঞ্জারি (জয়পুরের অন্তর্গত) অঞ্চলের খনি হইতে অল্প সীসক ও দস্তা পাওয়া যায়। দস্তা শোধনের কোন ব্যবস্থা ভারতে নাই। সীসক শোধন করা হয় বিহারের কাত্রাশগড়-অঞ্চলে ধানবাদের নিকটবর্তী টাণ্ডু (Tundoo) নামক স্থানে। কিন্তু টাণ্ডুর শোধন-যন্ত্র ছোট। সেজন্য অতিরিক্ত সীসক ও সমগ্র দস্তা জার্মানিতে শোধন করার জন্য পাঠাইতে হয়। ১৯৫৫ সালে ঘনীভূত সীসক (Concentrates) উৎপন্ন হইয়াছিল ৩১১২ টন, কিন্তু আমদানি করা হইয়াছিল ১২০৫০ টন। দস্তা (Concentrates) উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৯১৩ টন ; কিন্তু আমদানি করা হইয়াছিল ৩৩,৬০০ টন। ১৯৬০ সালে

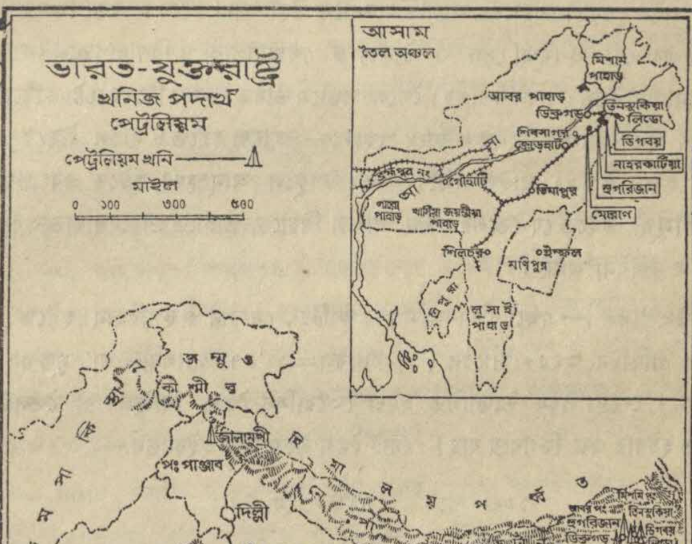
	উৎপাদন
সীসক (Concentrates)	৬,২০০ মে- টন
দস্তা (Concentrates)	৯৭৮৬

ভারতে দস্তা শোধন হয় না, সমস্ত অপরিস্কৃত দস্তা জাপান হইতে শোধিত হইয়া আসে। ১৯৫৮ সালে ২১,৮৪৪ মে. টন সীসা ও ৬১,৬৫৫ মে. টন দস্তা আমদানি করা হয়।

সমস্যা।—(১) ভারতে সীসা ও দস্তার উৎপাদন কম। বৎসরে সীসার প্রয়োজন ১৫,০০০ টন। কিন্তু উৎপাদন অনেক কম। (২) সীসক-শোধন এদেশে অল্প পরিমাণে হয়। দস্তা-শোধন হয় না। সেজন্য জার্মানির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।

1963 Same language in 1965

১০। পেট্রোলিয়ম (Petroleum)—কি দৈনিক জীবন যাপনে, কি যুদ্ধকার্যে, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের প্রয়োজনীতার অতিশয়োক্তি হয় না। কিন্তু



১০১ নং চিত্র

পেট্রোলিয়ম উৎপাদনে ভারতের দৈন্য অত্যন্ত বেশী। ১৯৬০ খৃঃ অব্দে সমগ্র পৃথিবীর ০.৮ শতাংশ মাত্র তৈল ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সাধারণ হিসাবে ভারতের বার্ষিক

প্রয়োজনের (৫ মিলিয়ন টনের) ৭ শতাংশ মাত্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাওয়া যায়। ডিগবয় হইতে মোটামুটি বৎসরে ৪ লক্ষ টন তৈল উৎপাদন হয়।

উৎপাদন-স্থান।—এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে আসাম প্রদেশে অবস্থিত লখিমপুর জেলায় **ডিগবয়** ও তাহার ২০ মাইল দূরে অবস্থিত **নাহার কাটিয়া** নামক স্থান এবং **হুগরিজান** ও **মোরান** নামক এই অঞ্চলের অন্য দুই স্থান হইতে তৈল উত্তোলিত হইতেছে। মোরান নাহার কাটিয়া হইতে ২৫ মা. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তৈল শোধনার্থ নাহার কাটিয়া হইতে ২২৫ মা. দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়া তৈল গৌহাটির নিকটবর্তী নুনমতি নামক স্থানে আনার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরে নুনমতি হইতে ৪৬৫ মাইল দূরবর্তী বেহারের অন্তর্গত বারুনীতে উহা আনা হইবে। এখন ডিগবয় নামক স্থানে এবং বোম্বাই (বর্মা সেল ও স্টানভ্যাক শোধনাগার) ও বিশাখাপত্তনে (ক্যালটেক্স শোধনাগার) তৈল শোধন করা হয়। তৈলের সন্ধানে ভারত সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে স্থানে-স্থানে—বিশেষতঃ কাম্বে অঞ্চলে,— **কাম্বে** হইতে ৮ মাইল উত্তরে লুনেজ গ্রাম হইতে ও ১০০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা উপকূলে **আন্‌ক্লেশ্বর** হইতে এবং পাঞ্জাবের **জ্বালামুখী** হইতে যে-তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের অভাব বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

উৎপাদন।—এক্ষণে ডিগবয়, নাহার কাটিয়া, মোরান ও হুগরিজান হইতে ১৯৫৮ সালে প্রতিদিন ৯৪৫০ ব্যারেল (১ ব্যারেল=৩৪·৯৭ গ্যালন,—আ. যুক্তরাষ্ট্রে ৪২ গ্যালন) পেট্রোলিয়ম উত্তোলিত হইয়া কেরোসিন তৈল, পিচ্ছিলকারী তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার জন্য ডিগবয়ে যায়। মোট তৈল উত্তোলিত হইয়াছিল,—

১৯৫৮ সালে	৪২৬ স. মে. টন
১৯৫৯ „	৪৪১ „
১৯৬০ „	৪৪৯ „

আমদানি—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে সাউদি আরব, বেহ্রিণ, ইরাণ, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে পেট্রোলিয়ম-দ্রব্যাদি আমদানি করে।

পেট্রোলিয়ম দ্রব্যাদি।—পেট্রোলিয়ম পরিশোধিত করিলে, তবে ব্যবহার-যোগ্য পেট্রোল তৈল পাওয়া যায় ও সেই সময় অন্য আরও নানাপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়ম হইতে এদেশে এক্ষণে মোটর চালানোর তৈল, কেরোসিন, ডিজেল তৈল (Diesel oil), চুল্লীর তৈল (Furnace oil), পিচ্ছিলকারী তৈল (Lubricating oil), পাট শুকাইবার তৈল (Jute batching oil), প্যারাফিন প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে। এদেশে একমাত্র ডিগ্‌বয়-এ একটিমাত্র তৈল-শোধন

Give an account of the [illegible] resources and problem indus[illegible]

কারখানা ছিল। এক্ষণে বোম্বাই-এ দু'টি এবং বিশাখাপত্তনে একটি তৈল-শোধন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গৌহাটিতেও একটি স্থাপিত হইয়াছে।

সমস্যা। পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা এই যে, ইহার উৎপাদন এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম—৭ শতাংশ মাত্র।

১১। বক্সাইট (Bauxite)—(৯৫ নং চিত্র দেখ)। আজকাল এলুমিনিয়ম-নির্মিত ধাতু-দ্রব্য বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। এই এলুমিনিয়ম শক্ত, হাল্কা ও দামে স্থলভ। সেজন্য গৃহস্থালীর দ্রব্য নির্মাণে, ঘরের চাল প্রস্তুত করিতে এবং আকাশযান, নৌকা ও জাহাজাদি প্রস্তুত করিতে ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার বিদ্যুৎ পরিচালন শক্তিও বেশী। সেজন্য ইলেকট্রিক-সংক্রান্ত জিনিসপত্র প্রস্তুত করিতেও ইহার ব্যবহার বাড়িতেছে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল মাটি ও প্রস্তরে এলুমিনিয়ম আছে। কিন্তু একমাত্র বক্সাইট হইতে ইহা নিষ্কাশন করিলে খরচ পোষায়।

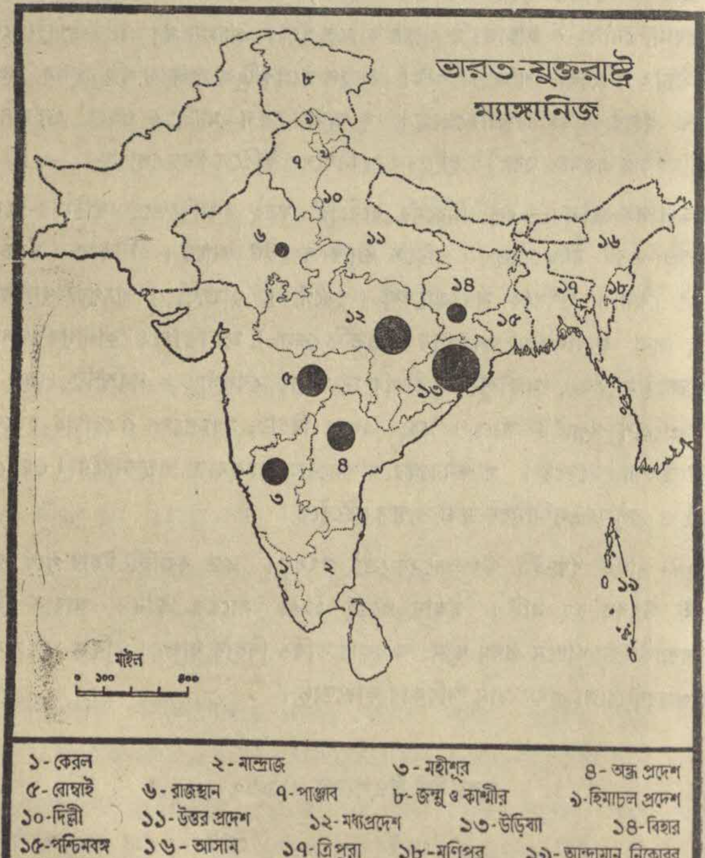
উৎপাদন-স্থান।—এলুমিনিয়মের ব্যবহার যতই বাড়িতেছে বক্সাইটের প্রয়োজনীয়তাও ততই বাড়িতেছে। ভারতে প্রচুর বক্সাইট আছে। **বিহার** (রাঁচি ও পালামৌ জেলা), তৎপরে **মধ্যপ্রদেশ** (সুরগোঁজা, রায়গড়, বিলাসপুর, বালাঘাট, মান্দলা, দ্রুগ, জাবালপুর (জব্বলপুর) প্রভৃতি জেলা), **মহারাষ্ট্র** (কোলাপুর জেলা), **মাদ্রাজ** (সালেম), **মহীশূর** (বাবাবুদান পাহাড়, বেলগাঁও), **কাশ্মীর** (জম্মু ও পুঞ্চ) প্রদেশে বক্সাইট আছে। তবে এক্ষণে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই হইতেই বক্সাইট উৎপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার অনুপনগরে (জে. কে. নগরে) ও বেলুড়ে এলুমিনিয়ম-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

১৯৬০ সালই বক্সাইট উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ বৎসর। এত বক্সাইট ইহার পূর্বে কোন বৎসরেই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার পরেই ১৯৫৯ সালের স্থান। আবার ইহার পূর্বে বক্সাইট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত বিহার রাজ্য। কিন্তু ১৯৫৯ সাল হইতে গুজরাট রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে।

বক্সাইট উৎপাদন—১৯৬০

স্টেট	মে. টন	স্টেট	মে. টন
১। গুজরাট	২১৮,১০১	৫। মহীশূর	২,২৪৯
২। বিহার	১০৭,৬৩৩	৬। মাদ্রাজ	৭৮৯
৩। মধ্যপ্রদেশ	৪৭,৫৩০	মোট—৩,৮৩,৫২৭	
৪। মহারাষ্ট্র	৭,২২৫		

১২। **ম্যাঙ্গানিজ** (Manganese)—লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পৃথিবীতে ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান রুশিয়ার পরেই দ্বিতীয়—এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের খনিজদ্রব্যের মধ্যেও ইহা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। খনিজ রপ্তানি-ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থ উপার্জনে ইহার স্থান সর্বাগ্রে ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ খৃ. অব্দে ইহা **প্রথম স্থান লৌহ খনিজকে দিয়া দ্বিতীয় স্থানে নামিয়া যায়।** এই বৎসর ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি দ্বারা ১৪ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ খনিজ দ্বারা আরও ১৯ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া



১০২ নং চিত্র।

যায়। ইহার উৎপাদনের পরিমাণে ও খনিজের উৎকৃষ্টতায় ভারতের স্থান অতি উচ্চে—ইহার স্থান রপ্তানি-ক্ষেত্রে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। কারণ, (১) ইহার প্রধান খরিদ্দার

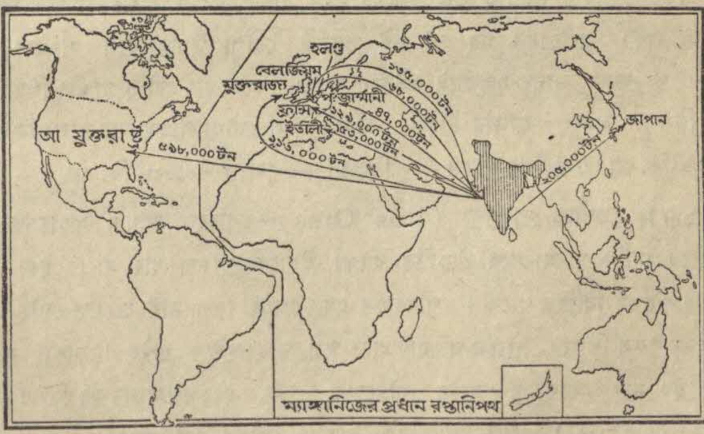
আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের এদেশ হইতে ম্যাঙ্গানিজ আমদানি কম হইয়াছে;—(২) বাণিজ্যক্ষেত্রে সো.-রুশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিয়াছে, (৩) নিকৃষ্ট ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

উৎপাদন-স্থান।—সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন-স্থান উড়িষ্যা। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায়ও ম্যাঙ্গানিজ মিলিতেছে।

এদেশের লৌহ-কারখানায় ম্যাঙ্গানিজের কিছু চাহিদা আছে। নতুবা ম্যাঙ্গানিজ প্রধানতঃ রপ্তানি হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারা বেশী বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন—১৯৬০

স্টেট	উৎপাদন (মে. টন)	স্টেট	উৎপাদন (মে. টন)
১। উড়িষ্যা	৩৪২,৮৯৬	৫। অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৯,৮৬৯
২। মহীশূর	২৯৩,৪৭৪	৬। বিহার	১৮,৭১৯
৩। মধ্যপ্রদেশ	২১৮,২৬৫	৭। রাজস্থান	৫,৪২৮
৪। মহারাষ্ট্র	১৮৫,৮২৬	৮। পশ্চিম বঙ্গ (মেদিনীপুর)	৬২৫
		মোট—	১,১৮২,১২০



১০৩ নং চিত্র।

উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজের মূল্য ৮১,৭৮৯ সহস্র টাকা। ১৯৫৯ সালে এজন্য ১২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই বৎসর হইতে ইহার রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

সমস্যা।—(১) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদিত হয়। কিন্তু এদেশে ইহার ব্যবহার কম। ইহা প্রধানতঃ একটি বড় রপ্তানি-খনিজ। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিজ অপেক্ষা ফেরো-ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা বেশী। কিন্তু ভারতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ অতি অল্পই প্রস্তুত হয় ও রপ্তানি-ক্ষেত্রে আসে। টাটা কোম্পানির লৌহ-কারখানায় ফেরো ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হয় ও কিছু রপ্তানি করা হয়। অন্যত্র অল্প হইলেও তাহা তাহাদের নিজের ব্যবহারে লাগে।

(২) উচ্চস্তরের ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর—যাহাতে ৪৮% ম্যাঙ্গানিজ আছে—তাহার জাহাজ-ভাড়া, আর নিম্নস্তরের ৪৬% অপেক্ষা কম ম্যাঙ্গানিজযুক্ত প্রস্তরের জাহাজ-ভাড়া একই। এজন্য ভারত হইতে যত ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হয় তাহার তিন-চতুর্থাংশ উচ্চস্তরের ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর। নিম্নস্তরের প্রস্তরগুলি খনির মুখে জমা করা থাকে। ভারতের সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ-খনিমুখে যে-নিম্নস্তরের ম্যাঙ্গানিজ জমা আছে, তাহার মূল্য ৪৫ কোটি টাকা হইবে।

১৩। রৌপ্য (Silver)—(১০০ নং চিত্র) ভারতে রৌপ্যখনি নাই। এখানে কিছু রৌপ্য পাওয়া যায় কোলার স্বর্ণখনি হইতে, এবং কিছু পাওয়া যায় বিহারের কাত্রাশগড়ের টাণ্ডুর সীসক-শোধন-কারখানা হইতে। রৌপ্য কোলারে স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং টাণ্ডুতে রাজস্থানের জওয়ার হইতে যে সীসক-দস্তা-প্রস্তর শোধিত হইবার জন্য আসে (২৯২ পৃঃ) তাহার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। শোধনের পর এই দুই স্থানেই রৌপ্য উপদ্রব্যরূপে পাওয়া যায়। ১৯৬০ খৃ. অব্দে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপে ৪,১২৮ কিলোগ্রাম রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল। মূল্য ছিল—৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ১৯৬০ সালে রৌপ্য পাওয়া যায় রাজস্থান হইতে ৩,৭৬৮ কি. গ্রা. ও মহীশূর হইতে ৩৬০ কি. গ্রা. ;—**মোট**—৪,১২৮ কি. গ্রা.।

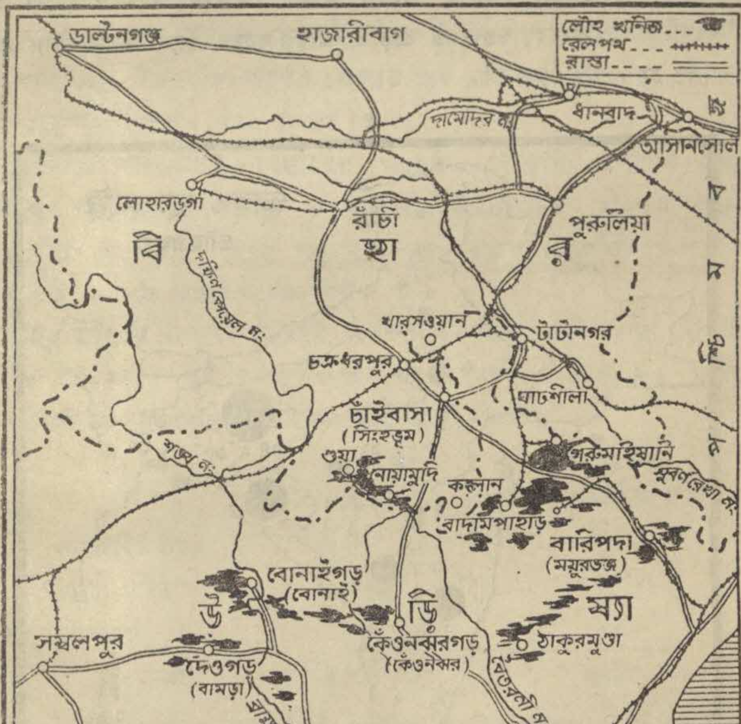
১৪। লৌহ-প্রস্তর (Iron Ores)—লৌহকে আমরা সাধারণতঃ যে-আকারে দেখি সে-আকারে প্রকৃতির রাজ্যে ইহাকে পাওয়া যায় না। ইহা সকল শিলার সহিতই মিশ্রিত থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন শিলা নাই যাহাতে লৌহ নাই। কিন্তু যে-সকল শিলায় লৌহের পরিমাণ অতি অল্প, তাহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিলে লাভ হয় না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লৌহসম্পদ্ প্রচুর, এবং এখানকার বহুস্থানের লৌহ-প্রস্তর (iron ore) গুণেও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লৌহপ্রস্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার লৌহপ্রস্তরে লৌহাংশ মোটামুটি ৬৭% অপেক্ষা বেশী। বিহারের ও মধ্য প্রদেশের অনেক লৌহ-প্রস্তরে লৌহাংশ ৬০-৬৫%।

লৌহ-প্রস্তর উৎপাদন-স্থান—ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রদেশেই অল্প-বিস্তর লৌহ-প্রস্তর আছে। কিন্তু ভারতের কোক কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া যে-সব

লৌহ-প্রস্তরে ৬০% বা ততোধিক লৌহ নাই সে-সকল প্রস্তর উত্তোলন করা হয় না। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে ভাল লৌহ-প্রস্তর পাওয়া যায়। লৌহশিল্পে নিম্নলিখিত স্থানের **হিমাটাইট** লৌহ-প্রস্তরই ব্যবহৃত হয়,—

(১) সিংহভুম লৌহবলয়—

(ক) **বিহারের অন্তর্গত সিংহভূম জেলায়**—নোয়ামুন্দি, পানসিরা, বুরু, বুদা বুরু, গুয়া।



১০৪ নং চিত্র।

(খ) **উড়িষ্যার অন্তর্গত**

(১) **কেঁওঞ্ঝরের** বাগিস বুরু খনি;

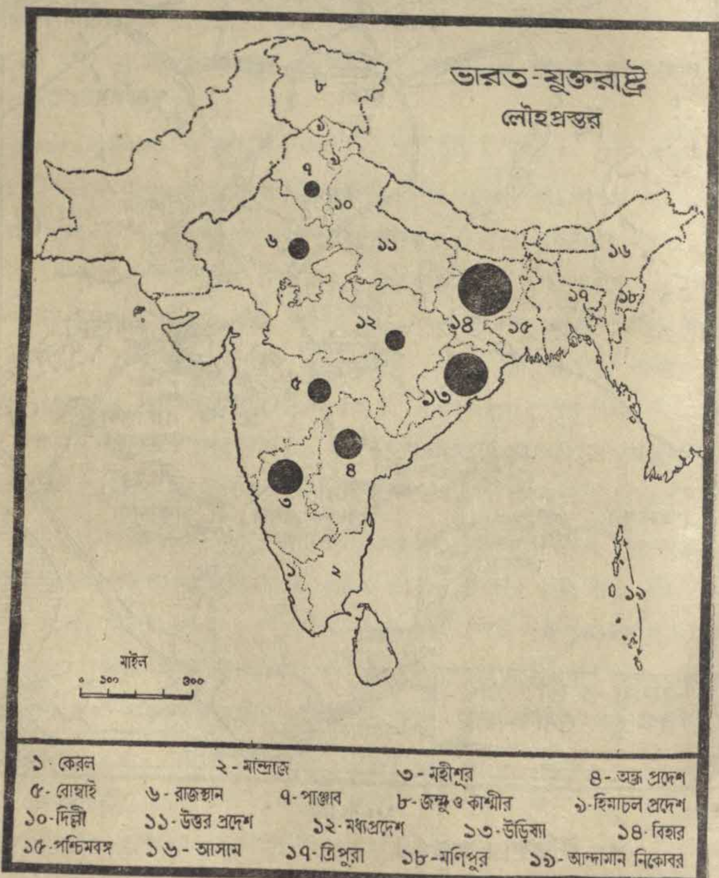
(২) **ময়ূরভঞ্জের** (ক) বামনঘাটি মহকুমায়—গরুমহিশানি পর্বত, সুলাইপেত-

বাদাম পাহাড়শ্রেণী ;—এগুলি হইতে টাটানগরের লোহার কারখানায় লোহা লওয়া হয় ;—(খ) পাঁচপীর মহকুমায়—কামদাবেদী, ও কান্তিকুয়া হইতে ঠাকুরমুণ্ডা পর্যন্ত ২৫ মাইল স্থান। (গ) সদর মহকুমায়—সিমলি পাহাড়শ্রেণী।

(৩) **বোনাই পাহাড়।**

(২) মধ্যপ্রদেশের লৌহখনি অঞ্চল—

(ক) **চন্দা জেলার খনিই শ্রেষ্ঠ খনি।** খণ্ডেশ্বর নামে পাহাড়টি প্রায় লৌহে গঠিত। লোহার', ওগুলপেট প্রভৃতি আরও কয়েক স্থানে উল্লেখযোগ্য প্রস্তর উত্তোলিত হয়।



১০৫ নং চিত্র।

(খ) **দ্রুগ জেলার** ধল্লি-লোহারা নামক সাত মাইলব্যাপী পর্বত।

(গ) **বাস্তার**—এখানে সিংহভূমের "প্রস্তরের" ন্যায় উচ্চশ্রেণীর-লৌহ-প্রস্তর বহু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩) মহীশূরের লৌহখনি অঞ্চল—কাডুর জেলায় বাবা বুদান পাহাড়ে প্রচুর হিমাটাইট লৌহ আছে। এই লৌহ মহীশূরের ভদ্রাবতী লৌহ-কারখানায় ব্যবহৃত হয়। মহীশূরের তিপ্টুরের নিকট শ্রাবণ পাহাড়ে, শিমোগা জেলার কোদাইছাদ্রি নামক স্থানে এবং চিতলদ্রুগ জেলার পাহাড়েও লৌহ আছে।

(৪) মান্দ্রাজ—লৌহ-প্রস্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হিসাবে সিংহভূম বলয়ের পরেই মান্দ্রাজের স্থান। **সালেম জেলাই** লৌহসম্পদে সর্বপ্রধান। **মাদুরাই জেলার** প্রায় সর্বত্র এবং উত্তর-দক্ষিণ **আর্কট জেলায়** প্রচুর লৌহ-প্রস্তর রহিয়াছে। এখানে প্রচুর ম্যাগ্নেটাইট লৌহও (২২৯ পৃঃ দেখ) আছে।

এতদ্ব্যতীত **পশ্চিমবঙ্গে—বিহারের** অন্যস্থানে—**বোম্বাই প্রদেশে—মধ্য-প্রদেশের** অন্যস্থানে—**রাজস্থানে** ও আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীতেও লৌহখনি আছে। আমেরিকার টেক্‌নিক্যাল মিশন অনুমান করেন—ভারতে লৌহ-ভাণ্ডার পৃথিবীর যে-কোন দেশের লৌহ-ভাণ্ডার অপেক্ষা বেশী।

লৌহ-ভাণ্ডার।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যত লৌহ-ভাণ্ডার মজুত আছে, পৃথিবীর কোথাও এরূপ নাই। পৃথিবীর মজুত লৌহের এক-চতুর্থাংশই ভারতে আছে। ভারতে ২১০০ কোটি টন মজুত লৌহ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তন্মধ্যে

	অনুমিত অঙ্ক (কোটি টন)	নিশ্চিত অঙ্ক (কোটি টন)
১। হিমাটাইট প্রস্তর	১৭৬৩·০	৫৩১·৬
২। ম্যাগ্নেটাইট "	১৯৪·৯	৯৭·৪
৩। লিমোনাইট "	২০০·০	৫০·০
মোট	২১৫৭·৯	৬৭৯·০

ইহার মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যাতেই অনুমিত প্রস্তরের পরিমাণ ৮০০·০ কোটি টন এবং নিশ্চিত বলিয়া পরিজ্ঞাত প্রস্তরের পরিমাণ ২৭৩·৩ কোটি টন। এই সমস্তই হিমাটাইট লৌহ-প্রস্তর।

লৌহ-উৎখাদন। ১৯৫৫ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৪৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টন লৌহ-প্রস্তর উৎখাত করা হইয়াছিল। ইহাতে ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টন লৌহাংশ ছিল। ইহা পৃথিবীর উৎপাদনের ১·৬ শতাংশ। এই বৎসর আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর ৩০·৬% লৌহশতাংশ পাওয়া গিয়াছিল।

ভারতের লৌহ-প্রস্তর উৎপাদন—১৯৫৯ ও ১৯৬০

(রাষ্ট্র-ভেদে)

স্থান	উৎপাদন (সহস্র মে. টন)		স্থান	উৎপাদন (সহস্র মে. টন)	
	১৯৫৯	১৯৬০		১৯৫৯	১৯৬০
১। বিহার	৩,২৩৪	২৮৪৭	৬। মধ্যপ্রদেশ	৪১৪	১৪৪৮
২। উড়িষ্যা	২৬১৫	৩৭৩৪	৭। মহারাষ্ট্র	৩২৫	৩২০
৩। অন্ধ্র	২২৬	৩২২	৮। পাঞ্জাব	২০	১২
৪। মহীশূর	১০৫৪	১৮৭২	**মোট ভারত**	৭৯৮২	১০৬৮৩
৫। রাজস্থান	৯৪	১২৫			

দ্রষ্টব্য—১৯৫৯ সালে লৌহপ্রস্তর উৎখাত করা হইয়াছিল ৭৯৮১ স. মে. টন। ইহার মূল্য ছিল ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। ১৯৬০ সালে উৎখাদিত লৌহপ্রস্তরের পরিমাণ ১০৬৮৩ স. মে. টন ; মূল্য ৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা।

এক্ষণে সমগ্র ভারতে ২২৭টি খনিতে কাজ চলে। খনির সংখ্যা মহীশূরেই বেশী। কিন্তু লৌহপ্রস্তর উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে বিহার। তৎপরে উড়িষ্যা।



১০৬ নং চিত্র।

রপ্তানি।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯৫৯ খৃ. অব্দে ২২ লক্ষ ৫০ সহস্র মে. টন (মূল্য ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা) এবং ১৯৬০ সালে ১৬ কোটি টাকার লৌহ রপ্তানি করা হয়।

লৌহশিল্প।—ভারতে এখন তিনটি লৌহ শিল্পকেন্দ্র আছে—(১) টাটানগরে টাটা আয়রণ ও স্টীল কোং, (২) কুলটি, হীরাপুরে ও বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ স্টীল কোং, ও (৩) মহীশূরে ভদ্রাবতী নামক স্থানে মহীশূর আয়রণ স্টীল ওয়ার্কস। আরও তিনটি নূতন লৌহশিল্প-কারখানা হইয়াছে—একটি উড়িষ্যায় রাউরকেলা নামক স্থানে, আর একটি মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে এবং তৃতীয়টি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। এই সকল স্থানই কয়লার খনি-অঞ্চলে বা সন্নিধানে অবস্থিত।

সমস্যা।—(১) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহ আছে। কিন্তু এতকাল ইহা অবলম্বনে শিল্পসৃষ্টির কোন চেষ্টাই হয় নাই। ইহার লৌহ বিদেশে বিশেষতঃ গ্রেটবৃটেনে, রপ্তানি করিয়া তৎপরিবর্তে উচ্চমূল্যে লৌহদ্রব্য খরিদ করা হইত। এক্ষণে লৌহশিল্প আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দেশের সমস্ত উৎপন্ন-লৌহ এদেশেই ব্যবহার করার মত শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। তাছাড়া পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বিক্রয়স্থলগুলি কোন-না কোন শক্তি অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে ভারতকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছে।

(২) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে যে-পরিমাণ লৌহ উৎখাত করা হয়, তাহা শিল্পে ব্যবহার করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোক কয়লার পরিমাণ এদেশে কম। সেজন্যও লৌহ রপ্তানি করিতে হয়।

১৫। স্বর্ণ (Gold)—স্বর্ণ পাওয়া যায়—মহীশূর, অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশ হইতে। ইহাদের মধ্যে মহীশূরের স্বর্ণখনি হইতেই বেশী স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখানকার কোলার খনিই প্রধান। উত্তর প্রদেশের স্বর্ণ পাললিক। স্বর্ণধর কোয়ার্টজ (quartz) প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণিত হইলে যখন স্বর্ণকণা বালি প্রভৃতির সহিত জলস্রোতে বাহিত হইয়া নদী প্রভৃতিতে আসিয়া পড়ে, তখন বালুকা ধুইয়া-ধুইয়া তাহা হইতে যে স্বর্ণকণা বা সোনার ছোট-ছোট খণ্ড সংগ্রহ করা হয়, তাহাই "পাললিক স্বর্ণ"। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রর মহীশূর হইতে ১৯৬০ খৃঃ অব্দে ৪৯৯৫ কিলোগ্রাম স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। তাহার মূল্য ছিল ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

১৬। হীরক (Diamond)—মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় হীরক পাওয়া যায়। উৎপাদন ১৯৬০ সালে ১১৫৭ ক্যারাট,—মূল্য ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা।

১৭। লবণ (salt)—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য-লবণের উৎপত্তি হিসাবে তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—(১) **সমুদ্রজ**, (২) **আভ্যন্তরিক জলাশয় ও মৃত্তিকাজাত** ও (৩) **খনিজ লবণ**।

(১) **সমুদ্রজ লবণ** প্রধানতঃ পাওয়া যায় বোম্বাই রাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, মাদ্রাজ রাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে, কেরলে ও উড়িষ্যায়। সমুদ্রের জল জাল দিয়া শুকাইয়া এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিতে হয়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরেও এইরূপ লবণ অল্প উৎপন্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের লবণ আসে এডেন, পোর্ট সৈয়দ ও লোহিত সমুদ্রের অন্য বন্দর হইতে।

(১) **আন্তর্দেশিক জলাশয় ও মৃত্তিকাজাত লবণ**। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পশ্চিমবায়ুপ্রবাহে কচ্ছ উপসাগর অঞ্চলের সামুদ্রিক লবণাক্ত জলকণা রাজপুতানার বিকানীর ও কাশ্মীর অঞ্চলে আসিয়া ভূমির উপর পড়ে, এবং শেষে বৃষ্টির জলে ধুইয়া উহা সম্বর হ্রদের জলে পড়ে। সূর্যের উত্তাপে উহার জল শুষ্ক হইলে লবণ পাওয়া যায়। যে-ভূমির উপর পড়ে তাহার মাটি হইতেও লবণ পাওয়া যায়। রাজপুতানায় গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত লবণের কারখানা আছে।

(৩) **খনিজ লবণ** হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি-অঞ্চলের খনি হইতে পাওয়া যায়। এই লবণ পাথরের মত, প্রায় বিশুদ্ধ ও ঈষৎ লাল। আমাদের দেশে ইহাকে **সৈন্ধব লবণ** বলে।

১৯৫৭ খৃঃ অব্দে ৩,৬৭০,১৭১ মে. টন লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৩৮১,৩৮৮ মে. টন রপ্তানি করিয়া ৬২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা পাওয়া যায়।

লবণের উৎপাদন—১৯৬০

স্টেট	উৎপাদন (সহস্র মে. টন)	স্টেট	উৎপাদন (সহস্র মে টন)
১। গুজরাট	১৬০৯	৬। উড়িষ্যা	৩৯
২। মাদ্রাজ	৭৬৯	৭। পশ্চিমবঙ্গ	১০
৩। মহারাষ্ট্র	৪৩৯	৮। হিমাচল প্রদেশ	৪
৪। রাজস্থান	৩০৭	৯। মহীশূর	৪
৫। অন্ধ্র-প্রদেশ	২৫২	১০। কেরল	১

মোট—৩৪৩৫

রপ্তানি।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে লবণ উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে তাহার আর লবণ আমদানি করিতে হয় না। বরং কিছু রপ্তানিও করিতেছে।

	রপ্তানি পরিমাণ (সঃ মে. টন।)	মূল্য (সহস্র টাকা)
১৯৫৭	৬৮১	৬,২০৫
১৯৫৮	২৫৭	৩৭৩৩
১৯৫৯	৩৪৬	৪৬৫০

ইহা ব্যতীত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক খনিজ দ্রব্য আছে।

১। **চীনামাটি** (**China Clay**)—তাপসহ ইষ্টক, স্বাস্থ্যপ্রদ মাটির বাসনাদি, প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। ইহা ভারতে প্রচুর আছে। প্রায় সব প্রদেশেই অল্পাধিক পাওয়া যায়। বিহারই প্রধান উৎপাদন-স্থান। ১৯৬০ সালে উৎপাদন—৩১০০,৯৮ মে. টন—মূল্য ৪৮ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা।

২। **ব্যারাইটিস** (**Barytes**)।—ইহা রং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্ধ্র ও রাজস্থান ইহার প্রাপ্তিস্থান। ১৯৬০ খৃঃ অব্দে ১৩৫৮৬ মে. টন ব্যারাইটিস উৎপন্ন হয়; মূল্য ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। ১৯৫৯ সালে পাওয়া যায় ১৩,৫৫২ মে. টন; মূল্য ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই বৎসর ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকায় ১৩,২২২ মে. টন রপ্তানি করা হয়।

৩। **মনাজাইট** (**Monazite**)—এই খনিজই কুমারিকা অন্তরীপের নিকট সমুদ্রতীরে ইল্‌মেনাইটের সঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহার উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর ৮৮% মনাজাইট ভারত-যুক্তরাষ্ট্রই প্রদান করে। ইহা হইতে প্রচুর থোরিয়ম ও অল্প ইউরোনিয়ম পাওয়া যায়। থোরিয়ম উৎপাদনেও ভারতই শ্রেষ্ঠ। গ্যাসের আলো জ্বালিতে যে টোপরের মত "ম্যাণ্টেল" (mantle) দরকার হয়, সেই ম্যাণ্টেল তৈয়ার করিতে হইলে উহা প্রথমে সূতা দিয়া বুনিতে হয় ও পরে উহা থোরিয়ম নাইট্রেট ও সিরিয়ম নাইট্রেটের জলে ভিজাইয়া শুকাইতে হয়। ইহার পরে ঐ ম্যাণ্টেল জ্বালাইলে সূতাটি পুড়িয়া যায়। ইহাই উত্তপ্ত হইলে আলো দান করে। ঐ দুইটি নাইট্রেট মনাজাইট হইতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রধান মনাজাইট-উৎপাদন স্থান—কেরলের কুমারিকা সন্নিহিত সমুদ্রতীর। অন্যস্থান—মহীশূর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধান-প্রধান খনিজদ্রব্য

অন্ধ্রপ্রদেশে—কয়লা, লৌহ-প্রস্তর, ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, অভ্র, লবণ, এস্‌বেস্‌টস্‌, চীনামাটি প্রভৃতি।

আসামে—কয়লা, খনিজ তৈল।

পশ্চিমবঙ্গে—কয়লা, লৌহ।

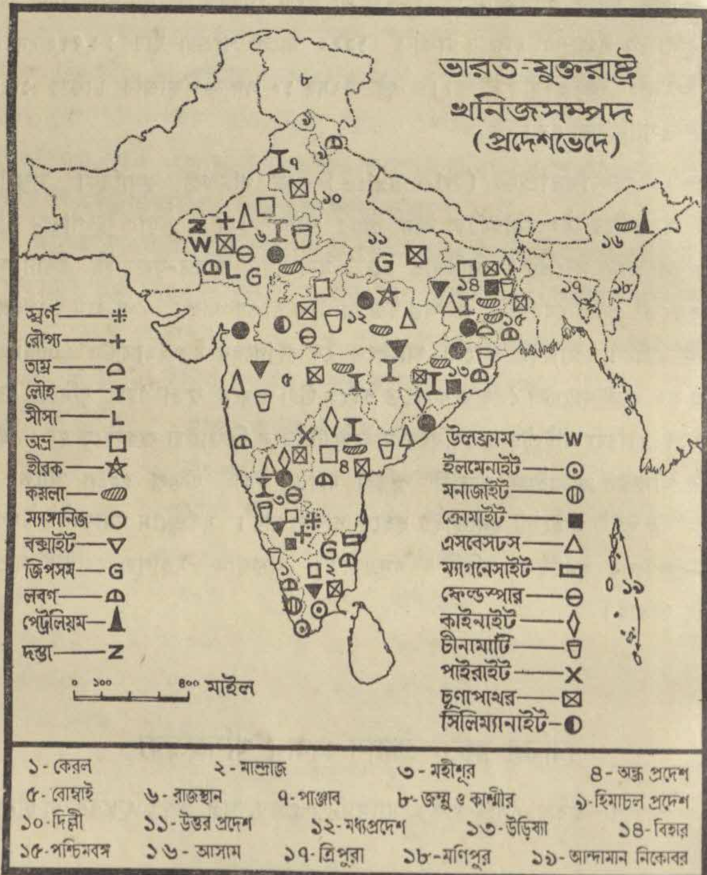
বিহারে—খনিজসম্পদে বিহার সর্বশ্রেষ্ঠ। কয়লা (ভারতের ৫৮%), তাম্র (১০০%), লৌহ-প্রস্তর (৪১%), অভ্র (৫৬%), বক্সাইট (৫০%), কাইনাইট (৯৮%), চীনামাটি, এস্‌বেস্‌টস্‌ প্রভৃতি।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে—ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লবণ, লৌহ, বক্সাইট।

গুজরাট প্রদেশে—লবণ, বক্সাইট।

মধ্যপ্রদেশে—ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তর, কয়লা, লৌহ-প্রস্তর বক্সাইট, হীরক।

মান্দ্রাজে—লবণ, অভ্র, ম্যাগ্‌নেসাইট, চীনামাটি।



১০৭নং চিত্র।

মহীশূরে—ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লৌহ-প্রস্তর, স্বর্ণ, ক্রোমাইট।

উড়িষ্যায়—ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, লবণ, লৌহ-প্রস্তর, কয়লা, ক্রোমাইট, চীনামাটি।

রাজস্থানে—কয়লা, মূল্যবান্ প্রস্তর, জিপসাম্, লৌহ-প্রস্তর, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর, অভ্র, লবণ, উলফ্রাম।

কেরলে—ইলমেনাইট, মনাজাইট, লবণ।

পশ্চিমবঙ্গে—লৌহ, কয়লা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ।

QUESTIONS

1. Draw a map of coal and iron deposits of West Bengal, Bihar, Orissa, Madhya Prodesh, locating in it the principal places of occurrence. (Cal. I.Com. 1929).

2. Draw a map of India, showing the places of principal mineral resources. (Cal. I.Com. '33, '34, '37, '39, '43, '47). Give an account of their commercial exploitation. (Cal. I.Com. '34, '39, ; B.Com. '32).

3. Estimate Iron resources of India. Show how far they are located near the coal-bearing regions of India. (Cal. I.Com. '36)

4. State the places in India where the following are found : Manganese, Copper, Mica, Salt. Also mention their commercial uses. (Cal. I.Com '44).

5. "India is the leading mica exporting country of this world and is likely to remain so."—Examine the statement. (Cal. I.Com. '45).

৪

জলসেচন ও জলবিদ্যুৎ-শক্তি সম্পর্কে ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনা

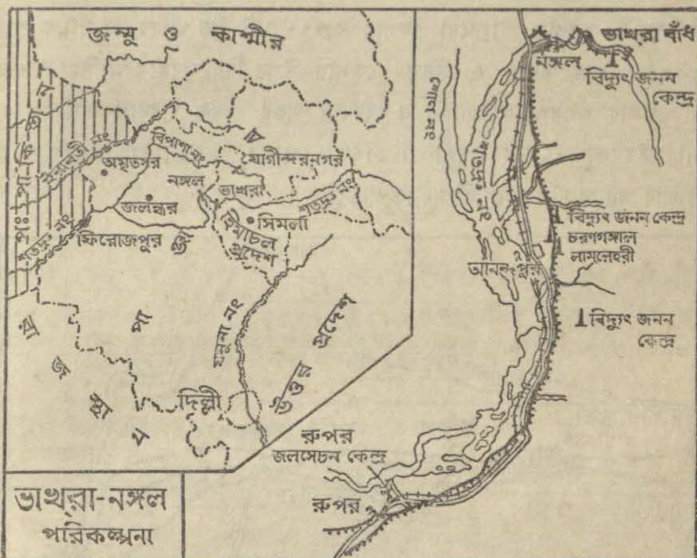
ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল স্থান শস্যশ্যামল হয়। কিন্তু নদী যে আরও কত রকমে আমাদের উপকার সাধন করে তাহা আমরা সম্যক্ অনুভব করিতেও পারি না।

এক্ষণে নদীর শক্তি আমরা দুইটি মাত্র কার্যে প্রয়োগ করিয়া থাকি—(১) জলসেচন, ও (২) বিদ্যুৎ-উৎপাদন। বহুবিস্তৃত পাঞ্জাবের খালগুলির দ্বারা আমরা জলসেচন ব্যতীত কিছুই করি নাই। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম, এবং উত্তর-পশ্চিম বোম্বাই প্রদেশের টাটা-কোম্পানি-প্রতিষ্ঠিত খপোলি প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে আমরা কেবলমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াছি। ইহার পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে একই গঙ্গা নদী হইতে উদ্ভূত উচ্চ গঙ্গা খালের জলে জলসেচন ও বিদ্যুৎপ্রজনন—দুই-ই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু ভারতের নদীগুলি বহুপ্রকারে কার্যকরী করিবার জন্য ভারত-সরকার বিস্তৃত বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা-অনুযায়ী নদীর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা **জলসেচন, জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন, নৌ-বাহন, জলপথে ভ্রমণ, বন্যা নিবারণ, মৎস্যের চাষের উন্নতি বিধান, ম্যালেরিয়া নিবারণ, বন-সংরক্ষণ** প্রভৃতি সমস্তই সম্ভব হইবে। এইরূপ পরিকল্পনাকে বহুমুখী পরিকল্পনা বলে। এই সকল পরিকল্পনার কার্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, এবং অন্যগুলি নিজ-নিজ রাজ্যসরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পরিকল্পনা

১। **ভাখ্‌রা-নঙ্গল পরিকল্পনা** (পাঞ্জাব ও রাজস্থান)।—পাঞ্জাবে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম নাই। সম্প্রতি জালামুখীতে কিছু পেট্রোলিয়ম পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। নদীও বেশী নাই। সেজন্য এখানে শিল্পসৃষ্টি হইতে পারিতেছিল না। ইহারই প্রতীকারকল্পে শতদ্রু নদী অবলম্বনে পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলায় এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্ববৃহৎ বহুমুখী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারে শতদ্রু নদীর উপরে ভাখ্‌রা নামক স্থানে ৭৪০ ফিট উচ্চ বাঁধ বা ভেড়ি বাঁধিয়া জলাধার করা হইবে। এখানে বিদ্যুৎপ্রজনন হইবে ও এখান হইতে খাল

দ্বারা ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইতে পারিবে। উহার ৮ মাইল নিম্নে নঙ্গল নামক স্থানে নঙ্গল নদীর উপর একটি "অপসারণ জাঙ্গাল" বাঁধিয়া নদীটিকে নঙ্গল জলবিদ্যুৎ-প্রজনন খালের মধ্যে প্রবেশ করানো হইবে। এই খালের উপর দুইটি বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র প্রস্তুত করা হইবে। এখান হইতেও জলসেচ হইবে। এই জলবিদ্যুৎ খাল (hydel channel) রুপর-এর নিকট শেষ হইবে। রুপর হইতে জলসেচ খাল আরম্ভ হইবে।



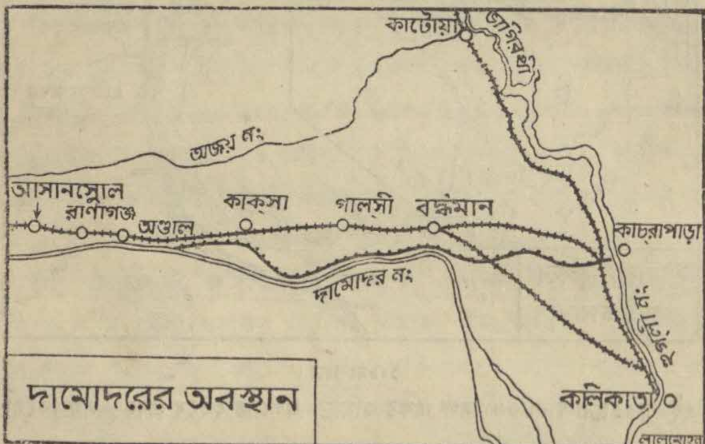
১০৮নং চিত্র।

এই পরিকল্পনা দ্বারা ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে দিল্লী, গুরগাঁও প্রভৃতি স্থানেও এখান হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পারিবে। এই বিদ্যুতের সাহায্যে পাঞ্জাবে শিল্পের উন্নতি হইবে। ইহার সাহায্যে নলকূপ দ্বারা জলসেচন হইতে পারিবে। এই পরিকল্পনাটি ১৯৪৬ খৃ.-অব্দে আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং ভাখ্‌রা বাঁধ ও তাহার বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সমস্তই সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ খৃ. অব্দে এই ভাখ্‌রা-নঙ্গল সংস্থান হইতে ১৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই অঞ্চলে কোন খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এইস্থানে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা ব্যবহার করার স্থান, বা শিল্প এখনও এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠে নাই। তবে জলসেচ দ্বারা এই অঞ্চলটি অবশ্যই শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হইবে। কুটির-শিল্পও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে। তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়

যে, যে-বিপুল অর্থ এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত করার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া লইতে বহু বিলম্ব হইবে। এমন কি এখানকার জলসেচ ও বিদ্যুৎ-জনন কেন্দ্রগুলি প্রতি বৎসর মেরামত করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও সম্পূর্ণ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

২। **দামোদর পরিকল্পনা** (বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ)—দামোদর নদ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলার ৩,০০০ ফুট উচ্চ খামারপাত নামক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া হাজারিবাগ ও মানভূম জেলার উপর দিয়া পূর্বমুখে আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ও বর্ধমান সহর পর্যন্ত পূর্বমুখে আসিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, তৎপরে হুগলী ও হাওড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতার অল্পদূর দক্ষিণে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে।



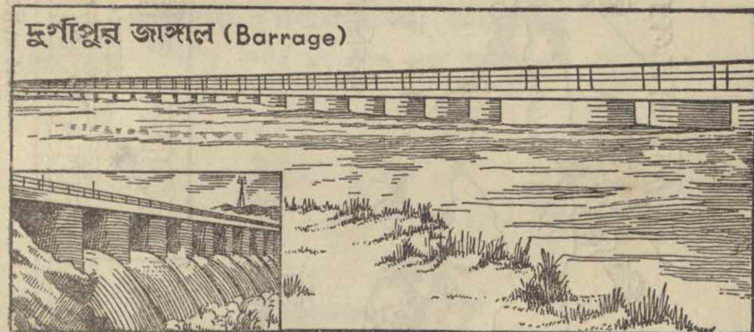
১০৯ নং চিত্র।

দামোদরের শেষাংশ বর্ধমান জেলার নিম্ন সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার প্রথমাংশ অত্যন্ত স্রোতস্বতী এবং শেষাংশে স্রোতের গতি কম। তাই মালভূমির মাটি বৃষ্টির জলের প্রবাহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ও দ্রুতগামী দামোদরের স্রোতে বাহিত হইয়া, বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে, এবং সেখানে স্রোতোবেগ কম বলিয়া ঐ মাটি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। সমতলভূমির মাটিও ধুইয়া আসিয়া নদীতে পড়ে,—ইহাতে ক্রমশঃ নদীর তলদেশ উচ্চ হইয়া উঠে, এবং নদীর মোহনা সংকীর্ণ হইয়া যায়। সেজন্য এই নদীর অববাহিকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলে, নদীর প্রথমাংশ হইতে যখন জল বেগে নামিয়া আসে, তখন তাহা শেষাংশের উচ্চ তলদেশে পদে-পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং সংকীর্ণ নদীমুখ দিয়া তাড়াতাড়ি

চলিয়া যাইতে পারে না। ইহাতে দামোদরে বৎসরে-বৎসরে বন্যা লাগিয়াই থাকিত। এই বন্যা বেশী হইলে এ-অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইত—লোকজন, গরুবাছুর ভাসিয়া যাইত, এবং রেলপথও ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইত। ইহার প্রতিরোধকল্পে একটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি করার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation) নামে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই পরিকল্পনা সাধারণতঃ ডি. ভি. সি. স্কীম (D. V. C. Scheme) নামে পরিচিত।

দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত বরাকর নদীর উপরিস্থ তিলাইয়া ও মাইথন বাঁধ কোনার নদীর উপরিস্থ কোনার বাঁধ এবং দামোদর নদীর উপরিস্থ পাঞ্চেৎ পাহাড় বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় তিনটি তাপ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বোকারো কেন্দ্র হইতে দুই লক্ষ ২৫ হাজার কিলোওয়াট, দুর্গাপুর কেন্দ্র হইতে বর্তমানে ৭৫ হাজার কি. ও. এবং চন্দ্রপুরার দুইটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটি হইতে ১'২৫ লক্ষ কি. ও. হিসাবে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এখনই সম্ভব হইয়াছে।

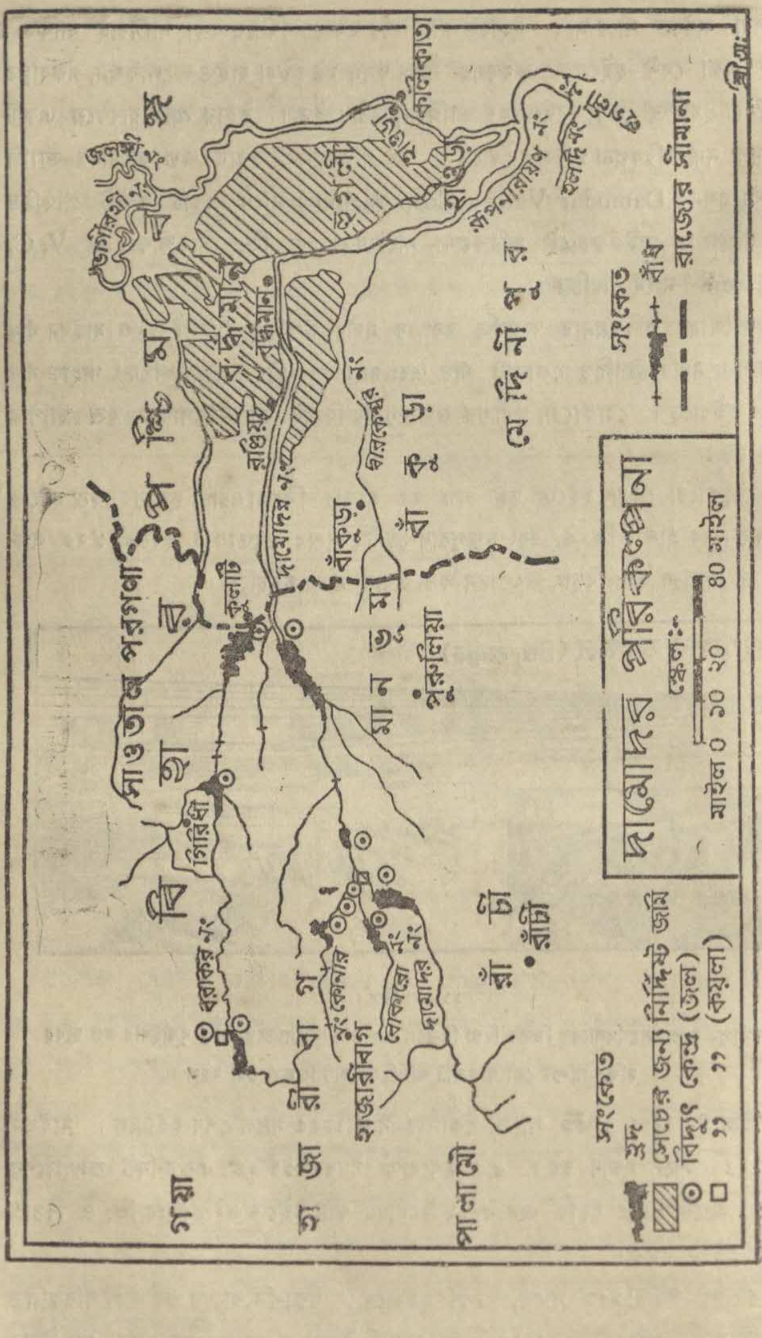


১১০ নং চিত্র।

দুর্গাপুর জাঙ্গালের খিলানের ভিতর দিয়া কিরূপে জলস্রোত আসিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য ছবির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি অতিরিক্ত ছোট চিত্র দেওয়া হইল।

তিলাইয়া বাঁধ ১৯৫৩ সালে, কোনার বাঁধ ১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে। মাইথন বাঁধ ১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হয়। এই শেষোক্ত বাঁধের ১১'০৪ একর-ফিট জলধারণের ক্ষমতা আছে, এবং ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন স্থান হইতে ৬০ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে পারে।

পাঞ্চেৎ বাঁধ ১৯৫৯ সালে, সম্পূর্ণ হইয়াছে। বন্যা-নিরোধের জন্য ইহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা ১২'১৪ লক্ষ একর-ফিট জল ধরিয়া রাখিতে পারে, এবং ইহার


দামোদর পরিকল্পনা
স্কেল:-
মাইল 0 10 20 40 মাইল
সংকেত
হ্রদ
সেচের জন্য নির্দিষ্ট জমি
বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জল)
,, ,, (কয়লা)
বাঁধ
রাজ্যের সীমানা
সাঁওতাল পরগনা
বর্ধমান
দুর্গাপুর
বাঁকুড়া
পুরুলিয়া
রাঁচী
হাজারীবাগ
গিরিডি
কলকাতা
মেদিনীপুর
গয়া
পালামৌ
দামোদর নং
বরাকর নং
রূপনারায়ণ নং

১১১ নং চিত্র।

নিকটে একটি ৪০ হাজার কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী বিদ্যুৎ-জনন-কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরের নিকট দামোদরের উপর একটি বিরাট জাঙ্গাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা ২২৭১ ফিট লম্বা, ও ৩৮ ফিট উচ্চ।

এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে ইহা হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া জলসেচন চলিবে। দামোদরের বাম পার্শ্বে ৮৫ মাইল দীর্ঘ খালে নৌবাহন চলিবে, এবং এই খাল রাণীগঞ্জ ও কলিকাতার মধ্যে সংযোগ সাধন করিবে। ইহা দ্বারা নব-নব শিল্প বৃদ্ধি করা যাইবে ও বিপুল মৎস্যের চাষ সম্ভব হইবে।

এখনই নিকটবর্তী জমিতে জলসেচ, এবং জামসেদপুর, চিত্তরঞ্জন, কলিকাতা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এখনও ইহার কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই,—এখনও একটি বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননের কাজ বাকি আছে। সেজন্য আজও আশানুরূপ বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও জলসেচ হইতেছে না। এই পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার, এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের মিলিত পরিচালনায় রূপায়িত হইতেছে।

৩। মহানদী পরিকল্পনা (উড়িষ্যা)।—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ছত্রিশগড়ের মালভূমির উপরে মহানদীর প্রথম অংশ,—এবং এই অঞ্চলের অববাহিকা



১১২ নং চিত্র।

হইতে ইহার অর্ধেক জলসঞ্চয় হয়। সুতরাং এই নদীর মালভূমির উপরিস্থ এই

অঞ্চলের উপনদীগুলি বিশেষ খরস্রোতা। সেজন্য তাড়াতাড়ি সমস্ত জল মহানদীতে আসিয়া পড়ে। সুতরাং এই অঞ্চলে শস্য-উৎপাদন-ঋতুর প্রথমভাগে বন্যা হয় ও শেষভাগে জলাভাব হয়। তাহাতে শস্য-উৎপাদন দুরূহ হয়।

মহানদীর মধ্যভাগে নদী ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়াছে। এখানে হীরাকুণ্ড নামক স্থান হইতে মহানদী দুইটি সংকীর্ণ শাখায় বিভক্ত হইয়া সম্বলপুরে আসিয়া মিশিয়াছে এবং সম্বলপুর, সনপুর, টিকারপাড়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হীরাকুঁদের নাম অনুসারে এই পরিকল্পনাকে হীরাকুঁদ পরিকল্পনা বলে। এই অংশে দুইটি উপনদী আছে—ইব ও টেল। এই অংশের জমি উঁচু-নীচু, এবং নদীতে বন্যা আসে। সেইজন্য এই অংশে লোকবসতি কম।

মহানদীর শেষ ভাগে—ব-দ্বীপ-অঞ্চলে—ভীষণ বন্যা আসে। প্রকৃতপক্ষে মহানদী নদীর বন্যা অত্যন্ত দুর্দশা আনে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য এক বহুমুখী মহানদী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বন্যানিরোধ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ প্রজনন, নৌ-চালন প্রভৃতি সহজসাধ্য হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে—

(১) ইহার উপনদীগুলির উপর এবং মহানদীর উপরিস্থ হীরাকুণ্ড, টিকারপাড়া ও নারাজ—এই তিনস্থানে বাঁধ বাঁধিয়া বন্যানিরোধ সম্ভব হইবে, এবং বাঁধ বাঁধিলে যে-জলাধার হইবে তাহাতে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা ও ২ লক্ষ কিলোওয়াট (Kw) শক্তির বিদ্যুৎ-উৎপাদন সম্ভব হইবে। জলসেচনের মূল খাল হইবে ৯২ মাইল ও শাখাপ্রশাখা ৪৬০ মাইল।

(২) মহানদীর উপরিস্থিত হীরাকুণ্ড বাঁধ প্রধান বাঁধ—১৫৭৪৮ ফুট দীর্ঘ—ইহার দুই পাশেই ভেড়ি আছে—ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম জলসেচন বাঁধ ; এই বাঁধের সাহায্যে জলসেচন দ্বারা উড়িষ্যার সম্বলপুর ও বোলাঙ্গির ৩.৫২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন দ্বারা খারিফ ধান্যের ও ১.১০ লক্ষ একর জমিতে রবিশস্যের চাষ করা হইতেছে।

(৩) এই বাঁধের পাশেই একটি বিদ্যুৎ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে ১ লক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রজনন করা হইতেছে, এবং এখান হইতে হীরাকুণ্ডের এলুমিনিয়ম কারখানায়, রাজগাংপুরের সিমেণ্ট কারখানায়, রৌরকেলার লোহার কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজের কলে, চৌদ্বারের কাপড়ের কলে, এবং কটক, পুরী, সম্বলপুর, সুন্দরগড় প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুৎ শক্তি প্রদত্ত হয়। হীরাকুণ্ড হইতেও বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়।

এই পরিকল্পনার আরও উন্নতি হইতেছে।

(৪) মহানদীতে ছোট-ছোট নৌকা সাধারণতঃ হাস্‌ডো পর্যন্ত যায়। কিন্তু বৎসরের সকল সময় ইহা সম্ভব হয় না। যে-সকল জলাধার সৃষ্টি করা হইবে, তাহাদের ভিতর দিয়া পথ থাকিলে বড়-বড় নৌকাও ছত্রিশগড় পর্যন্ত সকল সময়ে যাইতে পারিবে।

(৫) উড়িষ্যায় বনজ শক্তি বাড়িবে ও শিল্পসমৃদ্ধি হইবে।

এই পরিকল্পনার মধ্যে হীরাকুঁদ বাঁধের কাজ ১৯৪৮ সালে আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা শেষ হইয়াছে।

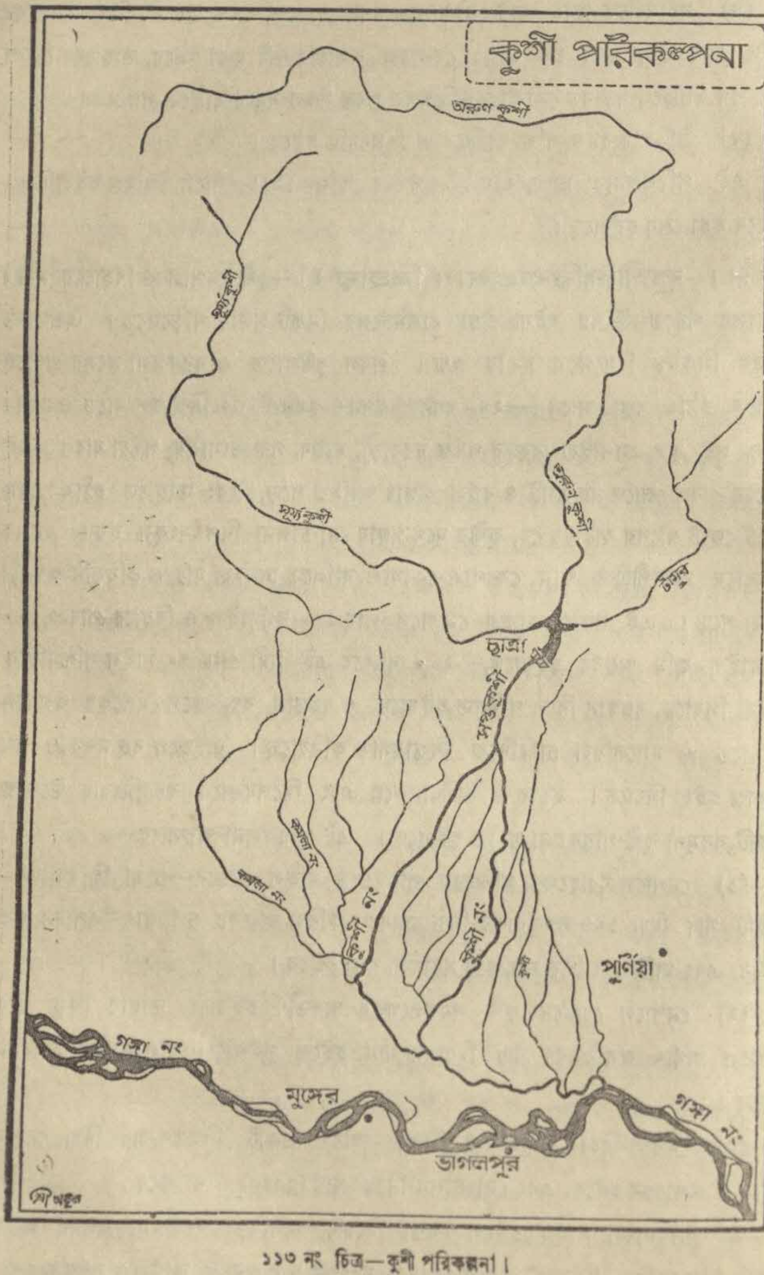
৪। **কুশী-পরিকল্পনা (বিহার)**।—কুশী নেপাল ও বিহারের নদী। হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া ইহা রাজমহলের নিকট গঙ্গায় পড়িতেছে। এভারেস্ট শৃঙ্গের নিকটস্থ হিমক্ষেত্রে ইহার জন্ম। প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফগলা জলের প্রবাহে কুশীতে হঠাৎ বন্যা আসে;—২৪ ঘণ্টায় কখনও-কখনও ৩০ ফিট জল বাড়ে ও বন্যার জলে দুই কূল ছাপাইয়া বহুদূর পর্যন্ত ঘরবাড়ী, মানুষ, গরু ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই সময়ের প্রবল স্রোতে বহু মাটি ও বালি গঙ্গায় আসিয়া পড়ে, এবং তাহাতে হঠাৎ এমন ছোট-ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয় যে, কুশীর মুখে গঙ্গায় নৌ-চালনা বিপৎসংকুল হয়। বন্যার অবসানে বন্যাপীড়িত স্থান কোথাও-কোথাও বালিতে ঢাকিয়া যায় ও কৃষিভূমি অনুর্বরা হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে নেপালে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল ও বিহারে প্রায় ৩,০০০ বর্গমাইল জমি অনুর্বর হইয়াছে,—২০০ বৎসরে এই নদী প্রায় ৭০ মাইল পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়াছে, বহুস্থান বিলে পরিণত হইয়াছে ও বহুস্থান বদ্ধ জলে মশকের জন্মস্থান হইয়াছে ও ম্যালেরিয়া চারিদিকে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এইরূপে বহু নগর ও গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে এবং বিশেষভাবে বন্যানিরোধ উদ্দেশ্যে একটি বহুমুখী কুশী-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে—

(১) নেপালে বরাহক্ষেত্র মন্দিরের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে—চাত্রা গিরিখাতে—একটি বাঁধ দিয়া ১০৬ লক্ষ একর-ফিট জলসঞ্চয় করিয়া জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে, এবং মাটি ও বালির সংরক্ষণে সহায়তা করা হইবে।

(২) নেপালে যেখানে কুশী সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু নিম্নে জাঙ্গাল অর্থাৎ জলবিতরণ বাঁধ দিয়া সেখান হইতে দুইপাশে খাল কাটিয়া জলসেচন হইবে।

(৩) নেপাল-বিহার সীমানার নিকট আরও একটি বিতরণ-বাঁধ দিয়া সেখান হইতেও জলসেচন হইবে, এবং নৌ-চালন-নিয়ন্ত্রণ-দ্বার (gate)-ও থাকিবে।

এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে—বন্যা নিরোধ, জলবিদ্যুৎ-প্রজনন, জলমগ্ন জমির উদ্ধার, ম্যালেরিয়া নিবারণ, শস্য-উৎপাদন, মৎস্যের চাষ করা ও কাটমাণ্ডু পর্যন্ত জলপথে গমন সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

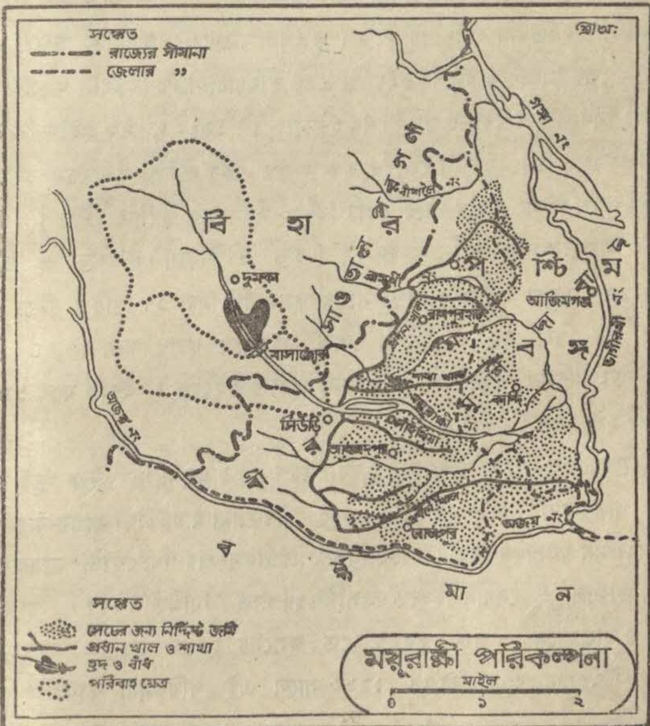


১১৩ নং চিত্র—কুশী পরিকল্পনা।

রাজ্যসরকার-পরিচালিত পরিকল্পনা

১। ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা (পশ্চিমবঙ্গ)—ময়ূরাক্ষী বা মোর নদী বিহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর মহকুমায় উৎপন্ন হইয়া সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নদীতে পড়িতেছে। ইহারও তলদেশ উন্নীত হইয়াছিল এবং এই অঞ্চলের শস্যহানি ও শস্যাভাব নিত্যবস্তুর মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৬ খৃঃ অব্দে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা শেষ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ—

(১) বিহারের অন্তর্গত মাসাঞ্জোর গ্রামে ২১৭০ ফিট দীর্ঘ ও ১০৫ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া একটি জলাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখান হইতে জলসেচন ও



১১৪নং চিত্র।

বিদ্যুৎ-উৎপাদন—দুইই হইবে। ক্যানাডার সাহায্যে এই বাঁধ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ক্যানাডা বাঁধ (Canada-dam) বলে।

(২) এই স্থানের ২০ মাইল নীচে,—বীরভূমের সদর সিউড়ি হইতে ২ মাইল উত্তরে **তিলপাড়া** নামক স্থানে একটি জলবিতরণ-বাঁধ অর্থাৎ জাঙ্গাল (barrage) নির্মিত হইয়াছে। ইহার দুইপার্শ্বে প্রত্যেকটি ৭৫ মাইল দীর্ঘ দুইটি জলসেচন-খাল কাটা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বক্রেশ্বর জাঙ্গাল ও দ্বারকা-জাঙ্গালও নির্মিত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা দ্বারা বিহারে ৩৫ হাজার একর ও পশ্চিমবঙ্গে ৭'২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন চলিবে, এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট (Kw) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

২। **তুঙ্গভদ্রা-পরিকল্পনা (অন্ধ্র ও মহীশূর)**—মান্দ্রাজ ও হায়দারাবাদ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাষাভিত্তিক দেশবিভাগ হওয়ার পর এই পরিকল্পনা অন্ধ্র ও মহীশূরের মধ্যে পড়িয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়া হায়দারাবাদ (বর্তমান অন্ধ্র) ও মান্দ্রাজে (বর্তমান মহীশূর) জলসেচন হইবে এবং ৭২ হাজার কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে—এই উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বর্তমান মহীশূরের দিকে (ভূতপূর্ব মান্দ্রাজের অন্তর্গত অংশে) ২২৫ মাইল দীর্ঘ খালের নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছে এবং হায়দারাবাদের (বর্তমান অন্ধ্রের) দিকে ৬৬ মাইলের নির্মাণ-কার্য বিভিন্ন স্থানে শেষ হইয়াছে। ১৯৫৩ খৃ. অব্দ হইতে কতকাংশ জল ছাড়া হইয়াছে এবং দুই রাজ্যে প্রায় ৮'৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইতেছে। নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি ও বাম পার্শ্বে একটি বিদ্যুৎ-জননকেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

৩। **মাচকুন্দ-পরিকল্পনা** (অন্ধ্র ও উড়িষ্যা)।—অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সীমায় অবস্থিত মাচকুন্দ নদীতে জালাপুট নামক স্থানে বাঁধ দিয়া ১৭ মাইল নিম্নে একটি জলবিতরণ বাঁধ দিয়া অন্ধ্র ও উড়িষ্যা দেশে জলসেচন করার জন্য, ১৭,২৪০ কি. ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার কার্য ১৯৪৭ খৃ. অব্দে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৪। **চম্বল-পরিকল্পনা** (মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান)।—উক্ত দুই রাজ্যের দ্বারা এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা দ্বারা গান্ধী-সাগর-বাঁধ, গান্ধী-সাগর-বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র ও সেখান হইতে বিদ্যুৎপরিচালন-তার-পথ, কোটা নামক স্থানে জলবিতরণ-জাঙ্গাল ও সেখান হইতে জলবিতরণ-খাল নির্মিত হইবে। খাল দ্বারা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ৭৫ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইবে। ১৯৬৩ সালে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা।

৫। **ভদ্রা-পরিকল্পনা** (মহীশূর)।—ভদ্রা নদীর উপর বাঁধ দিয়া সিমোগা, চিকমাগালুর, চিত্রদুর্গ ও বেলারী জেলায় ২'৪৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৩৩ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে।

৬। **কাক্‌রাপাড় পরিকল্পনা** (গুজরাট)।—সুরাটের ৫০ মাইল উত্তরে তাপ্তী নদীর বাঁধ বাঁধিয়া ও খাল কাটিয়া ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার জমিতে জলসেচন ও ৪৮ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কাক্‌রাপাড় বাঁধ ১৯৫৩ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে;—খালগুলি ১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

৭। **নিম্ন ভবানী পরিকল্পনা**।—ভবানী—কাবেরী নদীর উপনদী। এই পরিকল্পনা অনুসারে ইহার উপর বাঁধ দিয়া ইহার ডানপার্শ্বে ১২০ মাইল খাল খনন করিয়া ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন এবং ১০ হাজার কি. ও. বিদ্যুৎ-উৎপাদন হইবে। ১৯৪৮ খৃ. অব্দে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়া ১৯৫৩ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, ৮। **রিহান্দ পরিকল্পনা** অনুসারে শোন নদীর **রিহান্দ উপনদীর** উপর বাঁধ দিয়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের রেওয়া অঞ্চলে;—৯। বোম্বাই প্রদেশের **মাহী নদীর** উপর বাঁধ দিয়া **মাহী পরিকল্পনা** অনুসারে রাজস্থান ও বোম্বাই অঞ্চলে;—১০। **কৃষ্ণা-পেন্নার পরিকল্পনা** অনুসারে **কৃষ্ণানদীর** উপর বাঁধ বাঁধিয়া রায়লাসীমা অঞ্চলে;—১১। কৃষ্ণানদীর উপনদী **কয়নানদীর** উপর বাঁধ বাঁধিয়া **কয়না-পরিকল্পনা** অনুসারে বোম্বাই প্রদেশে পুনা ও সাতারা জেলায় জলসেচন হইবে ও জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইবে। এই সকল পরিকল্পনার কতক গৃহীত হইয়াছে মাত্র এবং কোন-কোন স্থানে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে।

Questions

1. What do you understand by the term *multipurpose* project? (Cal. B. Com. 1949)
2. Give a short account of the Damodar Valley Project. Explain how it is immensely necessary for the area in which the scheme is executed.
3. "The Damodar is aptly known as the River of Sorrow."—Explain this and compare it with the Hwang Ho.
4. What economic advantages Bihar and West Bengal are likely to derive from the Damodar Valley Projects when it materialises? (Cal, I. Com. 1047, '50; Cal. B. Com. 1947, '49)
5. Give a short account of the Bhakra-Nangal Project.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

①

মৎস্য-শিল্প

মৎস্য।—যে-দেশে তৃণভূমি নাই সে-দেশে পশুপালন হয় না। সুতরাং সেখানকার লোক মৎস্যই সেখানে বেশী খায়। তাই জাপানের লোক পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী মৎস্য খায়,—আ. যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি বৎসরে মাছ লাগে ১৩ পাউণ্ড, জাপানে লাগে ৫৫ পাউণ্ড।

মৎস্যের শ্রেণী,—অবস্থিতি হিসাবে শ্রেণীভেদ।—প্রাপ্তি-স্থান হিসাবে মৎস্যকে নিম্নলিখিত দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন,—

মৎস্য

- ১। আভ্যন্তরীণ বা অ-সামুদ্রিক
  - (১) স্বাদু জলের
    - (ক) নদী, (খ) হ্রদ
    - (গ) খাল, (ঘ) বিল
    - (ঙ) পুষ্করিণী প্রভৃতি
  - (২) লাবণ জলের
    - (ক) নদী মুখ ও
    - (খ) লাবণ নদী
- ২। সামুদ্রিক
  - (১) সৈকতীয়
  - দূর উপকূলীয়
  - (৩) গভীর সমুদ্রীয়

উপরি-প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ খাল, বিল, মিষ্ট জলের নদী ও হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি মিষ্ট জলের জলাশয় হইতে কতক মাছ পাওয়া যায়, এবং নদীমুখের ও উপহ্রদের লবণাক্ত জল হইতে মাছ পাওয়া যায়। এগুলি অ-সামুদ্রিক মাছ। সামুদ্রিক মাছ প্রধানতঃ সমুদ্রের উপকূল, সন্নিহিত স্থান, উপকূল হইতে অল্পদূরস্থ স্থান, এবং সমুদ্রের গভীর অংশ হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ বা অ-সামুদ্রিক মাছ সাধারণতঃ দেশের লোকের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়। সামুদ্রিক মৎস্যের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান আছে।

সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের উপযোগী স্থান।—(১) মহাদেশ-সন্নিহিত সমুদ্রের অগভীর অংশই মৎস্য-শিকারের প্রশস্ত-স্থান। কারণ,—

(ক) সমুদ্রজলে,—এমনকি যে-জল আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়—তাহাতেও,—নানাপ্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টির অগোচর লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি

উদ্ভিদ্ মিশ্রিত থাকে। এই সকল উদ্ভিদের সাধারণ নাম প্লাঙ্কটন (plankton)। অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবাণু এই সকল প্লাঙ্কটন ভক্ষণ করে, এবং ছোট-ছোট মৎস্য ও অন্য ছোট-ছোট জলজ প্রাণী এই সকল ক্ষুদ্রতর জীবাণু ভক্ষণ করে,—আবার বড়-বড় মাছ এইসকল ছোট-ছোট মাছ ও প্রাণী ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল প্লাঙ্কটন তীর হইতে বহু দূরে থাকে না, এবং সূর্যের আলোক ভিন্ন বাঁচে না। আবার, নদীসকল স্বাদু জলের সহিত যে-নাইট্রোজেন সমুদ্রে লইয়া আসে, খাদ্যের জন্য তাহারও উপর ইহারা নির্ভর করে। তাই সমুদ্রের গভীর অন্ধকারময় অংশে তাহারা থাকে না। তদুপরি চড়ার উপরে যে-স্থানে শীতল ও উষ্ণ জলের মিশ্রণ হয়, সেখানে অনেক রকম প্লাঙ্কটন জন্মে। সেইজন্য মহীসোপান ও মগ্ন উপত্যকায় মৎস্যসকল খাদ্যসংগ্রহের জন্যই একত্রিত হয়। একারণেই তীরসন্নিহিত স্থান মৎস্য-শিকারের উপযোগী।

(খ) মহীসোপানের উপরিস্থিত অধিকতর অগভীর চড়া মৎস্য-শিকারের অধিকতর উপযোগী। মোটামুটি ৪০ ফিট হইতে ৬০০ ফিট গভীর জলে মৎস্য-শিকার হয়। (কিন্তু হালিবট মাছ ২০০০ ফিট্ গভীর জলেও পাওয়া যায়)।

(গ) ভগ্ন তটরেখা মৎস্য-শিকারের ও মৎস্য-ব্যবসায়ের উপযোগী। ভগ্নতট যে-উপসাগরের সৃষ্টি করে, তাহাতে কোন-কোন জাতীয় মৎস্য বাস করে।

(২) অগভীর যে-সকল স্থানে শীতল ও উষ্ণ জল মিলিত হয়, সেখানে মৎস্যের প্রাচুর্য হয়। নিউফাউণ্ডলণ্ডের নিকট শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত;—উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে নরওয়ের পার্শ্বে উষ্ণ উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক স্রোত ও তাহার তলদেশে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত শীতল উত্তর আর্কটিক স্রোত;—উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে উষ্ণ কিউরোসিয়া ও শীতল কামচাটকা স্রোত;—মিলিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানগুলি শ্রেষ্ঠ মৎস্য-শিকার স্থল।

(৩) সমুদ্রের অগভীর অংশ যদি হিম-শীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হয়, তবে সেখানে সুস্বাদু মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

সূর্যের আলোকের তারতম্য ও জলবায়ু হিসাবে জলজ উদ্ভিদের তারতম্য হয়। সেইজন্য ঋতুভেদে ও জলবায়ুভেদে মৎস্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ইংলিশ প্রণালীতে ফেব্রুয়ারি মাসে সূর্যোত্তাপ বাড়ে বলিয়া মৎস্যের খাদ্যও বাড়ে। সেজন্য জুনমাসে ম্যাকারেল মৎস্য খুব বেশী উৎপন্ন হয়।

উষ্ণমণ্ডলের মাছের সৌন্দর্য বিখ্যাত—নানা রঙের সুন্দর-সুন্দর মাছ উষ্ণমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অনেকগুলি খাদ্য নহে—এমন কি বিষাক্ত।

এই সকল মৎস্য-চারণ ক্ষেত্রের নিকট লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়ে। কোন স্থানে লোকবসতি বেশী হইলে, এবং মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য মাছ শুকাইবার ও মাছের তৈল বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে এবং মাছ কৌটাবদ্ধ করিয়া বিদেশে চালান দিবার সুবিধা থাকিলে সে-স্থান মৎস্যের ব্যবসায়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পৃথিবীর মৎস্য উৎপাদন-স্থান।—পৃথিবীর সামুদ্রিক মৎস্য পাইবার শ্রেষ্ঠ স্থান চারিটি,—



১১৫নং চিত্র।—পৃথিবীর সামুদ্রিক-মৎস্য উৎপাদন-স্থান

(১) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক মহাসাগর।

(২) উত্তর-পূর্ব আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মহাসাগর।

(৩) উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর।

(৪) উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর।

(১) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব আট্লাণ্টিক মহাসাগর।—ইহা পৃথিবীর বিখ্যাত মৎস্য-উৎপাদনের ও মৎস্য-ব্যবসায়ের স্থান। ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(ক) উত্তর সাগর (North Sea)-স্থিত চড়া (bank), ও (খ) নরওয়ে-সন্নিহিত অংশ।

(ক) উত্তর সাগর-স্থিত এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের প্রধান অংশের মধ্যস্থ ৬০০ ফিট গভীর মগ্ন উপত্যকা,—বিশেষতঃ তাহার উপরে অবস্থিত ১২০ ফিট গভীর **ডগার ব্যাঙ্ক,**—মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। আটলাণ্টিকের এই অঞ্চলের অধেক মৎস্য উত্তর সাগরে পাওয়া যায়। মৎস্যের আধিক্য ইহার কারণ হইলেও, অন্য বিশেষ কারণ এই যে, এই স্থান গ্রেটবৃটেনে, ফ্রান্স, হলণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি কয়েকটি

প্রধান মৎস্য-ব্যবসায়ী জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাদের মধ্যে আবার গ্রেটবৃটেন সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু এই স্থানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে লোকবসতি ঘন, এবং মৎস্য বিক্রয়েরও সুবিধা।

গ্রেট্‌বৃটেনে—পূর্বতীরে স্কটলণ্ডের অন্তর্গত—পিটারহেড, এবার্ডিন, স্টোনহেভেন ;—ইংলণ্ডের অন্তর্গত—হাল, গ্রিম্‌স্‌-বি, ইয়ারমাউথ, লোয়েস্ট-অফ্‌ট্‌, ও লণ্ডন এবং পশ্চিমতীরে ইংলণ্ডে ফিট্‌উড, ও ওয়েল্‌সে কার্ডিফ **প্রধান মৎস্য-ব্যবসায়ের বন্দর**। ইহাদের মধ্যে **গ্রিম্‌স্‌-বি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৎস্য ব্যবসায়ের স্থান**। বিলিংস্‌গেট্‌ বাজার হইতে লণ্ডনে মাছ আসে। কড্‌, ম্যাকারেল, হেরিং, হ্যাডক্‌ এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। ১৯৫৪ সালে গ্রেট্‌বৃটেন ১ কোটি পাউণ্ডের মাছ ধরিয়াছিল।

(খ) নরওয়ে-সন্নিহিত অংশ।—এই অঞ্চলে নরওয়ে ও আইস্‌লণ্ডের লোকেরা মৎস্যজীবী। আটলাণ্টিকের এই অঞ্চলে এক-পঞ্চমাংশ মৎস্য নরওয়ের ও এক-দশমাংশ মৎস্য আইস্‌লণ্ডের লোকেরা ধরিয়া থাকে। এই অঞ্চলে **মাছের প্রাচুর্য প্রধানতঃ তিনটি কারণে**;—(১) পূর্বেই বলিয়াছি,—এই অঞ্চলের উষ্ণ আটলাণ্টিক স্রোতের তল দিয়া শীতল আর্কটিক স্রোত দক্ষিণে আসিতেছে; (২) নরওয়ের ফিয়র্ডগুলিতে উত্তর সাগরের মাছেরা ডিম পাড়িতে আসে, ও (৩) এখানে কৃষিভূমি কম বলিয়া এখানকার লোকে বেশীর ভাগ মৎস্যজীবী;—প্রধানতঃ এই তিন কারণে এখানে মাছের এত প্রাচুর্য। প্রচুর কড ও হেরিং মাছ এ-অঞ্চলে ধরা পড়ে, এবং এ-অঞ্চল লবণাক্ত মাছ ও কড্‌লিবর তৈলের জন্য বিখ্যাত।

এই অঞ্চলে দূর সমুদ্রেও মাছ ধরা হয়, এবং এই সকল মাছের মধ্যে ম্যাকারেল প্রধান,—এই মাছ দূর সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়ায়।

ভূমধ্যসাগর-অঞ্চল হইতে সার্ডিন মাছ পাওয়া যায়। সার্ডিনিয়া দ্বীপ হইতেই ইহার নাম হইয়াছে সার্ডিন। এই মাছ তৈলাক্ত করিয়া টিনে ভরিয়া দেশবিদেশে চালান দেওয়া হয়।

(২) উত্তর-পূর্ব আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মহাসাগর।—আমেরিকার এই অংশের মৎস্য-উৎপাদক দেশগুলিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(ক) নিউফাউণ্ডলণ্ড-সন্নিহিত বড় চর (Grand Bank), (খ) ল্যাব্রাডর সন্নিহিত ছোট চর, (গ) নোভাস্কোসিয়া-সন্নিহিত অংশ, (ঘ) নিউ ইংলণ্ড-সন্নিহিত অংশ।

(ক) নিউফাউণ্ডলণ্ড-সন্নিহিত বড় চর।—নিউফাউণ্ডলণ্ড হইতে ১৮০ মাইল পূর্বে অবস্থিত গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বা বড় চর এই অঞ্চলের মৎস্য ধরিবার প্রধান

স্থান। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত ও শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের এই স্থানে মিলনই এখানে বেশী মাছ পাইবার অন্যতম কারণ। দূর সমুদ্রের মাছ ম্যাকারেল এই অঞ্চলের জলের উপর অংশেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার **প্রধান মাছ কড্‌**। কড্‌, হ্যালিবট ও হ্যাডক প্রভৃতি মাছ সমুদ্র-তলের নিকট হইতেই পাওয়া যায়।—কারণ, প্রধানতঃ



১১৬নং চিত্র।

সমুদ্র-তল হইতেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে। নিউফাউণ্ডলণ্ড দেশে কৃষিকার্য সম্ভব নহে। সেজন্য মৎস্য-শিকার ও মৎস্য-সংক্রান্ত ব্যবসায়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

(খ) **ল্যাব্রাডর-সন্নিহিত ছোট চর।**—কড্‌ই এখানকার প্রধান মৎস্য। মনে রাখা দরকার—পূর্ব ক্যানাডার সন্নিহিত আট্‌লাণ্টিকে বেশীর ভাগ কড্‌ই ধরা পড়ে, এবং শুষ্ক কডের ব্যবসায়ই প্রধান মৎস্য-ব্যবসায়।

(গ) **নোভাস্কোসিয়া-সন্নিহিত অংশে**ও প্রচুর কড্‌ মৎস্য ধরা পড়ে।

(ঘ) **নিউ ইংলণ্ডের সন্নিহিত অংশের** স্থান নিউফাউণ্ডলণ্ডের পরেই। ম্যাসাচুসেট্‌স্ স্টেট হইতে মাত্র কিঞ্চিদধিক ১৫০ মাইল দূরে জর্জেস্ ব্যাঙ্কস্ বা জর্জ চরের জন্য ম্যাসাচুসেট্‌স্ ও নিউ ইংলণ্ড স্টেটস্ মৎস্য-ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। এ-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে উষ্ণতম প্রদেশে অবস্থিত। তাই এখানে কড, ম্যাকারেল ও হ্যালিবট প্রধান মৎস্য। **বোস্টন** এ-অঞ্চলে **প্রধান মৎস্য-বন্দর,** এবং অন্য মৎস্য-বন্দর **গ্লস্টর** ও **মেন**।

উত্তর আমেরিকার পূর্ব তটরেখা অনেক স্থলে ভগ্ন। ইহাতে তীর-সন্নিধানে সর্বত্রই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফ্লোরিডা হইতে নিউফাউণ্ডলণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই মেন-হাডেন মাছ পাওয়া যায়। ইহা সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভগ্ন তীর সন্নিধানে

গল্দা চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি খোলাযুক্ত মাছ পাওয়া যায়। আবার জর্জ চর হইতে বড় চর পর্যন্ত এক সুবৃহৎ চর রহিয়াছে,—ইহার উচ্চতা স্থানে-স্থানে কম বেশী হইলেও ইহা এক অখণ্ড চর, এবং ইহা **পৃথিবীর কড্ মৎস্যের** প্রধান আড্ডা।

(৩) **উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর।**—উত্তরে কামচাট্কা হইতে দক্ষিণে ফর্মোজা দ্বীপ পর্যন্ত পূর্ব-এশিয়ার সন্নিহিত প্রশান্ত মহাসাগরের যে-অংশ—ইহা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মৎস্য-বিক্রয়-স্থান। কারণ, (ক) ইহার উত্তর হইতে শীতল সমুদ্রস্রোত জাপানের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত উষ্ণ কিউরোসিয়ার সঙ্গে মিশিয়াছে;—(খ) এদিকের এশিয়ার তটরেখা ভগ্ন, এবং দ্বীপগুলিও অগভীর প্রণালীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন; (গ) তদুপরি এই অংশ এক জনবহুল অংশে অবস্থিত—ইহারা বৌদ্ধ, কতকাংশে জীবহত্যার বিরোধী, এবং মৎস্যের উপর নির্ভরশীল। আবার (ঘ) জাপানে মাংস নাই। জাপানীরাও মৎস্য-ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে। সেজন্য **এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম আট্লান্টিক অঞ্চল অপেক্ষাও বেশী মৎস্য ধৃত হয়।**

এই অঞ্চলের মৎস্য ধরিবার স্থান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,—(ক) **কামচাট্কা, সাখালিন, ও জাপান দ্বীপপুঞ্জের উত্তরের দ্বীপ হোক্কেইডো-সন্নিহিত অংশ**,—ইহা পৃথিবীর অন্যতম মৎস্যবহুল স্থান। শীত-প্রধান বলিয়া এ-অঞ্চলে কৃষিকার্য ও কাষ্ঠবিক্রয় প্রভৃতি জীবিকার সুবিধা নিতান্ত কম। তাই মৎস্য-শিকার এ-অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়। কড্, স্যামন, হেরিং, সার্ডিন এ-অঞ্চলের প্রধান মৎস্য। (খ) **এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে** শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনহেতু প্রচুর ম্যাকারেল, কাঁকড়া, গল্দা, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যায়;—কড্ নহে।

(৪) **উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর।**—এই মৎস্যক্ষেত্র বেরিং সমুদ্র হইতে উত্তর কালিফোর্নিয়া পর্যান্ত বিস্তৃত। এক্ষণে ইহাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মৎস্যচারণ ভূমি। এখানে মহীসোপান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কোন-কোন স্থানে নাই বলিলেই হয়। সেজন্য এখানে মৎস্য-ব্যবসায়ের খুবই সুবিধা। আলাস্কা উপসাগরের মধ্যে হালিবট ও কড পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কড এ-অঞ্চলে কমই পাওয়া যায়। কড বেশী পাওয়া যায় আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে। এ-অঞ্চলের প্রধান মাছ সামন। সামন মাছ, বঙ্গদেশের ইলিশ মাছের মত, ডিম পাড়িবার জন্য নদীমধ্যে প্রবেশ করে, এবং সেই সময় প্রচুর ধরা পড়ে। হেরিং মাছও এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।

মৎস্য-ব্যবসায়ের সমস্যা।—উত্তর-শীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেশী, খাদ্যের অভাবও বেশী, সেজন্য এই অঞ্চলে মৎস্য বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য,—এবং মৎস্য-ব্যবসায়

প্রধানতঃ এই অঞ্চলেই প্রবল। দক্ষিণ-শীতোষ্ণ অঞ্চল জনবহুল নহে, সেজন্য সেখানে মাছ ধরিবার আগ্রহ বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে নাই। অবশ্য, সেখানে মাছ ধরিয়া উত্তর গোলার্দ্ধে বিক্রয় করা চলিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও জাহাজে হিমপ্রকোষ্ঠ থাকিত না। সুতরাং বিষুবরেখা পার হইয়া অত দূরে মাছ চালান দিলে মাছ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। এক্ষণে জাহাজে হিমপ্রকোষ্ঠ হইয়াছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মৎস্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ভৌগোলিক রাসেল স্মিথ লিখিয়াছেন যে, বিশ বৎসর পূর্বে আ. যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিষয়ক সেক্রেটারি মৎস্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, যেরূপ দ্রুতগতিতে নির্মমভাবে মৎস্যকুল ধ্বংস করা হইতেছে, মৎস্যের খাদ্য নষ্ট করা হইতেছে, জাহাজ, কারখানা, কয়লা-খনি, সহর ও নগর, জলে আবর্জনা ফেলিয়া ও ময়লা দ্বারা জল নষ্ট করিয়া মৎস্যের উৎপাদন হ্রাস করিতেছে, তাহাতে মৎস্য-বংশ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। তিনি উদাহরণস্বরূপ দেখাইয়াছেন, উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চলে ৪০ বৎসরে শতকরা ৯৮ ভাগ মাছ কমিয়া গিয়াছে ; আবার হাড্‌সন নদীতে ১৮৮৯ সালে যত মাছ ধরা হয়, ১৯১৬ সালে তাহারা শতকরা ৯৯ ভাগ কম ধরা পড়ে।

২

ভারতের মৎস্য-শিল্প

আভ্যন্তরীণ মৎস্য-শিল্প।—ভারতের অভ্যন্তরস্থ খাল, বিল, পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ মৎস্য ধরিবার স্থান। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী হইতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ভারতে, বিশেষতঃ পূর্ব-ভারতে, সামুদ্রিক মাছের ব্যবহার কম,—সেই অঞ্চলে দেশের আভ্যন্তরীণ মৎস্যই প্রধান মৎস্য। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশে ভারতের স্বাদু জলের মাছের প্রায় ৭২ শতাংশ পাওয়া যায়। চিল্কা হ্রদ, কেরলের পার্শ্ববর্তী উপহ্রদ, এবং গঙ্গার ও মহানদীর মোহনায় প্রচুর লবণ জলের মাছ পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, চিংড়ি প্রভৃতি স্বাদু জলের মাছ।



১১৭ নং চিত্র।

সামুদ্রিক মৎস্য-শিল্প।—দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরল ও বোম্বাই প্রদেশের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রেই প্রধানতঃ সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হয়। এ-অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা অত্যন্ত দরিদ্র। সেজন্য সমুদ্রে মাছ ধরিবার উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাহাদের

পক্ষে দুঃসাধ্য। সে-কারণে তাহারা উপকূল হইতে ৬০-৭০ ফিট অপেক্ষা বেশী দূরে যাইতে পারে না। ম্যাকারেল, সার্ডিন (Sardine), চিংড়ি (Prawn), ভাওয়াল (Pomfret), হেরিং (Herring) প্রভৃতিই সমুদ্রের উপকূলের নিকটে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে যে-মাছ ধরা হয় তাহা সাধারণতঃ এ-দেশের লোকের পক্ষে সুপ্রচুর নহে। সেজন্য এখন সামুদ্রিক মাছ ধরিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং কিছু লোনা মাছ, শুঁট্‌কি মাছ ও টিনের কৌটার মাছ এ-দেশে আমদানি করা হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গে শুঁট্‌কি মাছ ব্যবহৃত হয়। শুঁট্‌কি মাছের ব্যবসায়ে মান্দ্রাজ শ্রেষ্ঠ। সেখানে মাছ শুকাইবার অনেক আড়ত আছে। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের—বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানের—টাট্‌কা মাছ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা হয় বটে, কিন্তু রাজনীতিক কারণে এই আমদানি অনিশ্চিত,—কখনও আসে, কখনও আসে না।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে মৎস্যজাত ব্যবসায়-দ্রব্য বিশেষ উৎপন্ন হয় না। কেবল বোম্বাই ও মান্দ্রাজে হাঙ্গরের তেল উৎপাদন করা হয়। ভবিষ্যতে এ-দেশে মাছের তেলের ব্যবসায়ের উৎকর্ষলাভের সম্ভাবনা আছে।

ধৃত মৎস্যের পরিমাণ, রপ্তানি ও আমদানি।—১৯৬০ সালে ভারতে ১১৪১·৬ সহস্র টন মাছ ধরা হইয়াছিল। তন্মধ্যে টাট্‌কা মাছ বিক্রীত হইয়াছিল ৫৪৬·৮ সহস্র টন, শুষ্ক করা হইয়াছিল ২৬৪·৯ ম. টন, লবণাক্ত করা হয় ২৩৪·০ ম. টন, এবং ওজনে কম পড়ে—৯৫·৯ সহস্র টন। ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৫৯৯ টন মাছ রপ্তানি করিয়া ৪·৬ কোটি টাকা পাওয়া যায়, এবং ৩·৫ কোটি টাকায় ১৯৩৬৯ টন মৎস্য আমদানি করা হয়।

কয়েকটি প্রধান মৎস্য-চাষের স্টেটের বিবরণ

১। **মান্দ্রাজ।**—মৎস্যশিল্পে মান্দ্রাজ বহু উন্নত, এবং গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগ মৎস্য-চাষের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহশীল। গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগের দ্বারা অথবা ইহার তত্ত্বাবধানে অন্য লোক দ্বারা মৎস্য-চাষ করা হয়। এই মৎস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধানেই কাবেরী নদীতে রোহিতাদি মৎস্যের, এবং ইলিশ মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়। ইহার জেলায়-জেলায়ও মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য মৎস্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। বিদেশী-মাছ এখানে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়। নানাপ্রকার রুই, ইলিশ ও বাইন প্রভৃতি, এবং যবদ্বীপ হইতে আনীত ও মৎস্য-বিভাগের চেষ্টায় প্রতিপালিত গৌরমি (Gaurami), বিলাতী রুই, বিলাতী ট্রেঞ্চ (Trench), ট্রাউট (Trout) এখানকার আভ্যন্তরীণ মাছ।

মান্দ্রাজের উপকূলে ট্রলার প্রভৃতি জেলে-স্টিমার রাখিবার মত পোতাশ্রয় নাই,—এমন কি দেশী নৌকা রাখারও অসুবিধা। সেইজন্য এ-অঞ্চলে দূর-সমুদ্রের মৎস্য শিকারের কোন ব্যবস্থাই নাই। কেবল "কাটামারান" নামক দেশী নৌকায় উপকূল হইতে কিছুদূর পর্যন্ত মৎস্যশিকার চলে।

মান্দ্রাজের মৎস্য-বিভাগের কার্য।—মান্দ্রাজের মৎস্য-বিভাগ (১) উপকূলে প্রায় একশত "লোনা মাছ" প্রস্তুত করার কারখানা করিয়াছে। সেজন্য সস্তায় লবণ সরবরাহ করে। লোনা মাছ প্রস্তুত করার এরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা অন্য কোন প্রদেশে নাই।

(২) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে মান্দ্রাজ সৈন্যগণের জন্য ধূমযোগে মাছ শুকাইবার জন্য সাতটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। ১টি এখনও বর্তমান আছে।

(৩) ধরা-মাছ জীবিত রাখার জন্য মান্দ্রাজ একটি সামুদ্রিক জলাশয় (marine aquarium) স্থাপন করিয়াছিল। এরূপ জলাশয় সমগ্র এশিয়ায় আর কোথাও ছিল না। যুদ্ধের সময় ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহা পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

(৪) **তিরুনেলভেলি** ও **রামনাদের** নিকট যে ঝিনুক-ক্ষেত্র আছে, সেখান হইতে মান্দ্রাজ মুক্তা-ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে ও সেজন্য গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে।

(৫) মান্দ্রাজ গভীর সমুদ্রে মৎস্য-শিকারের ব্যবস্থা করিয়াছে, এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীরা যাহাতে উৎসাহিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছে।

(৬) হাঙ্গর ধরিয়া তাহার লিভার হইতে ভিটামিন "এ" সম্পদে মূল্যবান্ হাঙ্গর-তৈল প্রস্তুত করিতেছে। এই তৈল কড্‌লিভার তৈলের অভাব পূরণ করিবে।

(৭) মৎস্য-সংক্রান্ত অনেক গবেষণাগার নানাস্থানে স্থাপন করিয়াছে।

২। **কেরল**।—কেরলের সমুদ্রতীরে কতক পোতাশ্রয়ের জন্য ও কতক মৎস্য-শিকারের অন্য সুবিধার জন্য অধিকতর মৎস্যজীবী বাস করে এবং প্রচুর মাছ ধরে।

৩। **বোম্বাই**।—বোম্বাই রাষ্ট্রে মৎস্যের চাষের উপযোগী জলসেচ-খাল, জলাশয় প্রভৃতির অভাব নাই বটে, কিন্তু এ-অঞ্চলে স্বাদু জলের মাছ বিশেষ নাই। কয়েক জাতীয় রোহিত মৎস্য এখানে জন্মানো হয় বটে, কিন্তু পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে উহার পোনা আনিতে হয়। সেইজন্য স্বাদু জলের মাছের এখানে বিশেষ অভাব।

সামুদ্রিক মৎস্য।—বোম্বাই অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য সুপ্রচুর। ইহার উপকূল সুদীর্ঘ ;—সম্মুখে বিশাল সমুদ্র,—সুতরাং উপকূলে বহুসংখ্যক সাহসী মৎস্যজীবী বাস করে। তা'ছাড়া, এই উপকূলে নৌকাদি রাখিবার অনেক পোতাশ্রয়ও আছে। সেইজন্য এই রাষ্ট্রের পশ্চিম-উপকূলে—কচ্ছ হইতে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত স্থানে এবং বোম্বাই সহরের দক্ষিণে রত্নগিরি ও রাজাপুর অঞ্চলে, সমুদ্র-উপকূলে সেপ্টেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত

প্রচুর মৎস্য ধরা পড়ে। বম্বেল (বোম্বাই Duck), পমফ্রেট (Pomfret), ও জু মাছ (Jew Fishes) এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য।

গভীর সমুদ্রের মৎস্য।—বোম্বাই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ইউরোপ হইতে জেলে-ষ্টিমার আনাইয়া গভীর সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বোম্বাই সহরে এইরূপ একটি মাছ ধরিবার আড্ডা আছে। সেখানে হাঙ্গর ধরিয়া হাঙ্গরের লিভার হইতে তৈল বাহির করিবার কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই সরকারের মৎস্যশিল্প-উন্নয়ন-কার্য।—মৎস্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে বোম্বাই সরকার—

(১) সামুদ্রিক মৎস্য চালান দিবার জন্য মোটর-নৌকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাণ্ড্রা নামক স্থানে প্রথম এইরূপ মোটর-নৌকা চলিতে আরম্ভ করে। এক্ষণে বোম্বাই হইতে মৎস্য ধরিবার স্থান পর্যন্ত ৪০ খানি মোটর-নৌকা চলিতেছে।

(২) বোম্বাই, পুণা, রত্নগিরি, মালভান, চেণ্ডিয়া, আঙ্কোলা প্রভৃতি স্থানে মাছ টাট্‌কা রাখিবার জন্য বরফের কল স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) মাছ লবণাক্ত করার জন্য বোম্বাই সহরে—৪০টি, রত্নগিরি জেলায়—২০টি ও কানারা জেলায়—১৫টি কারখানা আছে। এই সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিনা শুল্কে লবণ দেওয়া হয়।

(৪) গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিবার কার্যে, জেলে-ষ্টীমার ও মোটর-ষ্টীমার চালাইতে, মৎস্য চালান দিতে ও যৌথ কারবার চালাইতে, এদেশী মৎস্যজীবীরা যাহাতে পটুত্ব লাভ করে, সেজন্য সুরাট, বোম্বাই, থানা, রত্নগিরি, কানারা প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে কড্‌লিভার তেলের আমদানি বন্ধ হইলে হাঙ্গরের তেলের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং দেখা যায় যে, ইহাতে ভিটামিন "এ" প্রচুর আছে, ও ইহা কড্‌লিভার তৈল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; সেজন্য জেলেদের মধ্যে সহজে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষণে অনেক স্থলে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। সাস্থন ডকে Fisheries Technological Laboratory স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সর্বসাধারণের তৈলও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই স্থানে ৪০০০ গ্যালন তৈল পরীক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে মাছের ডানা, হাড় ও আঁশ হইতে শিরিষ (gelatine), আঠা (glue) ও জমির সার প্রস্তুত হয় এবং অন্যত্র চালান যায়।

৪। **পশ্চিমবঙ্গ।**—পশ্চিমবঙ্গের লোক প্রধানতঃ মৎস্যভোজী, এবং বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বঙ্গদেশে মৎস্যের প্রাচুর্য ছিল। ইহার স্বাদু জলে রুই, কাতলা, ও মৃগেল

এবং সুন্দরবনের লবণ জলে ভেট্‌কি, তপসে, পারসে, ও ইলিশ প্রধান মৎস্য। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে মাছের বিশেষ অভাব হইয়াছে। এই **অভাবের কারণ** মোটামুটি এইরূপ :

(১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানী কর্তৃক বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া পাছে তাহারা সহজে নদী-খাল পার হইতে পারে সেইজন্য তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট জেলেদের নৌকা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) নৌকাশূন্য হইয়া অনেক মৎস্যজীবী অন্য জীবনোপায় অবলম্বন করিয়াছিল। অব্যবহারে জেলেদের জালও নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে অনেক জেলে মারা যায়।

(৪) যুদ্ধের পরে কাষ্ঠ ও সুতা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়ে এবং মূল্য দিলেও উহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য জেলেরা আর নৌকা ও জাল প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না।

(৫) বঙ্গবিভাগের পর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট মৎস্যক্ষেত্র পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে ২৫ মাইল মাত্র সমুদ্রোপকূল, গুটিকয়েক নদী, কয়েকটি মাত্র বিল, খাল ও পুষ্করিণী এবং ১২ লক্ষ একর উচ্চভূমির জলাশয়। ইহাদের মধ্যে নদীগুলি প্রায় মজিয়া গিয়াছে, এবং বিল, খাল ও পুষ্করিণীগুলি পঙ্কে ও দামে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উপকূলও অতি অল্প বলিয়া সৈকতীয় মৎস্যশিকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৬) নদী ও নদীশাখা দ্রুত মজিয়া যাইতেছে।

(৭) পূর্ববঙ্গের লোক উদ্বাস্তুরূপে পশ্চিমবঙ্গে অধিক পরিমাণে আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মাছ প্রায়ই আসে না।

মৎস্যশিল্প উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা।—পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যের অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে—

(১) গ্রামের ভিতরের পঙ্ক ও দামপূর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ঋণ দিবেন। অথবা, পুষ্করিণী খরিদ করিয়া পঙ্কোদ্ধার করিয়া মৎস্যচাষের জন্য জমা দিবেন।

(২) গবর্ণমেণ্ট পুকুরে রোহিত প্রভৃতি মাছের পোনা ফুটাইয়া সেই পোনা স্থানীয় লোকদের নিকট বিক্রয় করিয়া মৎস্যচাষে উৎসাহ দিবেন।

(৩) সৈকতীয় ও দূর-উপকূলীয় মৎস্যশিকার যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য উপযুক্ত জাল, নৌকা প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া জেলেদিগকে উৎসাহ দিবেন।

(৪) দূর হইতে মৎস্য চালানের সুবিধার জন্য বরফঘরযুক্ত স্টিমারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) ইউরোপ হইতে জেলে-স্টিমার ও জেলে আনিয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য-শিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং হাঙ্গরের লিভার হইতে তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। কণ্টাই মহকুমার উপকূলে এক্ষণে এই তৈল উৎপন্ন হইবে এবং কলিকাতা টেকনোলজিক্যাল ল্যাবোরেটরিতে ইহা শুদ্ধীকৃত হইবে। অন্য-অন্য মৎস্যজাত দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত করা হইবে।

৫। **উড়িষ্যা।**—উড়িষ্যার পূর্বদিকের সমুদ্র এবং আভ্যন্তরীণ বিল, নদী ও পুষ্করিণী, বিশেষতঃ চিল্কাহ্রদ, মৎস্যপূর্ণ। সেইজন্য উড়িষ্যার মৎস্য-সম্পদ্ বেশী। কিন্তু উড়িষ্যার মৎস্য-শিকার ও মৎস্য-সংক্রান্ত ব্যবসায় সাধারণতঃ জনসাধারণের হস্তে,—গবর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন না। উপকূলে পোতাশ্রয়ের অভাব, ব্যবসায়ের মূলধনও কম, মাছ তাজা রাখিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। জেলেরাও গরীব। সেইজন্য উপকূলীয় মৎস্য-শিকার উন্নত হয় নাই।

আভ্যন্তরীণ নদী, বিল, খাল ও পুষ্করিণীতে রোহিত, মৃগেল, কাতল ও ইলিশ প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। বালেশ্বর, কটক, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে মাছের পোনা সংগৃহীত হয়। বালেশ্বর জেলার লক্ষ্মণনাথে মাছের পোনার ব্যবসা চলে।

চিল্কাহ্রদে প্রচুর মৎস্য আছে, এবং এখানে প্রধানতঃ ভেট্‌কি, মুলেট (mullet), ম্যাকারেল, পমফ্রেট, ভারতীয় স্যামন (Indian salmon) প্রভৃতি ধরা হয়। মাছ প্রধানতঃ কলিকাতায় চালান যায়। এখান হইতে অন্ততঃ ৫০ হাজার মণ মাছ রপ্তানি হয়। মহানদীর নদীমুখেও ভাল মাছ পাওয়া যায়, এবং সেখানে স্থানে-স্থানে মাছের আড়ত আছে।

মৎস্য শুষ্ক করা ও লবণাক্ত করা এখানকার মৎস্য-সংক্রান্ত অন্য শিল্প।

৬। **অন্যস্থান।**—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহীশূর প্রভৃতি স্থানেও মৎস্য পাওয়া যায়, এবং ঐসকল স্থানে মৎস্য-শিল্পের উন্নতি-সম্বন্ধে নানা চেষ্টা হইতেছে।

মাছের চাষের বর্তমান অবস্থা।—মাছের চাষের দিকে বর্তমান ভারত-সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এজন্য তাঁহারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রায় ৫০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) রোহিতাদি প্রধান মৎস্যের পোনা-সংগ্রহ,—উপযুক্ত জলাশয়-রক্ষা,—এবং কোন রাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত পোনা অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ।

(২) মৎস্য-শিকার, -রক্ষণ, -চালন ও -বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতি করা, তাহাদের মধ্যে যৌথ কারবার করিবার সুবিধা প্রচার করা ও তাহাদের এই কার্যে উৎসাহ প্রদান করা।

(৪) মৎস্য লবণাক্ত ও শুষ্ক করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া—মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশে মৎস্যরক্ষণশিল্প-স্থাপনের যথোচিত উন্নতি করা, ও বিজ্ঞানসম্মত উন্নত মৎস্যরক্ষণ-প্রথার প্রবর্তন করা।

(৫) মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য ব্যবসায়িগণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

(৬) অ-সামুদ্রিক মাছের চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচন করা, ও সামুদ্রিক মাছের দ্রুত চালানের জন্য বাষ্পীয় পোতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট তিনটি গবেষণাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

(১) সামুদ্রিক মৎস্যের জন্য দক্ষিণ-ভারতে মান্দাপাম নামক স্থানে, (২) অ-সামুদ্রিক মাছের জন্য কলিকাতার নিকট বারাকপুরে, ও (৩) গভীর সমুদ্রের মাছের জন্য বোম্বাই সহরে।

এইসকল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভারত-সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রকে ৩৪,৫৬,৫৩৬ টাকা সাহায্যদান, ২৩,৬০,০০০ টাকা ঋণ দান করিয়াছেন।

ভারতে মৎস্য-শিল্পের উন্নতির উপায়।—ভারতের মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য (১) প্রত্যেক মৎস্য-শিক্ষার কেন্দ্রের সন্নিকটে বরফ-ঘর থাকা দরকার। (২) মৎস্য জীবীদের মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য সহজ সর্তে উপযুক্ত ঋণদান আবশ্যক। মৎস্য-জীবীদের মধ্যে যৌথ কারবারের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজনীয়। (৪) সমুদ্র-উপকূলে লবণ-জলের জলাশয়গুলি মৎস্য-চাষের উপযোগী করার জন্য গবর্ণমেণ্টের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা দরকার। (৫) মৎস্য-সংরক্ষণের ও চালানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত দরকার। (৬) সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার চেষ্টা সফল করার জন্য গবর্ণমেণ্টের যথোচিত চেষ্টা করা দরকার;—বিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষক ও জেলে-স্টীমার ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আনাইয়া এদেশের জালিকদিগকে শিক্ষিত করা দরকার। (৭) মৎস্য-তৈল, মৎস্য-সার, মৎস্য-পাকস্থলী প্রভৃতি মৎস্য-জাত দ্রব্যের উৎপাদন-প্রণালী ও ব্যবসায় সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষাদি দরকার।

রপ্তানি।—মান্দ্রাজ, কেরল ও মহারাষ্ট্র প্রধান মৎস্য রপ্তানি-কারক প্রদেশ।

Questions

1. What are the different sources from which fish is caught. Describe the location and physical characteristics of the principal fishing grounds of the world.

2. Examine the principal world fisheries ground, and point out their chief characteristics. (Cal. Inter. 1944, '46).

3. Describe the economic importance of shallow seas with regard to fishing. (Cal. Inter. 1930, '39, '40).

4. "All fishing grounds are confined to the temperate zone". —Explain.

5. Give an account of the principal fisheries of the world. Which of these are of special importance to Great Britain. (I. I. B. 1931). Explain the importance of this fishing ground on Great Britain.

6. What are the problems of the fishing industry in India ?

7. What are the important conditions for the development of fishing industry in India ? Examine the present position and future prospects of the fishing industry in West Bengal. (W. B. C. S. 1949).

8. Which of the states of Indian Republic have made much progress in the fishing industry and in what respects have they made the improvement ?

9. Give reasons why West Bengal has so much scarcity of fish.

নবম পরিচ্ছেদ

পরিবহন, বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্যকেন্দ্র

(১)

পরিবহন

পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা।—কোন জিনিষের একস্থান হইতে অন্যস্থানে যে স্থানান্তরীকরণ তাহাকে বলা হয় পরিবহন। দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে পরিবহনের সুব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কি বাণিজ্যের প্রসারতা সাধনে, কি শিল্পোন্নতিকরণে, কি দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রোধ করিতে, কি উপনিবেশ সংস্থাপনে, পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাংশে অগ্রগণ্য। এই সমস্তের সফলতা পরিবহনের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে।

বাণিজ্য ও পরিবহন।—(১) পরিবহন বাণিজ্যের জীবনস্বরূপ। ইহা পরিবহনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। একস্থান হইতে স্থানান্তরে বাণিজ্য করিতে হইলে তাহার প্রধান বাধা দূরত্ব। উৎপন্ন দ্রব্য ক্ষেত্র হইতে বাড়ীতে লইতে হইলে দূরত্ব কম হইতে পারে, তথাপি সে-স্থলেও পরিবহনের ব্যবস্থা দরকার। এই দূরত্বও যত অধিক হইবে পরিবহনের জন্যও তত অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। পরিবহনের সুব্যবস্থাই বাণিজ্য-সংসৃষ্ট দূরত্বের সমাধান করে।

(২) পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য জাতি নাই যে, কোন-না-কোন দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী নহে। আধুনিক জগতের শিল্পোন্নত ও সভ্যতাগর্বী ইউরোপ ও আমেরিকারও কাঁচা মালের জন্য অনুন্নত এশিয়া ও আফ্রিকার উপর নির্ভর করিতে হয়। পরিবহনের সুব্যবস্থা না থাকিলে এইরূপ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আর্থনীতিক প্রচেষ্টা ও পরিবহন ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গিভাব।—দেশের উন্নতির জন্য কোন নূতন প্রচেষ্টা করিতে হইলে অনেকাংশে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেক সময়ে বিদেশ ভ্রমণ হইতে অনুপ্রাণনা আসে ও তদনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। আবার সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ সকলেরই জন্য সুষ্ঠু পরিবহন-ব্যবস্থার দরকার। কোন দেশে পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত হইলে সহজেই বিভিন্নমুখী আর্থনীতিক উন্নতি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে **আর্থনীতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিবহন-**

ব্যবস্থা পরস্পরের সহায়ক ;—কর্মপ্রচেষ্টা সফল করিতে যেমন পরিবহনের দরকার, পরিবহনের সুব্যবস্থা থাকিলেও তেমনি কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়।

শিল্প-প্রচেষ্টা।—শিল্পদ্রব্য যদি বিদেশে রপ্তানি করা না যায়, তবে অর্থাগমও হয় না, শিল্পেরও উন্নতি হয় না। রপ্তানি-কার্যে সুলভ ও সহজ পরিবহন-ব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজন।

দুর্ভিক্ষের প্রতীকার।—দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিলে, বা দুর্ভিক্ষ সমাগত হইলে বিদেশ হইতে খাদ্যাদি আনাইতে পরিবহন-ব্যবস্থারই প্রয়োজন।

উপনিবেশ-সংস্থাপন।—দেশে জনবৃদ্ধি হইলে পৃথিবীর জনহীন বা জনবিরল অংশে উপনিবেশ-সংস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠে। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বর্তমান অধিবাসিগণের অধিকাংশই ইংরাজের বংশধর। যদি উপনিবেশ সংস্থাপন না করিয়া এই দুই মহাদেশের ইংরাজগণের ইংলণ্ডেই বাস করিতে হইত, তবে এক ভয়াবহ আর্থনীতিক অবস্থার উদ্ভব হইত। এই উপনিবেশ সংস্থাপনে, এবং তৎপরে ঔপনিবেশিকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ কারণে, পরিবহনের গুরুত্ব এত অধিক যে, তাহার আর অতিশয়োক্তি চলে না।

পরিবহনের বিভিন্ন উপায়।—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে পরিবহন-কার্য সম্পাদিত হয়। যেমন, বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রাভূমিতে বল্গাহরিণ ও কুকুরের সাহায্যে পরিবহন চলে,—উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে উষ্ট্রই একমাত্র পরিবাহনের উপায়,—ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে ভারী কাষ্ঠ পরিবহনের জন্য হস্তীর সাহায্য লওয়া হয় (৭১ নং চিত্র দেখ)। নিম্নে পরিবহনের কয়েকটি প্রধান উপায় নির্দেশ করা যাইতেছে ;—

১। রাস্তা
২। দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ
৩। রেলপথ ও ট্রামপথ
৪। সমুদ্রপথে জাহাজাদি
৫। আকাশপথে আকাশযান

১। রাস্তা

রাস্তা প্রধানতঃ তিন প্রকার,—(১) **প্রধান-প্রধান রাজপথ**—এগুলি দেশের, বা প্রদেশের বা জেলার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। (২) এই সকল রাজপথে আসিবার জন্য এবং ইহাদের পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে বাণিজ্যসম্পদ্ এই রাজপথের উপর অবস্থিত বাণিজ্যস্থলে আনিবার জন্য যে-পথগুলি থাকে, তাহাদের বলা হয় **শাখাপথ**। ইহারা বহুদূর হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য বা যাত্রিগণকে বড় রাস্তায় আনে বলিয়া ইহাদের বলা হয় যোগানদার পথ বা **পোষক পথ** (feeder road)।

রাজপথ দিয়া লরী, মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং গরু বা মহিষের গাড়ী যাতায়াত করে। কিন্তু শাখাপথ সঙ্কীর্ণ,—সেজন্য ইহার উপর দিয়া গরু-মহিষের গাড়ীই প্রধানতঃ চলে। আবার গ্রামের মধ্যে গরুর গাড়ীও চলিতে পারে না,—এমন ছোট রাস্তাও আছে। মাঠের উপর দিয়া মানুষ পায়ে হাঁটিয়া এই সকল পথ অনায়াসে সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের বলে **মেঠো পথ**। ইহার উপর গাড়ী চলে না,—মানুষের মাথায় বা জন্তুর পিঠে মাল চাপাইয়া ইহার উপর দিয়া মাল-পরিবহন-কার্য সম্পাদিত হয়।

স্থায়ী বড়-বড় রাজপথে এখন মোটর লরী রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক দেশেই রেলপথ বহুবিস্তৃত নহে,—দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম্য পরিবেশে বহুস্থানে রেলপথ নাই। এ-সকল স্থানে এখন মোটর লরীতে মাল সরবরাহ চলিতেছে ও মোটর বাসে যাত্রী যাতায়াত করিতেছে। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও দেশের অভ্যন্তরে এখনও মোটর লরীযোগে মাল যাতায়াত করে।

উপরি-উক্ত বিবরণ স্মরণ রাখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, **রাস্তার সুবিধা** অনেক,—(১) রাস্তা থাকিলে মোটর গাড়ী ও মোটর লরী তাহার উপর দিয়া যাত্রী ও মাল বহন করিয়া রেলগাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে ;

(২) রেলগাড়ীতে যে-সকল যাত্রী বা মাল আসে, শাখাপথগুলি তাহারই পোষক পথ (feeder road) ;

(৩) গ্রামাঞ্চলে রেলপথ প্রায়ই থাকে না ; সেখানে রাস্তাযোগেই পরিবহন-কার্য চলে। রাস্তার উপর দিয়া পশুচালিত গাড়ী ও মোটর গাড়ীতে, এবং মানুষের দ্বারা ও পশুপৃষ্ঠে কিছু-কিছু পরিবহন চলে। রাস্তা না থাকিলে এই সকল গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে পারিত না। রাস্তা থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কষ্টকর হয়। বাণিজ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান অসম্ভব হয়। সেজন্য উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহারা কোন মূল্যই পায় না।

(৪) দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য দেশের মধ্যে সুরক্ষিত রাস্তার বিস্তৃতি দরকার।

(৫) কৃষিপ্রধান দেশেও রাস্তার প্রয়োজনীয়তা বেশী। তাহা না হইলে ফসল গৃহে বা বাজারে লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য হয় না।

(৬) শিল্পের উন্নতির জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ দরকার। কারণ, তাহা না হইলে শিল্পের উৎপাদন-স্থান ও বিক্রয়-স্থানের মধ্যে যোগাযোগ থাকে না।

(৭) রাস্তাঘাট না থাকিলে কোন দেশেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হয় না।

(৮) জ্ঞানবিস্তারের পক্ষেও রাস্তাঘাটের বিশেষ দরকার।

(৯) সৈন্য-চলাচলের জন্যও রাস্তাঘাটের বিশেষ প্রয়োজন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাস্তাঘাট

আ. যুক্তরাষ্ট্র	৩,৪১৮,২১৪ মা.	জার্মানি (প.)	৮১,৫৪৭ মা.
ফ্রান্স	৪০৭,২১৬ মা.	পাকিস্তান	৬০,২৬০ মা,
যুক্তরাজ্য	১৯০,১২৮ মা.	ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৩১৬,৬৬৮ মা.

বিভিন্ন দেশের রাস্তাঘাটের তুলনা

রাস্তার দৈর্ঘ্য হিসাবে বিভিন্ন দেশের তুলনা করিলে দেখা যায় প্রত্যেক বর্গমাইলে

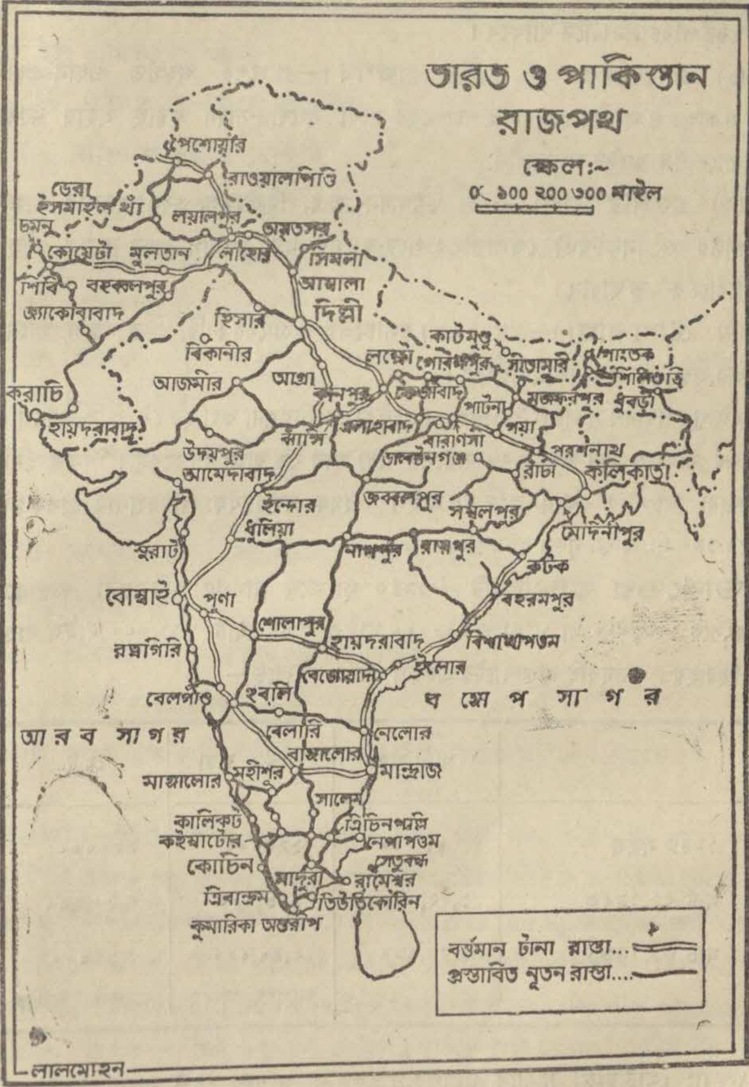
পাকিস্তানে	০'১৭ মা.	আ. যুক্তরাষ্ট্রে	১'০০ মা.
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে	০'২৫ মা.	ফ্রান্সে	১'৯০ মা.
জাপানে	০'৬১ মা.	যুক্তরাজ্যে	২'১০ মা
জার্মানিতে	০'৮৬ মা.		

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাঘাট

ভারতের বর্তমান রাস্তাঘাট প্রকৃতপক্ষে পাঠান ও মোগল সম্রাট্‌গণের নির্মিত রাস্তার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি পড়ে। লর্ড ডালহৌসির সময়ে জলপথ ও স্থলপথ—দুইই নির্মিত হইতে থাকে। তাহার পরেও রাস্তাঘাটের কিছু-কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রেলপথ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিলেও রাস্তাঘাট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের হাতে ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আবার জেলাবোর্ড ও লোকালবোর্ডের হাতে উহার ভার দিয়া দায়মুক্ত ছিলেন। অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধকালে রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। রাস্তা আছে, কিন্তু মোটর চলে না,—এক রাস্তার সহিত আর এক রাস্তার সংযোগ নাই,—নদীর উপর সেতু নাই, শীতকালে যেখানে পথ আছে, বর্ষায় সেখানে পথের চিহ্ন নাই—এইরূপ নানা অসুবিধা পরিলক্ষিত হইল। সেজন্য যুদ্ধের সময় বহু ব্যয়ে আবশ্যকীয় রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইল, এবং যুদ্ধান্তে রাস্তার উন্নতি করার দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়াকর কমিটির উপদেশানুসারে প্রতি গ্যালন পেট্রলের উপর দুই আনা ট্যাক্স ধরিয়া ঐ টাকায় এক কেন্দ্রীয় রাস্তা-তহবিল (Central Road Fund) স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সেই তহবিল হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে রাস্তার জন্য অর্থসাহায্য করা হইতে লাগিল।

নাগপুর পরিকল্পনা।—১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে যে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সমস্ত রাস্তা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়,—(১) জাতীয় রাজপথ



১১৮ নং চিত্র।

(National Highways), (২) প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ (Provincial or State Highways), (৩) জেলার রাস্তা, (৪) গ্রাম্য রাস্তা।

(১) **জাতীয় রাজপথ**।—এই রাস্তা রাজধানী, বড়-বড় সহর, বন্দর, বিভিন্ন স্থানীয় এ রাষ্ট্র-বহির্ভূত রাস্তার যোগসাধন করিবে। প্রদেশে-প্রদেশে রাস্তার ইহাই হইবে যোগসূত্র,—মূল শিরা। সৈন্ত-চালনার ইহাই হইবে প্রধান পথ। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিবে।

(২) **প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় রাজপথ**।—প্রদেশের অন্তর্গত প্রধান-প্রধান স্থান ও রাস্তা ও জাতীয় রাজপথের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-সাধন করাই ইহার কার্য। ইহা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের শাসনাধীন।

(৩) **জেলার রাস্তা**।—ইহা উৎপাদন-ক্ষেত্র, বিক্রয়স্থল, এবং জেলার প্রধান স্থানগুলির ও নিকটবর্তী জেলাগুলির সদর-স্থানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ইহা, জেলাবোর্ডের কর্তৃত্বাধীন।

(৪) **গ্রাম্য রাস্তা**।—গ্রামের মধ্যে চলাচলের ও গ্রামের চারিদিকের গন্তব্য স্থানের সুবিধার জন্য এই রাস্তা নির্মিত হইবে।

নাগপুর পরামর্শ সভায় (Conference) ইহাও পরিকল্পনা করা হয় যে, কৃষি-অঞ্চলে ৫ মাইলের মধ্যে ও অন্য অঞ্চলে ২০ মাইলের মধ্যে সদর বড় রাস্তা থাকিবেই। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুসারে কোন কাজ হয় নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ১৯০ মা. রাস্তা নূতন হইয়াছে।

ভারতের রাস্তাঘাট।—১৯৪৩ খৃঃ অব্দে নাগপুর পরিকল্পনা অনুসারে ২০ বৎসরে ১২৩,০০০ মা. পাকা ও ২০৮০০০ মাইল কাঁচা মোট ৩৩১,০০০ মাইল রাস্তা করা স্থির হয়। তদবধি রাস্তাঘাটের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে—

	পাকা রাস্তা	কাঁচা রাস্তা	মোট
১৯৪৩ সালে	৮৮০০০	১২৩০০০	২২০০০০
মার্চ ৩১, ১৯৫৬	১,২২,০০০	১৯৮,০০০	৩,২০,০০০
মার্চ ৩১, ১৯৬১	১,৪৪,০০০	২,৫০,০০০ অপেক্ষা অধিক	৩,৯৪০০০ অপেক্ষা অধিক

সুতরাং মোট রাস্তা হিসাবে নাগপুর পরিকল্পনা অপেক্ষা বেশী রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

জাতীয় রাজপথ।—উপরি-উক্ত রাস্তাগুলির মধ্যে জাতীয় রাজপথ ধরা হইয়াছে। জাতীয় রাজপথ নিম্নলিখিত রাজপথগুলি লইয়া গঠিত—

(১) **কলিকাতা হইতে অমৃতসর**—ইহার নাম **গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড**;—কলিকাতা হইতে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লী হইয়া খাইবার গিরিপথের জামরুদ পর্যন্ত দীর্ঘ। কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্যন্ত ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। অবশিষ্ট অংশ ইহা পাকিস্তানের অন্তর্গত।

(২) **কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ**

(৩) **মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাই**

(৪) **বোম্বাই হইতে দিল্লী**

এই চারিটি পথের মোট দৈর্ঘ্য ৫,০০০ মাইল

(৫) কলিকাতা হইতে বোম্বাই

(৬) বারাণসী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ (কানপুর, হায়দারাবাদ, কুর্ণুল ও বাঙ্গালোরের মধ্য দিয়া)

(৭) আগ্রা হইতে বোম্বাই

(৮) আমেদাবাদ হইতে কাণ্ডলা বন্দর (অসম্পূর্ণ)

(৯) আম্বালা হইতে তিব্বত সীমান্ত (সিমলার মধ্য দিয়া)

(১০) দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ

(১১) লক্ষ্ণৌ হইতে মজঃফরপুর হইয়া বারাউনি

(১২) আসাম যাওয়ার রাস্তা

(১৩) আসাম ট্রাঙ্ক রোড (মণিপুরের ভিতর দিয়া একশাখা ব্রহ্মদেশে গিয়াছে।)

গাড়ী।—কাঁচা ও পাকা—উভয় রাস্তার উপর দিয়া গরুর গাড়ী ও ঘোড়া বা উটের গাড়ী চলে, এবং পাকা রাস্তার উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—মোটর গাড়ী ছিল ৪৯৮,৭১৩ অর্থাৎ প্রতি লক্ষ ভারতবাসীর জন্য ৮৯ খানি গাড়ী। তন্মধ্যে মোটর সাইকেল ৫৬,৪৫০, মালগাড়ী ১৩৪,৮০৬, বেসরকারী পরিবহন গাড়ী (Private Cars) ২১০,৪৫৮, সরকারী গাড়ী (Public Service Vehicles) ৪১,৯০৮, জিপ ১৭,১৭৪, মোটরে চলা অন্য গাড়ী ১৪৯৮৯, মোটর রিক-স ৩,৫৯০, অন্যান্য—২৯,৯১৪। ১৯৬০ সালে ভারতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা এইরূপ—মোটর সাইকেল—৬৯,৩৬৪, মোটর রিক্-স ৪৯৬০, জীপগাড়ী ২৬২৯০, জনসাধারণের মোটর গাড়ী ২,৪০,৩৭০, গবর্ণমেন্ট সার্ভিসের গাড়ী ৫০৭৬৭, মোটর কার ১৮১৪৮, মালটানা গাড়ী ১৫২৯৩৮, নানাপ্রকার গাড়ী ৩৫৫৪৭।

২। দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ

দেশের অন্তর্বর্তী নদী, খাল ও হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া নৌকা ও স্টিমার প্রভৃতির যোগে পরিবহন-কার্য সম্পাদিত হয়। ইহার নানা সুবিধা আছে—এইরূপ জলপথে পরিবহন অল্পব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক ;—কারণ, পণ্যদ্রব্য ইহাতে ভালভাবে রাখা যায়, অনবরত নড়াচড়ার জন্য তাহার ক্ষতি হইতে পারে না। তাছাড়া, রেলপথ নির্মাণের জন্য যেমন অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়, জলপথের জন্য তাহা হয় না। তবে জলপথে যাতায়াত করিতে অনেক সময় লাগে,—এবং কখন কোথায় পৌঁছিবে তাহা খুব নিশ্চয়ভাবে বলা যায় না।

নদী ও খাল।—ব্যবসা-বাণিজ্যে নদী বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্বেই বলিয়াছি, জলপথে দ্রব্যাদি সুলভে ও স্বচ্ছন্দে আমদানি-রপ্তানি করা যায়। তবে কোন দ্রব্য বহু দূর লইতে হইলে বহু সময় লাগে, এবং ফল প্রভৃতি কাঁচা মাল হইলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী। পরিবহন-কার্যে নদীর উপযোগিতা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার—

(১) নদীর গভীরতা বেশী হওয়া দরকার।

(২) সারা বৎসরই পরিবহন চালাইতে হইলে নদীর বরফমুক্ত হওয়া দরকার।

(৩) নদীর মোহানা বরফমুক্ত থাকা প্রয়োজনীয়।

উত্তর মহাসাগর বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার নদীগুলির নিম্নাংশ নৌবাহনোপযোগী নহে।

(৪) নদী যেন খরস্রোতা না হয়, এবং ইহার গতিপথে ইহা যেন কোন প্রপাতের সৃষ্টি না করে। ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক।

আফ্রিকার নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা এবং তাহা স্থানে-স্থানে প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। সেজন্য সেখানকার নদীতে বেশীদূর নৌ-বাহন সম্ভব নহে।

(৫) নদীতে সারা বৎসরই প্রচুর জল থাকা দরকার।

(৬) ঘনবসতিপূর্ণ এবং খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ সম্পদপূর্ণ অঞ্চলের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে সেই নদীর উপযোগিতা বেশী। ইহাতে সেই অঞ্চলের বাণিজ্যের বৃদ্ধি হয়।

দেশের মধ্যে সহজে সর্বত্র জলপথে যাতায়াতের সুবিধা ও বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য অনেক দেশে নদীগুলি খালদ্বারা যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ইউরোপ অগ্রণী।

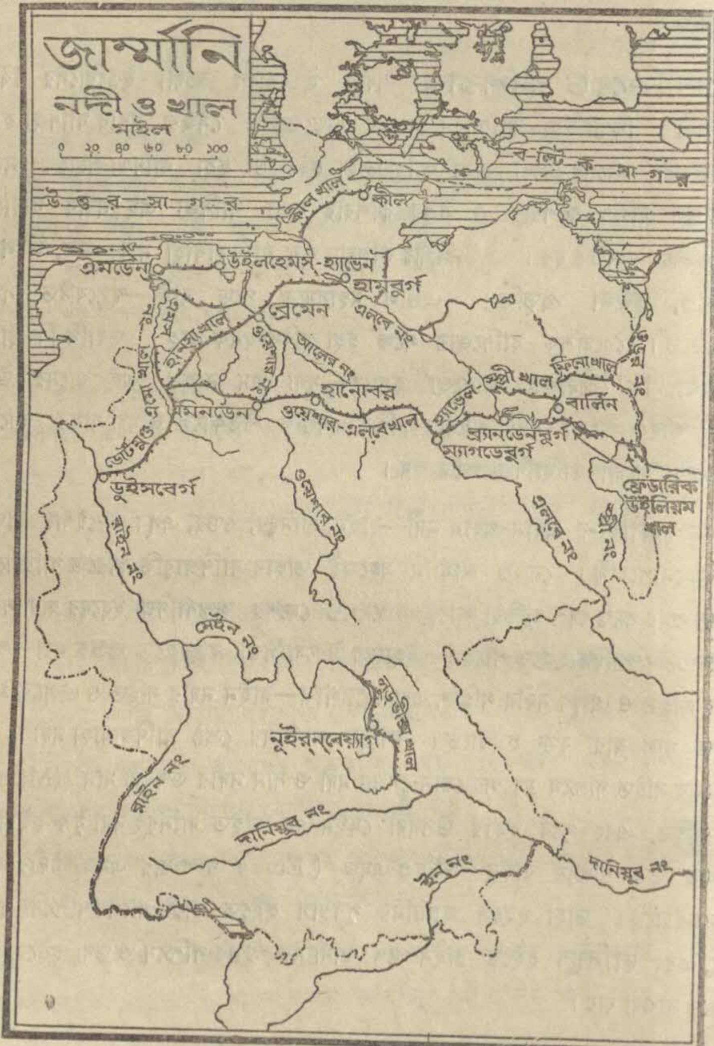
ইউরোপে সোভিয়েট রুশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি তাহাদের নদীগুলি খালদ্বারা সংযুক্ত করিয়া যাতায়াতের পথ সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত করিয়াছে।

সোভিয়েট রুশিয়ার অধীন ইউরোপে **ভল্গা** ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহৎ নদী। কিন্তু ইহা কাস্পিয়ন সাগরে পড়িতেছে। সেজন্য ইহার বাণিজ্য ইহার সন্নিকটবর্তী অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহা হইলেও ইহা বাণিজ্য-সহায়ক নদী। ইউরোপে দক্ষিণ রুশিয়ার ও উত্তর রুশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য এই নদীর মাধ্যমেই বিশেষভাবে সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্য বাণিজ্যবাহী নদী—**ডন, নীপার, নীস্টার, ডুইনা** প্রভৃতি। এগুলি মহাসমুদ্রে পড়ে নাই,—স্থলবেষ্টিত সমুদ্রে পড়িতেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক নহে। তথাপি কি স্থানীয় বাণিজ্যে, কি বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহাদের মূল্য কম নহে। এই স্থানের উত্তর দিকে আরও অনেক নদী আছে। কিন্তু সেগুলি শীতকালে জমিয়া যায়। কাজেই তাহাদের উপযোগিতা বাণিজ্যক্ষেত্রে কম।

জার্মানি-র প্রধান-প্রধান নদী—রাইন, দানিয়ুব, ওডর, এল্‌ব, ওয়েশার প্রভৃতি নৌবাহনোপযোগী। সেজন্য জার্মানি সহজেই তাহার বাণিজ্যবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে। ইহারা প্রায় সমস্ত দেশ জুড়িয়া আছে। সেজন্য দেশের অন্তর্বাণিজ্য ইহদের দ্বারা সহজে ও সুলভে সম্পাদিত হইতে পারে। ইহাদের উপযোগিতা বাড়াইতে **ওডর** নদী—**স্প্রী** নদীর সহিত ও **এল্‌ব** নদীর সহিত, এবং **ওয়েশার**—রাইন নদীর সহিত ও **এল্‌বে** নদীর সহিত খাল দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। **রাইন** জার্মানির শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবাহী নদী। এই রাইনের সহিত পশ্চিমে ফ্রান্সের রোন-সেওন নদী ও সীন নদীর উপনদী মার্ন (Marne)-এর সহিত, এবং পূর্বে ইহার উপনদী মেইন-এর সহিত দানিয়ুব নদী যুক্ত হইয়াছে। আবার উত্তর-পশ্চিমে রাইন—ডর্টমুণ্ড-এম্‌জ্ (Ems) খাল দ্বারা এম্‌জ্ নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে জার্মানির পূর্বভাগ হইতে খালে-খালে পশ্চিমে যাওয়া যায়, এবং **দানিয়ুব** হইতে রাইন-পথে জার্মানির উত্তর-পশ্চিমে ও তথা হইতে উত্তর সাগরে যাওয়া যায়।

জার্মানির পূর্ব সীমানায় ওডর বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে এবং মধ্যভাগে এল্‌ব উত্তর সাগরে পড়িতেছে। কিন্তু বাল্টিক সাগর শীতকালে কিছুদিন বরফাচ্ছন্ন থাকে। তাই এই অঞ্চলের রপ্তানি-দ্রব্য এল্‌বের উপরিস্থ হাম্বুর্গের ভিতর দিয়া কীল বন্দরে পৌছায় এবং কীল খালের ভিতর দিয়া উত্তর সাগরে পৌছে। এই কীল খাল বাল্টিক সমুদ্র ও উত্তর সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। রাইন হলাণ্ডের ভিতর দিয়া

উত্তর সাগরে পড়িতেছে। এই সকল নদী অবলম্বন করিয়া পরিবহন-ব্যবস্থা এত সুন্দর হইয়াছে যে, জার্মানির অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং



১১৯নং চিত্র।

নদীগুলির উপর বড়-বড় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

ফ্রান্সের নদীগুলির মধ্যে **সীন, লয়ার, গ্যারোন, ডোর্ডোনি, রোন-সেওন** নদীগুলি প্রধান। এগুলিরও বহুদূর নৌ-বাহনোপযোগী। সেজন্য এখানেও নদী-

যোগে পরিবহন-কার্য জার্মানি অপেক্ষা কম সুবিধাজনক নহে। আবার এই সকল নদী খাল দ্বারা যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ফ্রান্সের পণ্য জলপথে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাঠাইতে হইলে ইহার জিব্রাল্টর প্রণালী ঘুরিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়া তবে দক্ষিণ ফ্রান্সে পৌছিতে হইত। সীন নদীর উপনদী **ইওন** (Yonne), ও **সেওন** যোগ করিয়া যে বার্গাণ্ডি খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে উত্তর ফ্রান্স হইতে সহজে দক্ষিণ ফ্রান্সে যাওয়া যাইতেছে।

গ্রেটব্রিটেনের টেম্‌স্‌, ট্রেণ্ট, মার্সে, আউস, হাম্বার ও সেভার্ণ প্রভৃতি নদীতে সারা বৎসরই জলপথে নৌ-চলাচল সম্ভব। এই নদীগুলির মধ্যে কোন-কোনটি খাল দ্বারা যুক্ত করিয়া তাহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ৩৫ মাইল দীর্ঘ **মাঞ্চেষ্টার খাল** দিয়া পণ্যবাহী জাহাজ একেবারে মাঞ্চেস্টার পৌছিতে পারে।

গ্রেটবৃটেনের প্রধান-প্রধান খাল—(১) লণ্ডন ও বৃস্টলের মধ্যে **কেনেট ও আভন** খাল, (২) লিভরপুল ও হালের মধ্যে **ট্রেণ্ট ও মার্সে** খাল, (৩) ইয়র্কশিয়ার-আউস ও মার্সে নদী যোগ করিয়া ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ইয়র্কশিয়ারের মধ্যে **লীড্‌স্‌ ও লিভরপুল খাল,** (৪) মাঞ্চেস্টর **জাহাজ যাতায়াতের খাল** ও (৫) মাঞ্চেস্টর জাহাজবাহী খালের জাহাজের ভিড় কমাইবার জন্য ছোট জাহাজের উপযোগী মার্সে নদীর মুখ হইতে মাঞ্চেস্টার পর্যন্ত **ব্রিজওয়াটার** (Bridgwater) খাল প্রভৃতি।

স্কটলণ্ডের ফোর্থ ও **ক্লাইড্‌** খাল ইহার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছে। স্কটলণ্ডের সুবিখ্যাত ক্যালিডোনিয়া খাল দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে যাতায়াত করা যায়।

উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা ও **আ. যুক্তরাষ্ট্রের** মধ্যে **সুপিরিয়র, মিচিগণ, হিউরন, ঈরি** ও **অণ্টারিও** নামে পাশাপাশি অবস্থিত যে "পঞ্চহ্রদ" আছে তাহাদের মধ্যে মিচিগন ব্যতীত অপর চারিটি দুই দেশেরই অধিকারভুক্ত। আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পক্ষে ইহাদের উপকারিতা অবর্ণনীয়। **সেণ্ট লরেন্স** নদী ইহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া আটলাণ্টিক হইতে এই মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ইহাই শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ। এই হ্রদ-অঞ্চলে খনিজ সম্পদ্‌ প্রচুর। আ. যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কয়লা-খনি এই হ্রদ-অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চলের কয়লা, লৌহ ও কৃষিদ্রব্য অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে নানা শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার, এই অঞ্চলটি ক্যানাডার কৃষিভূমির সন্নিকটে অবস্থিত। কুইবেক ও অণ্টারিও ইহাদেরই তীরে অবস্থিত। এই দুই প্রদেশে পশুপালন হয়। সুতরাং লোম, চামড়া ও মাংস প্রভৃতি পশুজাত দ্রব্যাদি এবং এই দুই দেশের খনিজ সম্পদ্‌ ও গম এই হ্রদগুলির উপর দিয়া রপ্তানি করা হয়। আমদানি

বস্তুও এই হ্রদপথে দেশের অভ্যন্তরে যায়। সেন্ট লরেন্সের মুখ হইতে সুপিরিয়র হ্রদ পর্যন্ত এই নদী ২৫০০ মা. দীর্ঘ। এই পথে সুয়েজ কিংবা পানামা খাল অপেক্ষা বেশী ওজনের (মূল্যের নহে) মাল যাতায়াত করে।

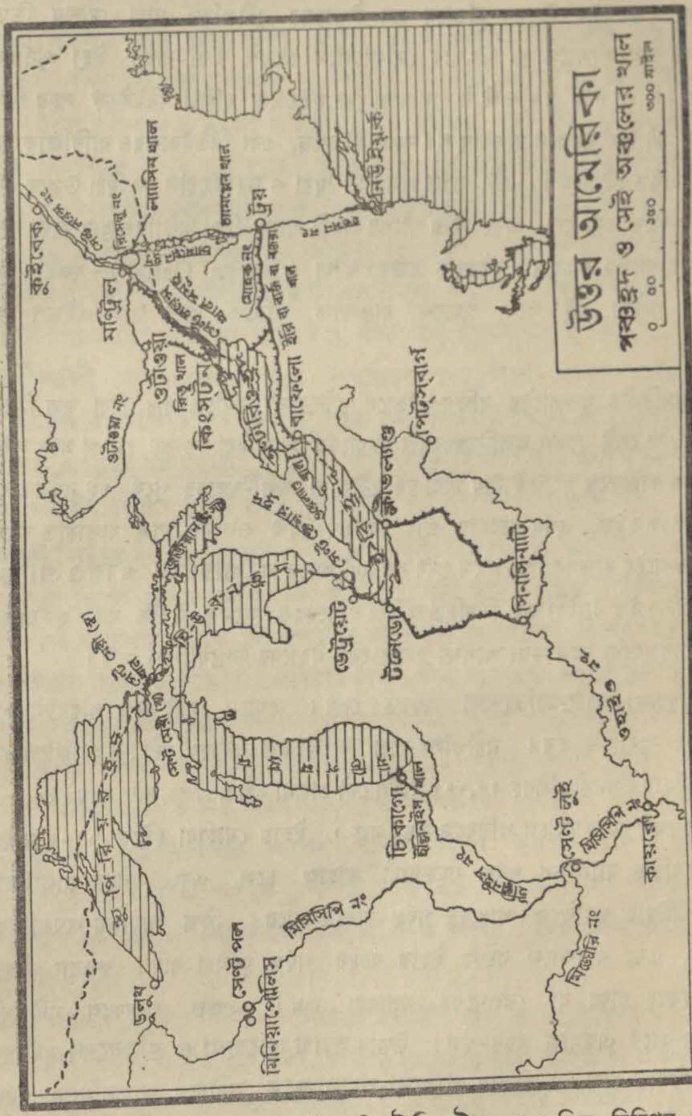
কিন্তু এই পথে অসুবিধাও আছে এবং তাহার যথাসাধ্য প্রতীকারও হইয়াছে। এই হ্রদগুলি বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত বলিয়া এক হ্রদের জল অন্য হ্রদে পড়িবার সময় প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল প্রপাতের স্থান এড়াইবার জন্য দুই উঁচু-নীচু হ্রদের মধ্যে খাল কাটিয়া জাহাজ চলাচলের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুপিরিয়র ও হিউরন হ্রদের মধ্যে আছে দুইটি **সেন্ট মেরী** খাল; ইহারা সু (Soo) খাল * নামে পরিচিত। হিউরন ও ঈরি হ্রদের মধ্যে সেন্ট ক্লেয়ার নামক প্রস্তরগর্ভ হ্রদের উপর দিয়া যাইবার জন্যও খাল আছে। ঈরি ও অন্টারিও হ্রদের মধ্যে নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে এড়াইবার জন্য আছে **ওয়েল্যাণ্ড** (Welland) খাল। অন্টারিও হ্রদের উত্তর ভাগের তীরবর্তী সহর কিংসটন হইতে ক্যানাডার ওটায়া সহর পর্যন্ত আছে **রিডু খাল**। অন্টারিও হ্রদ ও মন্ট্রিল সহরের মধ্যে সেন্ট লরেন্স নদীতে খরস্রোত (rapids) ও প্রপাত প্রভৃতির জন্য বড় জাহাজ আসিতে পারে না। এই সকল খরস্রোত অতিক্রম করিবার জন্য এখানে অনেক খাল আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান খাল—**ল্যাসিন খাল** (Lachine Canal)। মন্ট্রিল ও আট্‌লান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সমুদ্রগামী বড়-বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। এই খালগুলি পাঁচ মাস (ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল) বরফে আচ্ছন্ন থাকে। সেজন্য সে-সময় এই পথ বন্ধ থাকে এবং এইপথে অত্যন্ত কুয়াসা হয়। সেজন্য আলোর সাহায্যে তখন জাহাজ চালাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে খনিজ সম্পদে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এই হ্রদ-অঞ্চল অনন্যসাধারণ। পরিবহনের যত সুবিধা হইয়াছে ততই এ-অঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নতি হইয়াছে।

ক্যানাডার অন্য নদীগুলির দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সুবিধা হয় না,—তবে আঞ্চলিক সুবিধা কিছু হয়।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নদী **মিসিসিপি** ও **মিজৌরী**। সেন্ট লুই সহরের নিকট মিজৌরী মিসিসিপির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইটি নদীর মিলিত স্রোত ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ⅔ অংশের জল এই নদীতে ও ইহার উপনদীগুলিতে পড়ে। তাই ইহার একটা চলিত নাম "জলের রাজা"। মেক্সিকো উপসাগরে ইহার মুখ হইতে সেন্টপল পর্যন্ত ২০০০ মা. দীর্ঘপথ নাব্য। মিনিয়াপোলিস

* ইহার ফরাসী নাম Sault Ste Marie—ইহার বাংলা উচ্চারণ অনেকটা এইরূপ—সু সেঁৎ মেয়ারী। এজন্য ইহাকে "সু" খাল বলে।

ও সেণ্ট লুই-এর মধ্যে বাণিজ্য-দ্রব্যের পরিবহন অত্যন্ত বেশী। মিজৌরীর গতিপথ ২০০০ মা. নাব্য। সুতরাং এই দুই নদী আ. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বাণিজ্যবাহী নদী।



১২০নং চিত্র।

আবার, মিসিসিপির একটি ছোট্ট উপনদী **ইল্লিনইস**-এর সহিত মিচিগন হ্রদ খাল দ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। তাহাতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর হইতে সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়া প্রবেশ করিয়া হ্রদগুলির উপর দিয়া মিচিগন হ্রদে আসিয়া ইল্লিনইস-মিসিসিপি নদী দিয়া

ও মেক্সিকো উপসাগর দিয়া বাহির হওয়া যায়। মিসিসিপির উপনদী ওহাইও (Ohio) একটি শ্রেষ্ঠ কয়লাবাহী নদী।

আ. যুক্তরাষ্ট্রের উপর পূর্বভাগে নব ইংলণ্ডের নদীগুলির দ্বারা দেশের ভিতরে কতকদূর জাহাজ-যোগে ও তৎপরে নৌকাযোগে প্রবেশ করা যায়। ইহা পূর্বাঞ্চলে মোহক নদী ও ঈরি হ্রদ ও ঈরি খাল দ্বারা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া নিউইয়র্ক সহর হইতে হাডসন নদী দিয়া হ্রদপথে যাওয়ার পথ সহজ হইয়াছে, এবং নিউইয়র্কেরও বাণিজ্যিক মূল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই **হাড্‌সন নদী** দিয়া ও **চ্যামপ্লেন** হ্রদ দিয়া উত্তরে সেণ্ট লরেন্স নদীতে পড়া যায়, এবং ঈরি খালের একটি শাখা দিয়া অণ্টারিও হ্রদে পড়া যায়। এই ঈরি খালের এখন নাম হইয়াছে **বজরা খাল** (Barge Canal)—বজরার মত বড়-বড় নৌকা এই পথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারে তাই এইরূপ নাম হইয়াছে।

আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বভাগে **টেনেসী** নদীতে বাঁধ দিয়া জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং সেই সকল জলনিয়ন্ত্রণকারী কবাটের মধ্য দিয়া বড়-বড় নৌকা মাল লইয়া যাতায়াত করিতেছে। এই বাঁধ দিয়া হ্রদ সৃষ্টির ও জলনিয়ন্ত্রণের পূর্বে এই নদীতে যত মাল চলাচল হইত, এখন তাহার প্রায় বিশগুণ বেশী ওজনের মাল যাতায়াত করে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে দুর্ধর্ষ বড় নদী আছে **কলোরাডো** ও **রিও গ্রাণ্ডি**। খাল কাটিয়া বাঁধ বাঁধিয়া জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহাদেরও অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যদ্রব্য বহন করা অপেক্ষা জলসেচনেই ইহাদের উপযোগিতা বেশী।

দক্ষিণ-আমেরিকা অনুন্নত দেশ। এখানে নদীযোগে পরিবহন-কার্য প্রধানতঃ সংসাধিত হয়। নদীগুলির মধ্যে **আমাজন** সর্ববৃহৎ নদী;—বর্ষাকালে এই নদী ও ইহার উপনদীগুলিসহ ৫০,০০০ মাইল নৌ-চালনা সম্ভব, কিন্তু অন্য সময় ২০,০০০ মাইলের বেশী নৌকাযোগে পরিবহন সম্ভব নহে। ইহার মোহানা হইতে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত ম্যানাওস পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ চলে, এবং নদীতে চালাইবার উপযুক্ত স্টিমার আন্দিজের পাদদেশ পর্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু আমাজন-অববাহিকা বনাচ্ছন্ন, এবং বর্ষাকালে বন্যায় ইহার বহুদূর পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। সুতরাং ইহার অববাহিকায় রাস্তা বা রেলপথের সম্ভাবনা কম। এজন্য এ-অঞ্চলে নদীপথই পরিবহন-কার্যে একমাত্র ভরসা-স্থল। উত্তরে **ম্যাগ্‌ডালেনা** ও **ওরিনকো** নদীপথে বহুদূর স্টিমার চলে। দক্ষিণে **পারানা-প্যারাগুয়ে** নদীপথে আসানসিওন পর্যন্ত বড়-বড় স্টিমার চলে। আর্জেণ্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিলের বাণিজ্য এই পথে বিশেষভাবে চলে। আরও দক্ষিণে **রিও নেগ্রো** প্যাটাগোনিয়ার মেষচারণ অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থলে

মাথাপিছু এত মেষ প্রতিপালিত হয় যে, পৃথিবীতে কোথাও তাহার তুলনা নাই। রিও নেগ্রো অবলম্বনে এখানে মেষের ব্যবসায় বিশেষভাবে চলে।

আফ্রিকায় নীল শ্রেষ্ঠ নদী। নীলের বন্যায় তাহার উভয় পার্শ্ব শস্যশালিনী হইয়াছে। কিন্তু ইহা অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে যতদূর উপকারী বহির্বাণিজ্যের পক্ষে তত নহে। ইহার গতিপথে ব্লু নীলের সহিত মিলিত হইবার পরে উচ্চ হইতে নিম্নতর ভূমিতে গমনকালে ইহার ছয় স্থানে খরস্রোতের (Cataract) সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য খার্তুম হইতে আসোয়ান পর্যন্ত অংশ নৌ-বাহনোপযোগী নহে। এই স্থানে রেলপথ নির্মাণ করিয়া খরস্রোতগুলিকে এড়াইয়া যাওয়া হয়। এই নদীর মুখে ব-দ্বীপের মধ্যে স্টিমারাদি চলে। আফ্রিকার দ্বিতীয় প্রধান নদী **কঙ্গো**। কিন্তু ইহার গতিপথে নানাস্থানে খরস্রোতের সৃষ্টি হওয়াতে ইহা সর্বত্র নৌ-বাহনোপযোগী নহে। ইহার উপনদী **উবাঙ্গী** মোহানা হইতে ইহার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত অংশ নৌ-চালনোপযোগী। দক্ষিণ আফ্রিকার **জাম্বেজি** ২০০ মাইল পর্যন্ত নৌ-চালনোপযোগী। ইহারও গতিপথে ভিক্টোরিয়া প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকায় **নাইজার** নদীতে মোহানা হইতে প্রায় ৫০০ মাইল নদীপথে যাওয়া যায়। মধ্য আফ্রিকার হ্রদ-অঞ্চলে জাহাজ চলে।

অস্ট্রেলিয়ায় নদী বিশেষ নাই। মারে ও ডার্লিং কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী। কিন্তু ইহারা বিশেষ নৌ-বাহনোপযোগী নহে। সেজন্য অস্ট্রেলিয়াতে বাণিজ্য-দ্রব্য পরিবহন-কার্য সাধারণতঃ লরীযোগেই সম্পাদিত হয়,—নদীপথে বাণিজ্য বিশেষ হয় না।

এশিয়ার মধ্যে এশিয়াধীন সোভিয়েট-রুশিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই কয়টি দেশেরই জলপথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট-রুশিয়ায় **ওবি, ইনিসি, লেনা** এবং **আমুর** সাইবিরিয়ার নদী। প্রথম তিনটি নদীই উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে। সুতরাং ইহাদের মোহানা বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এজন্য ইহার উচ্চ অংশেই নৌ-বাহন চলে। **আমুর** মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়া ওখ্‌ট্স্ক্‌ সাগরে পড়িতেছে। ইহারও মুখ শীতকালে কিছুদিন বরফাচ্ছন্ন থাকে। **নিকোলেয়েভ্‌স্ক্‌** ইহার বন্দর। ইহার বৈকাল হ্রদের উপর জাহাজ চলে।

চীনের প্রধান নদী তিনটি—হোয়াং, ইয়াংসি ও সি (সি=পশ্চিম)। **হোয়াং-হো** (হোয়াং=পীত, হো=নদী) তিব্বতীয় মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া চীনের ভিতর দিয়া পোহৈ (চিলি) উপসাগরে পড়িতেছে। **উই-হো** ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপনদী। মোঙ্গলিয়া মরুভূমি হইতে লোয়েস্ নামক বালুকা উড়িয়া আসিয়া হোয়াং নদী-অঞ্চল ঢাকিয়া ফেলে এবং নদীগর্ভে অনবরত পড়িয়া তাহা উঁচু করিয়া দেয়। তখন দুইধারে বাঁধ বাঁধিয়া নদীকে যথাস্থানে রাখিতে হয়। বর্ষাকালে স্রোতের বেগে কখনও-কখনও

এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং বন্যার জল দুই কূলের বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত করিয়া ধ্বংসসাধন করে। এইজন্য এই নদী বিশেষ বাণিজ্যবাহী নদী নহে।

ইয়াংসি-কিয়াং (ইয়াংসি=স্বর্ণ, কিয়াং=নদী) মধ্যচীনের সৌভাগ্যের কারণ। এই নদী তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যচীনের সুসে-চুয়ান মালভূমির উপরিস্থিত লাল বালুকাময় রেড্ বেসিনের উপর দিয়া, এবং রেড্ বেসিনের সীমাস্থিত পর্বত ভেদ করিয়া চুংকিং হইয়া ইচাং পৌছিয়াছে। চুংকিং হইতে ইচাং পর্যন্ত বিপজ্জনক খরস্রোত আছে। তথাপি ইচাং হইতে চুংকিং পর্যন্ত নৌকা যায়। এই পর্যন্ত ইয়াংসি-নদীর **প্রথম অংশ**।

ইহার পরে ইয়াংসি—ইচাং হইতে সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া হান্-কৌ আসিয়াছে। ইহাই ইয়াংসির **দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ অংশ**। এখানে ইহার **হান্** উপনদী—কৃষিপ্রধান, বিশেষতঃ চা-প্রধান, অঞ্চল হইতে আসিয়া ইয়াংসি-র সহিত মিলিয়াছে। এই মিলন-স্থানে তিনটি শিল্পপ্রধান সহর আছে,—হান্-কৌ, হান্-ইয়াং, ও উচাং। ইচাং ও হান্-কৌর মধ্যে নৌকা ও স্টিমার চলে।

হান্-কৌ হইতে ইয়াংসি তাহার ব-দ্বীপের সমতলভূমির উপর দিয়া সাংহাই সহরের নিকট চীন সাগরে পড়িতেছে। ইয়াংসির মুখ হইতে এই হান্-কৌ পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ আসে, ইহাই ইয়াংসি অববাহিকার **তৃতীয় অংশ**। এই পূর্ব অঞ্চল হোয়াং ও ইয়াংসির সুবিস্তৃত নিম্ন সমতলভূমি। ইহা চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্র—এখানে কৃষিশস্য—ধান। ইয়াংসির ব-দ্বীপ হইতে তিয়েনসান পর্যন্ত এক খাল কাটিয়া যেমন কৃষিকার্যের উন্নতি করা হইয়াছে, তেমনি এই কৃষিদ্রব্যবহুল অংশে পরিবহনেরও সুবিধা করা হইয়াছে।

চীনগণতন্ত্রের দক্ষিণে সি কিয়াং। ইহা পশ্চিমে উয়ান মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সোজা পূর্বে গিয়া চীন সাগরে পড়িতেছে। এখানকার একই জমিতে বছরে তিনবার ফসল হয়। সুতরাং ইহা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এই নদীতে প্রায় আগাগোড়া নৌকা চলে।

ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নদী **ইরাবতী**। ইহা উত্তর-ব্রহ্মের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হইয়া ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত মার্টাবান উপসাগরে পড়িতেছে। ইহার প্রধান উপনদী **চিন্দুইন** উত্তর-ব্রহ্মের উত্তর-পশ্চিমে উৎপন্ন হইয়া মান্দালয় সহরের ৩০ মাইল দক্ষিণে ইরাবতীর সহিত মিশিয়াছে। উত্তরের অল্প অংশ বাদে ইহার অবশিষ্ট অংশ সমতলভূমির উপর দিয়া গিয়াছে বলিয়া, নদীমুখ হইতে ৯০০ মাইল দূরস্থ ভামো পর্যন্ত স্টিমার চলে। এই নদীর অববাহিকাই ব্রহ্মদেশের সমৃদ্ধিসম্পন্ন অংশ—ব্রহ্মের প্রধান খনিজদ্রব্য তৈল ও প্রধান কৃষিদ্রব্য ধান্য প্রভৃতি এই অঞ্চলেই বিশেষভাবেই জন্মে। তাই ইরাবতী ব্রহ্মদেশের প্রধান বাণিজ্যবাহী নদী।

ব্রহ্মের আর একটি নদী **সিতাং** ইরাবতীর পূর্বে ধান্য-প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত, এবং **সালউইন** তিব্বতের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সান মালভূমির উপর দিয়া মার্টাবান উপসাগরে পড়িতেছে। ব্রহ্মের এই নদীগুলির উপর দিয়া নৌকাযোগে ধান্য প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য, তৈল প্রভৃতি খনিজদ্রব্য ও বনাঞ্চলের সেগুণ কাষ্ঠ প্রভৃতি অনবরত বিদেশে চালান যাইতেছে।

থাইল্যাণ্ডের মধ্যে তিনটি নদী আছে—পূর্বে **মেকং**, মধ্যভাগে **মেনাম**, আর ব্রহ্মদেশের সালউইন ইহার পশ্চিমে কতকদূর প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদীপথে ধান্য প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য এবং বনজ কাষ্ঠাদি রপ্তানি করা হয়।

পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে প্রধান নদী **সিন্ধু**, এবং পূর্বাংশে প্রধান নদী **গঙ্গা** (পদ্মা), **ব্রহ্মপুত্র** ও **মেঘনা** এবং তাহাদের উপনদীগুলি। সমগ্র পাকিস্তানের জলপথ মাত্র ৫ হাজার মাইল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গেই ৪৫০০ মাইল। পূর্ব-পাকিস্তানের নদীতে ছোট-বড় নানাপ্রকারের নৌকা, স্টিমার, ও নদীমুখে জাহাজ চলে। এই নদীপথে বৎসরে ১ কোটি যাত্রী এবং ৫০ লক্ষ টন মাল যাতায়াত করে। চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে এবং নারয়ণগঞ্জ ও চালনার মধ্যে প্রধানতঃ পাট ও অন্য পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া পোতবহর (flotilla) যাতায়াত করে। এক্ষণে কলিকাতা হইতে আসাম বা বিহারে যে-স্টিমার যাতায়াত করে, তাহার কতকদূর পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার অংশ দিয়া যাইতে হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জলপথ

ভারতবর্ষে বহু নদী থাকিলেও প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুই সমগ্র ভারতের সর্বপ্রধান বাণিজ্যবাহী নদী ছিল। এই তিন নদী বর্ষায় বৃষ্টির জলে ও গ্রীষ্মে বরফ-গলা জলে পরিপুষ্ট থাকে বলিয়া ইহারা সারা বৎসরই নৌচালনোপযোগী। ইহাদের মধ্যে সিন্ধুর কতকাংশ এখন পাকিস্তানে পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষে যে-সকল নৌবাহনোপযোগী নদীপথ আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইল। ইহাদের মধ্যে প্রধান নদীপথগুলি—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের উপনদী,—গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তাহাদের খালগুলি, কেরলের বিল ও তাহাদের খাল, মাদ্রাজের অন্ধ্র ও মাদ্রাজ রাজ্যের বাকিংহাম খাল। পশ্চিম উপকূলস্থ খালগুলি ও উড়িষ্যার মহানদীর খালসমূহ।

বর্তমানে ১৫৫৭ মাইল নদীপথে যন্ত্র-চালিত স্টিমারাদি চলে এবং ৩৫৮৭ মাইল পথে বড়-বড় দেশী মাল্লাবাহিত নৌকা চলে।

এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য পাট ও চা সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থপ্রসূ পণ্য। সেইজন্য এই জলপথও ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবাহী জলপথ। দেশী নৌকা এই পথে বাণিজ্যের প্রধান পরিপোষক,—ইহা দূরদূরান্তর হইতে পণ্যদ্রব্য স্টিমারে, জাহাজে ও বন্দরে পৌঁছাইয়া দেয়।

কলিকাতা হইতে ব্রহ্মপুত্র-পথে আসামের অন্তর্গত ডিব্রুগড় পর্যন্ত, এবং কলিকাতা হইতে গঙ্গাপথে পাটনা পর্যন্ত পথ দুইটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ জলপথ। প্রথমটির দৈর্ঘ্য ১১৭৫ মাইল এবং দ্বিতীয়টির ৯২০ মাইল। এই দুই পথে বহুদিন জাহাজ চলিতেছে। ইহাদের আবার শাখাপথও আছে। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারত-বিভাগের ফলে এই জলপথের কোন-কোন অংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়াছে। সেজন্য ভারত-বিভাগের পরে প্রথমে জাহাজ-চালনায় কিছু-কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজ-কোম্পানীগুলির চেষ্টায় কালোপযোগী মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে আর কোন গোলযোগ নাই।

উত্তর-ভারতে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর খালপথ আছে। এই সকল খালপথে ও নদীপথে বহুলভাবেই নৌকা চলাচল হয়। কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানীর ১২% অংশ মালের যাতায়াত বেশীর ভাগ নৌকাযোগেই হইয়া থাকে। নৌবাহন জলপথ আসামে ৯২০ মাইল, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৭ মাইল, বিহারে ৭১৫ মাইল, উত্তরপ্রদেশে ৭৪৫ মাইল।

দক্ষিণ-ভারতে—খালপথই জলপথ। দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলি মালভূমির নদী—বর্ষাকালে ইহাদের স্রোত প্রবল হয়, গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। সেজন্য এ-অঞ্চলের নদীগুলি নৌচালনার বিশেষ উপযোগী নহে। ইহাদের মোহনায় ও নিকটবর্তী অংশে মাত্র নৌবাহন চলে। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও মহানদী-পথে নৌকা-চলাচল কিছু পরিমাণে আছে। কিন্তু মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের গোদাবরী খাল, ডাম্মাগুডান খাল, কৃষ্ণা খাল, বাকিংহাম খাল, কুর্নুল খাল, কেরলের বিলের মধ্যস্থ খাল, উড়িষ্যার মহানদী খাল প্রধান বাণিজ্যবাহী জলপথ।

গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপের খালগুলি এ-অঞ্চলে প্রধান জলপথ। পশ্চিম উপকূলে কেরলের নিম্নে যে-বিল আছে, এই বিলের উপর দিয়া খাল কাটিয়া সেই খালপথে সমুদ্রে মাল লইয়া জাহাজ বোঝাই করা হয়।

বলাবাহুল্য,—নদীপথের ও খালপথের যাত্রীসংখ্যা বা পণ্যের পরিমাণ করা যায় না। তবে জাহাজ-কোম্পানি যে-যাত্রী ও মাল বহন করে তাহার কিছু হিসাব থাকে। ইহাদের হিসাবমতে জানা যায় ইহারা বৎসরে ১ কোটি যাত্রী ও পণ্যের ৭৫ শতাংশ বহন করে। কোন-কোন খালপথে যে-শুল্ক আদায় হয়, তাহা হইতেও কিছু যাত্রী ও পণ্যের হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু দেশী-নৌকা-বাহিত যাত্রী বা পণ্যের কোন হিসাব

পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায়,—এক-শতাংশ যাত্রী ও মাল দেশী নৌকায় বাহিত হয়।

ভারতের প্রদেশগুলির সীমানার মধ্যে যে-নদী থাকে বা কোন নদীর যতটুকু থাকে তাহার বিধি-ব্যবস্থা তাহারাই করে। কেবল যে-নদীগুলি জাতীয় নদী বলিয়া বিজ্ঞাপিত তাহার বিধি-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ইহাতে খুবই অসুবিধা হয়। কোন নদীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হয় না। এজন্য ১৯৫২ খৃ. অব্দে উত্তর-ভারতের জন্য (Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র জলপথ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নদী-বাণিজ্য একই নিয়মে পরিচালনার জন্য ইহার সৃষ্টি।

এক্ষণে ভারতে নৌবাহনোপযোগী জলপথ :

উত্তরপ্রদেশ	৭৪৫ মা.	আসাম	৯২০ মা.
বিহার	৭১৫ মা.	উড়িষ্যা	২৮৭ মা.
পশ্চিমবঙ্গ	৭৭৭ মা.	মান্দ্রাজ ও অন্ধ্র	১৭০০ মা.
		মোট	৫১৪৪ মা.

এই সংখ্যা প্রধানতঃ যে-পথে স্টিমার ও বড়-বড় নৌকা চলে তাহাই নির্দেশ করিতেছে।

৩। রেলপথ (Railways)

সভ্য জগতের সর্বত্রই রেললাইন জালের মত ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেলপথ নির্মাণে প্রাথমিক খরচ কিছু বেশী, এবং রেলপথ রক্ষণের জন্যও খরচ কম নয়। রেলরাস্তা তৈয়ার করিতে যাইয়া কখনও বা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিতে হয়, কখনও বা পাহাড় ভেদ করিয়া লাইন লইয়া যাওয়া হয়, কখনও বা জমি ভরাট করিয়া সাধারণ উচ্চতা অপেক্ষা রেলপথ উঁচু করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় এই সকলের খরচ কম নহে। তারপর মাঝে-মাঝে রেলগাড়ী থামিবার ব্যবস্থা করিতে অগণিত স্টেশন করিতে হয়। রেলপথের দুই ধারে টেলিগ্রাফের তার ও টেলিফোন তার লইয়া যাইতে হয়। রেলপথের জন্য প্রয়োজন লৌহবর্ত্ম, কাঠের স্লিপার ও পাথরের নুড়ি। এইগুলি সকল সময় প্রস্তুত রাখিতে হয়। এই খরচের সহিত রেলগাড়ীর যাতায়াতের সংখ্যার সম্বন্ধ অতি অল্প। যাতায়াত কম বা বেশী হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এগুলি সকল সময়ই প্রস্তুত রাখিতে হয়। কোন-একটি পথে রেলগাড়ীর যাতায়াত কম হইলে রেলপথ-সংস্করণ-খরচ কমে না।

রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা নির্ভর করে আঞ্চলিক সম্পদ ও যাত্রীর উপর। ক্যানাডায় গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর জন্মে, এবং ক্রমশঃ অন্যান্য খনিজ-সম্পদ্ আবিষ্কৃত হইতেছে,—কাষ্ঠব্যবসায় বিশেষভাবে চলিতেছে, আবার এখানকার লোকসংখ্যাও কম—শিল্পবাণিজ্যও পূর্বাঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র স্থাপিত হয় নাই; সুতরাং এই সম্পদ্ রেলযোগে সর্বত্র রপ্তানি করিতে হয়। রেলপথে ভাড়া নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির শুল্কের উপর। যদি দেখা যায় যে, কোন স্থানের রেলের ভাড়া কম হয়, সেই স্থানটি নিশ্চয়ই বাণিজ্যে বা শিল্পে উন্নত। সেখানে বাণিজ্যদ্রব্য অধিক আমদানি ও রপ্তানির জন্য অধিক শুল্ক পাওয়া যায়। সুতরাং ভাড়া কম করিলে ক্ষতি হয় না। অবশ্য দূরত্ব অনুসারেই ভাড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তবে দূরত্ব অনুসারে ভাড়া না বাড়িলে বুঝিতে হইবে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভাব সেইস্থানে খুব বেশী। প্রতিযোগিতার দ্বারা অনেক সময় ভাড়া হ্রাস পায়। যখন রেলগাড়ী ও মটরগাড়ী পাশাপাশি চলে, তখন উভয়েরই ভাড়া প্রতিযোগিতামূলক হয়,—ইহাতে উভয় প্রকার যানেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিবার চেষ্টা বাড়ে, উভয়ের গতিও ক্রমশঃ বাড়ে এবং রেলস্টেশনে থামিবার সময়টুকুও অতি অল্প হয়।

রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ তিন উদ্দেশ্যে রেলপথ বিস্তার করা হয়,—(১) বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তার, (২) দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ, (৩) দেশ, বিশেষতঃ সীমান্ত-রক্ষার্থ সৈন্য চলাচল।

কয়েকটি বড়-বড় দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নীচে দেওয়া যাইতেছে,—

দেশ	রেলপথের দৈর্ঘ্য	যত বর্গমাইলে রেলপথের দৈর্ঘ্য ১ মাইল
গ্রেটবৃটেন	১৯,০৪৫ মাইল	৪.৫
ক্যানাডা	৫৯,৩১৫ মা.	৫১
অস্ট্রেলিয়া	২৬,৪৭৩ মা.	১১
আ. যুক্তরাষ্ট্র	২২০,২২১ মা.	১৬
ফ্রান্স	২৯,২৯৩ কি. মি.*	১১ মা.
জার্মানি (প.)	৩৯,৮০০ কি. মি.*	৩.৯ মা.
জাপান	২৭,৭৮৭ কি. মি.*	৮.২ মা.
ভারত	৩৫,০৮১ মা.	৩৫

* ১ কিলোমিটর = ০.৬২১৩৭ মাইল।

উপরে প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে গ্রেটবৃটেনে রেলপথের বিস্তার বেশী, এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কম।

রেলপথের উপযোগিতা।—(১) ইহা দুই দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব কমাইয়া দেয়। (২) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে রেলপথ পরিবহনের প্রধান উপায়। রেলপথযোগেই এক দেশের কাঁচা মাল অন্য দেশে পাঠান যায়,—একস্থানের শিল্পদ্রব্য অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়। (৩) দুর্ভিক্ষকালে সচ্ছল দেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার পক্ষে রেলপথ বিশেষ প্রয়োজনীয়। (৪) অনাবিষ্কৃত দেশ রেলপথযোগে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। ক্যানাডার বিভিন্ন অংশ রেলপথের জন্য সহজে আবিষ্কৃত হইতে পারিয়াছিল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের মোট রেলপথ (৩১শে মার্চ ১৯৫৯) ৩৫,০৮১ মাইল। ইহাতে ভারত এশিয়ার মধ্যে প্রথম ও পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহাতে গবর্ণমেন্টের খাস রেলপথ ৩৪,৬৩৬ মাইল। বে-সরকারী কোম্পানির অধীন ৪৪৪ মাইল রেলপথ। বে-সরকারী সমস্ত রেলপথই ছোট মাপের (Narrow Gauge)। ভারতে তিন প্রকার বিস্তারের রেলপথ আছে,—(১) বড় মাপ (Broad Gauge—B. G.—$5\frac{1}{2}'$), (২) মধ্যম মাপের (Metre Gauge—M. G.—$3'\ 3\frac{3}{8}''$) ও (৩) ছোট মাপের (Narrow Gauge—N. G.—$2'\ 6''$ এবং $2'$) এই রেলপথের মোটামুটি শতকরা ৫০ ভাগ **গাঙ্গেয় উপত্যকায়** অবস্থিত। ইহার কারণ এই যে,

১। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত, নদনদী, খনি ও খালের জন্য কৃষিদ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়,—সেজন্য লোকবসতি এখানে খুব ঘন। এই লোক-চলাচলের ও কৃষিদ্রব্য চলাচলের জন্য এ-অঞ্চলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বেশী।

২। গাঙ্গেয় উপত্যকা হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যে সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। সমতলক্ষেত্রে রেলপথ-বিস্তার সহজসাধ্য ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য।

৩। রেলপথ-বিস্তারের পূর্বে গঙ্গা ও তাহার উপনদীগুলি অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হইয়াছিল।

৪। উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ সহর ও নগর গঙ্গানদীর সন্নিকটেই অবস্থিত। সেজন্য রেলপথের আবশ্যকতা এখানে বেশী।

৫। গঙ্গা-উপত্যকার পাশেই ভারতের খনি-অঞ্চল ও শিল্প-অঞ্চল অবস্থিত। সেজন্যও রেলপথের আবশ্যকতা এখানে বেশী।

৬। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা এই সমতল গাঙ্গেয় উপত্যকার এক পাশেই

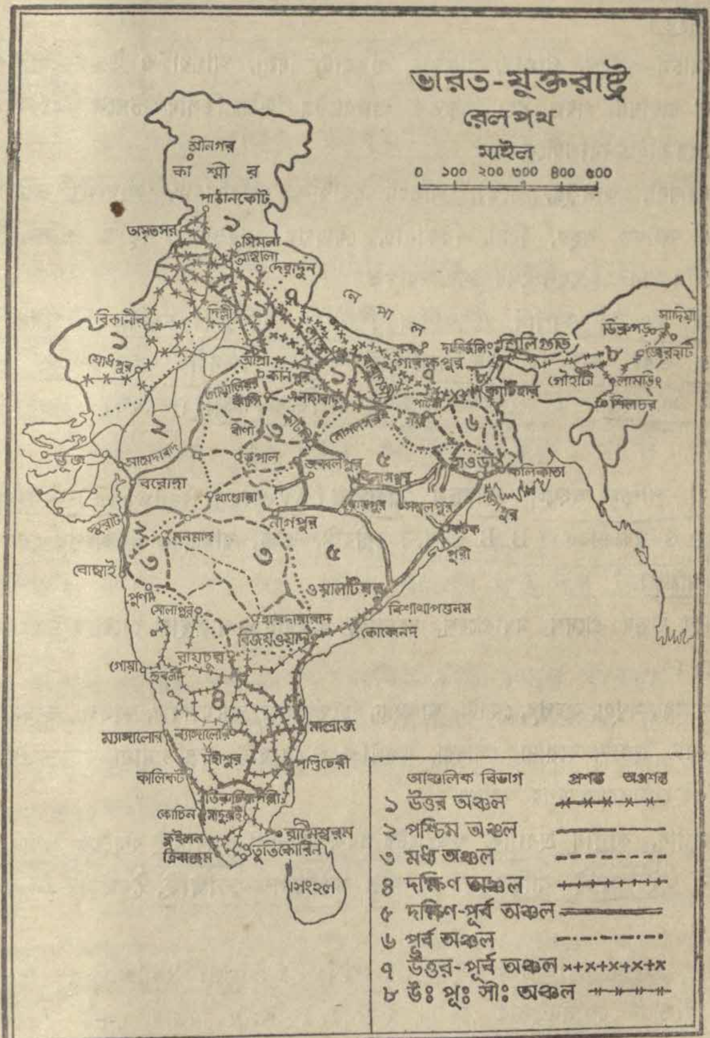
অবস্থিত। এই হেতু গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাণিজ্য-বৃদ্ধি হইয়াছে ও রেলপথের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতের রেলপথ।—দক্ষিণ-ভারত মালভূমি,—ইহা সমতল নহে,—বন্ধুর;—ইহার উচ্চতা পদে-পদে পরিবর্তিত হয়, অভ্যন্তরভাগ হইতে সমুদ্রোপকূলে ও বন্দরে যাইতে হইলে পর্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল কারণে দক্ষিণ-ভারতে রেলপথ-বিস্তার সহজ নয়,—ইহা ব্যয়সাধ্য;—সমতল-ক্ষেত্রের মত সরল রেলপথ এখানে দুর্লভ, এবং পর্বতপথ কাটিয়া ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া এখানে রেললাইন বসাইতে হয়। এ-অঞ্চলে কৃষিশস্য ও শিল্পদ্রব্য থাকিলেও, উহাদের শ্রীবৃদ্ধি উত্তর-ভারত অপেক্ষা কম।

রেলপথ-অঞ্চল (Zone)।—ভারতবর্ষে রেলপথ-বিস্তার সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় নাই। সাধারণতঃ বৃটেনের বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়াই এদেশে রেলপথ-বিস্তার করা হইয়াছিল। এজন্য দেখা যায়, বন্দরের নিকটেই রেলপথ সমাবেশ বেশী, এবং দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা আছে। এই সকল রেলপথের বিলি-ব্যবস্থা করারও অসুবিধা বিস্তর। রেলপথগুলির বিভিন্ন সত্তার জন্যও বিস্তর অসুবিধা ছিল। সেজন্য দেশের বিভিন্ন আইনসভা, বণিক্-প্রতিষ্ঠান এবং রেল-কর্মচারিগণের সমিতি, রেলপথগুলিকে মিলিত করিয়া কয়েকটি মাত্র রেলপথে পরিণত করিবার আবেদন করেন। এজন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃষ্টিশ গবর্ণমেণ্ট রেলপথের সমস্যা আলোচনার জন্য ওয়েজউড্ সাহেবের অধীনে একটি কমিটি বসান। সেই কমিটির কার্য বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ভারত গবর্ণমেণ্ট রেলপথ-সমস্যা সমাধানের জন্য আবার কমিটি নিয়োগ করেন। অনেক আন্দোলন ও আলোচনার পরে রেলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সম্মতিক্রমে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথগুলি ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এক্ষণে আটটি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে।—যথা,—(১) উত্তর রেলপথ, (২) পশ্চিম রেলপথ, (৩) মধ্য রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) পূর্ব রেলপথ, (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ। ১৯৫৫ খৃঃ অব্দে পূর্ব রেলপথ ভাঙ্গিয়া পূর্ব ও (৭) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ হইয়াছে, এবং ১৯৫৮ খৃঃ অব্দে উত্তর-পূর্ব রেলপথ ভাঙ্গিয়া উত্তর-পূর্ব ও (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ নামে দুই রেলপথ করা হইয়াছে।

রেলপথ পুনর্বিন্যাসের সুবিধা।—(১) এই অঞ্চলগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চল। (২) এগুলি ন্যূনাধিক ৫০০০ মাইল রেলপথ লইয়া গঠিত। সুতরাং আশা করা যায়, এইরূপ বিভাগবশতঃ পরিচালনার ব্যয় হ্রাস পাইবে, পরিচালনা-দক্ষতা

বৃদ্ধি পাইবে, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক আর্থনীতিক নির্ভরতা কমিয়া যাইবে। (৩) এই ব্যবস্থায় এক-এক পথে কোন এক প্রকারের গেজের (gauge) রেলপথ অধিক দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ইষ্টার্ণ রেলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে প্রায় সবই ব্রড গেজ



১২১ নং চিত্র।

পথ। এখানে মিটার গেজের রেলপথ নাই। উত্তর ও মধ্য রেলপথে ব্রড গেজ বেশী। দক্ষিণ রেলপথে ও পশ্চিম রেলপথে ও উত্তর-পূর্ব রেলপথে মিটার গেজের পথ বেশী।

রেলপথের আঞ্চলিক বিভাগ ও তাহার বিবরণ।—

(১) উত্তর অঞ্চলে—**উত্তর রেলপথ** (North Railways) পূর্ব পাঞ্জাব, যোধপুর, বিকানীর রেলপথ ও পূর্ব রেলপথের তিনটি উত্তর-পশ্চিম দিকের শেষ রেল-বিভাগ লইয়া গঠিত।

হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী, আগরা ও উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বারাণসী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। গুজরাটের ভিতর ভিলদি স্টেশনে ইহা পশ্চিম রেলপথের সহিত মিশিয়াছে।

বারাণসী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগরা, বেরিলি, মোরাদাবাদ, আম্বালা, চণ্ডীগড়, সিমলা, জলন্ধর শহর, দিল্লী, বিকানীর, যোধপুর, মারওয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও শিল্পপ্রধান স্থান এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

এই অঞ্চলের কার্পাস ও কার্পাস শিল্পদ্রব্য, কানপুরের চর্মশিল্প ও পশমশিল্প প্রভৃতি, উত্তর প্রদেশের চিনি এবং এই অঞ্চলের তৈলবীজ প্রভৃতি এই পথে রপ্তানি করা হয়। এই রেলপথের **সদর আফিস—দিল্লী** ;—**দৈর্ঘ্য**—৬,৪৪০·০১ মাইল।

(২) পশ্চিম অঞ্চলে—**পশ্চিম রেলপথ** (Western Railways)—বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারত (B. B. C. I.) সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, রাজস্থান ও জয়পুর রেলপথ লইয়া গঠিত।

ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থান রাজ্যের উপর দিয়া গিয়াছে।

আগরা, মথুরা, জয়পুর, কোটা, আজমীঢ়, চিতোরগড়, আমেদাবাদ, কান্দলা, জামনগর, রাজকোট, স্বরাট, বরোদা, গোধরা, জলগাঁও ও বোম্বাই প্রভৃতি নানা কারণে প্রসিদ্ধ শহর এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

কার্পাস, কার্পাস দ্রব্যাদি, গুজরাটের লবণ, কান্দলা ও বোম্বাই বন্দরের আমদানি-রপ্তানি এই পথেই সাধিত হয়। **সদর আফিস—বোম্বাই, দৈর্ঘ্য**—৬০৬৪·৬৪ মাইল।

(৩) তৃতীয় মধ্য-অঞ্চলে **মধ্য রেলপথ** (Central Railways)—ভূতপূর্ব গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলপথ (G. I. P. R.), নিজাম স্টেট রেলওয়ে, সিন্ধিয়া ও ঢোলপুর রেলপথ লইয়া এই নূতন রেলপথ গঠিত হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশের উপর দিয়া এই রেলপথ গিয়াছে। পাঞ্জাবের মধ্যে উহার অতি অল্প অংশই রহিয়াছে। ঢোলপুর সেই অংশে অবস্থিত।

আগরা, মথুরা, গোয়ালিয়র, ঝান্সি, ভূপাল, হোসাঙ্গাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, নাগপুর, বিজয়ওয়াদা, সেকেন্দরাবাদ, কুর্নুল, গুলবার্গ, সোলাপুর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান এই পথের উপর অবস্থিত।

ম্যাঙ্গানিজ, তৈলবীজ, তূলা, তূলাদ্রব্য, চর্ম, চর্মদ্রব্য, এই পথে আমদানি-রপ্তানি হয়। বোম্বাই বন্দরের কিয়দংশ আমদানি-রপ্তানি এই পথে হয়। ইহার **সদর আফিস—বোম্বাই ;** দৈর্ঘ্য—৫৪৮২·৭৭ মাইল।

(৪) চতুর্থ অঞ্চলে—**দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railways) একেবারে দক্ষিণ ভাগে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরল, মান্দ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যগুলির উপর দিয়া গিয়াছে।

পুনা, কোলাপুর, মহীশূর, বাঙ্গালোর, রায়চুর, নেলোর, মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী তুতিকোরিণ, মাদুরৈ, কুইলন, কোচিন, কালিকট (কোঝিকোড), মাঙ্গালোর, ত্রিরুচিরাপল্লী প্রভৃতি এই পথের উপর অবস্থিত।

তূলা, তূলার দ্রব্য, তৈলবীজ, স্বর্ণ, অভ্র, চর্ম, লৌহদ্রব্য, রেশমদ্রব্য প্রভৃতি এই পথে আমদানি-রপ্তানি হয়। **সদর আফিস—মান্দ্রাজ ;—দৈর্ঘ্য**—৬১৬৪·৩১ মাইল।

(৫) পঞ্চম অঞ্চলে—**দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railways)—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহার পূর্বনাম বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ।

হাওড়া, খড়্গপুর, আসানসোল, পুরুলিয়া, রাঁচি, গোমো, চক্রধরপুর, সম্বলপুর, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক, পুরী, ভিজিয়ানাগ্রাম, ওয়ালটেয়ার, বিশাখাপত্তনম্, জগদ্দলপুর, রায়পুর, দুর্গ, ভিলাই, বিলাশপুর, নাগপুর ইত্যাদি শিল্পবহুল স্থান এই পথের উপর অবস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গের, বিহারের ও উড়িষ্যার কয়লা ও মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ ও কাষ্ঠাদি এই পথে রপ্তানি হয়। লৌহখনি, বক্সাইট, ডলোমাইট, অভ্র প্রভৃতি খনিজদ্রব্য এই অঞ্চলেই উত্তোলিত হয়। রায়রাকেলা, ভিলাই, টাটানগর ও বার্ণপুরের লৌহ কারখানা এই পথের উপর অবস্থিত। **সদর আপিস—কলিকাতা,—দৈর্ঘ্য**—৩৬৪০·৫৩ মাইল।

(৬) ৬ষ্ঠ অঞ্চলে—**পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railways)—ভূতপূর্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের পশ্চিম দিকে তিনটি বিভাগ বাদে অবশিষ্ট অংশ এক্ষণে পূর্ব রেলপথ নামে কথিত হইয়াছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব সীমার উপর দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। ইহার এক অংশ পশ্চিম দিকে, দ্বিতীয় অংশ দক্ষিণে বজবজ,

ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষীকান্তপুর, ক্যানিংএর দিকে এবং তৃতীয় অংশ শিয়ালদহ হইতে পূর্ববঙ্গের সীমানায় অবস্থিত পেট্রোপোল পর্যন্ত গিয়াছে।

বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ধানবাদ, মোগলসরাই, গয়া, পাটনা, মুঙ্গের, ডাল্টনগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান এই পথের উপর অবস্থিত।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লা, সিন্ধ্রীর সার, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্রের দ্রব্যাদি, আসানসোলের এলুমিনিয়াম, টিটাগড়ের,রাণীগঞ্জের কাগজ, হাওড়ার মোটরগাড়ী, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাত দ্রব্য এই পথেই আমদানি-রপ্তানি হয়। ইহার **সদর অফিস কলিকাতা,**—দৈর্ঘ্য ২৩৫১০·৭ মাইল।

(৭) ৭ম অঞ্চলে—**উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North-Eastern Railways)—ভূতপূর্ব অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, আসাম রেলপথ ও বোম্বাই, বরোদা ও মধ্য-ভারতের রেলপথের কিয়দংশ লইয়া গঠিত। ইহা বিহার ও উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কাটিহার, মজঃফরপুর, ছাপরা, গাজীপুর, বারাণসী, বেরিলী প্রভৃতি স্থান এই পথের উপর অবস্থিত। এই অঞ্চলে ইক্ষু, তামাক, ধান্য প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর জন্মে। সেইজন্য চিনি, চাউল, সিমেণ্ট, ইক্ষু প্রভৃতি এই রেলপথে আমদানি ও রপ্তানি হয়। **সদর অফিস—গোরক্ষপুর,** দৈর্ঘ্য—৩০৫৭·৭৩ মাইল।

(৮) ৮ম অঞ্চলে—**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** (North-East Frontier Railways)—ইহা উত্তর-পূর্ব রেলপথের কতকাংশ। এই রেলপথ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব বিহারের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথ এই অঞ্চলে অবস্থিত।

তিনসুকিয়া, ডিগবয়, শিবসাগর, লামডিং, আমিনগাঁও, পাণ্ডু, আলিপুর দুয়ার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থান এই পথের উপর অবস্থিত।

আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা, এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল এই পথের বাণিজ্য দ্রব্য। মনিহারী ঘাট হইতে পাণ্ডু পর্যন্ত এই রেলপথকে আসাম-লিঙ্ক বলে। ইহার **সদর-অফিস—পাণ্ডু,**—দৈর্ঘ্য—১৭৪৮·৮৭ মাইল।

অঞ্চল বিভাগকালে লক্ষীভূত বিষয়।—অঞ্চল বিভাগকালে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে,—

(১) অঞ্চলটি যেন একটি সংহত অঞ্চল হয়।

(২) ইহার আয়তন যেন খুব ছোট না হয়। মোটামুটি ৫০০০ মাইলের কম না হওয়াই উচিত; কারণ, প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রে রেলপথ-সংক্রান্ত কার্যে সুদক্ষ

ও অভিজ্ঞ কর্মচারী, উচ্চ অঙ্গের কারখানা ও গবেষণাগার প্রভৃতি রাখিয়া তাহা পোষণ করার ক্ষমতা যেন ঐ অঞ্চলের থাকে। কিন্তু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইল অপেক্ষা কম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের রেলপথ,—চিত্তরঞ্জন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে বিশেষতঃ ভারত-বিভাগের ফলে এদেশে রেলগাড়ী চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব হইয়াছিল। অভিজ্ঞ মুসলমান রেলকর্মচারী পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল, ১৯৩৮-'৩৯ খ্রীষ্টাব্দের রেলগাড়ী অপেক্ষা ঐ সময়ে যাত্রী দ্বিগুণ হইয়াছিল, কিন্তু রেলগাড়ীর বহন-ক্ষমতা ১৪.৫% কমিয়া গিয়াছিল।* এজন্য দেশের মধ্যে যতদূর সম্ভব রেল-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং বিদেশে ৮৬৩ খানি ইঞ্জিনের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্ট উহাতেই নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমায় চিত্তরঞ্জন নামক ষ্টেশনের অদূরে চিত্তরঞ্জন কারখানা খুলিয়াছেন। টাটা লোকোমোটিভ কারখানা ও চিত্তরঞ্জন কারখানায় প্রস্তুত ইঞ্জিন রীতিমত বাহির হইলে আর বিদেশ হইতে ইঞ্জিন আনিবার দরকার হইবে না বোধ হয়।

১৯৬০-৬১ সালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় ১৭৩ খানি ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখন হইতে বৎসরে ৩০০ খানি ইঞ্জিন ও আরও ৬০ খানি বিদ্যুৎবাহিত ইঞ্জিন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা আছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৬০-৬১ সালে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ৯৯ খানি ইঞ্জিন বাহির করিয়াছে। গ্যাস-চালিত ইঞ্জিন সম্পর্কে ভারত আর পরমুখাপেক্ষী নহে। শীঘ্রই এখান হইতে ইঞ্জিন বিদেশে রপ্তানি করার আশা করা যাইতেছে।

পেরাম্বুর (মাদ্রাজ) কোচ ফ্যাক্টরি হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৪৬ খানি ও ১৯৬০-৬১ সালে ৫৮০ খানি রেলগাড়ি বাহির হইয়াছে।

৪। জাহাজ (Shipping)

জলপথে দ্রব্যাদি অল্পমূল্যে বহন করা যায়। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে কয়লাদি আনিবার জন্য জলপথই পছন্দ করা হয়। আবার, জলপথে দ্রব্যাদি যতদূর ভালভাবে লওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নহে। সেইজন্য রেলগাড়ী দ্রুতগামী হইলেও ব্যবসায়িগণ জলপথই যোগ্যপথ বলিয়া মনে করে।

* *The Industries of India*—Burmah-shell Service.

জলপথে যে-জাহাজগুলি যাতায়াত করে, তাহা তিন শ্রেণীভুক্ত করা যায় ;— ১। **লাইনার** (Liner)—এগুলি মালপত্র ও আরোহী—উভয়ই লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে, নির্দিষ্ট জলপথে যাতায়াত করে, এবং নির্দিষ্ট বন্দরে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে। ইহার গতি দ্রুত। যে-সকল মালের অল্প সময়ে ও নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানো দরকার, সাধারণতঃ সেই সকল মালই এই জাহাজে যাতায়াত করে। ২। **ট্রাম্প** (Tramp)—এই জাহাজ লাইনার জাহাজ অপেক্ষা দেখিতে ছোট ও ইহার গতিও কম। ইহার স্থান-কাল নির্দিষ্ট নাই। কোন নির্দিষ্ট পথেও ইহা চলে না। ভারী বৃহদাকার ও অল্পমূল্যের মাল এই জাহাজে বহন করা হয়। শস্যাদি, কাষ্ঠ, কয়লা, খনিজ দ্রব্য, চিনি প্রভৃতি এইরূপ জাহাজে পাঠানো হয়। যাঁহারা অল্প খরচে যাইতে চান, এবং যাঁহাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার নাই সেরূপ যাত্রীও এই জাহাজে গিয়া থাকেন। ৩। **সওদাগরী** (Merchant-ship) বা **শিল্পবাহী জাহাজ** (Industrial Vessel)—এগুলিও ট্রাম্প জাহাজ। ইহা অল্পদিন প্রচলিত হইয়াছে। এগুলি কোন বিশেষ শিল্পজাত ও খনিজদ্রব্য বহনের উপযোগী করিয়া বড়-বড় সওদাগর বা শিল্পকোম্পানি তৈয়ার করাইয়াছেন। সেজন্য ইহার কোনটি তৈলবাহী (oil-tankers), কোনটি ফলবাহী (fruit-ship), কোনটি কাষ্ঠবাহী (timber-ship) প্রভৃতি।

সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৫৬ সালের হিসাবমত যত জাহাজ আছে, তাহাদের মোট মালবহন ক্ষমতা ১০৫,২০০ সহস্র Gross Registered Ton (G. R. T.)। কোন জাহাজ—নাবিক, জাহাজ-পরিচালক, জাহাজের কর্মচারী ও জল রাখিবার স্থান বাদে কেবল যাত্রী ও মাল বহিবার স্থানে যত টন * মাল বহন করিতে পারে তাহাকে তত

---

* Ton = Unit of measurement for ship's tonnage—100 cub. ft.—The Oxford Dictionary.

The figures (*i.e.* the tonnage figures) are given in gross registered tons (100 cub. ft.) and represent the total volume of all the permanently enclosed spaces of the vessels to which the figure refer.—Statistical Yearbook, 1957,—p.346.

Gross tonnage is the sum in cubic feet of all the various enclosed spaces of a vessel divided by 100.—Whitaker's Almanack.

Net tonnage is the gross tonnage *less* certain deductions on account of crew spaces, engine room, water ballast and other spaces not used for passenger or cargo.—Whitaker's Almanack.

জাহাজের অভ্যন্তর মাপের সময় যে একক ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলে "টন"। ১ টন—১০০ ঘনফুট। সুতরাং জাহাজের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত স্থান মাপিয়া যত ঘনফুট হইবে, তাহাকে ১০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে-অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহাই টন, এবং এই টন-অঙ্কই ঐ জাহাজের gross tonnage.

কোন জাহাজের gross tonnage হইতে ঐ জাহাজের খালাসী, কর্মচারী, ইঞ্জিনের ঘর, জল রাখিবার স্থান ও অন্যান্য এইরূপ বিশেষভাবে অধিকৃত স্থানের ঘনফল বাদ দিয়া যাত্রী ও মাল-এর জন্য যে-স্থান বাকি থাকে তাহার টন-অঙ্কে প্রকাশিত সংখ্যা Net or registered tonnage.

registered বা net tonnage বলে। যে-জাহাজ এইরূপে দশ হাজার টন মাল বহিতে পারে তাহাকে দশ সহস্র টনী gross registered tonnage বলে। পৃথিবীতে ২৮,২১১ সহস্র G. R. Tanker আছে। যে-জাহাজে খনিজ তৈল বা তদ্রূপ তরল পদার্থ বহনের জন্য Tank আছে, তাহাকেই Tanker বলে। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাহাজ-সম্পদের অধিকারী আ. যুক্তরাষ্ট্র। সাধারণ জাহাজ—২৬,১৪৬ সহস্র টনবাহী Tankers—৪২১০ স. টনবাহী। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী আ. যুক্তরাজ্য ;—সাধারণ জাহাজ—১৯,৫৪৬, Tankers—৫,৩৪৯। তৃতীয়—নরওয়ে ;—সাধারণ জাহাজ—৮,০৩৫, Tankers ৪,৬৬০। চতুর্থ—লাইবেরিয়া ;—সাধারণ ৫,৫৮৪, Tankers—৩,১৮৪। পঞ্চম—ইতালী ;—সাধারণ—৪১৯৭, Tankers—১৩০৩। ষষ্ঠ—জাপান ;—সাধারণ ৪,০৭৬, Tankers—৭৮৯ স. টনবাহী। সপ্তম—নেদারলণ্ড ;—সাধারণ—৪০০৬, Tankers—১,০৮৩। অষ্টম—ফ্রান্স ;—সাধারণ—৩,৯৪৩, Tankers—১,২৫৯।

পৃথিবীর প্রধান-প্রধান দেশে ১৯৫৬ সালে যত টনী জাহাজ (Tonnage) কর্ম রত ছিল তাহার একটি হিসাব দেওয়া গেল—

দেশ	জাহাজের সংখ্যা রেজেষ্ট্রীভুক্ত সহস্র টন Thousand net registered tons		মালের হিসাব সহস্র মেট্রিক টন Thousand Metric ton	
	বন্দরে প্রবেশকারী	বন্দর ত্যাগকারী	রপ্তানিকৃত (Loaded)	আমদানিকৃত (Unloaded)
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১০২,৯৮৪	৯৮,৮৪৩	১৩৬,৪০৯	১৫৬,১৬১
যুক্তরাজ্য	৭৭,১৩৮	৪৯,৯১৬	৩৬,৪৬৭	১০৩,০৮৯
ফ্রান্স	৫৪,৬৯০	৩৯,০৫৫	২৫,১২০	৫৬,০৮০
ক্যানাডা	৩৪,৭৮৪	৪০,৮১১	৪৪,৭৯১	৩৬,৭৯০
জাপান	২৯,২৭৬	২৯,৬৯১	৮,৮১৪	৪৬,৪৭৪
সুইডেন	২৩,১৬৫	২০,৫৭৭	১৬,৭৫৯	২১,০৭৯
স্পেন	১৮,৪৩৭	১৮,৫১৬	৭,৮৮৫	৮,২৪১
অস্ট্রেলিয়া	১০,০২৫	৬,৮৮৭	৭,৮২২	১৪,৯৪৮
ভারত	৯,৯৫২	৮,৮৪৩	×	×
চীন	৩,৭৩১	৩,৭২৬	১,২৪৮	১,২২২

উপরি-প্রদত্ত হিসাব দেখিলে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে কাহার কিরূপ স্থান তাহা কিছু-কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন জাতির নৌবহরের সংখ্যা, ও জাহাজের আকার তাহার গৌরবের নিদর্শন। আ. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ নিজ-নিজ জাহাজে নিজ-নিজ মাল আমদানি-রপ্তানি করেই, অন্য দেশের কাজ করিয়াও অর্থোপার্জন করে। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যাহার যেরূপ নৌবহর, তাহার সম্মানও তদ্রূপ, এবং তাহা তাহার বাণিজ্যের পরিমাণজ্ঞাপক। একে ত জাহাজে মাল আনয়নের খরচ কম, তাহার উপর পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের ইহাই ভরসাস্থল। এক্ষণে ব্যোমযানে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল যাতায়াত চলিতেছে বটে, কিন্তু জাহাজের মত বোঝাই লইতে এখনও ব্যোমযান সক্ষম নহে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের জলপথ ও জাহাজের ব্যবহার

বহির্ভূত জলপথ দুই ভাগে বিভক্ত: (১) উপকূলপথ, (২) সমুদ্রপথ।

উপকূল-পথ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলপথ ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার উপকূলরেখা সরলপ্রায়—ইহাতে উপসাগর বা খাড়ির অত্যন্ত অভাব। সেজন্য উপকূলে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় বা বন্দর অত্যন্ত কম। বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ ও কলিকাতা— এই চারিটি মাত্র উচ্চশ্রেণীর বন্দর এখানে আছে। ইহার মধ্যে মাদ্রাজে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় নাই—বহু ব্যয়ে কৃত্রিম পোতাশ্রয় রক্ষা করিতে হয়। কলিকাতা বন্দর সমুদ্র হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে হুগলী নদীপথে এই বন্দরে পৌছিতে হয়। এই নদীপথও সুগভীর নহে। বহুব্যয়ে ইহাকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখিতে হয়।

এই উপকূলে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে—অথবা, এই উপকূলের বন্দর হইতে ব্রহ্মদেশ, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, আফ্রিকা, পারস্য ও পাকিস্তান প্রভৃতি নিকটবর্তী দেশগুলিতে যে-বাণিজ্য চলে তাহার নাম **উপকূল-বাণিজ্য**।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এই উপকূল-বাণিজ্য নগণ্য নহে। উপকূলের এই পথে প্রায় কুড়ি কোটি যাত্রী যাতায়াত করে। ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যে-যাত্রী যাতায়াত করে তাহারও সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। পণ্য হিসাবে প্রায় ২ কোটি টন কয়লা, লবণ ও তৈল প্রভৃতিও এই পথে পরিবাহিত হয়।

উপকূল-বাণিজ্য দুই উপায়ে চলে;—(১) দেশী নৌকাযোগে ও (২) বাষ্পীয়পোত দ্বারা।

দেশী নৌকা—বড় জোর ১০০ টন মাল বহন করিতে পারে। এইসকল নৌকা পাইলভরে চলে ও মাঝিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা এক বন্দর হইতে

অন্য বন্দরে **অপেক্ষাকৃত সস্তা ভাড়ায়** মাল ও যাত্রী বহন করে। জাহাজে আমদানি ও রপ্তানির মাল নামানো ও ওঠানোর কাজও ইহারা করিয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা পূর্ব উপকূলে এইরূপ নৌকার চলাচল বেশী। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ঠিকমত নির্ণয় করা যায় না। কতক নৌকা রেজেষ্ট্রি খাতায় লিপিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু অনেক নৌকার কোন হিসাব নাই।

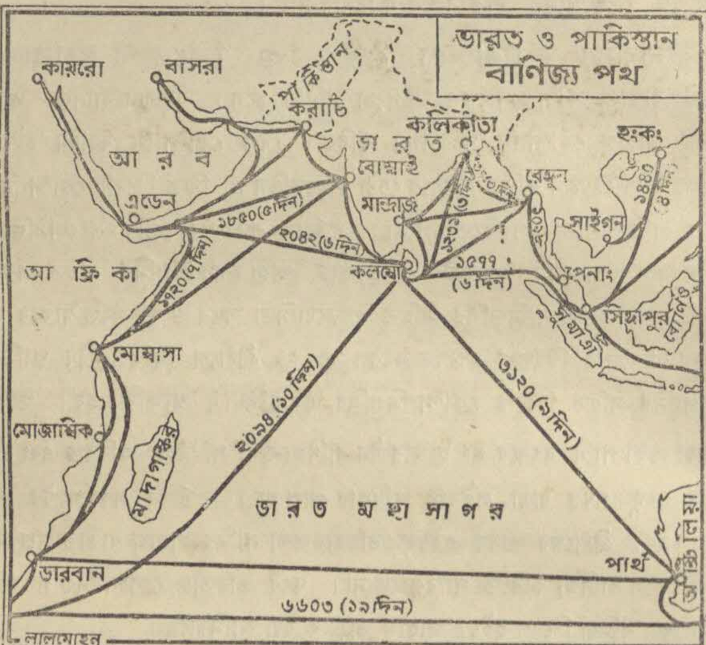
উপকূল বাণিজ্যে দেশী ও বিদেশী জাহাজ।—নৌকা ব্যতীত বাষ্পীয়পোতেও উপকূল-বাণিজ্য চলে। উপকূল-বাণিজ্য প্রধানতঃ বিদেশী জাহাজ কোম্পানি পরিচালন করিত। দেশী কোম্পানি বহুদিন হইতে এই বাণিজ্য ব্যাপারে স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিদেশী কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিতেছিল না। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি কয়েকটি ছোট-ছোট জাহাজ-কোম্পানির সহিত একযোগে বিদেশী জাহাজ-কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করে ও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া উপকূল বাণিজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির সহিত বিদেশী কোম্পানিগুলির এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুসারে সিন্ধিয়া কোম্পানি বৎসরে ৫০ হাজার টন বাণিজ্য-দ্রব্য পরিবহন করিবার এবং চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত যাত্রী লইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। বর্তমান গবর্ণমেন্টের আদেশ মতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজ এই উপকূলে বাণিজ্য করিতে পারিতেছে না। তবে ভারতীয় কোম্পানিগুলি জাহাজ--সংখ্যা কম বলিয়া বিদেশ হইতে জাহাজ ভাড়া করিয়া আনিয়াছে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উপকূল-বাণিজ্য পরিচালিত করার জন্য কয়েকটি দেশী কোম্পানির ও দুইটি বৃটিশ কোম্পানির প্রতিনিধি লইয়া Indian Coastal Conference গঠিত হইয়াছে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় ২৫টি কোম্পানি এদেশে উপকূল-বাণিজ্য ও সমুদ্র-বাণিজ্য করিত। ইহাদের ১১১ খানি জাহাজ ছিল। এই জাহাজগুলির মোট মালবহন-শক্তি ৪২২,৭৩৪ টন। ইহাদের ২২টি কোম্পানির জাহাজ উপকূল-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। তাহাদের জাহাজের মালবহন-শক্তি মোটামুটি ২৩৭ সহস্র টন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২৫৫ সহস্র টনী জাহাজ তাহারা চুক্তি দ্বারা আনিয়া উপকূলে খাটাইতেছে।

উপকূল-বাণিজ্য-বৃদ্ধির ফল।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারত সরকার ভারতের পোত-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্পে এক কমিটি নিয়োগ করেন। সেই কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, উপকূল-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দিগের দ্বারা

পরিচালিত হইবে, এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে; উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহাতে উপকূল শত্রুহাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হইবে,—অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এদেশের লোকের জলপথে বাণিজ্যের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রমশঃ বহির্বাণিজ্যের প্রতি



১২২ নং চিত্র।

আগ্রহ বাড়িবে। জলপথে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলেই জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পেরও উন্নতি হইবে। উপকূল-বাণিজ্যের উন্নতি হইলে সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসাও বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, **১৯৫৭ খৃ. অব্দে** ৩১শে মার্চ **ভারতের নিজের ২৩২,১৬৭ টন মালবাহী (G.R.T.) ৮১ খানি জাহাজ ছিল।** কিন্তু ১৯৫৭ খৃঃ অব্দের শেষে মোট ২৪০,০০০ টন (G. R. T.) মাল বহন করার ক্ষমতা ছিল। ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাসে উপকূল-বাণিজ্যে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টন (G. R. T.) মালবাহী ১০০ খানি জাহাজ ছিল।

সমুদ্রপথ।—অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কাষ্ঠনির্মিত ও পাইলভরে চালিত জাহাজে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের চাপে এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জাহাজ-নির্মাণশিল্প উঠিয়া যায়।

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বৃটিশস্বার্থ-সহায়ক ও ভারতীয় বণিকস্বার্থের বিরোধী কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এদেশে সামুদ্রিক বাণিজ্যের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল।

গবর্ণমেন্টের সাহায্যে এদেশে দুইটি প্রধান বৃটিশ কোম্পানির অধীনে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের একটি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি (B. I. S. N. Co.), এবং অপরটি পেনিনসুলার ও অরিয়েন্ট কোম্পানি (P. & O. Co.)। দুই-একটি ভারতীয় কোম্পানি মধ্যে-মধ্যে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের লগুড়াঘাতে তাহারা অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টার জে. এন. টাটার বেঙ্গল স্টীম্ ন্যাভিগেশন কোম্পানি ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যপথ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইলে ইহাদেরই চাপে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আসিল, এই সময়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে উপরি-উক্ত দুইটি বৃটিশ কোম্পানি মিশিয়া এক হইল এবং আরও শক্তিশালী হইল। এই সময়েই ভারতীয়গণের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও পুনরায় প্রবল হইল।

ভারতের উপকূল-বাণিজ্য বিশেষ অর্থকর। ইহার বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি। আবার ভারতবর্ষে যে বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য চলে, তাহাতেও প্রায় ২ কোটি টন মাল এবং ২ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে,—এবং পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ অষ্টম স্থান অধিকার করে।* এই অর্থপ্রসূ বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়গণ প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া ন্যাভিগেশন কোম্পানি ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্রে স্থান করিয়া লইবার দৃঢ়সংকল্প লইয়া রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ও পরে বাণিজ্য-জাহাজ নির্মাণে কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছিল, এখানেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

দুর্ধর্ষ বৃটিশ কোম্পানি সিন্ধিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্যপথ হইতে সরাইবার জন্য তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে শুল্কহ্রাস-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, এবং তৎপরে সিন্ধিয়া কোম্পানিকে খরিদ করিয়া লইবার জন্য বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সিন্ধিয়া কোম্পানির বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তাহারা হটিয়া গেল না। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কোম্পানি ৭৫,০০০ টন মাল বহনের অনুমতি পাইল। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট-ছোট ভারতীয় কোম্পানি পশ্চিম--উপকূলে বৃটিশ কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় পিষ্ট হইতেছিল। তাহাদের কয়েকটি সিন্ধিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন হইল, এবং কঙ্কণ উপকূলের কয়েকটি

* ভূতপূর্ব বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী কে. সি. নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

কোম্পানিও ইহার পরে সিন্ধিয়ার সহিত একীভূত হইল এবং ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য বাড়াইবার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিল। এই যুদ্ধকালে ভারতীয় কোম্পানির জাহাজগুলি গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লইলেন এবং দেখা গেল ভারতে এই সময়ে ভারতীয় জাহাজের মাল-বহনের ক্ষমতা মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন অর্থাৎ পৃথিবীর টনের মাত্র ৩.২ শতাংশ ছিল। যুদ্ধকালে অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হইল,—যেগুলি ফেরত পাওয়া গেল তাহাদেরও সংস্কার করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইল। কিন্তু এই যুদ্ধকালে ইহা অনুভূত হইল যে, এদেশীয়দিগকে সামুদ্রিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে। সেজন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থাপিত রি-কনস্ট্রাক্শন পলিসি বা পুনর্গঠন নীতি নামে এক কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থির হইল যে,—

পাঁচ হইতে সাত বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ২০ লক্ষ টন বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করিবে ;

এক্ষণে স্বাধীন ভারত সমুদ্রপথে জাহাজ পরিচালনায় কতদূর উন্নতি করিয়াছে, নিম্নে তাহা অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

(১) সমুদ্র-বাণিজ্য ১৯৪৭ সালে ভারত সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করে।

(২) ১৯৫৭ সালে ৩১শে মার্চ ভারতীয় পাঁচটি জাহাজ-কোম্পানি ৪৩ খানি জাহাজ দ্বারা সমুদ্রপথে মোট ২৮৯,২৭৩ রেজেষ্ট্রীভুক্ত টন মাল (gross registered tons) বহন করে।

(৩) নিম্নলিখিত পথে এখন ভারতের বাণিজ্য-পোত বাণিজ্য করিতেছে :—

(ক) ভারত—যুক্তরাজ্য—প্রধান ইউরোপ

(খ) ভারত—জাপান ও দূরস্থ পূর্বাঞ্চল

(গ) ভারত—সিঙ্গাপুর

(ঘ) ভারত—পূর্ব-আফ্রিকা

(ঙ) ভারত—কৃষ্ণ সমুদ্র।

(৪) ১৯৫৭ সালে ভারতের মোট ৩৩১,০০০ ধন মালবাহী (G. R. T.) সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। ১৯৬১ সালে সমুদ্র-বাণিজ্যে ৫ লক্ষ ৬১ হাজার টন মালবাহী ৭৫ খানি জাহাজ ছিল।

পরপৃষ্ঠায় একটি হিসাব দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে ভারত জাহাজ-চালনা ব্যবসায়ে ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিতেছে,—

লক্ষ G. R. T.

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১
উপকূল বাণিজ্যে	২.১৭	২'৪০	২'৯২
সামুদ্রিক বাণিজ্যে	১'৭৪	২'৪০	৬'১৩
মোট—	৩'৯১	৪'৮০	৯'০৫

ভারতের জলপথে বাণিজ্য ১৯৫৫-৫৬

ভারতের বন্দরে যাতায়াত করিয়াছিল

	যতবার	মোট যত টন বহন করিয়াছিল
বৃটিশ জাহাজ	১২১৬	৬,৬০৬,১০৯
ভারতীয় জাহাজ	১৮৯০	১,০১১,৭৫১
অন্য দেশের জাহাজ	১৯৪১	৬,২০৯,২৪৬
	৫০৪৭	১২,৮২৬,১০৬

ভারতের বন্দর হইতে বাহিরে গিয়াছিল

বৃটিশ জাহাজ	১২১৬	৫,৪৪০,২১৩
ভারতীয় জাহাজ	১৯৩৯	৯৭৮,০৮৬
অন্য দেশের জাহাজ	১৯৯১	৬.০৫৮,০৪৪
	৫১৪৬	১২,৪৭৬,৩৪৩

গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় জাহাজ পরিচালনা ব্যবসায়ের নিম্নলিখিতরূপ উন্নতি হইয়াছে :—

সাল	কোম্পানীর সংখ্যা	জাহাজের সংখ্যা	টন হিসাবে মালবহন শক্তি
১৯৫৫	৩০	১২৬	৪৬৫,২৬৪
১৯৫৬	৩০	১২৫	৪৭৮,৩০৭
১৯৫৭	২৫	১৩০	৫৭১,৪৪০
১৯৫৮	২৫	১৪২	৬৩০,০০০
১৯৫৯	২৫	১৫৯	৭৪৪,০০০

১৯৫৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসের শেষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৯ খানি জাহাজ ছিল। ইহার মধ্যে উপকূল-বাণিজ্য করিত ৩০৭,০০০ টনী ৯৫খানি জাহাজ, এবং সমুদ্র-বাণিজ্য করিত ৪৩৭,০০০ টনী ৬৪খানি জাহাজ।

সমুদ্র-বাণিজ্যের অন্তরায় ও প্রতিকার।—এদেশের সমুদ্র-বাণিজ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টাকার্যে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহার প্রতিকারকল্পেও বহু চেষ্টা হইতেছে।

(১) জাহাজ-নির্মাণ। জাহাজ-নির্মাণ না করিতে পারিলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে উন্নতি-লাভ সহজ নহে। এদেশে জাহাজনির্মাণক্ষেত্র ছিল বটে, কিন্তু সেখানে ছোট-ছোট জাহাজ নির্মিত হইত, এবং তাহার শিল্পী ও সরঞ্জাম ইংলণ্ড হইতে আসিত। সিন্ধিয়া নাভিগেশন কোম্পানিই এদেশে বিশাখাপত্তনমে বড়-বড় জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্র প্রথম স্থাপিত করেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানির সর্বস্বত্ব খরিদ করিয়া লইয়াছেন, এবং **হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড কোং** এখন ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড কোং গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি। এই জাহাজনির্মাণ-ক্ষেত্র হইতে বৎসরে চারিখানি ডিজেল-চালিত জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। এখানকার প্রথম জাহাজ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে জলে ভাসে। এ পর্যন্ত ২৭ খানি সমুদ্রগামী জাহাজ, ৩খানি ছোট জাহাজ (craft) ও ১ খানি জাহাজাদি বন্দরে বাঁধার জাহাজ প্রস্তুত করা হইয়াছে। গড়ে ইহাদের মালবহন-ক্ষমতা ১৪৫,৩০৪ টন।

কোচিনে আর-একটি জাহাজনির্মাণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইবে। সেখান হইতে ৫ বৎসরে যত জাহাজ প্রস্তুত হইবে, তাহারা ৬০ হাজার টন মাল বহন করিতে পারিবে।

(২) দক্ষ কর্মচারী শিল্পী।—পূর্বেই বলিয়াছি, বাণিজ্য-জাহাজ চালাইবার উপযুক্ত কর্মচারী ও শিল্পী ভারতে বেশী নাই, এবং সেজন্য ১৫ বৎসর পূর্বে "ডফরিন" নামে একখানি শিক্ষক-জাহাজ নির্দিষ্ট করিয়া তাহাতে শিক্ষানবিশ লওয়া হয়। এক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত কম যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্য-জাহাজ গঠন করিতে হইলে এখনও বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। সেজন্য ভারত সরকার নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন, এবং আশা করা যায় আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে একশত উপযুক্ত কর্মচারী ও একশত ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাইবে।

(৩) নাবিক বা খালাসী (Crew)।—এদেশের খালাসীরা বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত, সেজন্য তাহারা বর্তমান যুগে বিশেষ উপযোগী নহে। এজন্য ভারত সরকার খালাসীদিগের জন্য সাধারণ শিক্ষা, ও ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন,

এবং যাহাতে এই চাকুরী গ্রহণে লোকে আগ্রহ করে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার জন্য নানা সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৫। আকাশযাত্রা (Aviation)

আকাশপথে যাতায়াতের এক্ষণে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। দুইটি মহাযুদ্ধ যেমন শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছে, আকাশ-ভ্রমণের পক্ষেও সেইরূপ নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশাল-বিশাল ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও যুদ্ধের রসদ প্রভৃতি আকাশযানে অনায়াসে সত্বর যুদ্ধস্থলে সরবরাহ করা হইত। কিন্তু এখনও আকাশপথে যাতায়াতের খরচ এমন কম হয় নাই যে, সাধারণ লোক ভ্রমণ করিতে পারে। রেল ও জাহাজের ভাড়া উড়ো জাহাজের ভাড়া অপেক্ষা অনেক কম। তবে যেখানে সময় হইল প্রধান বিবেচ্য বিষয়, সেইসব স্থলে রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী ও রাজন্যবর্গ আকাশপথে যাতায়াত করেন। অনেক সময় হাল্কা অথচ মহার্ঘ পণ্যবস্তু আকাশমার্গে প্রেরিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে আকাশযাত্রা বিপজ্জনক। সেইজন্য আমেরিকা, জার্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সমতলক্ষেত্র-অঞ্চলেই আকাশযান-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়সূত্রে আকাশযান চালাইয়া থাকেন।

আকাশযাত্রার সুবিধা ও অসুবিধা। (১) বিমানযানে দুই দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব কমাইয়া দেয়। পূর্বেই বলিয়াছি রেলপথ দুই দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব কমাইয়া দেয়। আকাশপথ দূরত্ব আরও বেশী কমাইয়া দেয়। ভারত হইতে লণ্ডন যাইতে জলপথে ১৪ দিন লাগে, কিন্তু আকাশপথে ৩৬ ঘণ্টা লাগে। (২) দুই স্থানের দূরত্ব কমিয়া যায় বলিয়া বাণিজ্যের প্রসার হয়, এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। কিন্তু অসুবিধা হিসাবে, (১) আকাশপথে ভাড়া অত্যন্ত বেশী। সেজন্য সাধারণ লোকে আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারে না। (২) আকাশযাত্রায় কুয়াসা ও প্রচণ্ড বাত্যা বিশেষ অন্তরায়। কুয়াসার সময় অবতরণ বড় কঠিন ও বিপজ্জনক। অত্যন্ত বেশী বৃষ্টিপাত ও বরফপাত হইলে আকাশযাত্রা বন্ধ রাখিতে হয়। (৩) পার্বত্য অঞ্চলে আকাশযানে যাওয়া নিরাপদ নহে। (৪) পার্বত্য অঞ্চলে বিমানঘাঁটি নির্মাণ করা অসুবিধাজনক এবং কখনও-কখনও অসম্ভব।

আকাশযাত্রার বহু উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ইহা পৃথিবীব্যাপী (global) হইতে পারে নাই। কারণ (১) ইহার ভাড়া এত বেশী যে সাধারণ লোকে এই উড়োজাহাজে যাতায়াত করিতে পারে না। (২) ইহার কলকজার এবং ইহার দ্বারা আকাশপথে ভ্রমণের অনেক সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহার যান্ত্রিক ও আনুষঙ্গিক উন্নতির

আবশ্যকতা আছে। (৩) বিভিন্ন দেশের উপর যান চালাইতে হইলে যে-স্বাধীনতা ও আইনাদি দরকার, এখনও এই ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবসায়ীর সেরূপ স্বাধীনতা বা আইন নাই। এখনও কোন দেশের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সেই দেশের উপর দিয়া আকাশ-জাহাজ চালনা নিষিদ্ধ।

প্রধান-প্রধান দেশের আকাশপথের ব্যবস্থা।—নিম্নে কয়েকটি প্রধান দেশের, বিদেশের সহিত যোগাযোগ করিয়া আকাশপথে যাতায়াতের জন্য যে-সকল আকাশপথ আছে, তাহাদের প্রধান-প্রধান গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।—

দেশ	প্রধান আকাশপথ
আ. যুক্তরাষ্ট্র	প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ
	ট্রান্স-ওয়ার্লড্ এয়ারলাইন্স্ (TWA)
যুক্তরাজ্য	ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ার কর্পোরেশন (B.O.A.C.)
	কোয়ান্টাস্ এম্পায়ার এয়ারওয়েজ
	মিডল্-ইস্ট এয়ারলাইন্স্
	ইস্ট আফ্রিকান এয়ারওয়েজ
সিংহল	ট্রান্সসিলোন
ফ্রান্স	এয়ার-ফ্রান্স
নেদারলণ্ড	রয়েল ডাচ এয়ার-লাইন্স্ (K.L.M.)
সোভিয়েট রুশিয়া	এয়ারোফ্লোট
ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন	স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এয়ার-লাইন্স্ সিস্টেম
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারনেশানাল
	ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স্ কর্পোরেশন
পাকিস্তান	পাকিস্তান ইন্টারনেশানাল এয়ারলাইন্স্ (P.I.A.)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথ

ভারত ও বিমানপথ। (১) ভারত মহাদেশ-প্রতিম সুবিস্তৃত দেশ। সুতরাং বিমান-চলাচলের সর্বতোভাবে উপযোগী।

(২) পূর্বগোলার্ধে ভারতবর্ষ এমন স্থানে অবস্থিত যে, আন্তর্জাতিক আকাশপথে চলিতে ভারতের উপর দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কারণ, পৃথিবীর

এই অংশের উত্তরভাগে বরফাচ্ছন্ন শীতপ্রধান সাইবিরিয়া, এবং দক্ষিণে বিশাল মহাসমুদ্র।

(৩) বৎসরের সমস্ত সময়ই ভারত আকাশযান চালনার উপযোগী। এখানে শীতকাল আকাশযান চালনার আদর্শকাল।

(৪) ভারতে বক্সাইট ও কাষ্ঠ এত প্রচুর পাওয়া যায় যে, এখানে অনায়াসেই আকাশযান প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভারতে আকাশপথে চলাচল।—পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর আকাশপথে চলাচলের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ পৃথিবীর দুইটি মহাযুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে মাত্র দুইটি ছোট-ছোট বে-সরকারী কোম্পানি ছোট-ছোট ব্যোমযান চালাইত। তখন জাহাজে অতি অল্প লোকই বহন করা সম্ভব ছিল, এবং তখন কোন আকাশ-বন্দর ছিল না,—বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দেখিয়াই জাহাজগুলি ভূমিতে অবতরণ করিত। ইহার পরে ১৯২৭ খৃঃ অব্দে এদেশে বেসরকারী আকাশযাত্রা বিভাগ (Civil Aviation Department) স্থাপিত হইল, এবং ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সাপ্তাহিক আকাশযান চলিতে লাগিল।

ইহার পরে ১৯৩১ খৃঃ অব্দে ভারতে আকাশপথের ও আকাশযাত্রার উন্নতির বীজ বপন করা হইল;—ভারতে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী ও করাচী—এই চারিস্থানে আকাশ-বন্দর স্থাপিত হইল। ১৯৩২ খৃঃ অব্দে ভারতের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য প্রথমে আকাশযান চলিতে লাগিল, এবং করাচী হইতে কলম্বো এবং করাচী হইতে লাহোর ব্যোমপথে যাত্রী চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতে ব্যোমপথের বিপুল উন্নতি হইল—সমগ্র ভারতে আকাশপথে জাহাজ চলিতে লাগিল,—বহু আকাশ-বন্দর প্রস্তুত করা হইল,—ব্যোমযান চালাইবার উপযুক্ত কর্মচারী বহু সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিল,—এবং এই সময়েই হিন্দুস্থান এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ লিঃ নামে এক কোম্পানি বাঙ্গালোরে সর্বপ্রথম আকাশযান নির্মাণশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। যুদ্ধান্তে দেখা গেল আকাশ-বন্দর ও আকাশপথে ভারত ছাইয়া গিয়াছে, এবং যুদ্ধের উদ্বৃত্ত বিমান ক্রয় করিয়া বহু কোম্পানি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কোম্পানিগুলি প্রধান—(১) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, (২) ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ, (৩) এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, (৪) ভারত এয়ারওয়েজ লিঃ, (৫) এয়ার ইণ্ডিয়া, (৬) ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ এয়ারলাইন্‌স্, (৭) এয়ার সার্ভিসেস্ অব ইণ্ডিয়া, (৮) ডেকান এয়ারওয়েজ লিঃ, (৯) জুপিটর এয়ারওয়েজ, (১০) অম্বিকা এয়ারলাইন্‌স্, (১১) কলিঙ্গ এয়ারলাইন্‌স্, (১২) হিমালয়ান এভিয়েশন লিঃ।

আকাশ-পরিবহন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয়করণ

অনেকগুলি আকাশ-যান কোম্পানির সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল না। তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট অল্প সুদে ঋণ চাহিতে লাগিল, এবং তাহাদের ঐ ঋণ আশু শোধ দিবার সম্ভবনাও বিশেষ দেখা গেল না। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯৫৩ খৃঃ অব্দে Air Corporation Act, 1953 নামে এক আইন পাশ করিয়া আকাশ-পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেন। ইহার ফলে,—(১) আকাশ-পরিবহন ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের খাসদখলের অন্তর্গত হইল।



১২৩ নং চিত্র।

(২) এয়ার ইণ্ডিয়া লিঃ, এয়ার সার্ভিসেস্ অব ইণ্ডিয়া লিঃ, দি এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ, দি ভারত এয়ারওয়েজ লিঃ, দি ডেকান এয়ারওয়েজ লিঃ, দি হিমালয়ান এভিয়েশন লিঃ, দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ লিঃ, দি কলিঙ্গ এয়ারলাইন্স্ লিঃ,—এই

আটটি আকাশযান কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ও স্বত্ব গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া কিনিয়া লইলেন।

(১) আকাশ-পরিবহনের কার্য চালাইবার জন্য দুইটি সমবায় (Corporation) গঠিত হইল। দেশের অভ্যন্তরে আকাশযান চালাইবার সমস্ত কর্তৃত্ব পাইলেন,—The Indian Airlines Corporation ও আন্তর্জাতিক আকাশপথে আকাশযান চালাইবার কর্তৃত্ব পাইলেন—The Air India International Corporation। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত সংযোগপথ প্রথমটির অধীন থাকিবে।

এক্ষণে পূর্বের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে সপ্তাহে ৪ বার, এবং বোম্বাই ও নৈরবির মধ্যে সপ্তাহে ২ বার ভারতীয় যান চলিতেছে। কায়রো, রোম, ডাসেলডর্ফ, জেনেভা, প্যারিস, এডেন, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, তোকিও, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল ও লণ্ডনের পথে ভারতীয় আকাশযান চলিতেছে। ভারতের অভ্যন্তরে—পূর্বভাগে কলম্বো, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন, ভুবনেশ্বর, কলিকাতা, গৌহাটি, জোড়হাট, আগরতলা, ইম্ফাল প্রভৃতি স্থানের পথে, এবং পশ্চিমভাগে ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, জামনগর ও ভুজপথে অনবরত আকাশযান চলিতেছে। মধ্যভাগে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বানারস, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর, দিল্লী ও উত্তরে শ্রীনগর যোগ করিয়া আকাশপথ রহিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপাল,—ভারতের পথের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে আসাম লিঙ্ক রেলপথে আসাম যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়, এবং অন্য অসুবিধাও আছে। আসামের সহিত কলিকাতা আকাশপথে যুক্ত হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। রেলপথে অনেক ঘুরিয়া কলিকাতা হইতে আসামে যাইতে হয়। ইহা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এইজন্য উড়োজাহাজে আসামে যাওয়া সুবিধাজনক। আসাম হইতে চা, কমলালেবু প্রভৃতি, এবং কলিকাতা হইতে পণ্যদ্রব্যের কিয়দংশ বিমানযোগে যথাক্রমে কলিকাতায় ও আসামে প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা, মণিপুর ও কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে আসামের মত বিমানপথে যাতায়াতই সুবিধাজনক। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরে যাইতে হইলে বানিহাল সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত সুবিধাজনক। কিন্তু বর্ষাকালে অত্যন্ত বর্ষা হইলে এবং শীতকালে অত্যধিক তুষারপাতে এই সুড়ঙ্গ সময়ে-সময়ে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়। সেজন্য কাশ্মীর ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে অন্য স্থানে যাইবার পক্ষে বিমানপথই সুবিধাজনক। কাশ্মীর হইতে ফল ও পশমীদ্রব্যাদি বিমানযোগে ভারতের অন্য স্থানে আসে। শ্রীনগর এবং পাঠানকোট, দিল্লী ও লে-র মধ্যে আকাশযান যাতায়াত করে।

এক্ষণে প্রত্যহ রাত্রে বোম্বাই ও নাগপুর, মাদ্রাজ ও নাগপুর, কলিকাতা ও নাগপুর, এবং দিল্লী ও নাগপুরের আকাশপথে ডাক যাতায়াত করিতেছে।

নিম্নের তালিকা দেখিলে ভারতে আকাশযান ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি করিতেছে, তাহার কিয়দংশ বুঝিতে পারা যাইবে,—

ভারতে আকাশ-পরিবহনের উন্নতির হিসাব

বৎসর	মোট যত মাইল ভ্রমণ করিয়াছে (সহস্র)*	যত যাত্রী আকাশপথে ভ্রমণ করিয়াছে (সহস্র)*
১৯৫৫	২১,২৬৬	৪৬৮
১৯৫৬	২৩,৪১৮	৫৩৮
১৯৫৭	২,৩৪,৯৬	৬১৫
১৯৫৮	২,৪৫,৭৮	৬৯৬
১৯৫৯	২,৪৭,৪২	৭৩৬
১৯৬০	২,৬৩,৬১	৮৫৫
১৯৬১	২,৭৪,৫২	৯৪৮

* India, a Reference Annual by Govt. of India.

এতদ্ব্যতীত সাময়িক ও বাঁধাবাঁধি সময়ের বহির্ভূত ৫৬ লক্ষ ৫৭ হাজার মাইল পথ আকাশযানে ১ লক্ষ ১১ হাজার লোক ভ্রমণ করিয়াছিল।

ভারতের আকাশবন্দর।—১৯৬১ সালের হিসাবে ভারতে ৮৬টি আকাশবন্দর আছে। তন্মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক বন্দর বলিয়া গণ্য হইয়াছে,—কলিকাতা (দমদম), দিল্লী (পালাম), বোম্বাই (সান্তাক্রুজ)। বোম্বাই (জুহু), আমেদাবাদ, ভুজ, দিল্লী (সাফদারগঞ্জ), যোধপুর, অমৃতসর, নাগপুর, তিরুচিরাপল্লী, গৌহাটি, আগরতলা, মান্দ্রাজ (সেন্ট টমাস মাউন্ট), বাগডোগরা (প. বঙ্গ), ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে আকাশবন্দর বেশ বড়।

ভারতের বৈদেশিক বিমানপথ।—(১) প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ, (২) বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন, (৩) ট্রান্সওয়ার্লড্ এয়ারলাইন্স্, (৪) রয়েল ডাচ এয়ারলাইন্স্, (৫) কোয়ান্টাস্ এম্পায়ার এয়ার-ওয়েজ, (৬) এয়ার ফ্রান্স। (৭) এয়ারসিলোন প্রভৃতি (৩৭২ পৃ. দেখ)।

এই কয়টি কোম্পানি নিয়মিত এদেশে বিমান চালাইতেছে। তাছাড়া

আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সুইডেন, সুইজর্লণ্ড, থাইল্যাণ্ড, ইরাক, সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত জাহাজ চালাইবার চুক্তি হইয়াছে।

অন্যান্য উন্নতির চিহ্ন।—এক্ষণে এলাহাবাদে একটি আকাশযান পরিচালনা শিক্ষা দিবার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের সহিত একটি আকাশ-যান মেরামত করার কারখানা করা হইয়াছে। দিল্লী, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, জয়পুর, ইন্দোর, নাগপুর, ভুবনেশ্বর, জলন্ধর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, বারাকপুর—এই কয়টি স্থানে আকাশ-উড্ডয়ন সমিতি (flying club) রহিয়াছে।

Questions

1. Draw a map of India showing the air-routes with principal air-ports. (Cal. I.Com. 1940)

2. For development of communication facilities in India, would you favour extension of Railways or construction of Roads, or both ? Give your reasons. (Cal. I.Com. 1940).

3. Draw a map of India showing the most important railway systems and the places of industrial importance served by them. (Cal. I.Com. 1942)

4. Of the three types of transport namely road, river, and railway, which one would be suitable for Bengal and why ? (Cal. I. Com. 1942)

5. Give a brief account of the different industrial activities which you will notice while travelling by rail from Digboy to Delhi via Calcutta by the shortest route. (Cal. I.Com. 1943)

6. There is a move for establishing (*a*) automobiles, (*b*) aviation, and (*c*) shipbuilding industries in India. What are the shortcomings in the way of successfully developing these industries and how can these be removed ? (Cal. B.Com. 1941)

7. Discuss the adequacy of transport facilities in North-Eastern India (Bengal & Assam) in normal times and also in an abnormal period. What in your opinion is the remedy to the apparent defects ? (Cal. B.Com. 1943)

8. Describe the principal air-routes now in operation in India. Do you think India offers facilities for the further development of air transports ? (Cal. B.Com. 1947)

9. What advantages will there be in the grouping of Indian Railways as has been done by the Government ?

10. How many kinds of transport system are there ? Which of them is the most advantageous ? Discuss the advantages and disadvantages of the land-transport.

11. Name the different railway zones in India. Mention at least two important industries served by each zone.

12. Describe the inland water transport system in W. Germany.

13. Describe the inland water transport system in the lake area of N. America. How is this system connected with the Mississippi system ? Is the connection of the Lake transport system with the Mississippi system of any advantage ?

(২)

বাণিজ্যপথ

বাণিজ্য।—পৃথিবীর সর্বত্রই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না। আবার এমন কতকগুলি দেশ আছে, যেখানে নিজ-নিজ চাহিদা অপেক্ষা কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিক উৎপন্ন হয়। এই দ্রব্যসকল অভাবগ্রস্ত দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। আবার, এইসকল দেশেও কোন-না-কোন দ্রব্যের অভাব আছে। অন্য স্থান হইতে কাঁচামাল বা শিল্পদ্রব্য আনিয়া তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে দরকার সুষ্ঠু পরিবহন-ব্যবস্থা। যাতায়াতের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্য কখনও বিস্তৃত হইতে পারে না। পরিবহন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থানে স্থল-জল ও আকাশপথের প্রধান-প্রধান বাণিজ্যপথগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। এই বাণিজ্যপথগুলি কোন-কোন স্থলে **আন্তর্মহাদেশিক (আন্তর্জাতিক)**—এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সংযোগ রক্ষা করিয়া গিয়াছে,—কোন-কোনটি আন্তর্দেশিক—একই মহাদেশের মধ্যে এক দেশ হইতে অন্য-অন্য দেশে গিয়াছে;—আবার কোন-কোনটি আন্তঃপ্রাদেশিক বা দেশীয়;—কোন দেশের মধ্যে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ পর্যন্ত গিয়াছে।

১। পৃথিবীর স্থলপথ

স্থলপথে যাতায়াতের জন্য রাজপথ, রেলপথ ও গো-যান পথের সাধারণতঃ প্রচলন রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্থানগুলি রেলপথের বা রাজপথের দ্বারা দেশ-বিদেশের সহিত যুক্ত রহিয়াছে।

স্থলপথে দেখা যায়, কোন-কোন রেলপথ ও রাজপথ এক দেশ হইতে অন্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—ইউরোপের রেলপথ ও রাজপথ। যে-কোন লোক ফ্রান্সের প্যারিস হইতে রেলযোগে বার্লিন বা মস্কো ও তথা হইতে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দর ভ্লাডিভস্টক পৌছিতে পারে। আবার, ভারতে রেলপথ ও রাজপথ, ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে পাকিস্তান হইয়া ইরাণ পর্যন্ত গিয়াছে। এইগুলি বাণিজ্যপথ বটে;—কিন্তু আন্তর্দেশিক পথ;—সমুদ্রপথের মত আন্তর্মহাদেশিক পথ নহে।

(ক) রাজপথ।—পৃথিবীর বাণিজ্যিক স্থলপথগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে—

১। প্রধান-প্রধান রাজপথগুলি ;—যাহা দেশমধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথগুলি দেশের বিভিন্ন প্রদেশের, কখনও-কখনও অন্য দেশের ভিতর দিয়া যায়। ইহারা কখনও-কখনও বন্দরে আসিয়া শেষ হয়।

২। শাখাপথ ;—যেগুলি বৃহৎ রাজপথগুলির সম্পদ্ যোগান দেয়। ঐসব পথ কোন এক সন্ধিস্থান হইতে পশ্চাদ্ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩। সমরনীতি-সম্বন্ধীয় রাজপথ বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিশিষ্ট রাজপথ ;—এই--সব রাজপথে বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতা অতি অল্প।

ইহার পর মাঠের রাস্তা বা কাঁচা রাস্তা ;—ইহার উপর কদাচিৎ গরুর গাড়ী যায়। ইহার উপর দিয়া স্থানীয় বাণিজ্য চলে। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া ঐসব পথে বেশী যাতায়াত করে এবং মালপত্র মানুষ মাথায় করিয়া বা পিঠে বোঝাই দিয়া, বা জন্তুর পিঠে বোঝাই দিয়া স্থানান্তরিত করে।

কিন্তু এই গমন-পথের আদিম যুগে মানুষ পায়ে হাঁটিয়া প্রথমে ইহা সৃষ্টি করে। পরে সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে কাঁচা পথ ও পরিশেষে পাকা পথের সৃষ্টি হয়। এই পথগুলি নিজ-নিজ কার্য বাণিজ্যিক জগতে বাছিয়া লয়। যে-সমস্ত পথ কৃষিজাত বা শিল্পজাত পণ্য উৎপত্তি-স্থান হইতে কেন্দ্রীয় স্থানে সরবরাহ করে, উহারাই **শাখাপথ** বা সম্পদ্ যোগানদার বা **পোষক পথ** (Feeder roads)। কেন্দ্রীয় স্থান হইতে আবার রাজপথে বিভিন্ন অঞ্চলে মালপত্র সরবরাহ করা হয়। ঐ পথগুলিকে বলা হয় **কেন্দ্রীয় পথ** (Trunk road)।

বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হইলে যাতায়াতের পথ ও যানবাহনের সংস্কার হয়। আঁকা-বাঁকা রাস্তা ক্রমশঃ সোজা হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ দেখা যায় সঙ্গে-সঙ্গে অভিনব যানবাহনের প্রচলন হইয়াছে।

পূর্বে (৩৩৭ পৃঃ) এ-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এগুলিও বাণিজ্যের সহায়ক। সেজন্য, এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইল।

উত্তর আমেরিকার পূর্বভাগের রাষ্ট্রগুলি ও ক্যানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের রাষ্ট্রগুলি লইয়া যে-অংশ তাহা শিল্পবহুল ও লোকবহুল। সেজন্য এই অংশে রাজপথ ও রেলপথ চারিদিকে বিস্তৃত। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মোটর গাড়ী এই অঞ্চলেই আছে। এই অঞ্চলের পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশ এই পথে মোটরগাড়ীযোগে বাহিত হয়। এই পথগুলিই প্রধানতঃ রেলপথের পোষক পথ। আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম

ভাগেও রেলপথ ও রাজপথ বিশেষ বিস্তৃত; এবং রকি পর্বতের ভিতর দিয়া পূর্বদিকের রাজপথ ও রেলপথের সহিত সংযুক্ত।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশ সমৃদ্ধিশালী। সেজন্য এখানেও উত্তর-পূর্ব উত্তর আমেরিকার মতই বাণিজ্যপথ আছে। কিন্তু এ-অঞ্চলে উত্তর আমেরিকার মত অত বেশী মোটরগাড়ী নাই।

এশিয়ায় জাপানেও বাণিজ্যপথ বিশেষ বিস্তৃত। কিন্তু জাপান দরিদ্র দেশ। তাই এখানে ইউরোপ বা আমেরিকার মত মোটরগাড়ী নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে অঞ্চলে এবং ব্রাজিলের পূর্ব-ভাগের মধ্যাঞ্চলে, **অষ্ট্রেলিয়ার** মারে-ডার্লিং উপত্যকায় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে শিল্পসমৃদ্ধি আছে, ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেজন্য এইসকল অঞ্চলে রেলপথ ও রাজপথ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

ভারতে কলিকাতা সহর হইতে **গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** অমৃতসর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ পথ আবার পাকিস্তানে করাচী বন্দরের সহিত অপর এক রাজপথ দ্বারা যুক্ত। এই পথগুলি প্রায়ই পাকা ও অনেক সেতু-বিশিষ্ট। পাকা রাস্তা আঁকিয়া-বাঁকিয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ হইয়া কতশত মাইল বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিস্তৃত রাজপথগুলি বাণিজ্যের সহায়ক। রাজপথগুলির সহিত শাখাপথ হেলিয়া-দুলিয়া মিলিত হইয়াছে। রাজপথের উপর দিয়া মোটরগাড়ী ও গরুর গাড়ী, এবং ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করে। তবে সত্বর যাতায়াতে মোটরগাড়ী বিশেষ কার্যকরী। শাখাপথে গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর আধিপত্য বেশী।

ভারতের অন্য জাতীয় রাজপথ—আগ্রা-বোম্বাই পথ, মান্দ্রাজ-বোম্বাই-বাঙ্গালোর পথ, মান্দ্রাজ-কলিকাতা পথ, কলিকাতা-নাগপুর-বোম্বাই পথ, বেনারস-নাগপুর হায়দারাবাদ-কুর্নুল-বাঙ্গালোর-কুমারিকা পথ, দিল্লী-আমেদাবাদ-বোম্বাই পথ। আরও এইরূপ "জাতীয় পথ" প্রস্তুত করা হইতেছে।

(খ) পৃথিবীর মধ্যে আন্তর্জাতিক **মহাদেশীয় রেলপথ**গুলির সংখ্যা অল্প—ছয়টি মাত্র। যেমন;—

১। **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ**	৪। **ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ**
২। **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক্-রেলপথ**	৫। **চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ**
৩। **ক্যানাডিয়ান ন্যাশান্যাল রেলপথ**	৬। **কেপ-কাইরো রেলপথ**

১। **ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ।**—এই পথটি সাইবিরিয়ার ভ্লাডিভষ্টক নামক প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর হইতে সরাসরি আমুর নদীর পার্শ্ব দিয়া, বৈকাল

হ্রদের পার্শ্ব দিয়া, খনি অঞ্চলের মধ্য দিয়া, ওবি ও ইনিসি নদীর অববাহিকার মধ্য দিয়া, ইউরালের দক্ষিণ দিয়া, রুশের বিস্তৃত সমভূমি অতিক্রম করিয়া মস্কো সহরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। মস্কো সহর ও রাজধানী রেলপথে রুশের অন্যান্য সহর ও সহরতলীর সহিত যুক্ত। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের সহিতও ইহার যোগাযোগ রহিয়াছে।

২ ও ৩। **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক্ ও ক্যানাডিয়ান ন্যাশান্যাল রেলপথদ্বয়** আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উপকূল ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের যোগসূত্র। এই রেলপথদ্বয় নির্মাণের ফলে ক্যানাডার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলপথদ্বয় সমতল গোধূম ক্ষেত্রের ও লোকবসতির উন্নতির একমাত্র কারণ। রেলযোগে অতিরিক্ত গম রপ্তানি করা হয়। কাষ্ঠখণ্ডগুলিও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান দেওয়া হয়।

২। **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথটি** সেণ্ট জন নামক স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। সেণ্ট লরেন্স পার হইয়া মণ্ট্রিল সহরে পৌঁছিবার পর রেলপথ অটোয়া হইয়া সাড্‌বেরী ও পরে পোর্ট আর্থার হইয়া উইনিপেগ সহরে পৌঁছে। এখান হইতে রেলপথ রেজিনা, মেডিসিন হাট হইয়া ভাঙ্কুবার বন্দর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রকি পর্বত অঞ্চলে রেলপথ কিকিং হর্স গিরিপথ দিয়া, টম্‌সন্ ও ফ্রেসার নদীর উপত্যকায় পৌঁছিয়াছে।

৩। **ক্যানাডিয়ান ন্যাশান্যাল রেলপথটি** পূর্বাঞ্চলে কুইবেক বন্দর হইতে পশ্চিমে ভাঙ্কুবর ও প্রিন্স রুপার্ট বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথটি কুইবেক হইতে হ্রদ অঞ্চলের বহু উত্তর দিয়া উইনিপেগে গিয়াছে। উইনিপেগ হইতে পশ্চিম দিকে যাইবার সময় রেলপথ সাস্‌কাটুন ও এড্‌মন্‌টন্ সহর দিয়া রকি পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছিয়াছে। পরে জ্যাসপার, ন্যাশান্যাল পার্ক ও ইয়েলো হেড গিরিপথ দিয়া রকি পর্বত পার হইয়া ফ্রেসার উপত্যকায় আসিয়াছে। পরে স্কিনা নদীর উপত্যকা ধরিয়া রেলপথ প্রিন্স রুপার্ট বন্দরে পৌঁছিয়াছে। ইহার অন্য শাখা রকি হইতে ভাঙ্কুবর গিয়াছে।

৪। **ট্রান্স-ক্যাস্‌পিয়ান রেলপথ**।—এই রেলপথটি আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জুলফিকার সহর হইতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে গিয়াছে। এই পথ টার্কোমান, উজবেকিস্তান, তুর্কিস্তান, কাজাকস্তান প্রদেশগুলির মধ্য দিয়া রুশের মস্কো সহরে পৌঁছিয়াছে। আফগানিস্তানে হেলমণ্ড ও হারিরুড উপত্যকায় প্রায় ৪০০ শত মাইল রেলপথ তৈয়ার করিলে সোভিয়েট রেলপথ পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথের সহিত যুক্ত

হইতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের রেলপথ কোয়েটা হইয়া, চামস্ দিয়া জাহিদান পর্যন্ত বিস্তৃত। জাহিদান পারস্য ও আফগান সীমান্তে অবস্থিত। ইহা আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৫। **চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ।**—এই রেলপথ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলকে যোগ করিতেছে। ইহা পূর্ব উপকূলের বুয়েনেস আইরেস্ হইতে পশ্চিম উপকূলে ভ্যালপারাইসো পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা এণ্ডিজ পর্বতের মেনডোথা (Mendoza) সহর দিয়া গিয়াছে। পূর্বভাগে গম জন্মে ও পশুচারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায় খনিজ সম্পদ্ ও ভূমধ্যসাগরীয় ফলমূল। উভয় অঞ্চলে অতিরিক্ত সম্পদ্ পণ্য হিসাবে আমদানি ও রপ্তানি হয়।

৬। **কেপ-কাইরো রেলপথ।**—আফ্রিকার এই পথ অবিচ্ছিন্ন নহে। আফ্রিকার দক্ষিণে কেপ টাউন বন্দর হইতে রেলপথ কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল) পর্যন্ত বিস্তৃত। পরে নদী ও স্থলপথে ভিক্টোরিয়া হ্রদ পর্যন্ত পৌছিতে হয়। এখান হইতে মোটর-গাড়ীতে করিয়া কিছুদূর যাইতে হয়। পরে নীল নদী দিয়া ষ্টীমারযোগে খার্টুম সহরে পৌছান যায়। পরে খার্টুম হইতে রেলপথ কাইরো পর্যন্ত গিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে রেলপথ কেবল দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূল দিয়া গিয়াছে। মহাদেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত যে-রেলপথটি গিয়াছে, তাহার গন্তব্যস্থল স্বর্ণখনি-অঞ্চল।

মহাদেশীয় রেলপথগুলি যুদ্ধকালে প্রধানতঃ প্রথম নির্মিত হয়। বিগত মহাযুদ্ধে কোন-কোন স্থানে বিশেষ-বিশেষ পাকা রাস্তা ও রেলপথ নির্মিত হয়। চীন ও ব্রহ্মে যাইবার দুইটি বিশেষ রাস্তা নির্মিত হয়। লেডো রোডটি আসামের সাদিয়া অঞ্চল হইতে ইয়ুনান মালভূমি পার হইয়া চুংকিং পর্যন্ত যায়। এই পথে যুদ্ধের রসদ ও সরঞ্জাম মোটরগাড়ী করিয়া চীনে রপ্তানি করা হয়। ব্রহ্মদেশ হইতেও বর্মা-রোড চীনে গিয়াছে।

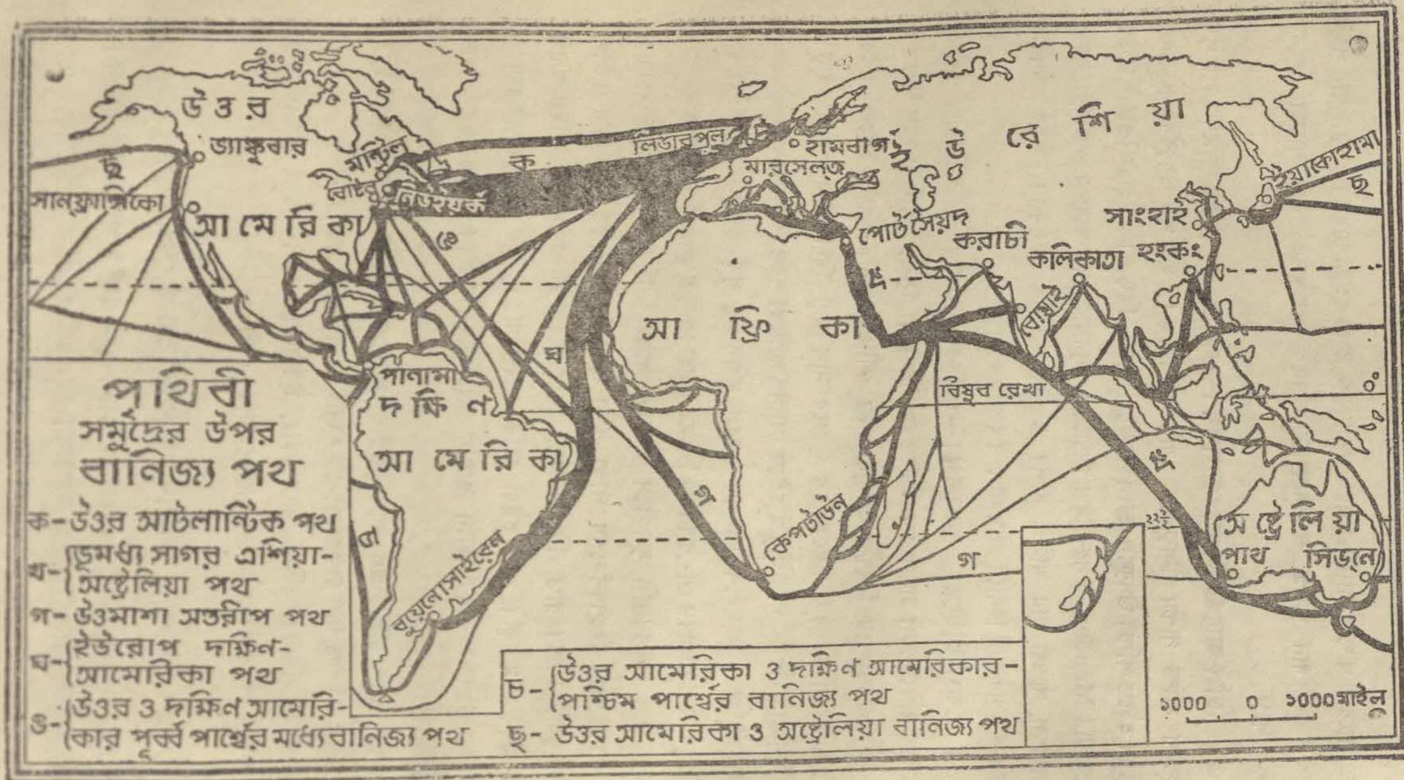
রেলপথগুলির সহিত জলপথ ও অন্যান্য স্থলপথের নিকট সম্বন্ধ। আভ্যন্তরীণ জলপথ ও পাকা রাস্তাগুলি রেলপথগুলিকে সর্বদাই পোষণ করিতেছে।

উত্তর আমেরিকার, দক্ষিণ আমেরিকার, ইউরোপের যে-যে স্থলে রাজপথ বেশী, একই কারণে সাধারণতঃ সেইসকল স্থানে রেলপথও বেশী।

২। পৃথিবীর জলপথ (আন্তর্জাতিক ও দেশমধ্যস্থ)

(অ) পৃথিবীর ছয়টি সামুদ্রিক জলপথই প্রধান,—এই ছয়টিই আন্তর্জাতিক জলপথ।

(১) **উত্তর আটলান্টিক জলপথ।**—ইহার এক দিকে লণ্ডন, ও অন্য দিকে নিউ ইয়র্ক। কিন্তু শাখা-প্রশাখা লইয়া ইহা আমেরিকার দিকে মেক্সিকো হইতে


পৃথিবী
সমুদ্রের উপর
বানিজ্য পথ
ক- উত্তর আটলান্টিক পথ
খ- ভূমধ্য সাগর এশিয়া- অষ্ট্রেলিয়া পথ
গ- উত্তমাশা অন্তরীপ পথ
ঘ- ইউরোপ দক্ষিণ- আমেরিকা পথ
ঙ- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্ব পার্শ্বের মধ্যে বানিজ্য পথ
চ- উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার- পশ্চিম পার্শ্বের বানিজ্য পথ
ছ- উত্তর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া বানিজ্য পথ
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আফ্রিকা
ইউরেশিয়া
অষ্ট্রেলিয়া
ভ্যাঙ্কুবার
সানফ্রান্সিস্কো
মন্ট্রিল
বোষ্টন
নিউইয়র্ক
লিভারপুল
হামবার্গ
মারসেলজ
পোর্টসৈয়দ
করাচী
বোম্বাই
কলিকাতা
সাংহাই
হংকং
ইয়াকোহামা
পানামা
বুয়েনোসাইরেস
কেপটাউন
সিডনে
বিষুব রেখা
১০০০ ০ ১০০০মাইল

১২৪ নং চিত্র।

নিউফাউল্যাণ্ড, এবং ইউরোপের দিকে ভূমধ্যসাগর হইতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত দেশেই বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রব্য ও কাঁচামাল-উৎপাদন-স্থান, এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিক্রয়-স্থান।

(২) **দক্ষিণ আট্‌লাণ্টিক জলপথ।**—এই জলপথের এক দিকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগর, অথবা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র,—ও অন্য দিকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বভাগ ;—এক দিকে শিল্পপ্রধান স্থান, ও অন্য দিকে কৃষিপ্রধান স্থান। কিন্তু আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে অবস্থিত আফ্রিকার সহিত দক্ষিণ আমেরিকার কোন বাণিজ্য নাই। কারণ এই দুইটির কোনটি শিল্পপ্রধান নহে ;—এবং পরস্পরের বিনিময়ের উপযোগী কোন দ্রব্য নাই।



১২৫ নং চিত্র।

(৩) **পানামা পথ।**—এই খাল ১৯১১ সালের ১৪ই আগষ্ট হইতে জাহাজ যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। পানামা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ ৫০০ মাইল বিস্তৃত যোজক ছিল। এক্ষণে ইহা কাটিয়া খাল করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমেরিকার পূর্ব পার্শ্ব হইতে পশ্চিম পার্শ্বে যাইতে হইলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত হর্ণ অন্তরীপের পাশ দিয়া যাইতে হইত। এক্ষণে এই খালের মধ্য দিয়া সহজেই আট্‌লাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে যাওয়া যায়।

এই খালের দৈর্ঘ্য—৫০০৭ মা.; তলার বিস্তার ৬০০ হইতে ১০০০ ফিট। এই খালের মধ্যে মিরাফ্লোরস্ ও গাটুন নামে দুইটি হ্রদ সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২টি অর্গল দ্বারা এই পথে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই পথ অতিক্রম করিতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা লাগে।

এই পথ সম্বন্ধে এমন দুইটি কথা বলা যায়, যাহা শুনিলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কথা দুইটি সত্য। আমরা জানি আমেরিকার পূর্বে আট্‌লাণ্টিক ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু এই খালের একখানি চিত্র লইয়া দেখ, ইহার পশ্চিমে আট্‌লাণ্টিক ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর। এই স্থানে পানামা যোজক এরূপ বাঁকের সৃষ্টি করিয়াছে যে, এই খালের চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে পশ্চিমে আট্‌লাণ্টিক ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরই পড়ে। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে-দুটি হ্রদের ভিতর দিয়া খাল চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মিরাফ্লোরসের উচ্চতা ৫৫ ফিট এবং গাটুনের উচ্চতা ৮৫ ফিট। তাহা হইলে কি এই পথে উপরে উঠিতে হয়? তাহা নহে, জল নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই পথে জাহাজ চলে।

পানামা-পথ উন্মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্যক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আট্‌লাণ্টিক অঞ্চলে, বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যেমন,—

ইহাতে উত্তর আমেরিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম দিকের বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে পশ্চিম ক্যানাডা, পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ভাগের বাণিজ্য করা সহজ হইয়াছে ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউজিলণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়াছে। নিউজিলণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চল হইতে খনিজদ্রব্য ও শিল্পোপকরণ এক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ভাগে আসিতেছে ও সেখান হইতে শিল্পদ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগে যাইতেছে।

আট্‌লাণ্টিকের বন্দর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বন্দরের দূরত্ব কমিয়াছে। নিউ-ইয়র্ক ও লিভারপুল হইতে সানফ্রান্‌সিস্কোর দূরত্ব যথাক্রমে ৭৯০০ মা. ও ৫৭০০ মা. কমিয়া গিয়াছে।

জাপান ও পূর্ব-যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে এবং এই দুই অঞ্চলের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৪) **ভূমধ্যসাগর-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া জলপথ বা সুয়েজপথ।**—গুরুত্বে উত্তর আট্‌লান্টিক বাণিজ্যপথের পরেই ইহার স্থান। ইহা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরতীরস্থ স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডকে যোগ করিয়া দিয়াছে। সুয়েজ যোজক কাটিয়া খাল করিবার পর হইতে এই পথের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পূর্বে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া উত্তমাশা-অন্তরীপ-পথেই ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য হইত। ভাস্কো-ডা-গামা এই অন্তরীপ-পথেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

এই পথে এশিয়ার মধ্যে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বন্দরের অনেকগুলি অবস্থিত। এই পথে যেমন সরাসরি এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাণিজ্য চলে তেমনি এই অঞ্চলে অন্য বাণিজ্যপথ কম বলিয়া খণ্ড বাণিজ্যও চলে; বরং শেষোক্ত বাণিজ্য বেশী চলে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগরে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপানে, স্থানীয় খণ্ড বাণিজ্য চলে। তথাপি এই পথের বাণিজ্যস্থানগুলি এরূপ দরিদ্র দেশে অবস্থিত যে, বাণিজ্যের পরিমাণ উত্তর আট্‌লান্টিক পথের বাণিজ্য অপেক্ষা কম।

সুয়েজখাল এই পথের দ্বারস্বরূপ। সুয়েজ পূর্বে ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার যোজক। সেজন্য তখন ভারত মহাসাগরের কোন অংশ হইতে ইউরোপে যাইতে হইলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্স এই যোজক কাটিয়া খাল করিবার পরিকল্পনা করেন ও ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে এই খালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। ইহাতে ভূমধ্য-সাগর ও লোহিত সাগর সংযুক্ত হয়, এবং এক অবিচ্ছিন্ন ভূমধ্যসাগর-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্যপথের সৃষ্টি হইয়াছে। সুয়েজখালের দৈর্ঘ্য ১০১ মাইল, বিস্তার ১০৫ ফিট্, ও গভীরতা ৩৫ ফিট্ ও তদূর্ধ্ব। এই খাল কাটিয়া এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যাতায়াত সহজ হইয়াছে এবং এই সুয়েজ-লোহিতসাগর পথ সমগ্র ভূমধ্য-সাগর-অস্ট্রেলিয়া পথের প্রধান অংশ। পূর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল এশিয়ায়। এই খাল কাটার জন্য তাঁহাদের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহারা এই খাল পরিচালক-সঙ্ঘের অধিক অংশ কিনিয়া এই খালের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এই খালের উপর মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা ভূমধ্যসাগর-লোহিতসাগর-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া জলপথে বাণিজ্যের পক্ষে সহজ ও নিরাপদ করিয়া দিয়াছে। এই খালের একটি সুবিধা এই যে, ইহার উভয় দিকেই জাহাজে ইন্ধন যোগাইবার স্থান আছে। ইহার একদিকে এডেন, এবং অন্য দিকে সৈয়দ বন্দর হইতে কয়লা পাওয়া যায়, এবং

অদূরেই ইরাণ ও ইরাক তৈলখনি হইতে তৈল পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ ভূমধ্য-সাগর-অস্ট্রেলিয়া জলপথে কলম্বো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি আরও বড়-বড় কয়লা লইবার স্থান আছে। এবং এই পথ উন্মুক্ত হওয়াতে,—

(১) প্রাচ্যের ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সহিত দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ সহজে যুক্ত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। লণ্ডন হইতে বোম্বাই-এর দূরত্ব উত্তমাশা অন্তরীপ-পথে ১১২০০ মাইল কিন্তু সুয়েজ-পথে ৬৩০০ মাইল। সুতরাং সুয়েজ-পথে বোম্বাই এর দূরত্ব মোটামুটি ৪৯০০ মাইল কমিয়াছে। লণ্ডন হইতে কলিকাতার দূরত্ব উত্তমাশা অন্তরীপ-পথে ১১৫০০ মাইল, কিন্তু সুয়েজ-পথে ৭৫০০ মাইল। সুতরাং কলিকাতার দূরত্ব মোটামুটি ৪০০০ সামুদ্রিক মাইল কমিয়া গিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে জানিয়া রাখা ভাল যে, এই খালের জন্য ভারতবর্ষ ও ইউরোপের দূরত্ব যেরূপ কমিয়াছে, জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের দূরত্ব ততদূর কমে নাই। লণ্ডন ও লিভারপুল হইতে এই পথে ইয়াকোহামার দূরত্ব কমিয়াছে ৩০০০ মা.,—সিড্‌নির ১০০০ মা.। সুতরাং এই পথের জন্য ভারতবর্ষের লোকের ইউরোপযাত্রার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

(২) এই পথে "লাইনার"-জাহাজ বেশী চলে। (৩৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য), "ট্রাম্প" জাহাজ (৩৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য) কম চলে। কারণ, লাইনার-জাহাজের গতি বেশী হইয়া থাকে। সেইজন্য ইউরোপ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া-যাত্রী "লাইনার" এই পথে যায়। ট্রাম্পের মধ্যে যেগুলি ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল লইয়া যায়, সেগুলি সুয়েজ-পথেই যায়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া হইতে আগত "ট্রাম্প" উত্তমাশা-অন্তরীপ-পথেই যায়। আবার অন্তরীপ-পথের মাশুল কম বলিয়া ট্রাম্পগুলি প্রধানতঃ সেই পথেই যায়।

(৩) দূরত্ব কমের জন্য বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যও কমিয়া গিয়াছে।

দ্রষ্টব্য।—ভূমধ্যসাগর—এশিয়া—অস্ট্রেলিয়া জলপথ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বিস্তৃত সুদীর্ঘ সর্বশ্রেষ্ঠ **ট্রাঙ্ক (Trunk) পথ**। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে ইহা আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগর, সুয়েজখাল, ভারত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সুদূর পূর্বে গিয়াছে। এই পথের পশ্চিম প্রান্তে ইহা একদিকে ইউরোপ ও অন্য দিকে আমেরিকার বাণিজ্য বহন করিতেছে। আবার পূর্ব প্রান্তে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক দিকে অস্ট্রেলিয়ায়, এবং অন্য দিকে চীন ও জাপানে গিয়াছে; সুতরাং ইহা এশিয়া, ইউরোপ. উ. আমেরিকা, উ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পাঁচটি মহাদেশের উপকার সাধন করিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমগ্র স্থল-গোলার্ধের মধ্যে ইহা সংযোগ সাধন করিয়াছে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোকের বাণিজ্যপথ ইহার সহিত সংযুক্ত। পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, এবং পশ্চিমের যান্ত্রিক শিল্প ও পূর্বের কুটীর ও কৃষি শিল্পের মধ্যেও ইহা যোগ সাধন করিতেছে। মোটকথা পৃথিবীর মধ্য ভাগের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বাণিজ্য করিবার ইহা অবিচ্ছিন্ন পথ।

সুয়েজ- ও পানামা-খাল।—এক বিষয়ে এই দুই খালের সামঞ্জস্য আছে। এই দুইটি খালই জলপথের দূরত্ব, সুতরাং দুই স্থানে যাতায়াতের সময় ও মাশুল, কমাইয়া দিয়াছে;—পানামা কমাইয়াছে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব-যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ-আমেরিকা ও পশ্চিম-উত্তর-আমেরিকার বন্দরসমূহের, এবং সুয়েজ কমাইয়াছে ইউরোপ ও এশিয়ার। কিন্তু অনেক বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য আছে। যেমন,

(১) পানামার তলদেশ ৩০০ হইতে ১০০০ ফিট্ বিস্তৃত এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৪১ ফিট্। কিন্তু সুয়েজের তলদেশের বিস্তার—১৫০ ফিট্ ও সর্বনিম্ন গভীরতা—৩৫ ফিট্। সুতরাং পানামার ভিতর দিয়া যত বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে, সুয়েজের ভিতর দিয়া তাহা পারে না।

(২) পানামার দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল, সুয়েজের দৈর্ঘ্য ১০১ মা.। পানামা পার হইতে ১২টি অর্গল পার হইতে হয়। কিন্তু সুয়েজে কোন অর্গল নাই। তথাপি পানামা পার হইতে ৬—৮ ঘণ্টা এবং সুয়েজ পার হইতে ১৬ ঘণ্টা লাগে।

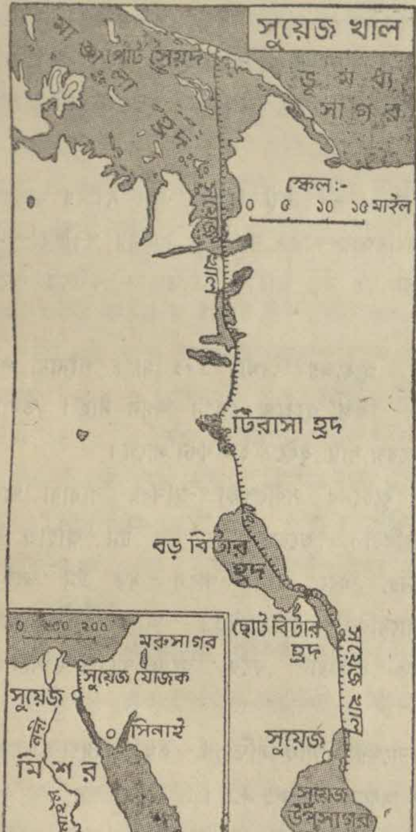
(৩) সুয়েজ-খালের দ্বারা গ্রেট্ বৃটেনের সর্বাপেক্ষা সুবিধা, পানামা খালে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সুবিধা। সুয়েজ-খালে যত টন জাহাজ যায় তাহার প্রায় অর্ধেক গ্রেট্ বৃটেনের, এবং পানামা-খালে যত টন জাহাজ যায় তাহার প্রায় ৪০ শতাংশ আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের। আবার পানামা-খালে গ্রেট্ বৃটেনের সওদাগরী জাহাজ যত যাতায়াত করে, সুয়েজ-খালে আমেরিকীয় জাহাজ তত যাতায়াত করে না।

(৪) সুয়েজ-পথ পৃথিবীর মধ্যভাগের লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চল দিয়া গিয়াছে, কিন্তু পানামা-খাল এরূপ লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত নহে।

(৫) সুয়েজ-খালের সহিত আফ্রিকার উত্তমাশা-পথের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পানামা-খালের সহিত দ. আমেরিকার হর্ণপথের সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

(৬) সুয়েজ-পথে ভারতের তৈলবীজ, চা, তুলা, চর্মদ্রব্য, পাটদ্রব্য, পাকিস্তানের তুলা ও পাট, জাপানের রেশম প্রভৃতি, অস্ট্রেলিয়ার পশম ও মাংস, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার রবার, পূর্ব আফ্রিকার তুলা এবং আরব ও

ইরাণের কতক তৈল ইউরোপে ও আমেরিকায় চালান যায়, এবং ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রাচ্য দেশে আসে। আর, পানামা পথে উত্তর-পশ্চিম উত্তর আমেরিকা হইতে কাষ্ঠাদি, ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে তৈলাদি, চিলি হইতে তাম্র ও নাইট্রেট, জাপানের রেশম পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে যায় এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পণ্যদ্রব্যাদি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের দেশগুলিতে যায়।



১২৬নং চিত্র।—সুয়েজ-খাল

সুয়েজ-পথ ও পানামা-পথ পূর্ব এশিয়া ও অষ্ট্রেলেশিয়াতে মিলিত হইয়াছে। লিভারপুল হইতে যে সকল জাহাজ এশিয়ার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের বন্দরে যায়, উত্তরে ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত এবং পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নে ও ব্রিস্‌বেনে যাইতে হইলে তাহাদের সুয়েজ-পথেই যাওয়া সুবিধাজনক;—কিন্তু যেগুলি এশিয়ার উপকূল দিয়া দক্ষিণে হংকং পর্যন্ত এবং পশ্চিমে অস্ট্রেলিয়ার এলবেনিতে যায়, তাহাদের পানামা-পথেই যাওয়া সুবিধাজনক। সুতরাং পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ার কতকাংশে পানামা ও সুয়েজ—এই দুই পথের জাহাজই গিয়া থাকে।

(৫) **উত্তমাশা অন্তরীপ-পথ।**—উত্তমাশা অন্তরীপ-পথ পাশ্চাত্য দেশে আরম্ভ হইয়াছে নিউ ইয়র্কে ও ইংলিশ চ্যানেলে,—পরে উত্তমাশা অন্তরীপে একত্র হইয়া আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক পথ গিয়াছে পূর্ব-আফ্রিকার তীর ধরিয়া উত্তরে,—দ্বিতীয় পথ গিয়াছে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে,—এবং তৃতীয় শাখা

গিয়াছে অস্ট্রেলিয়ায়। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য ইউরোপের সহিত প্রধানতঃ এই পথেই হইয়া থাকে।

এই পথ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাণিজ্যপথ,—ভাস্কো-ডা-গামা ইহার আবিষ্কারকর্তা। যখন জাহাজ পাইল-ভরে চলিত, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুভরে, ও এই বায়ু-তাড়িত কুমেরু স্রোতে দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকা হইতে অস্ট্রেলিয়া যাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু বিপরীত বাতাসে ও বিপরীত স্রোতে এই পথে আসা যাইত না। অস্ট্রেলিয়া হইতে আসিবার সময় পূর্বমুখে গিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসা সহজ ছিল। স্যুয়েজ-পথ উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে এই পথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যপথ ছিল। একে ত দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণিজ্যদ্রব্য কম, তাহাতে ইহার বন্দরের সহিত সংযোগের অভাব, তাহার উপরে ইহার বন্দরগুলির ভাল পোতাশ্রয় নাই, সুতরাং পরে স্যুয়েজ-পথ উন্মুক্ত হইলে ইহার অবনতি হয়। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যদ্রব্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইহার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

(৬) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ**।—প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান পথ দুইটি;—(ক) **উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ**, ও (খ) **দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ**।

(ক) **উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ**।—ইহার এক দিকে আমেরিকীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের পশ্চিম পার্শ্ব, এবং অপর দিকে পূর্ব-এশিয়া। উত্তর-আট্‌লান্টিক পথে যেমন বৃহৎ বৃত্তের চাপ অনুসরণ করিয়া নৌবাহন প্রয়োজনীয়, এই পথে ইহা তদধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, দুই ধারের প্রধান বাণিজ্যস্থানগুলি প্রায় একই অক্ষরেখার উপর অবস্থিত, এবং দুই স্থানের দূরত্ব এত বেশী যে, বৃত্তের উত্তর দিকে বেশী বাঁকিয়া যাইতে হয়। পানামা-খাল কাটিয়া দেওয়ায় এই পথের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে মেক্সিকো উপসাগর হইতেও এই পথে জিনিষ রপ্তানি হয়। সেজন্য আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব তীরের—কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ, মধ্য যুক্তরাষ্ট্রের—গম ও ময়দা, ক্যালিফোর্নিয়ার খনিজ তৈল, টিনে-রক্ষিত ফল, জমির সার ও মেক্সিকো-অঞ্চলের—তূলা, গন্ধক, প্রভৃতি এই পথে রপ্তানি হয়; এবং পূর্ব-এশিয়া হইতে রেশম, চা, গালার দ্রব্য, খেলনা, বাজি প্রভৃতি এখানে আমদানি হয়।

(খ) **দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান পথ**।—এই পথে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডের সহিত আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম তীরের ভাঙ্কুবর, সিয়াট্‌ল্, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো ও লস এঞ্জেলস্ প্রভৃতি বন্দরের সংযোগ রহিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথের অনেকগুলি শাখা হয়াই দ্বীপে মিলিত হইয়াছে।

(আ) দেশমধ্যস্থ জলপথ।—মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি নদী ও কৃত্রিম খাল দ্বারা যানবাহনের সুবিধা হয়। **আ. যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ-অঞ্চলে** কয়েকটি খাল কাটিয়া তাহার দ্বারা পঞ্চহ্রদের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি কার্যে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে (৩৪৬ পৃ.)। এই হ্রদগুলি আবার খাল কাটিয়া হাডসন নদী ও মিসিসিপি নদীর উপনদী ইল্লিনইস-এর সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (৩৪৭ পৃ.)। **ডেনমার্কের দক্ষিণে কীল খাল** বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরকে যোগ করিয়াছে (১১৯নং চিত্র)। জার্মানির অভ্যন্তরস্থ **নদীগুলি যোগ করিয়া** বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডে **মাঞ্চেস্টর খাল** বয়নশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। লিভরপুল বন্দরটিকে উহা মাঞ্চেস্টর সহরের সহিত যোগ করিয়াছে। খালটি ২৮ ফিট্ গভীর ও ১০৯ ফিট্ প্রশস্ত। সুতরাং সাধারণ ভারবাহী জাহাজ অনায়াসে এই পথে যাতায়াত করিতে পারে। মাঞ্চেস্টর খাল ৩৫ মাইল দীর্ঘ।

৩। পৃথিবীর আকাশপথ

আকাশপথে যাতায়াতের এখন ক্রমশঃ সুবিধা হইতেছে। পার্বত্য অঞ্চলে আকাশপথে যাওয়া নিরাপদ নহে। বাণিজ্যিক হিসাবে সমতলের উপর আকাশপথে যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে। তবে আকাশপথে যাতায়াতের খরচ এত বেশী যে, সাধারণ লোক আকাশপথে যাইতে পারে না। পূর্বে (৩৭১ পৃ.) দেশের মধ্যে আকাশপথে চলাচলের কথা কিছু-কিছু বলিয়াছি। এক্ষণে পৃথিবীর বিখ্যাত উড়োজাহাজ চলাচলের আন্তর্জাতিক পথগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

আন্তর্জাতিক আকাশপথ

১। **ইউরোপ—এশিয়া—অস্ট্রেলিয়া-পথ।**—এই পথে বৃটিশের বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের (British Overseas Airways Corporation—B.O.A.C.), হলণ্ডের রয়াল ডাচ এয়ারলাইন্স্ (Royal Dutch Airlines—K.L.M.), এবং ফ্রান্সের এয়ার ফ্রান্স (Air France—A. F.) আকাশযান চলে। এই তিন দেশেরই উপনিবেশ এই পথে আছে। অবশ্য, হলণ্ডের উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। তথাপি হলণ্ডের কিছু-কিছু স্বার্থ এখনও ইন্দোনেশিয়ার সহিত জড়িত আছে।

প্রধান বৃটিশ আকাশপথটি লণ্ডনের সন্নিহিত ক্রয়ডন বা সাউথ-হাম্পটন হইতে আরম্ভ করিয়া মার্সেল্‌স্‌, জুরিক, বেইরুট, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, দমদম, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, পেনাং, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, ডারউইন ও ব্রিসবেন হইয়া সিড্‌নি যায়। ইহার এক শাখা ডারউইন হইতে বাঁকিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে পার্থ পর্যন্ত যায়। লণ্ডন হইতে এই পথে অন্য আকাশযান টোকিও যায়।

এই পথেই ডাচ আকাশযান জাকার্তা ও টোকিও পর্যন্ত এবং ফরাসী আকাশযান সৈগন হইয়া হংকং—ম্যানিলা ও টোকিও পর্যন্ত যায়।

বৃটিশের অন্য আকাশযান লণ্ডন হইতে বোম্বাই কিংবা লণ্ডন হইতে বোম্বাই ও কলিকাতা হইয়া সিঙ্গাপুর যায়।

২। **ইউরোপ-আফ্রিকা আকাশপথ।**—ইউরোপের বিভিন্ন অংশের সহিত আফ্রিকা বিমানপথে সংযুক্ত আছে। বৃটিশ আকাশযান সাউথ-হাম্পটন হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া লেগস্‌ পর্যন্ত যায়। অন্য শাখা খার্টুম হইতে অন্যপথে কেপটাউন পর্যন্ত যায়।

ফরাসী বিমানপথের এক শাখা বাথার্ষ্ট হইয়া বিষুবরৈখিক আফ্রিকা পর্যন্ত এবং অন্য শাখা সাহারা ও কঙ্গো হইয়া মাদাগাস্কার পর্যন্ত গিয়াছে।

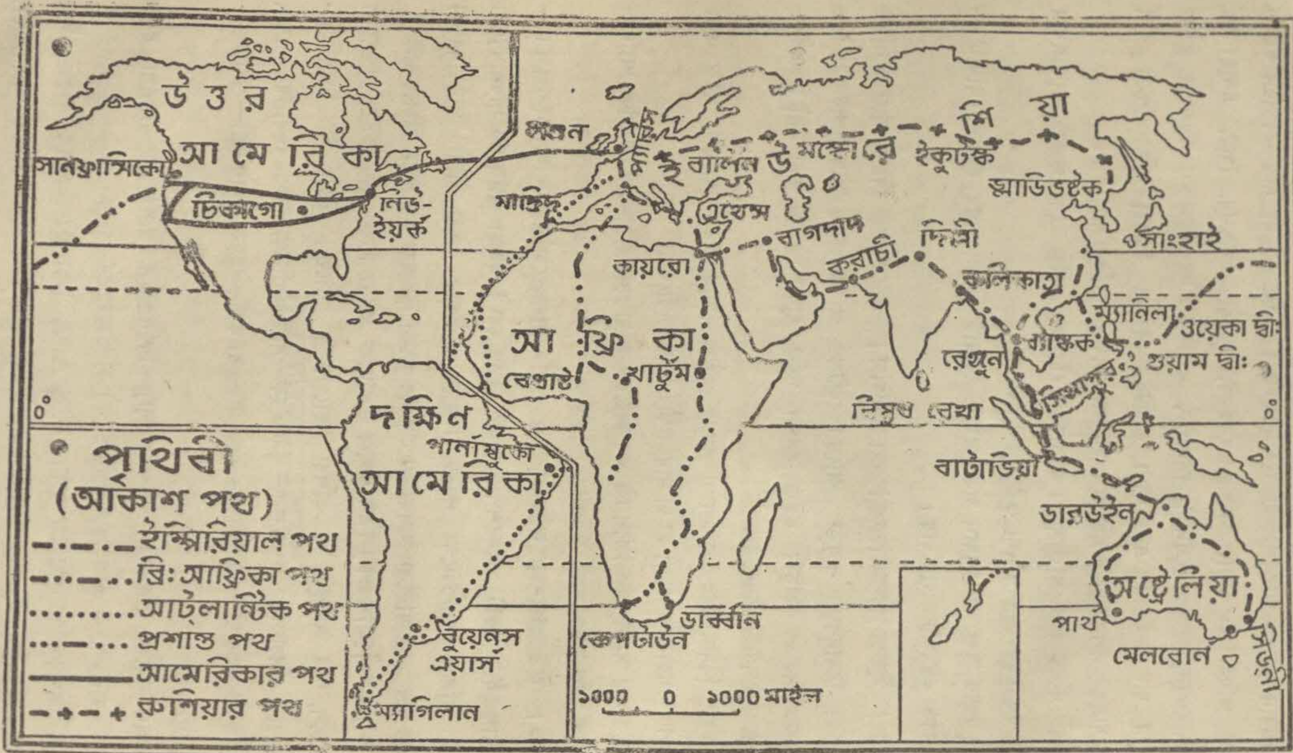
ইতালীর আকাশযান ত্রিপোলি ও কায়রো হইয়া আবিসিনিয়ার অন্তর্গত আদিস-আবাবা পর্যন্ত যায়।

৩। **ইউরোপ-আমেরিকা ও এশিয়া-আমেরিকা আকাশপথ।**—ইউরোপ হইতে একটি আকাশপথ বাথার্ষ্ট (গাম্বিয়া) হইয়া ব্রাজিলের পারনামবুকো হইয়া চিলিতে স্যান্টিয়াগো পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার অন্য শাখা পারনামবুকো হইতে বুয়োনোস আইরেস অথবা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্য-অন্য স্থানে গিয়াছে।

প্যান-আমেরিকান-বিমানপথ একদিকে আট্‌লান্টিক পার হইয়া ইউরোপ মহাদেশে, পরে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশদ্বয়ে পৌছে। ইহার উ. আমেরিকা-ইউরোপ-এশিয়া-পথ এইরূপ,—নিউইয়র্ক—সানফ্রানচিস্কো—লণ্ডন—প্যারিস—রোম—বেইরুট—করাচী—কলিকাতা—রেঙ্গুন—ব্যাঙ্কক—হংকং—ম্যানিলা—টোকিও—হনোলুলু।

অন্য দিকে সান্‌ফ্রান্‌চিস্কো, হনোলুলু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলা হইয়া অস্ট্রেলিয়ায়, অথবা এশিয়ার অন্তর্গত চীনের ক্যান্টন সহরে পৌছে।

বৃটিশ ও দক্ষিণ আমেরিকা (B. S. A. A.) আকাশ পথ।—লণ্ডন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের উপর দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছে।


পৃথিবী
(আকাশ পথ)
ইম্পিরিয়াল পথ
ব্রিঃ আফ্রিকা পথ
আটলান্টিক পথ
প্রশান্ত পথ
আমেরিকার পথ
রুশিয়ার পথ
উত্তর আমেরিকা
সানফ্রান্সিস্কো
চিকাগো
নিউ-ইয়র্ক
দক্ষিণ আমেরিকা
পার্নাম্বুকো
বুয়েনস এয়ার্স
ম্যাগিলান
মাদ্রিদ
কায়রো
আফ্রিকা
খার্টুম
কেপটাউন
ডার্বান
বাগদাদ
করাচী
দিল্লী
কলিকাতা
রেঙ্গুন
ব্যাঙ্কক
ম্যানিলা
ওয়েকা দ্বীঃ
গুয়াম দ্বীঃ
সাংহাই
ভ্লাডিভষ্টক
ইকুটস্ক
শিয়া
বার্লিন
মস্কো
বাটাভিয়া
ডারউইন
অষ্ট্রেলিয়া
পার্থ
মেলবোর্ন
সিডনী
বিষুব রেখা
১০০০ 0 ১০০০ মাইল

১২৭ নং চিত্র।

আ. যুক্তরাষ্ট্রে বোষ্টন, ওয়াশিংটন, সানফ্রান্‌চিস্কো, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, সিএট্‌ল্‌ প্রধান বিমান-বন্দর।

৪। **ইউরোপ-এশিয়ায় রুশিয়ার বিমানপথ।**—ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি বিমানপথের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের পূর্বভাগে মস্কো হইতে আরম্ভ করিয়া কাজান, নেভোসাইবিরিস্ক, ইর্খুট্স্ক, ও চিতা হইয়া রুশিয়ার এক আকাশপথ এশীয় ও ইউরোপীয় রুশিয়া যোগ করিয়া ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত গিয়াছে।

৫। **উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা যোগকারী আকাশ-পথ।**—উত্তর আমেরিকার আ. যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউইয়র্ক হইতে আর্জেনটিনার বুয়েনস আইরেস পর্যন্ত গিয়াছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আকাশযানও এখন আন্তর্জাতিক আকাশপথে স্থান পাইয়াছে। এখানকার আকাশযানও ইংলণ্ডে, পূর্ব-আফ্রিকায় ও সিঙ্গাপুরে যায়। প্রত্যহ কলিকাতা হইতে দিল্লী—বোম্বাই—কায়রো—দামস্কস—বেইরুট—রোম—জেনেভা—জুরিক—প্রাগ—প্যারিস—ও ডাসেলডর্ফ হইয়া এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশানাল কর্পোরেশনের আকাশযান লণ্ডনে যায়। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ—সিঙ্গাপুর হইয়া ডারইউন; এবং বোম্বাই হইতে কলিকাতা—ব্যাংকক—হংকং হইয়া ভারতীয় আকাশযান প্রতি সপ্তাহে টোকিও যায়।

আফ্রিকা-যাত্রী ভারতীয় আকাশযান বোম্বাই হইতে করাচী—এডেন হইয়া নৈরবি, অথবা সোজাসুজি বোম্বাই হইতে এডেন হইয়া নৈরবি যায়।

Questions

1968 (K) 1. Describe the Suez route and discuss its commercial value.

2. Discuss the importance of the Suez route to India's extended trade. How will the trade be affected if the route be temporarily closed? (Cal. B. Com. 1930)

3. How does the Cape route compare with the Mediterranean from India to Europe? In what way will India's trade with Western Europe be affected if the latter route is blocked during a war?

4. "The opening of the Panama Canal has brought about many changes in the ocean routes, but by no possibility can it

have such an important effect on the commerce of the world and lead to such rapid expansion of trade and traffic as was brought about by the opening of the Suez Canal."—Discuss.

5. "The traffic through the Panama Canal has increased with surprising rapidity in recent years." State briefly the factors that have led to the improvement. What are the principal commodities that pass through this canal ? What are the main defects of this route to the East and how are these going to be remedied ?

6. Draw a map of the world and show thereon the principal air-routes between Asia and Europe and also the Imperial air-route.

7. What do you know of the British Imperial air-route in East. State your opinion about the prospects of the Air-transport in India. (Cal. B Com. 1927).

8. Discuss the importance of transport. How many kinds of transport system are there ? Discuss the chief advantage of the land transport.

9. What do you know of inland water transport ? Mention the chief geographical factors which make a river a highway of commerce. Illustrate your answer by a few examples. (C.U. 1952)

10. Give a brief idea of the present position of shipping of the leading countries of the world.

11. Compare and contrast the Panama Canal and the Suez Canal as fully as you can.

12. Describe the effect of the Panama and the Suez Canal on the commercial activities of their own region.

13. Name two important internal waterways, one from Europe and the other from N. America which are the principal factors to improve the trade of the regions.

14. Name the principal international airways of the world adding a short description of the route.

৩

বাণিজ্যকেন্দ্র (Trade Centre)

বাণিজ্যকেন্দ্র।—যে-স্থানে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়, এবং যে-স্থান হইতে নানা দিকে বিতরিত হয়, সেই স্থানকে বলে **বাণিজ্যকেন্দ্র**। প্রধানতঃ সমস্ত নগর ও সহরই শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। কিন্তু কেন সমস্ত নগর ও সহর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়? সহর মাত্রই যেমন ন্যূনাধিক বাণিজ্যস্থল, বাণিজ্যকেন্দ্র মাত্রই কি সহর? এবিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার আদিম যুগে মানুষের কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে পণ্যবিনিময় করিয়াই সে তাহা প্রাপ্ত হইত। সকল মানুষের মধ্যে নানাবিধ অভাবের যখন সৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন পরস্পরের কোন এক স্থানে মিলিত হওয়ার দরকার হইল। এইরূপে হাট, বাজারের সৃষ্টি হইল। ক্রমশঃ দেখা গেল নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে ঠিক নিজের আবশ্যকমত জিনিষ সকল সময় পাওয়া যায় না। সেজন্য **মুদ্রার প্রচলন** হইল,—মুদ্রার মাধ্যমে খরিদ-বিক্রয় হইতে লাগিল, এবং অস্থায়ী হাট-বাজারের স্থানে স্থায়ী ঘর-বাড়ী হইতে লাগিল। আরও কিছুদিন পরে সে-স্থানের সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইল,—সেখানে নানাপ্রকার শিল্পোপকরণ আমদানি হইতে লাগিল, এবং সেই-সকল শিল্পোপযোগী কাঁচা মাল কতক অন্যত্র রপ্তানি হইতে লাগিল, ও কতক সেই-স্থানে শিল্পসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কালক্রমে সে-স্থানেই স্থায়ী লোকবৃদ্ধি হইল, অস্থায়ী লোক বহুলাংশে যাতায়াত করিতে লাগিল, এবং সেই স্থানের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে সেই স্থান সহরে ও নগরে পরিণত হইয়া উঠিল। বসুরহাট, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইহা এককালে হাট বা গঞ্জমাত্র ছিল। পরে সহরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে যে-স্থান আদিতে একটি ক্ষুদ্র মিলনস্থান ছিল, তাহাই শেষে সহরে পরিণত হয়। যে-স্থানে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের যত সুবিধা, এবং যে-স্থানে অল্পায়াসে ও অল্প খরচে যাতায়াত করা যায়, সেই স্থানই তত শীঘ্র উন্নতি লাভ করে। সব সহরের উন্নতির এখানেই শেষ নহে। এমনও হইতে পারে যে, এস্থানে গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সাদি সংগ্রহের পক্ষে সুবিধা থাকিলে, গবর্ণমেন্ট এখানে বিচারালয়, স্কুল, কলেজ, পোষ্টাপিস, শুল্কগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ইহাকে একটি বড় নগরে পরিণত করেন। এমন কি কালক্রমে ইহা রাজধানীতেও পরিণত হইতে পারে। মুসলমান রাজত্বে

সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট নামে যে-জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল তাহাই এখন কলিকাতা সহর।

সুতরাং প্রত্যেক সহরের আদিরূপ একটি **ক্ষুদ্র মিলনস্থান, মধ্যস্তরে** ইহা হয় **শিল্পস্থান** বা **বাণিজ্যস্থান,** অথবা **শিল্প ও বাণিজ্য—**এই **দুই-ই দ্বারা অধ্যুষিত স্থান। শেষ স্তরে** ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য বা শিল্পস্থান এবং সহর পরস্পর প্রতিক্রিয়াত্মক। শিল্পস্থানই সহজে বাণিজ্যস্থান হয়। এইরূপ বাণিজ্যস্থানও সহজেই শিল্পস্থান হইয়া উঠে ও ক্রমশঃ সহরে পরিণত হয়। আবার যদি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা রাজনীতিক কারণে অন্য কোন নগরের সৃষ্টি হয়, তাহাও অনতিবিলম্বে শিল্প ও ব্যবসায় ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং সহর মাত্রই ন্যূনাধিক বাণিজ্যকেন্দ্র। এই বাণিজ্যকেন্দ্রিক সহর দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) বন্দর ও পোতাশ্রয়, এবং (২) সহর ও নগর।

(১) বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours)

বন্দরগুলি জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থল। স্থলপথ হইতে জলপথে অথবা জলপথ হইতে স্থলপথে বাণিজ্য করিতে হইলে বন্দরই হইল দ্বার-স্বরূপ। এখান হইতেই দেশের পণ্য বিদেশে যায়—আবার বিদেশের পণ্য দেশে আসে। এজন্য এখানে বড়-বড় জাহাজ রাখিতে হয়, এবং জাহাজ যাহাতে নিরাপদে থাকে, ও অনায়াসে জাহাজের লোকজন আহার্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিতে হয়।

আদর্শ বন্দর।—সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা-বিশিষ্ট বন্দরকে আদর্শ বন্দর বলা যাইতে পারে। তবে সকল বন্দরের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকিতে পারে না। কাহারও কোন-কোন সুবিধা আছে, কাহারও ঐ সকল সুযোগ অল্প মাত্রায় রহিয়াছে, কাহারও বা অনেক সুবিধা নাই; সুতরাং আদর্শ বন্দর পাওয়া কষ্টকর। তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা থাকিলেই বন্দরটি কার্যকর হয়।

বন্দর-সৃষ্টির উপযোগী স্থান—

(১) বন্দরটি সমুদ্র-উপকূলে অথবা নদীতীরে হইলেই ভাল হয় এবং ঐ উপকূলে জলের গভীরতা থাকা দরকার। কেননা, অতিকায় বিশেষ ওজন-বিশিষ্ট জাহাজের নঙ্গর ফেলিতে হইলে গভীর জলের প্রয়োজন। আবার, জাহাজের তলা সমুদ্রপৃষ্ঠে আটকাইলে জাহাজ ভাসিবে না, সেজন্য ভাটার সময়ও প্রচুর জল থাকা দরকার।

(২) উপকূলটি ভগ্ন হইলে ও কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত হইলে বন্দর গঠনের সুবিধা হয়।

(৩) বন্দরটি এমন স্থানে হওয়া উচিত, যেখানে ঝড়ের ও ঢেউয়ের প্রকোপ নাই বলিলেই চলে। কেননা, ঝড়ে বন্দরস্থ জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, ঢেউয়ের দ্বারা জাহাজের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, আবার বন্দরটিতে বালুকণা জমা হইয়া, জল অগভীর হইতে পারে। অনেক সময় ঢেউগুলি ভাঙ্গিবার জন্য বন্দরের অনতি-দূরে এক প্রাচীর নির্মিত হয়। উহাকে বলা হয় ব্রেক ওয়াটার (Break-Water)। বোম্বাই বন্দরটি যেভাবে গঠিত তাহাতে বাতাস বা স্রোত সোজাসুজি আসিয়া জাহাজের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। বিশাখাপত্তন বন্দরের দক্ষিণে ঐরূপ ব্রেক-ওয়াটার রহিয়াছে। বিশাখাপত্তন (ভিজাগাপট্টম) একটি কৃত্রিম বন্দর। কিন্তু নিউ ইয়র্ক, ব্রিসবেন, লিভারপুল স্বাভাবিক সমুদ্র বা নদী-তীরস্থ বন্দর।

(৪) বন্দরটি সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত হইলে অনেকগুলি জাহাজ একত্রে পাশাপাশি নঙ্গর করিতে পারে। ইহাতে মাল বোঝাই ও খালাস করা কার্যের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জাহাজ অল্পসময়ের মধ্যে বন্দর ছাড়িতে পারে।

(৫) বন্দরটির প্রবেশপথ বোতলের মুখের মত হইলে ভাল হয়। ইহাতে জাহাজ সহজে প্রবেশ করিতে পারে,—কিন্তু মুখে বেশী বালি জমিতে পারে না। বায়ুর প্রকোপও কম হয়।

(৬) বন্দরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হইলে সরবরাহ-কার্য ও পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান অতি সহজেই হয়। যেমন,—

(ক) জলবায়ু অনুকূল হইলে সারাবৎসরই বন্দরে কাজ চলিতে পারে এবং জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধা হয় না। যে-সমস্ত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ খুব বেশী, সেই-সমস্ত অঞ্চলেই শীতকালে বরফ পড়িলে বন্দরের কার্য বন্ধ হইয়া যায়। আবার অতিবৃষ্টি-অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য আনয়নের অসুবিধা হয়।

(খ) পশ্চাৎ-ভূমি জনবহুল ও ফসলপ্রদ হইলে আমদানি-রপ্তানি কার্যের অনেক সুবিধা ঘটে। জনবহুল-অঞ্চলে জীবিকা-নির্বাহের পরিমাপ উচ্চ হইলে, বাজার বেশ শ্রীসম্পন্ন ও সুবিশাল হয়, এবং ঐ-সমস্ত বাজারে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান খুব বেশী হয়। তারপর যদি ঐ পশ্চাৎ-ভূমি বেশ উর্বরা হয়, তবে কৃষিজ সম্পদের অভাব হয় না। পশ্চাৎ-ভূমি উন্নততর হইলে সেখানে শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠে। সুতরাং কৃষিজ, খনিজ, বনজ, শিল্পজ সামগ্রীর, পণ্যদ্রব্য হিসাবে বন্দরের মধ্য দিয়া, আদান-প্রদান হয়। এরূপ স্থলে, অনেক সময় বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি করিয়া শিল্প গড়িয়া তুলিতে হয় এবং শিল্পজাত সামগ্রী বিদেশে প্রেরিত হয়।

(গ) বন্দরটি পশ্চাৎ-ভূমির সহিত স্থলপথে সর্বপ্রকার যানবাহনে যুক্ত হইলে পণ্যদ্রব্য সরবরাহে সুবিধা হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক পশ্চাৎ-ভূমি সমতল হইলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কেননা, সমতল ক্ষেত্রে সরবরাহ-কার্য অতি সহজেই সাধিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, পশ্চাৎ-ভূমি হইতে পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইবে এবং বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ঐ পশ্চাৎ-ভূমিতে আনীত হইবে ;—উভয় দিকেই পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান থাকিলে বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

(৭) শুল্ক নির্ধারণের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। বন্দরের শুল্ক-হার কম বলিয়া কাথিওয়ার বন্দরের প্রাধান্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শুল্ক নির্ধারণ ভার সরকারের উপর ন্যস্ত। সুতরাং বন্দরের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে সরকারের উপর।

(৮) বন্দরের সন্নিকটে সুস্বাদু জল ও ইন্ধন-দ্রব্য থাকা প্রয়োজন। আরোহিগণের জন্য সুস্বাদু জলের প্রয়োজন। সমুদ্রের জল লবণাক্ত। সুতরাং বন্দর হইতে জাহাজে জল লওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত জাহাজটি বাষ্পে চালিত হইলে, জলের দরকার। জাহাজ চালাইতে ইন্ধনের জন্য কয়লা ও খনিজ তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। সুদূরগামী জাহাজগুলিতে মাঝে-মাঝে মধ্যবর্তী বন্দর হইতে ইন্ধন লইতে হয়। এই কারণে বন্দরে কয়লা বা খনিজ তৈল থাকা প্রয়োজন।

(৯) বন্দরটি স্বাস্থ্যপ্রদ হইলে, লোকজনের থাকার পক্ষে সুবিধা হয়।

সুতরাং বন্দরটি আদর্শস্বরূপ হইতে হইলে উপরি-উক্ত সর্বপ্রকার সুবিধা থাকা আবশ্যক।

প্রকার ভেদ।—বন্দর যে কেবলমাত্র গভীর সমুদ্রের উপকূলেই অবস্থিত থাকিবে, তাহা নয়। এমন হইতে পারে মহাসাগর বা সাগরের উপকূল সরল ও অভগ্ন, এমনকি নিকটস্থ জল অগভীর, এবং আরও অসুবিধা আছে। তথাপি আবশ্যক হইলে ঐ-সমস্ত অঞ্চলেই অন্যত্র বন্দর গড়িয়া উঠে। এই কারণে—বন্দরের প্রকার ভেদ রহিয়াছে—

(১) **সমুদ্র-উপকূলস্থ মুক্ত বন্দর।**—সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলি সবসময় বড় হইতে পারে না। ইহাদের অসুবিধা অনেক বেশী। ভীষণ ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গ ও উর্মিবিতাড়িত বালুকারাশি অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে। অনেক সময় উপকূল এত গভীর যে জাহাজ নঙ্গর করা নিরাপদ নয়।

(২) **উপসাগরীয় বন্দর।**—এইরূপ বন্দরের সুবিধা অনেক। উপসাগরে সাধারণতঃ তরঙ্গ নিস্তেজ থাকে। ইহার তিন দিক্ স্থলদ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় প্রবল ঝটিকা সোজাসুজি প্রবাহিত হয় না। সুতরাং ঝটিকার প্রভাব থাকে না। এমন

কি জাহাজ-নঙ্গরের উপযুক্ত গভীরতা সবসময় পাওয়া যায়। এই-সমস্ত কারণে এইরূপ বন্দর শীঘ্র উন্নতি করিতে পারে।

(৩) **নদীতীরস্থ বন্দর।**—এই-প্রকার বন্দরের অনেক সুবিধা। এখানে জাহাজ-নঙ্গরের সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চাৎ-ভূমি বন্দরের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত থাকে।

বন্দরের কার্য।—আমদানি-রপ্তানি বন্দরের প্রধান কার্য। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে, আমদানি-রপ্তানির কার্য কি ভাবে হয়। বন্দরটি যে-দেশে বা যে-অঞ্চলে স্থাপিত থাকে সেই অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা যায় এবং বিদেশ হইতে আমদানি-দ্রব্যাদি ঐ অঞ্চলে সরবরাহ করা যায়। কিন্তু অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, অনতিদূরে যে-সমস্ত দেশ বা রাজ্য রহিয়াছে, তাহাদের সুদূরের দেশগুলির সহিত সোজাসুজি বাণিজ্যের সুবিধা নাই বলিয়া, তাহাদের আমদানি-রপ্তানি কার্যও ঐ বন্দরটির দ্বারা সাধিত হয়। ঐরূপ বন্দরকে মাধ্যম বা **গুদাম বন্দর** (entrepot) বলা হয়। মাধ্যম বন্দরগুলি স্বদেশের পণ্যদ্রব্য ব্যতীত অপরাপর দেশের জিনিষপত্র আদান-প্রদান করে।

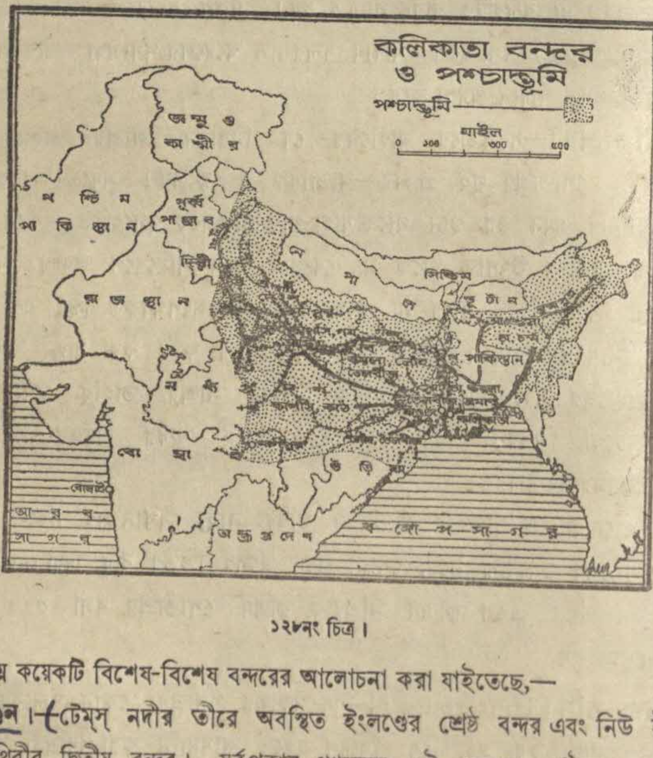
পোতাশ্রয়।—সমুদ্রতীরে জাহাজের যে নিরাপদ আশ্রয় তাহাকে বলে পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। সমুদ্রের উপকূলে বা নদীতীরে যদি এমন ভগ্ন স্থান থাকে যাহা প্রায় চারিদিকে স্থলবেষ্টিত, যেখানে সমুদ্রের বা নদীর ঢেউয়ের উৎপাত থাকে না, যে-স্থান এমন পরিবেশে অবস্থিত যে ঝড়েও জাহাজের ক্ষতি করিতে পারে না, যেখানকার জল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং গভীর, যেখানে নির্বিবাদে জাহাজ-সংক্রান্ত আমদানি-রপ্তানির কাজ করা যায়, অর্থাৎ যে-স্থান জাহাজের সর্বতোভাবে স্বাভাবিক নিরাপদ আশ্রয়, তাহাই **পোতাশ্রয়।** সান্‌ফ্রান্‌চিস্কো, লিভরপুল এবং ভারতের বোম্বাই বন্দর এইরূপ পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয় নিরাপদ বন্দর।

যে-স্থানে জাহাজ থাকিবার স্বাভাবিক সুবিধা নাই, যেখানকার পরিবেশ জাহাজ থাকার বিশেষ উপযোগী নহে, সেরূপ স্থলে জলের ভিতর বাঁধ দিয়া নিরাপদ বন্দর রচনা করা হয়। এরূপ কৃত্রিম আশ্রয়কে কৃত্রিম পোতাশ্রয় বলা হয়। মাদ্রাজ কৃত্রিম পোতাশ্রয়।

পশ্চাভূমি (Hinterland)।—যে-অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য কোন বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়, এবং বিদেশ হইতে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য যে-অঞ্চলের মধ্যে বণ্টনার্থ আসে, সেই অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাভূমি বলে। আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা লইয়া যে-অঞ্চল,

তাহাই কলিকাতার পশ্চাভূমি। কারণ আসামের চা, বিহারের খনিজদ্রব্য, উত্তর-প্রদেশের কৃষিদ্রব্য, উড়িয়্যার লৌহদ্রব্য, পশ্চিমবঙ্গের পাট ও পাটদ্রব্যাদি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়; এবং এই-সকল প্রদেশের আমদানি-দ্রব্য এই বন্দর দিয়া আসে।

প্রকৃতপক্ষে বন্দরের উন্নতি ও অবনতি তাহার পশ্চাভূমির উপর নির্ভর করে। যদি কোন বন্দরের (১) পশ্চাভূমি বহুবিস্তৃত ও উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, (২) বন্দর হইতে পশ্চাভূমির মধ্যে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়, (৩) বন্দরের মধ্যে জাহাজ বোঝাই করা ও খালাস করার বিশেষ সুবিধা থাকে, এবং (৪) বন্দর উত্তম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তবেই বন্দরের উন্নতি হয়। অবশ্য কোন বন্দরের যদি ভাল পোতাশ্রয় না থাকে, তবে কৃত্রিম পোতাশ্রয় প্রস্তুত করা সম্ভব,—পণ্যদ্রব্যের বোঝাই ও খালাস করার সুব্যবস্থা করাও সম্ভব, কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন পশ্চাভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।



১২৮নং চিত্র।

নিম্নে কয়েকটি বিশেষ-বিশেষ বন্দরের আলোচনা করা যাইতেছে,—

লণ্ডন।—টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং নিউ ইয়র্কের পরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বন্দর। সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্য এই বন্দরে পৌছে। বন্দরের চারিপার্শ্বে শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি করা ও বন্দরটি হইতে বিদেশে শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানি করা হয়।

এতদ্ব্যতীত বন্দরটি মাধ্যম বন্দর হিসাবেও পণ্য আদান-প্রদান করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর হিসাবে ইহার প্রাধান্য এক সময়ে খুব বেশী ছিল।

বন্দরটিতে খাদ্যসামগ্রী, চা, তামাক, মদ্য, রবার, চিনি, ফলমূল, গালিচা, কফি, মাংস প্রভৃতি আমদানি করা হয়, এবং যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, বয়নশিল্পজাত সামগ্রী, কাগজ, বিলাসদ্রব্য, মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত ইহার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রহিয়াছে।

লিভারপুল (ইংলণ্ড)।—ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে মার্সে-মোহনায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরটি পৃথিবীর সমস্ত বন্দরের সহিত জলপথে যুক্ত। বন্দরটির পশ্চাদ্ভূমি সমগ্র ল্যাঙ্কাশিয়ার, চেশিয়ার, স্টাফোর্ডশিয়ার ইত্যাদি। ঐ-সমস্ত অঞ্চল শিল্প বিষয়ে উন্নত। বয়ন-শিল্প, পশম-শিল্প, মৃৎশিল্প, রসায়ন-শিল্প, এবং ইস্পাত-কারখানা ইহার চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণে বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আনয়ন করা ও শিল্পজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা, বন্দরটির প্রধান কার্য।

ম্যাঞ্চেস্টার (ইংলণ্ড)।—মার্সে নদীর উপনদী ইরওয়েল নদীর তীরে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা নদীতীরস্থ বন্দর। বন্দরটি নদীমোহানায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরের সহিত খালদ্বারা যুক্ত। ম্যাঞ্চেস্টার বয়ন-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রপ্তানির জন্য এই স্থানে জমা করা হয়। এই কারণে কাঁচা তূলা আমদানি হয় এবং সূতা ও বস্ত্র রপ্তানি করা হয়।

গ্লাসগো (স্কটলণ্ড)।—ইহা স্কটলণ্ডের অন্তর্গত গ্রেট্‌বৃটেনের দ্বিতীয় সহর, এবং রপ্তানি-বন্দর হিসাবে ইহা লণ্ডন ও লিভারপুলের পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু গ্রেট্‌বৃটেনের সমগ্র বাণিজ্য হিসাবে ইহার স্থান দ্বিতীয়। ক্লাইড নদীমুখে ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজনির্মাণ-স্থান। ইহা পূর্বে ছিল স্কটলণ্ডের পশ্চিম-অঞ্চলের কৃষিদ্রব্যের বাজার। কিন্তু ক্লাইড-অঞ্চলে চারিদিকের পথ আসিয়া মিশিয়াছে। সেজন্য ইহা একটি বড় শিল্পস্থানে পরিণত হইয়াছে। এখন ইহা বড় সামুদ্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য-নির্মাণকেন্দ্র। ইহারই সন্নিকটে বহু শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। আটলান্টিকের অপর তীরে ইহার সম্মুখস্থ আমেরিকার সহিত ইহার সংস্রববৃদ্ধির জন্য ইহার শিল্পের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহা এরূপ শিল্পপ্রধান হইয়াছে যে স্কটলণ্ডের $\frac{1}{5}$ অংশ লোকই এই সহরে ও ইহার উপকণ্ঠে বাস করে।

এইস্থানে **পোর্ট গ্লাসগো, গ্রীনক্, ডামবার্টন** প্রভৃতি বন্দরগুলি জাহাজ-নির্মাণ-সংক্রান্ত শিল্পের জন্যই বিখ্যাত।

নিউ ক্যাস্‌ল্ (ইংলণ্ড)।—স্কটলণ্ডের ক্লাইডনদী-অঞ্চল গ্রেট্‌বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহাজনির্মাণ-স্থান। তাহার পরেই উত্তর-পূর্ব ইংলণ্ডে টাইন নদীর উপত্যকা

জাহাজ-নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। এই নদীর দুই ধারে জোড়া-জোড়া জাহাজনির্মাণ স্থান আছে। তাহার একজোড়া নিউ ক্যাস্‌ল্ ও গেট্‌স্‌হেড—নদীর দুই তীরে অবস্থিত। নিউ ক্যাস্‌ল্-সহরে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, রেলগাড়ীর সরঞ্জাম তৈয়ারির শিল্প, সামুদ্রিক পূর্ত শিল্প (marine engineering), এবং দড়ি, কাচ, কাগজ ও বিশোধিত চিনি প্রভৃতি বহু শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। লৌহ ও কয়লা নিকটেই পাওয়া যায় বা সহজে আমদানি করা যায় বলিয়া ইহা বড় শিল্পস্থান ও বন্দর হইয়াছে।

হাল (ইংলণ্ড)।—হাম্বার নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের তৃতীয় বন্দর ও বড় সহর। ইহা খালদ্বারা লীড্‌স, ওয়েকফিল্ড ও সেফিল্ড সহরের সহিত সংযুক্ত। নানা দিক্ হইতে রাজপথ ও রেলপথ এখানে আসিয়া মিশিয়া চারিদিকে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পশ্চিম রাইডিং-এর পশম ও লৌহ শিল্পের জন্য এই বন্দরের এত উন্নতি। সুইডেনের লৌহ, বাল্টিক-অঞ্চলের কাষ্ঠ ও দুগ্ধদ্রব্য, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার পশম, এবং মাঞ্চুরিয়ার প্রচুর সয়াবীন এই বন্দর দিয়া আমদানি হয়। পশমী দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, দক্ষিণ লাঙ্কাশিয়ারের কার্পাসশিল্প-দ্রব্য এই পথে রপ্তানি করা হয়। ইহারই অদূরে উত্তর সাগরের মৎস্য ধরিবার চড়া। সেজন্য ইহা একটি প্রসিদ্ধ মৎস্য-বন্দর।

(**সাউদাম্পটন** (ইংলণ্ড)।—ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রী যাতায়াতের বন্দর। সাউদাম্পটনে নামিলে টেম্‌স্ দিয়া পৌছিবার ১২ ঘণ্টা পূর্বে লণ্ডন পৌছান যায়। সে-হিসাবে সাউদাম্পটন লণ্ডনের বহির্বন্দর। বন্দর হিসাবে সাউদাম্পটনের অনেক সুবিধা। এখানে দিনের অধিকাংশ সময়ে জোয়ারের জলের সুবিধা পাওয়া যায়, এবং তীরভাগের অনেক দূর এই বন্দরের অন্তর্গত। সেজন্য আমদানি-রপ্তানির বিশেষ সুবিধা। তাজা ফল আমদানির ইহা সুবিধাজনক বন্দর। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ফল এই পথে আমদানি করা হয়। অন্য আমদানি-দ্রব্য—ফুল, মাংস, তরকারী, পশম, খাদ্যশস্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি।) H.S. 1963

পোর্টস্‌মাউথ (ইংলণ্ড)।—ইংলণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ওয়াইট্ দ্বীপের আশ্রয়ে ভাল পোতাশ্রয়। ইহা ফ্রান্সের সীন নদীমুখের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত।

লা হাব্‌র্ (ফ্রান্স)।—সীন নদীর মুখে বন্দর। ইহা ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত প্রধানতঃ বাণিজ্য করে। ইহার পশ্চাদ্ভূমি কৃষিপ্রধান। সেজন্য এই বন্দর হইতে রপ্তানি হয় মাখন, ডিম প্রভৃতি। এখানে আমদানি হয় তুলা, গম, তামাক, রবার, কফি প্রভৃতি।

এণ্টওয়ার্প (বেলজিয়ম)।—স্খেল্ড নদীমুখে অবস্থিত বড় বন্দর। রেলপথ ও খালপথ স্খেল্ডের মুখের সহিত এরূপভাবে যুক্ত যে, সে-স্থানে সহজেই এণ্টওয়ার্প-এর সমৃদ্ধি-লাভ সম্ভব হইয়াছে। জার্মানির পশ্চিম ভাগের কতকাংশের আমদানি ও রপ্তানি এই বন্দর দিয়া সম্পাদিত হয়। তাহাতেও ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি বেশ বিস্তৃত—বেলজিয়ম, পূর্ব ফ্রান্স, রাইন-উপত্যকা, রুড়-অঞ্চল। রুড়ের কয়লা, পূর্ব ফ্রান্সের খনিজ লৌহ এই পথেই আমদানি-রপ্তানি হয়। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির অন্যতম।

(**রটারডাম** (হলণ্ড)।—হলণ্ডের বড় বন্দর। নিউ ওয়াটারওয়ে (New water-way) খাল দিয়া রটারডামে পৌছিতে হয়। রটারডাম হইতে হানোভার হইয়া শীঘ্র বার্লিনে পৌছান যায়। সেজন্য লণ্ডনের লোকও বার্লিন যাইতে হইলে এই পথে যায়। এজন্য এই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে।)

(**হামবুর্গ** (জার্মানি)।—এল্‌বে নদীর তীরে অবস্থিত। বন্দরটি সমুদ্র-উপকূল হইতে ৭০ মাইল ভূ-ভাগের মধ্যে অবস্থিত। রেলপথ ও নদীপথ এখানে মিলিত হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। মধ্য জার্মানির নদীগুলি খালদ্বারা যুক্ত হইয়া এল্‌বে-র মাধ্যমে এই বন্দরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত এল্‌বে অববাহিকা ও ওডর অববাহিকার উত্তরাংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এক্ষণে এই বন্দর একটি বড় শিল্পস্থান,—জাহাজনির্মাণ ও জাহাজ-মেরামত, গম-ভাঙ্গানো ও সাবান-প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ইহার প্রধান শিল্পদ্রব্য। চিনি, কফি, কোকো, কাঁচা পশম, খনিজ লৌহ ইত্যাদি ইহার আমদানি-দ্রব্য, এবং বীটচিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, শিল্পজাত সামগ্রী, আলু, লবণজাতীয় দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি-দ্রব্য।)

এই অঞ্চলে উত্তর সাগর-তীরে **ব্রিমেন,** ও **কুক্সহাফেন** এবং বাল্টিক-তীরে **কীল, লুবেক্, স্টেটিন** ও **কোনিগ্‌স্‌বুর্গ** (কালিনিন গ্রাড্) অন্য বন্দর।

কীল ও কুক্সহাফেন খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য এখন আর ডেনমার্কের উত্তর ঘুরিয়া বাল্টিক সাগরে আসিতে হয় না। সুতরাং কীল বড় বন্দর। এখানে জাহাজ-নির্মাণ হয়।

ডানসিগ (পোলণ্ড)।—বাল্টিকতীরে পোলণ্ডের বন্দর। ইহা শিল্পস্থান ও জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র। এই পথে চিনি, কাষ্ঠ, লোম ও পেট্রোলিয়ম বাহিরে রপ্তানি হয়। শীতকালে ইহা বরফাবৃত থাকে। ইহারই সন্নিকটে বিশ্‌চুলা নদীর মুখে **গডিনিয়া** (Gdynia) পোলণ্ডের অন্য বন্দর। বাল্টিক সমুদ্রের বন্দরগুলির মধ্যে ইহা এখন প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রধানতঃ সুইডেনে এখান হইতে কয়লা যায় ও সুইডেন হইতে লৌহ এখানে আসে।

(**জিব্রলটর** (স্পেন)।—স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথে ইহা বৃটিশ-অধিকারভুক্ত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও পোতাশ্রয়। ইহা একটি পার্বত্য অন্তরীপ। এই পর্বতের উপর একটি দুর্গ আছে। সেখানে সৈন্য রক্ষিত আছে। ইহা জাহাজে কয়লা লইবার স্থান। এখান হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশার্থী ও সেখান হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছুক জাহাজের উপর লক্ষ্য রাখা যায়।)

লিস্‌বন (পর্তুগাল)।—পর্তুগালের রাজধানী ও শিল্পপ্রধান বন্দর।

জেনোয়া (ইতালী)।—ইতালীর উত্তর-পশ্চিমে একটি পুরাতন বন্দর। ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে ভারতে যাইবার পথ আবিষ্কারের পূর্বে জেনোয়া ও ভেনিস ইউরোপের বড় বন্দর ছিল। এশিয়ার, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, পণ্য দুই বন্দরে আনিয়া এখান হইতে ইউরোপের অন্য স্থানে বণ্টন করা হইত। ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরের উন্নতি হইলে ইহার অধঃপতন ঘটে। সুয়েজ খাল কাটিবার পরে ইহার পুনরায় কিছু উন্নতি হইয়াছে। লম্বার্ডির পশ্চিম ভাগ ইহার স্বাভাবিক পশ্চাদ্ভূমি। কিন্তু সেণ্ট গদার্ড ও সিম্‌প্লন গিরিপথ নির্মাণের পরে জেনোয়ার পশ্চাদ্ভূমি সুইজার্লণ্ড ও দক্ষিণ জার্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে কার্পাস, জাহাজ-নির্মাণ, লৌহ ও অলিভ তৈল হইতে সাবান-শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(**মারসেই** (Marseilles—ফ্রান্স)।—রোন মোহানার পূর্ব-দক্ষিণে ফ্রান্সে অবস্থিত এই বন্দর ইংলণ্ড ও প্রাচ্যের বাণিজ্যপথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বন্দরটি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও উত্তর-পশ্চিমে ক্যালে বন্দরের সহিত রেলপথে যুক্ত। সেজন্য প্রাচ্যদেশ হইতে অনেক ইংলণ্ডযাত্রী সময় সংক্ষেপের জন্য এই স্থানে জাহাজ হইতে নামিয়া রেলপথে ক্যালে যাইয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইংলণ্ডে যান। রেশম, ভূমধ্যসাগরীয় ফল, মদ্য ও সূচীকার্য বন্দরের রপ্তানি-বস্তু, এবং পেট্রোল, শিল্পজাত দ্রব্য, চা, কফি, তামাক, তাল তৈল প্রভৃতি অন্যতম আমদানি-দ্রব্য।)

ব্রিন্দিসি (ইতালি)—ইতালীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বন্দর। পূর্বে প্রাচ্যদেশের ডাক এই পথে ইংলণ্ডে যাইত। ইহা এক্ষণে একটি আকাশপথের বন্দর।

আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর)।—ভূমধ্যসাগর-তীরে নীল নদের ব-দ্বীপের উপরে আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের বড় বন্দর। কিন্তু অনবরত মাটি কাটিয়া ইহার গভীরতা রক্ষা করিতে হয়। এক্ষণে ইহা আকাশপথের বন্দর। নীল নদের উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। ইহার রপ্তানি-দ্রব্যের $\frac{৮}{১০}$ অংশই তূলা। অন্য রপ্তানি-দ্রব্য—তূলার বীজ, চিনি, ভুট্টা ও নানাবিধ ফল। আমদানি-দ্রব্য—তামাক, কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি।

সৈয়দ বন্দর (মিশর)—সুয়েজ খালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কয়লা লইবার প্রধান বন্দর ও গুদাম বন্দর (entrepot—আঁত্রেপো)। এখানে কিংবা নিকটবর্তী

স্থানে কয়লা নাই। তথাপি ইহা জাহাজে কয়লা লইবার শ্রেষ্ঠ বন্দর। ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়লা এখানে আসে। কিন্তু এই-সকল স্থান হইতে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অঞ্চলের বন্দরে কয়লা আনিয়া জাহাজে যে-মূল্যে দেওয়া যায়, সৈয়দ বন্দর প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-অঞ্চলের স্থানে তাহা অপেক্ষা মূল্য বেশী নহে। কারণ, যে-জাহাজ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে কয়লা লইয়া আসে, ফিরিবার সময় তাহা মিশর ও কৃষ্ণসমুদ্র অঞ্চলের প্রচুর মূল্যবান পণ্য লইয়া ফিরিতে পারে। ইহাতে এত লাভ হয় যে, কয়লার দাম বেশী পড়ে না।

ডার্বান (নাটাল)—নাটালের বৃহত্তম সহর ও প্রধান বন্দর। ইহা প্রায় চারিদিকে স্থলবেষ্টিত। সেজন্য ইহা উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ইহা মেষচারণ-ক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী, এবং এই বন্দর জোহান্স্বার্গ ও অন্য স্বর্ণখনির নিকটবর্তী এবং রেলপথ-দ্বারা যুক্ত। সেজন্য এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য স্বর্ণ ও পশম। নিকটবর্তী নিউ ক্যাস্ল্ কয়লাখনির কয়লাও এই পথে রপ্তানি করা হয়। প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—কয়লা, পশম, চামড়া, চিনি ও স্বর্ণ। দক্ষিণে **পোর্ট এলিজাবেথ** (উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশ) পশম-রপ্তানির সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

কেপটাউন (উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশ)।—ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবেশ-দ্বার ও অন্তরীপ প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা-সম্মেলনের ব্যবস্থাপক সভা এখানেই বসে। জোহান্সবার্গ ও কিম্বার্লির স্বর্ণ ও রৌপ্য এই বন্দর দিয়াও রপ্তানি হয়। পূর্ব-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার যাত্রিজাহাজ কয়লা লইবার জন্য এখানে থামে।

আক্রা (ঘানা—পূর্ব নাম স্বর্ণ উপকূল—Gold Coast)—গিনি উপসাগর-তীরে কোকো রপ্তানির এবং **লাগোস** (নাইজেরিয়া) তালতৈল-রপ্তানির প্রধান বন্দর।

নিউ ইয়র্ক (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহা আট্লাণ্টিক উপকূলে হাড্‌সন ও তাহার উপনদী মোহক লইয়া গঠিত হাড্‌সন-মোহক নদীর মোহানায় অবস্থিত। এই হাড্‌সন-মোহক পথ ও ঈরি খাল যোগে অ্যাপালাশিয়ান পর্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া ঈরি হ্রদে, এবং সেখান হইতে দেশের মধ্যে যাতায়াত করা যায়। হাড্‌সন নদী যোগে বরাবর উত্তর মুখে যাইয়া রিসেলু নদীর ভিতর দিয়া সেণ্ট লরেন্স নদীতীরস্থ মণ্ট্রিল সহরে যাওয়া যায়,—এবং যদিও নিউ ইয়র্ক অ্যাপালাশিয়ান পর্বতের পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত, কিন্তু ইহা রেলপথ ও রাজপথ দ্বারা পর্বতের পশ্চিমদিকস্থ দেশের অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত। সুতরাং ইহার পশ্চাদ্ভূমি বহুদূর বিস্তৃত। এজন্য নিউ ইয়র্ক আ. যুক্তরাষ্ট্র দেশের সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান বন্দর এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়াছে। ইহা হাড্‌সন নদীর

মুখে ম্যানহাট্টান দ্বীপের উপর অবস্থিত। কিন্তু ইহা এরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে যে এক্ষণে ইহা হাড্‌সন নদীমুখের দুই তীরে, নিউ জার্সি ও ম্যানহাট্টানের উপর ও লং দ্বীপের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। বহুসংখ্যক জাহাজ এই বন্দরে আসে ও যায়। সেজন্য ছোট-ছোট ব্যবসায়ী-জাহাজ হইতে বড়-বড় সকল রকম জাহাজ রাখিবার মত নানা প্রকার ডক্ এখানে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, মুদ্রণ, বস্ত্রবয়ন, তামাক, জাহাজনির্মাণ, তৈলশোধন প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পের কারখানা এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। হাড্‌সন-মোহক পথ ও ডেলাওয়ার উপত্যকা দিয়া কয়লা ও লৌহপিণ্ড সহজে ও সুলভে এখানে আসিতে পারে বলিয়া এ-অঞ্চলে শিল্পের সহজেই উন্নতি হইতে পারে।

বস্টন (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—বস্টন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ অঙ্গরাজ্যে আট্‌লাণ্টিক উপকূলে নিউইয়র্কের উত্তরে অবস্থিত বন্দর। এক কালে ইহা বড় বন্দর ছিল, এবং নিউ ইংলণ্ডের রপ্তানি ও আমদানি এই বন্দর দিয়া হইত। কিন্তু নিউইয়র্কের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ইহার অবনতি হইয়াছে। এখন নিউ ইংলণ্ডের বাণিজ্যও নিউইয়র্কের ভিতর দিয়া হয়।

ফিলাডেলফিয়া (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—ইহা ডেলাওয়ার নদীতীরে পেন্‌সিল-ভ্যানিয়া রাষ্ট্রে প্রপাত-বন্দর। ডেলাওয়ার নদীর প্রপাত অবলম্বনে এখানে শিল্পসৃষ্টি হইয়াছে। পেনসিলভ্যানিয়া কয়লাখনির কয়লা ও লৌহ, এখান হইতে রপ্তানি হয়। আন্দিজ পর্বতের ও পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের তামা পানামা খাল দিয়া এখানে আসিয়া বিশুদ্ধীকৃত হয় ও শেষে তাহা রপ্তানি করা হয়। টেক্‌সাস্ ও ওক্‌লা-হোমার পেট্রোলিয়মও নলপথে এখানে আনিয়া বিশুদ্ধ করা হয়, এবং আট্‌লাণ্টিক-অঞ্চলের দেশে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়। H. S. 1961 Comp.

বাল্‌টিমোর (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—ইহা মেরিল্যাণ্ড রাষ্ট্রে সাস্‌কুইহান্না নদীতীরে বন্দর। এখানে সার ও জাহাজনির্মাণ-উপকরণ প্রস্তুত হয় ও রপ্তানি হয়। ইহাও ফিলাডেলফিয়ার মত প্রপাত-বন্দর।

দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে আট্‌লাণ্টিক উপকূলে **চার্লস্‌টন** (আ. যুক্তরাষ্ট্র—দক্ষিণ ক্যারোলাইনা), **স্যাভানা** (আ. যুক্তরাষ্ট্র—জর্জিয়া), মেক্সিকো উপসাগর-তীরে **নিউ অর্লিয়ান্‌স্** (আ. যুক্তরাষ্ট্র—লুইসিয়ানা), এবং **গ্যালভেস্টন** (আ. যুক্তরাষ্ট্র —টেক্সাস)—যুক্তরাষ্ট্রের তুলা-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত বন্দর। এই বন্দরগুলি দিয়া প্রচুর তূলা রপ্তানি হয়। নিউ অর্লিয়ান্‌স্ মিসিসিপি তীরে মেক্সিকো অঞ্চলের প্রধান বন্দর। এই অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিমে রেলপথ নির্মাণের পূর্বে ইহা মধ্যভাগের নিম্নভূমির কৃষিদ্রব্যের প্রধান রপ্তানি-বন্দর ছিল। পানামা খাল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রভৃতি ইহা হইতে দূরবর্তী নহে। সেইজন্য কিউবা ও দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ইহার বাণিজ্য চলে। কিউবার ইক্ষু চিনি, ইউকাতানের শিশল-তন্তু, নাইট্রেট, দক্ষিণ আমেরিকার কফি এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কলা এই বন্দর দিয়া আমদানি হয়।

গ্যালভেস্টন মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা ৫০ মাইল দীর্ঘ একটি জাহাজ যাতায়াতের উপযোগী খালদ্বারা **হাউস্‌টন**-এর সহিত সংযুক্ত। এই দুইটি বন্দর তূলা-রপ্তানির প্রধান বন্দর। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোর সহিত ইহার বাণিজ্য চলে। টেক্‌সাসের পেট্রোলিয়ম এই পথে রপ্তানি হয়। এখানে তৈলশোধন, জাহাজনির্মাণ, চিনি ও চাউল প্রস্তুত করা হয়।

লস্ এঞ্জেলস্ (আ. যুক্তরাষ্ট্র—ক্যালিফোর্ণিয়া)।—আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে ২০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। **সানপেড্রো** ইহার বন্দর। ইহার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার জন্য এখানে "হলিউড্" নামক স্থানে সচল আলোকচিত্রের ছবি তৈয়ার করা হয়। লৌহ ও খনিজ তৈল পরিশোধন-শিল্পও এখানে প্রধান শিল্প। ক্যালিফোর্ণিয়ার ফল, তৈল, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য।

সান্‌ফ্রানচিস্কো (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয়। সমুদ্রতীরে কোষ্টরেঞ্জ কেবল এই স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। সেজন্য ক্যালিফোর্ণিয়া উপত্যকায় প্রবেশের ইহাই প্রবেশ-দ্বার। সেইজন্য ইহাকে বলে "স্বর্ণদ্বার"—এবং ইহা বড় বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। সমগ্র উর্বরা কালিফোর্ণিয়া উপত্যকাই ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর দিয়া ফল, কৌটাবদ্ধ ফল প্রভৃতি রপ্তানি হয়, এবং চা, রেশম, চিনি ও নারিকেলের শাঁস প্রভৃতি আমদানি হয়। এশিয়ার সহিত ইহার বিশেষভাবে বাণিজ্য চলে। H. S. 1960, 63 Comp, 64

সিএট্‌ল্ (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন রাষ্ট্রে পিউগেট উপসাগরের তীরে বড় সহর ও বন্দর। ইহা পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলিয়া সানফ্রান্‌চিস্কোর মত ইহার এশিয়ার সহিত বাণিজ্য চলে। চিকাগোর সহিত ইহা রেলপথেযুক্ত। এখানে জাহাজনির্মাণ, ফল কৌটাবদ্ধ করা, কাষ্ঠশিল্প, উড়োজাহাজ-নির্মাণ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আলাস্কা হইতে স্বর্ণ, তাম্র, কাষ্ঠ ও স্যামন মাছ প্রভৃতি দক্ষিণ প্রদেশে চালান দেওয়ার ইহা কেন্দ্রস্থল।

ভাঙ্কুবর (ক্যানাডা)—ফ্রেসার নদীর মুখে বন্দর, বৃটিশ কলম্বিয়ার সর্ববৃহৎ সহর ও ক্যানাডার তৃতীয় সহর। ইহার পাশ দিয়া উষ্ণ স্রোত গিয়াছে বলিয়া এই বন্দর বারমাসই বরফমুক্ত থাকে। ইহা ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ক্যানাডিয়ান ন্যাশানাল

রেলপথের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত স্টেশন। সুতরাং ক্যানাডার প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া বাণিজ্য করিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ বন্দর। শীতকালে হ্রদপথ বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া যখন সেই পথে মধ্য ক্যানাডার গম রপ্তানি ব্যাহত হয়, তখন এই বন্দর দিয়া সেই গম রপ্তানি করা হয়। পানামা খাল কাটার জন্য এই বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর-অঞ্চলের দেশগুলির জন্য কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, গম, তামা, সীসা, দস্তা ও কৌটাবদ্ধ মাছ প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। এখান হইতে আলাস্কার স্কাগওয়ে বন্দর পর্যন্ত স্টিমারে যাইয়া রেলপথে ইউকনের স্বর্ণখনিতে যাওয়া যায়। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ইহার সমুদ্রপথে সংযোগ আছে। এখানে করাত-ঘর আছে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজনির্মাণ শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

চিকাগো (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—ইল্লিনইস্ রাষ্ট্রে মিচিগন হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি হ্রদ-বন্দর। এখান হইতে পঞ্চ হ্রদের মধ্য দিয়া সেন্টলরেন্স নদীপথে আট্লান্টিক মহাসাগরে যাওয়া যায়। মিসিসিপির উপনদী ইল্লিনইসের সহিত মিচেগন হ্রদ খালপথে যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মিসিসিপি দিয়া এখান হইতে মেক্সিকো উপসাগরেও যাওয়া যায়। নানা দিক্ হইতে রেলপথ আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। সেজন্য ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেলপথসংযোগ-কেন্দ্র। ইহা ভুট্টা-অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য ভুট্টা-অঞ্চলে শূকর ও গবাদি পশু পরিপুষ্ট হইলে এখানে মাংস প্রস্তুত করার কারখানায় আনিয়া তাহাদের মাংস বিদেশে চালান দেওয়া হয়। সুপিরিয়র হ্রদ-অঞ্চল হইতে লৌহ এবং মিনিয়াপোলিস-অঞ্চলের গম এখানে আনিয়া লৌহদ্রব্য ও ময়দা প্রস্তুত করা হয়। ইল্লিনইস-ইণ্ডিয়ানা কয়লাখনি হইতে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া এখানে শিল্পসৃষ্টির কোন অসুবিধা হয় না। এইসকল কারণে ইহা বড় সহর, বড় শিল্পকেন্দ্র ও বড় বন্দরে পরিণত হইয়াছে। H.S. 1963, 64

সেন্টলুইস (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—মিসিসিপি ও মিজৌরির মিলন-স্থানে অবস্থিত বন্দর ও বড় সহর। ইহা ভুট্টা-অঞ্চলে অবস্থিত। সেজন্য শূকর ও গবাদি পশু এখানে আনিয়া পরিপুষ্ট করা হয়। এ-কারণে এখানে মাংস-উৎপাদন একটি প্রধান শিল্প। ইল্লিনইস রাষ্ট্র হইতে কয়লা আনাইয়া এখানে লৌহশোধন কার্যও করা হয়।

ডুলুথ (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—মিনেসোটা রাষ্ট্রে সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম তীরে হ্রদ বন্দর। নিকটবর্তী বন হইতে কাঠ, এবং সুপিরিয়র হ্রদের সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ লৌহ-খনি হইতে লৌহ এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। এখান হইতেই লৌহ ক্লীভল্যাণ্ড হইয়া প্রসিদ্ধ লৌহশিল্পস্থান পিটস্‌বার্গে যায়।

ডেট্রয়েট (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—মিচিগন স্টেটে সেন্ট ক্লেয়ার হ্রদের তীরে অবস্থিত বন্দর। ডুলুথ হইতে এখানেও লৌহদ্রব্য প্রেরিত হয় ও উহা হইতে লৌহদ্রব্য উৎপন্ন

হয়। এখানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মটরগাড়ী প্রস্তুত করার বড় কারখানা আছে।

ক্লীভল্যাণ্ড (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—ওহিও স্টেটে ঈরি হ্রদতীরে হ্রদ-বন্দর। সুপিরিয়র হ্রদ-অঞ্চল হইতে হ্রদপথে লৌহ আসিয়া এখান হইতে পিট্‌সবার্গ যায়, এবং এখান হইতে কয়লা রপ্তানি হয়।

বাফেলো (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—নিউ ইয়র্ক স্টেটে ঈরি হ্রদতীরে হাড্‌সন-মোহক পথের পশ্চিম প্রান্তে বন্দর। হ্রদপথে পণ্যদ্রব্য আসিয়া এখান হইতে নদীপথে নিউ ইয়র্ক যায়। এখানে নায়াগ্রা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। তাহার সাহায্যে এবং হ্রদপথে যে-লৌহ আসে তাহা দিয়া লৌহশিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

মন্ট্রিল (ক্যানাডা)।—সেন্ট লরেন্স নদীর মোহানা হইতে সহস্র মাইল দূরে একটি দ্বীপের উপর এই সহর ও বন্দরটি অবস্থিত। সমুদ্রগামী জাহাজ সমুদ্রের মুখ হইতে এই পর্যন্ত আসিতে পারে। এখান হইতে হাডসন-রিসেলু নদীপথে নিউ ইয়র্ক যাওয়া যায়। আবার, অটোয়া নদীর উপত্যকা দিয়া পশ্চিম ক্যানাডায় যাওয়া যায়। সুতরাং মন্ট্রিলের অবস্থিতির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশী। এখান হইতে শস্যাদি ও কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, আকাশযান ও জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। এই বন্দর পাঁচ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। H. S. 1965

হালিফাক্স (ক্যানাডা)।—নোভাস্কোসিয়ার রাজধানী ও সরকারী বন্দর। এখান হইতে ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথের শাখা আরম্ভ হইয়াছে। এই বন্দর উষ্ণ-"উপসাগর-স্রোতের" সন্নিধানহেতু শীতকালে জমে না। সেজন্য শীতকালে যখন সেন্ট লরেন্স নদী জমিয়া যায়, তখন প্রেরি-অঞ্চলের গম রেলপথে আসিয়া এখান হইতে রপ্তানি হয়। ইহা কড মৎস্য ব্যবসায়ের প্রধান স্থান।

কুইবেক (ক্যানাডা)।—সেন্ট লরেন্স নদীমুখ হইতে ৪০০ মাইল দূরে বন্দর। ইহা ব্যবসায়ের প্রধান স্থান, এবং কাষ্ঠ ও কাষ্ঠখণ্ড প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, জুতা, ছুরি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কারখানা চলিতেছে। এখান হইতেই ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ (C. N. R.) আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্যানাডা অতিক্রম করিয়া ইহার পশ্চিমতটে ভাঙ্কুবরে শেষ হইয়াছে।

রিও-ডি-জানেরো (ব্রাজিল)।—মকরক্রান্তির ঠিক উত্তরেই ব্রাজিলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন অংশে অবস্থিত বন্দর। ইহা প্রধানতঃ কফি, চিনি ও তূলা রপ্তানির বন্দর। H. S. 61 Comp. 63.

প্যারা (ব্রাজিল)।—আমাজন নদীমুখে রপ্তানির বন্দর। আমাজন-বনভূমির রবার এই পথে রপ্তানি হয়।

মণ্টিভিডিও (উরুগোয়ে)।—প্লেট নদীর মোহানায় অবস্থিত বন্দর। "প্যাম্পাস" তৃণক্ষেত্রই ইহার পশ্চাদ্ভূমি। সুতরাং এই বন্দর হইতে মাংস, পশম, চামড়া প্রভৃতি পশুসংক্রান্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়।

বুয়েনোস-আইরেস (আর্জেণ্টিনা)।—প্যাম্পাস্-অঞ্চলে অবস্থিত আর্জেণ্টিনার রাজধানী ও বন্দর। এখান হইতে গম প্রভৃতি কৃষিদ্রব্য ও পশু-সংক্রান্ত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। ইহা সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার চতুর্থ সহর। **বাহিয়া ব্লাঙ্কা** গম ও পশু-সংক্রান্ত দ্রব্য রপ্তানির অন্য বন্দর।

ভ্যালপারিসো (চিলি)।—প্রশান্ত মহাসাগর-তীরে প্রধান বন্দর।

রক্‌হাম্পটন (অস্ট্রেলিয়া—কুইন্সল্যাণ্ড)।—পূর্ব-উপকূলে ইহা বন্দর। ইহার পশ্চিমে একটি পর্বত আছে। সেই পর্বতের মধ্য দিয়া যে-গিরিপথ আছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্বতের পশ্চিমের কৃষিভূমিতে যাওয়া যায়। রক্‌হাম্পটন ঐ গিরিপথের রক্ষকস্বরূপ। কৃষিভূমির তামাক, কফি, ভুট্টা এবং কলা, আনারস প্রভৃতি উষ্ণ দেশীয় ফল এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়।

ব্রিজবেন (অস্ট্রেলিয়া—কুইন্সল্যাণ্ড)।—কুইন্সল্যাণ্ডের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। কিন্তু ইহার সহিত ইহার পশ্চাৎভূমির রেলপথে যোগাযোগ কম। বিশেষতঃ এই অঞ্চলের অন্য বন্দরগুলি বিশেষ উন্নতিশীল। সেজন্য এই বন্দরটির বিশেষ উন্নতি হইতে পারে নাই।

সিড্‌নি (অস্ট্রেলিয়া)—নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ প্রদেশের রাজধানী এবং **পোর্ট-জ্যাক্‌সন** নামক প্রায় স্থলবেষ্টিত, অতি সুন্দর ও সুবিধাজনক পোতাশ্রয়ের উপর ইহা অবস্থিত। ইহা অস্ট্রেলিয়ার সর্বপুরাতন ও সর্ববৃহৎ সহর। ইহা এই প্রদেশের রেলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল। রেলপথ পর্বত ভেদ করিয়া কৃষি- ও পশুপালন-ভূমির ভিতর গিয়াছে। সেজন্য ইহার পশ্চাদ্ভূমি বহুবিস্তৃত, এবং ইহা একটি প্রধান বন্দর। পশম, বরফে-রক্ষিত মাংস, মাখন, চামড়া, পরিষ্কৃত চামড়া, গম, ময়দা প্রভৃতি কৃষি ও পশু-সংক্রান্ত দ্রব্য ও স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজদ্রব্য এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়।

মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)।—ভিক্টোরিয়ার সর্ববৃহৎ সহর। ইহা পোর্টফিলিপ উপসাগর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়ের উপর অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটি গ্রস্ত উপত্যকা (rift valley) রহিয়াছে। এই স্থান পশুচারণ ও দুগ্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় ফল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সেজন্য এই বন্দর হইতে পশু-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়।

এডিলেড্ (অস্ট্রেলিয়া)।—দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বড় সহর। ইহার সহিত সংলগ্ন

পোর্ট এাডলেড ইহার বন্দর। প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য—গম, ময়দা, পশম, তামা, ফল প্রভৃতি।

পার্থ (অস্ট্রেলিয়া)।—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। সোয়ান নদীর মুখ হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ফ্রেম্যান্‌টল্‌ ইহার বন্দর এবং কলম্বো হইতে অস্ট্রেলিয়ার পথে যাইতে জাহাজগুলির প্রথম কয়লা লইবার জায়গা। কুলগার্ডির স্বর্ণখনি আবিষ্কারের জন্য ইহার উন্নতি হইয়াছে।

করাচী (পাকিস্তান)।—ইউরোপ হইতে পাকিস্তানের নিকটতম বন্দর; ইহা পাকিস্তানের ভূতপূর্ব রাজধানী ও পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুদেশে অবস্থিত। ভারত বিভাগের পর হইতে ইহার গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহা সিন্ধুনদের মুখে প্রস্তরবহুল দ্বীপরক্ষিত বন্দর। এখানে মানোরা দ্বীপ ও প্রধান ভূ-খণ্ডের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া তরঙ্গ রোধ করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা জেটি, ডক, ও সর্বপ্রকার সুবিধা-সমন্বিত প্রথম শ্রেণীর বন্দর। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি বহুবিস্তৃত। পশ্চিম-পাকিস্তানের রপ্তানি-দ্রব্য ও আমদানি-দ্রব্য যাতায়াত করিবার ইহাই একমাত্র পথ। রপ্তানি-দ্রব্য—গম, যব, তূলা, চাউল, ডাল, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, হাড় প্রভৃতি। প্রধান আমদানি-দ্রব্য—কার্পাসদ্রব্য, পশমদ্রব্য, চিনি, যন্ত্রপাতি, লৌহদ্রব্য, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি।



১২৯নং চিত্র।

কলম্বো (সিংহল)।—সিংহলের রাজধানী **কলম্বো** পশ্চিম-উপকূলে একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর ও কৃত্রিম পোতাশ্রয়। মান্নার উপসাগর ও পক্-প্রণালী দিয়া জাহাজ চলে না বলিয়া জাহাজ সিংহলের দক্ষিণ দিয়া যাতায়াত করে। সুয়েজ খালপথে যে-সকল জাহাজ অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব-এশিয়ায় যায়, সেই সমস্ত জাহাজই এখানে কয়লা লইবার জন্য থামে। নারিকেল, নারিকেলদ্রব্য, রবার, চা এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

চট্টগ্রাম (পাকিস্তান)—পূর্ব-পাকিস্তানের কর্ণফুলী নদীমুখ হইতে ১০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। যদিও ইহা বহুকাল হইতে বাণিজ্যস্থান, কিন্তু আসাম-বেঙ্গল রেলপথ না হওয়া পর্যন্ত ইহার বহির্বাণিজ্য কিছুই বাড়ে নাই। তারপর হইতে ইহা আসামের ও তদানীন্তন উত্তর-পূর্ববঙ্গের রপ্তানি-স্থান হয়। বঙ্গবিভাগের পর হইতে ইহা আর আসামের বা ত্রিপুরার বন্দর নহে। সেজন্য ইহার ক্ষতি হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য পাট এই বন্দরে আসিবার কোন সরাসরি রেলপথ নাই। যাহা হউক, এই বন্দরের উন্নতি করিয়া ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং সেজন্য কাজও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের ইহা শ্রেষ্ঠ বন্দর।

রেঙ্গুন (ব্রহ্মদেশ)।—ইরাবতী-তীরে ব্রহ্মদেশের রাজধানী। এখানে বহুসংখ্যক চাউলের কল ও করাতঘর আছে। এখানে খনিজ তৈল পরিষ্কার করা হয়। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর এবং পৃথিবীর মধ্যে চাউল-রপ্তানির শ্রেষ্ঠ স্থান। ব্রহ্মদেশের খনিজ তৈল ও কাষ্ঠাদিও এই পথে রপ্তানি হয়।

মান্দালে (ব্রহ্মদেশ)।—ব্রহ্মদেশের মধ্যভাগে ইরাবতী-তীরে বড় বন্দর। ইহা উত্তর-ব্রহ্মের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এখানে চাউলের কল ও করাতঘর আছে। চাউল ও কাষ্ঠ প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর)।—মালয় উপদ্বীপের অগ্রভাগে একটি দ্বীপমাত্র, এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৌরবময় বন্দর। এক্ষণে ইহা স্ব-শাসিত রাষ্ট্র। ভারত মহাসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরে যাতায়াতের সংকীর্ণ পথ মালাক্কা প্রণালী। সিঙ্গাপুর হইতে তাহা অনায়াসে রক্ষা করা যায়। তাই ইহার রাজনৈতিক মূল্য বেশী,—তাই এখানে ইংরেজের নৌবহর থাকে। ইহা একটি গুদামবন্দর (entrepot)। এই অঞ্চলের অনেক পণ্যদ্রব্য এখানে আসিয়া জমে, ও পরে এখান হইতে অন্যত্র রপ্তানি হয়।

ক্যান্টন (চীন)।—সি-নদীর তীরে বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। দক্ষিণ চীনের ইহা বড় রপ্তানি-বন্দর

হংকং।—চীনের একটি পার্বত্য দ্বীপ। ইহা বৃটিশ অধিকারভুক্ত। এখন ইহা একটি বড় জাহাজ নির্মাণের স্থান। তাছাড়া সিমেণ্ট, দড়ি, প্লাস্টিক, ক্যাম্বিসের জুতা, কার্পাস সূত্র প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়। ইহা একটি বন্দর। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। চা, ধান্য, কার্পাস, খনিজ তৈল, আফিম প্রভৃতি ইহার রপ্তানি-দ্রব্য।

সাংহৈ (চীন)—মধ্যচীনে ইয়াংসি নদীর মুখে,—অল্প দক্ষিণে—চীনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র, বন্দর, ও গুদাম বন্দর। ইয়াংসি নদীর উর্বর ও জনবহুল অববাহিকা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। চা, কার্পাস, কার্পাসদ্রব্য, চাউল, রেশম, সয়াবীন ইহার রপ্তানি-দ্রব্য

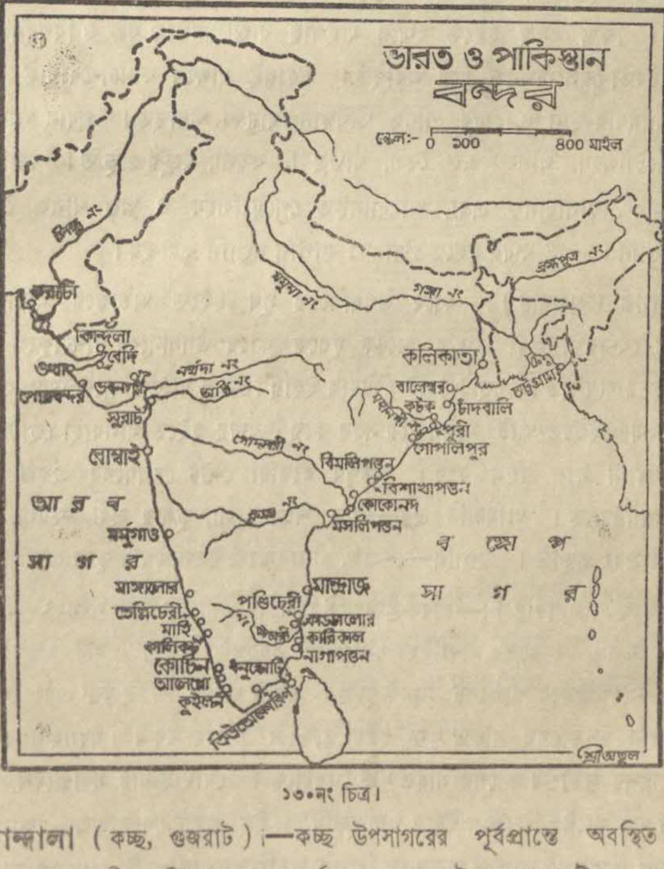
ইয়োকোহামা (জাপান)।—জাপানের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। জাপানের রাজধানী টোকিও-র ইহা বন্দর। রেশম, রেশমদ্রব্য, কার্পাসদ্রব্য, কাচ, চীনামাটির দ্রব্য ও খেলনা প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

ওসাকা (জাপান)।—জাপানের দ্বিতীয় বন্দর ও কিওটোর বন্দর। ইহা কার্পাসশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ও প্রধান কার্পাসদ্রব্য-রপ্তানি-স্থান।

ভ্লাডিভস্টক (সো. রুশিয়া)।—প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বন্দর। মস্কো হইতে সাইবেরিয়ার উপর দিয়া যে-রেলপথ আসিয়াছে তাহা এই স্থানে শেষ হইয়াছে। সাইবেরিয়ার কাষ্ঠ, মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন এই পথে রপ্তানি হয়। জাপান হইতে অনেক দ্রব্য এই পথে আমদানি হয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বন্দর

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি বড় বন্দর এবং অন্ততঃ ২২৬টি মাঝারি ও ছোট বন্দর আছে। তন্মধ্যে ১৫০টি বন্দরে কিছু-না-কিছু পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বন্দরের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—



১৩০নং চিত্র।

কান্দালা (কচ্ছ, গুজরাট)।—কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি পোতাশ্রয়। করাচী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই পোতাশ্রয়টিকে বড় বন্দরে

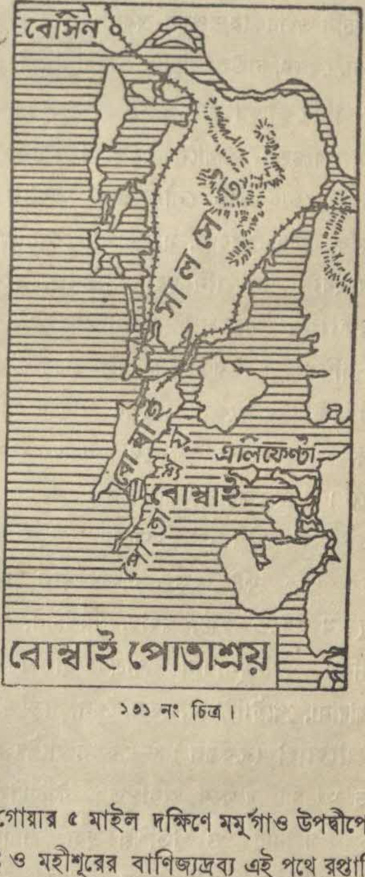
পরিণত করা স্থির হইয়াছে। প্রবেশপথের চড়া দূরীভূত করিয়া পলি-উত্তোলন-কার্যের সুচারু ব্যবস্থা রাখিলে ইহা একটি উচ্চ অঙ্গের বন্দর হইবে। দিল্লী হইতে ইহার দূরত্ব করাচী অপেক্ষা কম, এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে খনিজ-সম্পদ্ বাড়িবার বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক্ষণে খনিজ তৈল পাওয়া গিয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশ করাচী বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল, তাহা সহজেই এই বন্দরের এলাকাধীন হইতে পারিবে। এখান হইতে দিশা পর্যন্ত একটি ছোট মাপের (metre-gauge) রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে নলযোগে জল আনিতে পারিলে, সে-অভাব দূরীভূত হইতে পারিবে।

ওখা (গুজরাট)।—কাথিয়াওয়ার উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানে সমস্ত স্টিমারই যাইতে পারে। বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং ইহা বর্তমানকালের উপযোগী সুখ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র হইতে বন্দরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত বক্র ও বিপদ্‌সংকুল ; এবং নিকটবর্তী রেলস্টেশনও দূরে অবস্থিত। ইহারই দক্ষিণে করাচী-বোম্বাই পথের স্টিমার থামিবার স্থান ও হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দ্বারকা অবস্থিত। প্রধান আমদানি দ্রব্য—পেট্রোলিয়ম, খনিজ অন্য তৈল, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, খর্জুর প্রভৃতি। রপ্তানি—সিমেণ্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য, আমদানিকৃত পেট্রোলিয়ম ও অন্য খনিজ তৈলের পুনরায় রপ্তানি। এই বন্দর হইতে প্রধানতঃ কার্পাস রপ্তানি করা হয়।

ভবনগর (গুজরাট)।—কাম্বে উপসাগরের মুখ হইতে অভ্যন্তরে মাহী নদীর মুখ পর্যন্ত যে-দূরত্ব, ইহা তাহার অর্ধেক দূরত্বে কাম্বে উপসাগরের পশ্চিমকূলে একটি খাড়ির ভিতর অবস্থিত। ছোট-ছোট স্টিমার ইহার ভিতরে যাইতে পারে, এবং বড়-বড় জাহাজ বন্দর হইতে আট মাইল দূরে নঙ্গর করে ; বন্দর হইতে মালবাহী ছোট-ছোট নৌকা সেখানে মাল বহন করে। ভূতপূর্ব বরোদা স্টেট রেলপথের একটি শাখা এখানে আসিয়াছে। আমদানি দ্রব্য—খাদ্য শস্য, তূলা, তূলার দ্রব্য, কয়লা, কাষ্ঠ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি। রপ্তানি—পেঁয়াজ, চীনাবাদাম, তেল, খৈল, তূলা প্রভৃতি।

বোম্বাই (মহারাষ্ট্র)।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লোকসংখ্যায় সর্ববৃহৎ সহর এবং সর্বপ্রধান বন্দর। ভারতের মধ্যে ইহা ধনসম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত,—ইহা উত্তরে সালসেট নামক বৃহত্তর একটি দ্বীপের সহিত যুক্ত এবং শেষোক্ত দ্বীপটি প্রধান ভূ-ভাগের সহিত যুক্ত হইয়াছে, এবং পশ্চিম-অঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল রেলপথ ইহাকে দেশের অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়াছে। বোম্বাই রাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ ও অন্ধ্র রাষ্ট্রের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহা একটি পোতাশ্রয়,—কোলাবা-র দক্ষিণদিকস্থ প্রবেশপথ ব্যতীত অন্যসকল দিকেই সুরক্ষিত পোতাশ্রয়টি প্রায় ১৪ মা. লম্বা,

এবং ৪ হইতে ৬ মাইল চওড়া,—ইহা ২২ হইতে ৪০ ফিট্ গভীর। যে-কোন আকারের জাহাজ এখানে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, ও নিরাপদে থাকিতে পারে। তাই ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। ইহা ইউরোপ হইতে ভারতের নিকটতম পোতাশ্রয়—ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি সুবৃহৎ,—রেলপথে যুক্ত,—রেলপথ পশ্চিমঘাট অতিক্রম করিয়া ইহাকে অভ্যন্তর ভাগের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভারতের তুলার উৎপাদনস্থান ইহারই সন্নিকটে অবস্থিত। তাই ইহারই উপরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তুলার গুদাম অবস্থিত,—ইহার আয়তন ১২৭ একর। তুলা, চীনবাদাম, তৈলবীজ, চামড়া, কার্পাসদ্রব্য, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির রপ্তানি এই পথেই হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে গৃহনির্মাণদ্রব্য, কাচদ্রব্য, ধাতুদ্রব্য, মোটরগাড়ী, যন্ত্রপাতি, মশলা, তুলা, রেশম, পশম, রেয়ন—বস্ত্রাদি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি-দ্রব্য প্রধানতঃ এখানেই আসে।



১৩১ নং চিত্র।

১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দর হইতে ৩৮৬৪ সহস্র টন পণ্য রপ্তানি হয়, ও ১ কোটি ৬ ল. ২৫ সহস্র টন পণ্য আমদানি হয়। এই বন্দরের আয় এই বৎসরে খরচ বাদে ছিল ৩ কোটি ২৬ ল. ৭৮ হাজার টাকা।

মর্মুগাও (গোয়া)।—পাঞ্জিম বা নব-গোয়ার ৫ মাইল দক্ষিণে মর্মুগাও উপদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে এই বন্দরটি অবস্থিত। মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের বাণিজ্যদ্রব্য এই পথে রপ্তানি করা হয়। তূলা, চীনাবাদাম, নারিকেল, লবণ ও ম্যাঙ্গানিজ প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, টালি প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

মাঙ্গালোর (মহীশূর)।—ইহা দক্ষিণ-রেলপথের এক প্রান্তে অবস্থিত। ২০০ টন পর্যন্ত জাহাজ ইহার ভিতরে থাকিতে পারে। এখান হইতে কাঠ, টালি, চা, মরিচ, কফি, কেস্থয়াদানা, কাঠ, দারুচিনি, গুপারি, চন্দনকাঠ, রবার প্রভৃতি রপ্তানি হয়,

এবং লাক্ষাদ্বীপ হইতে নারিকেল-সংক্রান্ত দ্রব্য এই স্থান হইতে বিক্রীত হয়। আমদানি-দ্রব্য—কাটাকাপড়, জ্বালানি কাঠ, লবণ, ছোবড়া, দালদা, ছোলা, ছালা, প্রভৃতি।

তেল্লিচেরি (কেরল)।—মাঙ্গালোর হইতে ৯৪ মাইল দক্ষিণে ও কোঝিকোড-মাঙ্গালোর রেলপথের উপর অবস্থিত। স্টিমারগুলি প্রায় দুই মাইল দূরে নঙ্গর করিয়া থাকে। যখন এই অঞ্চলের অন্যান্য বন্দর মৌসুমি বায়ুপ্রবাহকালে বন্ধ হয়, তখনও এই বন্দরে কাজ চলে। বেত, কাষ্ঠ, চা, কফি, চন্দনকাঠ, মরিচ, আদা, নারিকেল, ও দারুচিনি এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য, এবং লবণ, লবণাক্ত মাছ, টালি, কেরোসিন, যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য, খেজুর, চাউল প্রভৃতি আমদানি-দ্রব্য।

কোঝিকোড (কালিকট—কেরল **)**।—কোঝিকোড—তেল্লিচেরি হইতে ৪২ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে সমুদ্র অগভীর। সেজন্য প্রায় ৩ মা. দূরে জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকে, ও ছোট-ছোট নৌকা দ্বারা জাহাজে মাল যাতায়াত করে। নারিকেল দড়ি, চা, কফি, কাষ্ঠ, ছোবড়া, মরিচ, নারিকেল, আদা, রবার, তূলা, চীনাবাদাম—এখানকার রপ্তানি-দ্রব্য। আমদানি-দ্রব্য—খাদ্যশস্য, কেরোচিন, কার্পাসদ্রব্য, খর্জুর প্রভৃতি।

কোচিন (কেরল)—কালিকটের ৯০ মা. দক্ষিণে কেরল রাষ্ট্রে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের একটি বড় বন্দর। ইহার পার্শ্বেই এক বিল আছে; তাহাতে কেরল স্টেটে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। এডেন হইতে ইহার দূরত্ব বোম্বাই অপেক্ষা ৩০০ মা. এবং কলম্বো অপেক্ষা ২৪২ মা. নিকটতর। সেইজন্য ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই বন্দরের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

উইলিংডন দ্বীপ এই বন্দরের এক অংশ। ইহার পশ্চাতে ১২০ বর্গমাইল বিল আছে। ৪৫০ ফিট বিস্তৃত একটি খাল দিয়া এই বন্দরে আসিতে হয়। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে কাষ্ঠ, রবার, দারুচিনি, মরিচ, চা, কফি, নারিকেল ছোবড়ার দ্রব্য, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। আমদানি-দ্রব্য—কয়লা, খাদ্যশস্য, কেস্থয়াদানা, পেট্রোলিয়াম, তেল, খৈল, প্রভৃতি।

আলেপ্পি (কেরল)।—কেরল রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহা কোচিন হইতে ৩৫ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। কাঁচামাল আদান-প্রদানের এখানে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। গৃহনির্মাণ ও পূর্তশিল্প দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি প্রধান আমদানি দ্রব্য। নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়া, নানা-প্রকারের নারিকেলের ছোবড়াজাত দ্রব্য, মরিচ, আদা, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

তিউতিকোরিন (মান্দ্রাজ)—মান্দ্রাজ স্টেটের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। মান্দ্রাজের পরে ইহা এই স্টেটের দ্বিতীয় বন্দর। দক্ষিণ-রেলপথের ইহা দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্ত। এখানে জল অগভীর, তাই জাহাজ প্রায় ৫ মা দূরে নঙ্গর

করে। এখান হইতে সিংহল দ্বীপে চাউল, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। অন্য **রপ্তানি-দ্রব্য**—তূলা, চা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, ছাগল, ভেড়া, তুলার দ্রব্য প্রভৃতি। ধনুষ্কোটি বন্দর খুলিবার পরে সিংহলের সহিত ইহার আদান-প্রদান কমিয়া গিয়াছে। আমদানি-দ্রব্য—কয়লা, তূলা, বস্ত্রাদি, নারিকেল, শস্য প্রভৃতি।

ধনুষ্কোটি (মান্দ্রাজ)—দক্ষিণ-রেলপথে দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে রামেশ্বর দ্বীপের উপর শেষ স্টেশন। ইহা পক্-প্রণালী ও মান্নার উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে সিংহলের তালাইমান্নার যাইতে স্টিমারে মাত্র ২ ঘণ্টা লাগে, এবং এখান হইতে প্রত্যহ ভারত ও সিংহলের মধ্যে স্টিমারে যাত্রী যাতায়াত করে।

কারিকাল (মান্দ্রাজ)।—এখান হইতে সিংহলে চাউল রপ্তানি হয়, এবং স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির তৈল নিকটস্থ বৃটিশ অধিকারে পাঠানো হয়। চাউল, সুপারী ও দেশলাই প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য।

পণ্ডিচেরি (মান্দ্রাজ)।—মান্দ্রাজ হইতে ১০৪ মা. দক্ষিণে কুড্ডালুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে একটি বন্দর এবং চীনাবাদাম-রপ্তানির বড় কেন্দ্র। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—আস্ত চীনাবাদাম, কাপড়, আম, হাড়ের গুঁড়ার সার ও পেঁয়াজ। প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**—তূলা, সুপারী ও সিমেণ্ট।



১৩২ নং চিত্র।

মান্দ্রাজ।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্য অংশের পূর্ব-উপকূলে ভারতের তৃতীয় বন্দর। কিন্তু ইহা একটি কৃত্রিম বন্দর। এখানে কোন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ছিল না,—জাহাজ তরঙ্গতাড়িত উপকূল সন্নিধানে থাকিত, এবং তীর হইতে নৌকা করিয়া জিনিসপত্রের ও যাত্রিগণের জাহাজে যাতায়াত চলিত। তৎপরে তীর হইতে সমুদ্রমধ্যে দুইটি দেওয়াল গাঁথিয়া ২০০ একর স্থান ঘিরিয়া লইয়া এখানে একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ার করা হইয়াছে। ৩১½ ফিট্ জলের গভীরতা দরকার এমন ১৪ খানি জাহাজ এখানে থাকিতে পারে। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ এই

বন্দরে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। দক্ষিণ রেলপথ এই বন্দরের সর্বত্র, সমস্ত জাহাজঘাট ও গুদাম-ঘরের মধ্যে রেলপথদ্বারা যোগস্থাপন করিয়াছে। এই বন্দরে প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**—চাউল, কয়লা, তেল, কাগজ, জমির সার, কাষ্ঠ, চিনি, রং, চামড়া রং করার দ্রব্য, ধাতুদ্রব্য, কাচদ্রব্য, রাসায়নিক-দ্রব্য, রেলপথ-সংক্রান্ত দ্রব্য, সিমেন্ট, চামড়া, মদ্য, মশলা, দেশলাই, তুলা মোটরগাড়ী, সাইকেল, তুলার দ্রব্য, পাটদ্রব্য, সাবান প্রভৃতি এবং প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—চীনাবাদাম, বস্ত্রাদি, বীজ, চামড়া, পেঁয়াজ, তামাক, তুলা, কফি, খইল, জমির সার প্রভৃতি।

মসলিপত্তন (অন্ধ্র)।—কৃষ্ণানদীর ব-দ্বীপে প্রধান বন্দর, এবং কলিকাতা-মান্দ্রাজ রেলপথের বিজয়ওয়াদা (অন্ধ্র) স্টেশনের সহিত একটি শাখাপথদ্বারা সংযুক্ত। এখানে বড়-বড় জাহজাগুলি ৫ মাইল দূরে থাকে। নৌকাযোগে জাহাজের সহিত সংস্রব রক্ষিত হয়। কিন্তু ঝড়-বাতাসের সময়ে সমস্ত কাজ বন্ধ থাকে। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—চীনাবাদাম, রেড়ি, খইল প্রভৃতি।

কাকিনাদ (অন্ধ্র)।—মান্দ্রাজ হইতে ২১০ মাইল উত্তরে গোদাবরী নদীমুখের উত্তরে অবস্থিত। এখানে জাহাজ ৬-৭ মাইল দূরে থাকে, এবং ছোট-ছোট স্টিমার জাহাজ হইতে মাল লইয়া কোকনদ খালের উপর গঠিত জাহাজঘাটে মাল লইয়া আসে। এখানে প্রায় ৪২টি জেটি হইতে জাহাজে মাল চালান দেওয়া হয়। প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—তুলা, চীনাবাদাম, রেড়ি, ধান ও চাউল। **আমদানি-দ্রব্য**—কেরোসিন, ধাতুদ্রব্য।

ভিজাগাপত্তন (অন্ধ) বা বিশাখাপত্তনম।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র স্থলবেষ্টিত সুরক্ষিত পোতাশ্রয় ও বন্দর। পার্শ্বেই সমুদ্রতীরে পাহাড়শ্রেণীর অবস্থিতির জন্য পোতাশ্রয় সমুদ্র হইতে দেখা যায় না। ইহা মান্দ্রাজ ও কলিকাতার অর্ধপথে অবস্থিত। কাকিনাদ হইতে ১০৫ মা. উত্তরে অবস্থিত, এবং ভূতপূর্ব মান্দ্রাজ ও সাউথ মাহারাট্টা রেলপথ এবং ভূতপূর্ব বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সঙ্গমস্থল ওয়ালটেয়ার-এর সহিত ২ মাইল দীর্ঘ শাখাপথদ্বারা সংযুক্ত। একটি ছয় বর্গমাইল জলাভূমি পরিষ্কার ও গভীর করিয়া এবং সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া এই পোতাশ্রয় ও বন্দর প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা এক্ষণে বড় বন্দর বলিয়া পরিচিত। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে মধ্যপ্রদেশের অরণ্য, কৃষি ও খনিজ-সম্পদ্ রহিয়াছে। ভিজিয়ানাগ্রাম ও রায়পুর রেলপথ খুলিবার পর হইতে মধ্যপ্রদেশের সহিত ইহার যোগসাধন হইয়াছে। সম্প্রতি এখানে জাহাজনির্মাণ-স্থান স্থাপিত হওয়ার জন্য ইহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল। নিকটবর্তী স্থানে কয়েকটা ছোট-ছোট পাটকল ও ছোট একটি

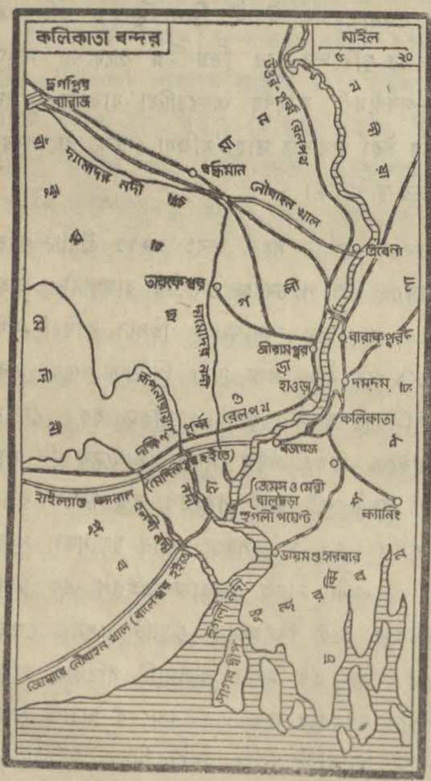
চিনির কল ব্যতীত কোন বৃহৎ শিল্পস্থান বা বড় সহর নাই। সেজন্য এ-বন্দরে আমদানি কম ও রপ্তানি বেশী।—ইহার প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**—ম্যাঙ্গানিজ, তামাক, হরীতকী, সরিষা, খইল ও কাষ্ঠ। প্রধান **আমদানি-দ্রব্য**—খাদ্যদ্রব্য, খনিজ তৈল, কলকব্জা ও রাসায়নিক-দ্রব্য প্রভৃতি।

পরাদিপ (উড়িষ্যা)—নূতন বন্দর। এই বন্দর দিয়া প্রচুর লৌহ জাপানে প্রেরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যেই এই বন্দরটির সৃষ্টি হইয়াছে।

বালেশ্বর (উড়িষ্যা)—এককালে উড়িষ্যার একমাত্র বড় বন্দর ছিল, এবং ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দীনেমার ও পর্তুগীজ বণিক্‌গণ এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। এখানে তখন লবণের ব্যবসায় প্রবল ছিল। তখন এখানে মান্দ্রাজ হইতে চাউল, এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ হইতে কড়ির চালান আসিত। এই কড়ি তখন ক্ষুদ্র মুদ্রা ছিল,—ছোট-ছোট কেনা-বেচায় ইহাই ছিল মুদ্রা। কলিকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি হইলে,—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পরে ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের সহিত সংযোগ-সাধনের সুব্যবস্থা হইলে,—গবর্ণমেন্ট লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় তুলিয়া দিলে—এবং যে-বুড়াবালাং নদীর উপর ইহা অবস্থিত তাহা মজিয়া গেলে, বালেশ্বরের অবনতি ঘটে। এখন বালেশ্বর অতীতের স্মৃতিমাত্র।

কলিকাতা (প. বঙ্গ)।—ভারতবর্ষের প্রধান সহর, এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইহা পশ্চিমবঙ্গ স্টেটের রাজধানী। ইহা হুগলী নদীর উপর নদীমুখ হইতে ১২০ মা. দূরে অবস্থিত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, হুগলী নদীর ১ ঘন ফুট জলে ১·১ ঘন ইঞ্চি শক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৬ কোটি ঘন গজ পলিমাটি হুগলীর জলে প্রবাহিত হয়। সেজন্য হুগলী নদীতে চড়া পড়ে। হুগলী হইতে সাগর পর্যন্ত নদীপথে অনেকগুলি চড়া আছে, তন্মধ্যে দশটি প্রধান। এই দীর্ঘ পথটি এই চড়া প্রভৃতির জন্য বিপদসংকুল। এই-সকল চড়া বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে ৪০ মা. পর্যন্ত পথের চড়াসকল সময়-সময় স্থান পরিবর্তন করে। জেম্‌স্ ও মেরী নামক জাহাজ এইরূপ এক চড়ায় বাধিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে। সেইজন্য সেই বিপজ্জনক চড়াটি এখনও জেমস্ ও মেরী চড়া নামে খ্যাত। এই-সকল কারণে এই নদীর পলিমাটি পরিষ্কার করিয়া ও চড়াগুলি কাটিয়া দিয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য এই বন্দরের অধ্যক্ষ পোর্ট কমিশন সর্বদাই সুদক্ষ কর্মচারীর অধীনে তলকর্ষিণী (dredger) নিযুক্ত রাখিয়াছেন, এবং সর্বদাই এই চেষ্টা চলিতেছে যেন জাহাজের চলিবার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়। যে-সকল জাহাজের চলিবার পক্ষে ২৭ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন, তাহা

এই পঙ্কোদ্ধারের ফলে সহজেই সকল সময় জোয়ারে আসিতে পারে। কিন্তু যে-সকল জাহাজের ৩০ ফুট গভীর জলের প্রয়োজন তাহাদিগকে তেজকোটালের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং কলিকাতা বন্দরে আসিতে কতকগুলি জাহাজকে সাধারণ জোয়ারের জন্য এবং কতকগুলি জাহাজকে তেজকোটালের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। এজন্য জাহাজ চালানো হিসাবে ইহা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য নদী। তলকর্ষিণী দ্বারা প্রতি বৎসর প্রায় ৭ কোটি ঘন গজ মাটি হুগলীগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলা হয়, এবং তাহাতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বন্দরে আগচ্ছমান জাহাজ নদীমুখ হইতে পোর্ট কমিশনারগণের নিযুক্ত এক পথপ্রদর্শক-জাহাজের কর্তৃত্বাধীনে নদীপথে অগ্রসর হয়। পথনির্ণয়ের সুবিধার জন্য নদীমধ্যে বয়া ও দীপবর্তিকা সন্নিবেশিত আছে। এই সকল কারণে **এই বন্দর রক্ষা করিতে বহু ব্যয় করিতে হয়।**



১৩৩নং চিত্র।

প্রথমে এই বন্দর কাশীপুর হইতে খিদিরপুর গার্ডেন রীচ পর্যন্ত ৯ মাইল দীর্ঘ ছিল, পরে খনিজ তৈল রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত আরও ১৬ মাইল এবং সর্বশেষে উত্তর কোন্নগর পর্যন্ত আরও ৯ মাইল বর্ধিত হয়। এই দীর্ঘ পথে নদীতীর কাপড়, কাগজ, চট প্রভৃতির কলে ও কারখানায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এখন বড়-বড় জাহাজ কলিকাতার নূতন সেতুর উত্তরে যাইতে পারে না।

একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে যে-সকল ডক, জেটি, মালগুদাম, এবং জাহাজ-যাতায়াতের ও মাল তুলিবার ও নামাইবার সুখ ও সুবিধা থাকা দরকার, তাহা সমস্তই এই বন্দরে আছে।

কলিকাতার উন্নতির জন্য কলিকাতার নিকটে হলদিয়া নামক স্থানে একটি উপ-বন্দর নির্মিত হইবে।

কলিকাতা এখনও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। তাহার কারণ এই যে, (১) পূর্ব-পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং বিশাখাপত্তন বন্দরের উন্নতিবশতঃ ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমি** কমিয়া গেলেও এখনও ইহা **বহুদূর-বিস্তৃত** (১২৮ নং চিত্র দেখ)। (২) ইহা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা জনবহুল এবং শস্য ও শিল্পবহুল সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত। (৩) ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়লাক্ষেত্র কলিকাতা হইতে ১৩০ মা. মাত্র দূরে অবস্থিত বলিয়া জাহাজের আবশ্যকীয় কয়লা এখান হইতে লইতে হয়। (৪) বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসামের আমদানি ও রপ্তানি বহুলাংশে এই পথে হইয়া থাকে। (৫) কাঁচা-পাট, পাটদ্রব্য, চা, চামড়া, তৈলবীজ, চাউল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি—ইহার প্রধান-প্রধান **রপ্তানি-দ্রব্য**। ভারতে প্রস্তুত কাঁচা লোহের (pig iron) কতকাংশ এই পথে রপ্তানি হয়। (৬) ইহার প্রধান **আমদানি দ্রব্য**—চাউল, কাপড়, লবণ, পেট্রোলিয়ম, যন্ত্রপাতি, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি।

তুলনার জন্য নিম্নে কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দরের ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ দেওয়া হইল।

	১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের আমদানি (সহস্র টন)	১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের রপ্তানি (সহস্র টন)	১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দের আয় (লক্ষ)
বোম্বাই	১০৬২৫	৩৮৬৩	৩২৬'৭৮
কলিকাতা	৫৪০৫	৩৯৪৫	৫০'৩৯

(২) সহর ও নগর

সহর ও নগরের উপযোগী স্থান ও অবস্থা

পূর্বেই বলিয়াছি যে-সকল স্থানে শিল্প বাণিজ্য ও সর্জন শিল্প গড়িয়া উঠে ও উন্নতি লাভ করে, সেই সকল স্থানই পরিণামে সহরে ও নগরে পরিণত হয়। কিরূপ স্থানে এইরূপভাবে সহরসৃষ্টি সম্ভব, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। বহু রাজপথের ও রেলপথের ও জলপথের সংযোগস্থল। যেমন,—কানপুর, চিকাগো, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, প্যারি, ভিয়েনা, বোম্বাই।

পার্বত্য-অঞ্চল,—

২। দুই বা ততোধিক পার্বত্য উপত্যকার সংযোগ-স্থল। অষ্ট্রিয়ার ইন্‌সব্রুক।

৩। পার্বত্য পথের প্রান্তভাগ। যেমন—পেশোয়ার, মিলান, সেণ্ট গদার্ড।

জলাশয়-সম্পর্কে—

৪। নদীমুখে বা তাহার সন্নিকটে অবস্থিত স্থান, বিশেষতঃ নদী যদি বাণিজ্যবাহী হয়। যেমন,—আমাজন মুখে—প্যারা; নীল নদীমুখে—কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া; সিন্ধুনদ মুখে—করাচী।

৫। দুই নদীর ছেদন-স্থল, বিশেষতঃ যে-সকল নদীর তীরে ব্যবসায়-স্থল বেশী। যেমন,—ম্যানাওস, এলাহাবাদ।

৬। নদী-তীরের যে-স্থান হইতে সমুদ্র-তীরের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। যেমন,—মণ্ট্রিল, লণ্ডন, কলিকাতা।

৭। অর্ধ-চক্রাকারগতি নদীর বহির্বর্তুল অংশ (এই অংশে বিস্তৃত স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়)। যেমন—সেণ্টপল, কলম্বো।

৮। যে-স্থানে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে মাল বোঝাই করিতে হয়। যেমন,—সিঙ্গাপুর।

৯। যে-সকল হ্রদের পার্শ্বস্থিত স্থান বাণিজ্যবহুল এবং হ্রদপথে যাহার বাণিজ্য হয়, সেই-সকল হ্রদের প্রান্তভাগ। যেমন,—চিকাগো, ডুলুথ।

১০। নদীর উপরিস্থিত সেতুমুখ, বা হাঁটিয়া পার হওয়া যায় নদীর এরূপ স্থান। যেমন,—শোণনদী-তীরস্থ ডেহরী।

স্থলভাগে,—

১১। যে স্থান হইতে শিল্পশক্তি সংগ্রহ করা হয়, বা উৎপাদন করা যায়, সে স্থানে যদি সহজে কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা থাকে, তবে ঐরূপ শিল্পশক্তি উৎপাদন স্থল সন্নিধান। যেমন,—নায়াগারা, পিট্‌স্‌বর্গ, আসানসোল, টাটানগর।

১২। যে-স্থান হইতে শক্তি-উৎপাদন-স্থলে বা বাজারে কাঁচামাল আনয়ন ব্যয়বহুল, ও অসুবিধাজনক, আবার, কাঁচামাল যদি বিপুলকায় ও অত্যন্ত ভারী হয়, —সে-স্থল হইতে যদি বাজার বা শক্তি-উৎপাদন-স্থলে যাতায়াতের অল্প সুবিধাও থাকে, তবে ঐরূপ কাঁচামাল-উৎপাদন-স্থল।

মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল স্থানে পরিবহন-সুবিধার পরিবর্তন হয়, সেথান অবস্থিত সহর ও নগরেরও পরিবর্তন ঘটে।

এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটি কারণে সহর ও নগর গড়িয়া উঠে। যেমন,

১। **গবর্ণমেণ্টের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী**।—দেশের যথাসম্ভব কেন্দ্রস্থলে ইহা স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু জনবহুল ও শিল্পবহুল অংশেই প্রায় ইহা স্থাপিত হয়। যেমন,—লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর।

২। **বিশ্রাম-নগর**।—এইরূপ স্থানের স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া ও দৃশ্যাবলী ভাল হওয়া আবশ্যক। যেমন,—মধুপুর, গোপালনগর।

৩। **খনি-সহর**।—উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের জন্য শিল্পপ্রধান স্থানের সহিত ইহার বাণিজ্য গড়িয়া উঠে। সেজন্য ইহা ক্রমশঃ জনবহুল হয়, ও নগরে পরিণত হয়। কিন্তু ময়লা, ধোঁয়া, কলের শব্দ ও লোকের কোলাহলে ইহা সমৃদ্ধি লাভ করে না, এবং খনিজ দ্রব্য ফুরাইয়া গেলে ইহার পতন হয়। যেমন,—ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, ডিগবয়।

৪। **উপনগর**।—কোন বৃহৎ নগর যখন অত্যন্ত লোকবহুল হয়,—যখন সেখানকার দ্রব্যমূল্য, ও জমির মূল্যও এরূপ বেশী হয় যে, সাধারণ লোকের সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়,—তখন সহরের উপকণ্ঠে স্বাস্থ্যপ্রদ ও বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী উপনগর গড়িয়া উঠে। যেমন,—বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, বরানগর।

৫। **তীর্থনগর**।—তীর্থস্থান সমৃদ্ধিশালী ও শিল্পপ্রধান হইয়া সহরে বা নগরে পরিণত হয়। যেমন,—কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি।

৬। **ঐতিহাসিক নগর**।—কোন-কোন স্থান ইতিহাসের কোন বিখ্যাত ঘটনা আশ্রয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী নগরে ও সহরে পরিণত হয়। যেমন, পাটলিপুত্র, দিল্লী, ফতেপুর।

৭। **বিশেষ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন-স্থান**।—মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর—রেশমদ্রব্য, বানারস—রেশমের উপর কারুকার্য, আলিগড়—মাখন, খাগড়া—কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

৮। **সৈন্যাবাস**।—কোন স্থানে স্থায়িভাবে সৈন্যরক্ষা করিলে, সেখানে সৈন্যগণের ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ করিতে-করিতে ক্রমশঃ একটি সহর গড়িয়া উঠে। যেমন,—মীরাট, কোয়েতা।

কয়েকটি মহাদেশীয় বাণিজ্যকেন্দ্র

পূর্বে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান বন্দরগুলির উল্লেখ করিয়াছি। পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্যকেন্দ্রই বন্দর। এক্ষণে মহাদেশের অভ্যন্তরস্থিত কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ করা যাইতেছে,—

১। **বার্মিংহাম** (ইংলণ্ড)।—ওয়ারউইকশিয়ারের শিল্পপ্রধান সহর। লণ্ডনের পরেই ইহা ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সহর, এবং সমগ্র গ্রেটবৃটেনের লণ্ডন ও গ্লাসগোর পরে তৃতীয় বড় সহর। এই সহরে এত কারখানা আছে এবং ফাঁকা জায়গা ও সবুজ মাঠের এত অভাব যে, ইহাকে "আঁধারে দেশ" (black country) বলে। পূর্বে ইহা প্রধানতঃ লৌহ-শিল্পের স্থান ছিল। এক্ষণে এখানে তাম্র, দস্তা, নিকেল, সীসা, এলুমিনিয়ম

প্রভৃতি এবং পিতল ও ব্রঞ্জের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতির ধাতুদ্রব্য ও অলঙ্কারাদিও এখানে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা সমুদ্রতীরস্থ বন্দর নহে, শিল্পদ্রব্য অন্যস্থান হইতে এখানে আনা সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য যে-সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ভারী কাঁচামাল দরকার হয় না, বিশেষভাবে শিল্পদক্ষতা প্রয়োজনীয়, সেই সকল দ্রব্য প্রধানতঃ এখানে প্রস্তুত করা হয়। ঘড়ি, সেলাইয়ের কল, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, বন্দুক, অলঙ্কারাদি ও নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য এখানকার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য। বার্মিংহাম—লিভরপুল, হাল, লণ্ডন ও বৃষ্টল—এই চারিটি বন্দরের সম-দূরবর্তী ও ইহাদের সহিত যুক্ত। বড়-বড় জিনিস রপ্তানির জন্য ইহা টেম্‌স্‌, মার্সে, হাম্বার, সেভার্ন প্রভৃতি নদীর সহিত খাল দ্বারা সংযুক্ত। গ্রেটবৃটেনে বার্মিংহাম একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র।

সেফিল্ড (ইংলণ্ড)—ইয়র্কশিয়ার, ডার্বিশিয়ার ও নটিংহামশিয়ারের বৃহৎ কয়লা খনি অবলম্বনে এখানে বৃহৎ লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে সেফিল্ড ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি তৈয়ার করার প্রধান স্থান।

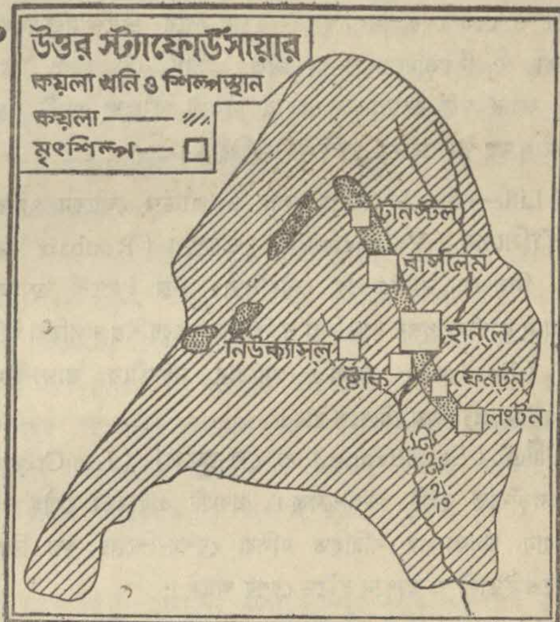
লীড্‌স্‌ (ইংলণ্ড)—আয়ার নদীতীরে বস্ত্রশিল্প এবং চামড়া, কাঠ ও সাবান-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আয়ার নদীর পথ দিয়া ইহা পশ্চিম তীরের সহিতও সংযুক্ত। সেজন্য ইহার বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

বেলফাষ্ট (আয়ারলণ্ড)—সমগ্র বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জে সর্বপ্রধান শণবস্ত্র নির্মাণের স্থান। স্থানীয় ও আমদানি-করা শণ হইতে এই বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এইস্থানে **লণ্ডনডেরি** আরও একটি শণবস্ত্র নির্মাণের স্থান।

ডবলিন (আয়ারলণ্ড)—আয়ারলণ্ডের রাজধানী ডবলিন ইংলণ্ডের মধ্যভাগের প্রবেশপথের ঠিক বিপরীত দিকে আইরিশ সমুদ্রতীরে আয়ারলণ্ডের মধ্যভাগের নিম্নভূমিতে প্রবেশপথে—লিফে নদীর মুখে অবস্থিত। ইহার এইরূপ অবস্থিতির জন্যই ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। রাজপথ, রেলপথ ও খাল প্রভৃতির দ্বারা আয়ারলণ্ডের বিভিন্ন দিকের সহিত ইহা সংযুক্ত। এক্ষণে ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান—মদ্য, বিস্কুট, পপ্‌লিন ও বিবধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এখানে প্রস্তুত করা হয়। ইহার রপ্তানি-দ্রব্য—গবাদি পশু, ভেড়া, শূকর, ছাগল, মুরগী, ডিম, দুগ্ধদ্রব্য, মাংস দ্রব্য প্রভৃতি। ইহার আমদানি-দ্রব্য—গম, ভুট্টা, সারদ্রব্য, খৈল, কয়লা প্রভৃতি।

স্টোক-অন-ট্রেন্ট (ইংলণ্ড)।—উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ারের ট্রেন্ট নদীর সন্নিহিত টানস্টল, বার্সলেম, হান্‌লে, স্টোক ও লংটন এই "পাঁচটি মৃৎশিল্প সহর"—এবং ফেন্‌টন্‌ নামক অপর একটি চীনামাটির দ্রব্য প্রস্তুতকারী সহর—এই ছয়টি সহরের

যৌথ নাম "স্টোক অন-ট্রেন্ট অর্থাৎ ট্রেন্ট-সন্নিহিত **স্টোকাদিসহর**। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের কর্নওয়াল ও ডর্সেট অঞ্চল হইতে চীনামাটি আনাইয়া



১৩৪ নং চিত্র।

স্থানীয় মৃত্তিকা লইয়া এখানে উচ্চশ্রেণীর মৃন্ময়দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তর স্টাফোর্ডশিয়ার কয়লা খনির নাম করিলেই সেই সঙ্গে মৃৎশিল্পের কথা মনে পড়ে।

ডাণ্ডি (স্কটলণ্ড)। টে ফার্থের উত্তর তীরে স্কটলণ্ডের তৃতীয় সহর, পঞ্চম বন্দর এবং শিল্পপ্রধান স্থান ডাণ্ডি অবস্থিত। পাটশিল্প এখানকার প্রধান শিল্প;—এখানে পাট হইতে দড়ি, দড়া, পাইল, ক্যাম্বিস প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। শণবস্ত্র, চাটনি প্রভৃতি ও নানা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত করা হয়। স্থানীয় ফল ব্যতীত, অন্য সমস্ত শিল্পোপকরণই আমদানি করিতে হয়। তথাপি ডাণ্ডি একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

প্যারিস (ফ্রান্স)—ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সীন ও তাহার উপনদী মার্নে-র সংযোগস্থলের উপর অবস্থিত। এই নদীর যেস্থানে অতিক্রম করা সহজ সেখানেই প্যারিস অবস্থিত,—এই নদীপথে সমুদ্রে যাওয়া যায়। ফ্রান্সে কৃষিভূমির মধ্যে

ইহা অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে কৃষিই প্যারিসের প্রধান সম্পদ্ ছিল। এই সকল কারণে প্যারিস একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এক্ষণে এখানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহা বিলাসের সহর,—তাই নানাপ্রকার বিলাস-দ্রব্য এখানকার মুখ্য শিল্পদ্রব্য। প্যারিস বহু রাজপথ ও রেলপথের মিলনস্থল। ইহার পূর্বে শ্যাম্পেন-অঞ্চলের উচ্চভূমিতে মেষপালন হয়, ও নিম্নভূমিতে দ্রাক্ষা জন্মে। তাই এই অঞ্চল "শ্যাম্পেন" নামক মদ্য প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত। ইহার নিকটে **রীম্‌জ্‌** একটি বড় বিক্রয়-কেন্দ্র;—মেষপালন ও মদ্য উৎপাদনের জন্যই ইহার শ্রীবৃদ্ধি।

লিল (Lille—ফ্রান্স)—স্থানীয় লৌহ ও প্রধানতঃ লোরেন খনির লৌহ লইয়া লিল, **ভালাঁসিয়েন** (Valenciennes) ও **রুবে** (Roubaix) সহরে লৌহদ্রব্য প্রস্তুত হয়। লিল-এর নানাপ্রকার লৌহশিল্পের জন্য ইহাকে "ফ্রান্সের বার্মিংহাম" বলে। এখানে কার্পাস, পশম বয়নশিল্প ও চিনি-পরিষ্করণশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

বঁর্দো (Bordeaux—ফ্রান্স)—গ্যারোন নদীতীরে দ্রাক্ষা-উৎপাদন স্থান। তাই এখান হইতে প্রচুর মদ্য বিদেশে যায়।

স্যাঁটেটিএঁ (St. Etienne) ও **লে-ক্রুজো** (Le Creusot) ফ্রান্সের মধ্যবর্তী মালভূমিতে দুইটি কয়লা-ক্ষেত্র। প্রথমটি প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত, এবং দ্বিতীয়টি রোন উপত্যকার সন্নিহিত বলিয়া রেশম-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় রেশম ব্যতীতও ইতালী ও জাপান হইতে রেশম আসে।

লিয়ঁ (Lyons—ফ্রান্স)—রোন ও সেওন নদীর সংযোগস্থলে প্রধান রেশম-শিল্প-কেন্দ্র।

নান্সি (Nancy—ফ্রান্স)—লোরেন লৌহক্ষেত্র-অঞ্চলে লৌহ-শিল্প-উৎপাদন-স্থান।

পশ্চিম জার্মানির রাইন নদীর রূঢ়-উপনদীর তীরে যে-কয়লাখনি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া রূঢ়-অঞ্চল জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। **এসেন** ও **ডর্টমুণ্ড** শিল্পস্থান। এই অঞ্চল বয়নশিল্পের জন্যও বিখ্যাত। **আকেন** (Aachen) পশম-শিল্প ও **ক্রেফেল্ড** (Krefeld) রেশমশিল্প ও কার্পাসশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ম্যাগ্‌ডেবার্গ (জার্মানি)—এল্‌বে নদীতীরে উত্তর জার্মানির সমতলভূমির সর্বোৎকৃষ্ট কৃষি-উৎপাদন-অঞ্চলে অবস্থিত সর্বশ্রেষ্ঠ বীট ও গম উৎপাদনস্থান। সেজন্য ইহা বীটচিনি ও ময়দা উৎপাদনস্থান।

স্টাস্‌ফোর্ট (জার্মানি)—হার্‌ৎস্ (Harz) পর্বতের নিকট **স্টাস্‌ফোর্ট** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পটাশ-সঞ্চয়-স্থান। ইহার নিকটে লিগ্‌নাইট কয়লা পাওয়া যায়। এজন্য এস্থানে সাবান, কাচ, রং প্রভৃতি নানা শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

লিপ্‌সিগ্ (জার্মানি)—পুস্তক প্রকাশ, ও মুদ্রণের জন্য বিখ্যাত বড় সহর। এখানে প্রতি বৎসরে পশুলোমের বড় বাজার বসে। সাইবেরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও এখানে লোম আসে।

ইন্‌স্‌ব্রুক (অষ্ট্রিয়া)—আল্পস্ পর্বতের মধ্যে একমাত্র বড় সহর। ইন্ নদীর সেতুর নিকটে এই অঞ্চলের বাজার বসে। ভেনিস্ হইতে ব্রেনার গিরিপথ দিয়া এখানে পণ্যদ্রব্য আসে। দেশভ্রমণকারিগণের জন্য ইহা এই অঞ্চলের ভ্রমণ-কেন্দ্র। এই সকল কারণে ইহার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে এবং পার্বত্য অঞ্চল ও নিম্নভূমির মধ্যে ইহা বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়াছে।

ভিয়েনা—অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ও বড় সহর। দানিয়ুব তীরে চারিদিকে পর্বত ও উচ্চভূমি বেষ্টিত যে-নিম্নভূমি আছে, সেখানেই ভিয়েনা অবস্থিত। এখান হইতে রুশিয়া, পোলণ্ড, জার্মানি, বেলজিয়ম, হলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, বল্‌কান উপদ্বীপ প্রভৃতি চারিদিকে পথ গিয়াছে। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস রেলপথ প্যারিস হইতে ইহার উপর দিয়া ইস্তাম্বুল গিয়াছে। ভেনিস এই সকল পথের রক্ষক-স্বরূপ। তাই ভেনিসের এক নাম 'ইউরোপের রাজধানী'। এইরূপ পথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ব্রঞ্জ ও লৌহ, বস্ত্রাদি, চর্মদ্রব্য, ও কাগজাদি প্রস্তুত হয়।

বুদা-পেস্ত (হাঙ্গারি)—হাঙ্গারির মধ্যে দানিয়ুব নদীর একপার্শ্বে বুদা ও অন্য তীরে পেস্ত সহর অবস্থিত, এবং এই দুই সহর লইয়া একটি সহর হইয়াছে বুদা-পেস্ত। এই দুইটি সহর সেতুদ্বারা যুক্ত। নানাদিক্ হইতে রেলপথ এখানে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং নানাদিক্ হইতে পণ্যদ্রব্য,—বিশেষতঃ কৃষিপণ্য—এখানে আসিয়া সংগৃহীত হয়, ও পরে বন্টিত হয়। ইহা হাঙ্গারির শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-কেন্দ্র।

মস্কো—সোভিয়েট রুশিয়ার রাজধানী। ইহা ইউরোপীয় রুশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এবং চারিদিক্ হইতে রেলপথ ও রাজপথ আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহার নিকটে **তুলা** সহরে কয়লা পাওয়া যায়। ডনবাস হইতেও এখানে কয়লা আসে। এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। আবার এই অঞ্চল পর্ণমোচী-বনাঞ্চলে অবস্থিত ও ইহারই নিকটে পশম, শণ ও চামড়া পাওয়া যায়। উত্তরে অদূরে কোলা উপদ্বীপ অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়। সেজন্য মস্কো-সহরে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং ইহা একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র।

লেনিনগ্রাড্ (সো. রুশিয়া)—ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের তীরে বনাঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে শণ উৎপন্ন হয়, ও এলুমিনিয়ম পাওয়া যায়। সেজন্য এই অঞ্চলে কাষ্ঠশিল্প

বয়নশিল্প, এলুমিনিয়ম শিল্প, ইলেক্‌ট্রিক-দ্রব্য নির্মাণ-শিল্প, জাহাজ নির্মাণ-শিল্প, বরফভাঙ্গা যন্ত্র নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বেলগ্রেড্ (যুগোশ্লাভিয়া)—সাভা ও দানিয়ুব নদীর সঙ্গমস্থলে এবং ইউরোপের মধ্যভাগে ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস্ রেলপথের উপর অবস্থিত যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

মিলান (ইতালী)—উত্তর ইতালীতে যেস্থানে আল্প্‌স্ পর্বতের সিম্‌প্লন ও সেণ্ট গদার্ড গিরিপথের রেলপথদ্বয়—তুরিন হইতে ভেনিস-গামী রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে সেইস্থানে অবস্থিত। সেজন্য মধ্য ইউরোপের পণ্যদ্রব্য পার্বত্য গিরিপথে এখানে আসে। আবার লম্বার্ডির সমতলভূমির রেশম এখানে সংগৃহীত হয়। চীন হইতেও এখানে রেশম আমদানি হয়। সেজন্য মিলান রেশমদ্রব্য, কার্পাসদ্রব্য ও কৃত্রিম রেশমদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যও নির্মিত হয়।

ভেনিস (ইতালী)—ব্রেনার গিরিপথের ভিতর দিয়া মধ্য ইউরোপের সহিত ইহার বাণিজ্য চলে। প্রাচীনকালে আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে যাইবার জলপথ আবিষ্কারের পূর্বে, ভারতবর্ষ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে পণ্যদ্রব্য এখানে আসিত, এবং পরে ব্রেনার গিরিপথ ও সমুদ্রপথ দিয়া চারিদিকে বণ্টিত হইত।

হানকাউ, হান-ইয়াং ও **উচাং** (চীন)—এই তিনটি সহর চীনের অভ্যন্তরে ইয়াংসি ও তাহার উপনদী হান্-এর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নদী-বন্দর। পিকিনের সহিত রেলপথে ইহার সংযোগ আছে। এই পথে সহস্র-সহস্র বড়ি-চা ও ইস্টক-চা রুশিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় রপ্তানি হয়।

ইর্খুট্স্ক্ (সো.-রুশিয়া)—সাইবেরিয়ার বড় সহর ও বাণিজ্যস্থান।

কাবুল (আফগানিস্তান)—আফগানিস্তানের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে খাইবার গিরিপথের ভিতর দিয়া পাকিস্তান ও ভারতের সহিত বাণিজ্য চলে। ফল, হিং, কার্পেট, পশম প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য।

তেহ্‌রাণ (ইরাণ)—পূর্বে ও পশ্চিমে এবং এলবুর্জ পর্বতের ভিতর দিয়া কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে এখান হইতে বাণিজ্যপথ গিয়াছে। দামাস্কাস ও বেইরুট পর্যন্তও মটর-গাড়ীর পথ আছে। সেজন্য এখানকার বাণিজ্য বিশেষ উন্নত হইয়াছে।

ইস্পাহান (ইরাণ)—অনেকগুলি বাণিজ্য-পথের মিলনস্থান। সেজন্য ইহা একটি বাণিজ্যস্থান।

দামাস্কাস (সিরিয়া)—মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। এখান হইতে মেসোপোটামিয়া, মক্কা, মদিনা, প্যালেস্টাইন—প্রভৃতি স্থানে পথ গিয়াছে। এজন্য ইহা বড় বাণিজ্য-

কেন্দ্র। ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পূর্বে এশিয়া হইতে এই পথে ভেনিসে পণ্যদ্রব্য যাইত। সুতরাং ইহা প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্যস্থান।

কায়রো (মিশর)—রেলপথ দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়া, রসেত্তা, দামিয়েত্তা, সুয়েজ ও সৈয়দ বন্দরের সহিত এবং জেরুজালেমের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত এবং আকাশ-পথের একটি বড় সংযোগ স্টেশন। সেজন্য ইহা ক্রমশঃ বড় বন্দরে পরিণত হইয়াছে। নীল অঞ্চলের পণ্য এইপথে বিদেশে যায়।

ওটাওয়া (ক্যানাডা)—সমগ্র ক্যানাডার রাজধানী। ইহার উত্তরে ইহার পশ্চাৎভূমি বনাকীর্ণ স্থান। সেজন্য ইহা কাষ্ঠের ব্যবসায়ের প্রধান স্থান।

মিনিয়াপোলিস (আ. যুক্তরাষ্ট্র)।—মধ্য-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগেই গম ও ওট জন্মে। সেজন্য মিসিসিপি-নদীতীরে মিনিয়াপোলিস পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ গম পিষিবার স্থান।

পিট্স্বার্গ (আ. যুক্তরাষ্ট্র)—ওহিও নদীর দুইটি উপনদী এলিঘেনি ও মননগাহেলা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে এই শিল্পস্থানটি অবস্থিত। এলিঘেনি নদী দ্বারা ঈরি হ্রদে যাওয়া যায়। মননগাহেলা দিয়া অ্যাপালাশিয়ান পর্বত ভেদ করিয়া পূর্বে যাওয়া যায়। ওহিও দিয়া মিসিসিপি-পথে যাওয়া যায়। সুতরাং এথান হইতে শিল্পদ্রব্যের চারিদিকে যাওয়ার সুবিধা আছে। তাছাড়া এই অঞ্চলেই কয়লা, লৌহ, প্রাকৃত গ্যাস প্রভৃতি পাওয়া যায়। এক্ষণে স্থানীয় লৌহ কমিয়া যাওয়ায় সুপিরিয়র হ্রদ-অঞ্চল হইতে প্রচুর লৌহ আসিতেছে। সেজন্য পিট্সবার্গ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য নির্মাণ-স্থল। এই সহরে ও নিকটবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত নানাসহরে লৌহ-সংক্রান্ত ইঞ্জিন, রেলের পাটি, শিল্পযন্ত্র, কাঁটা, ইলেকট্রিক-দ্রব্য প্রভৃতি সকল রকম লৌহদ্রব্য প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ লৌহদ্রব্য এথানে প্রস্তুত হয়।

উইনিপেগ (ক্যানাডা—ম্যানিটোবা)—ক্যানাডার প্রেইরি অঞ্চলে সর্ববৃহৎ সহর ও গম-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সকল পথের ইহা কেন্দ্রস্থল।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের বাণিজ্য-প্রধান নগরাদি

ত্রিপুরা—

আগরতলা—ত্রিপুরার রাজধানী। এথানে ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তুলা ও আরণ্যদ্রব্য প্রভৃতির বাজার আছে। এথানকার তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধ।

আসাম—

শিলং—ইহা মনোহর পার্বত্য প্রদেশে ৫ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত আসামের রাজধানী। গৌহাটি হইতে শিলং যাইবার জন্য সুন্দর মোটর চলাচলের রাস্তা আছে।

গৌহাটি—ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আসামের সর্বাপেক্ষা বড় ও বাণিজ্যপ্রধান সহর। এই স্থানেই আসামের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, তেজপুর, শিবসাগর, ও ডিব্রুগড় প্রভৃতি আসামের সমৃদ্ধিশালী স্থানগুলি ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় নদীতীরে অবস্থিত,—এগুলিই আসামের প্রধান বাণিজ্যস্থান,—চা, কাষ্ঠ ও ধান্য প্রভৃতির ব্যবসায়স্থল।

শিলচর—দক্ষিণ-পূর্ব আসামে বরাক নদীর উপত্যকায় কাছাড়ে অবস্থিত। চা ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ের বিখ্যাত স্থান।

পশ্চিমবঙ্গ—

দার্জিলিং—৭০০০ ফি. উচ্চে হিমালয় পর্বতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সুন্দর শৈল-সহর ও গবর্ণমেন্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এই অঞ্চলে অনেক চা-এর বাগান আছে। এখান হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইবার রাস্তা আছে, ও এই পথে কাষ্ঠের ব্যবসায় চলে। ইহার পূর্বে—

কালিম্পং—তিব্বতের সহিত ভারতের পশমের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এই অঞ্চলে কার্সিয়াং চা-উৎপাদন স্থল।

শিলিগুড়ি—দার্জিলিং অঞ্চলে যাইবার প্রবেশদ্বার। এখান হইতে ছোট রেলপথে দার্জিলিং যাইতে হয়। কাষ্ঠ, চা, কমলালেবু প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

জলপাইগুড়ি—তরাই অঞ্চলে অবস্থিত আর একটি চা-এর উৎপাদন-স্থল।

বর্ধমান—বর্ধমান জেলার প্রধান সহর এবং ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়স্থল।

আসানসোল ও রাণীগঞ্জ—পশ্চিমবঙ্গের কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত এবং কয়লা-রপ্তানির প্রধান স্থান। কয়লা অবলম্বন করিয়া এই অঞ্চলে নানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রাণীগঞ্জে কাগজের কল ও মৃৎশিল্পের কারখানা আছে। আসানসোল-অঞ্চলে বাইসাইকেল এবং অন্য লৌহশিল্প ও এ্যালুমিনিয়ম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে ইহা ইষ্ট রেলপথের একটি বড় ষ্টেশন।

বিহার—

পাটনা—বিহারের রাজধানী—গঙ্গা, গণ্ডক ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা একটি ব্যবসায়স্থল। ইহা হিন্দুরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। রেলপথ-বিস্তারের পরে ইহার ব্যবসায় কমিয়া গিয়াছে। পূর্বে পাটনা হইতে এত চাউল রপ্তানি হইত যে, একপ্রকার মোটা চাউল সর্বত্র "পাটনাই চাউল" বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার সহরতলী বাঁকিপুর ও দিনাপুরে সেনানিবাস আছে।

ভাগলপুর ও **মুঙ্গের**—গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া দুইটিই ব্যবসায়স্থল। ভাগলপুরের রেশমদ্রব্য বিখ্যাত। মুঙ্গেরে মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন দুর্গ আছে।

রাঁচী—ছোটনাগপুর-মালভূমিতে অবস্থিত বিহার-গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। রাঁচী খৃষ্টান মিশনারীদিগের একটি কর্মভূমি। ইহারই সন্নিকটে **হাজারিবাগে** অভ্রের খনি আছে।

ডালমিয়ানগর—এখন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়স্থল ও শিল্পপ্রধান স্থান—ইহা শোণ নদীর উপরে অবস্থিত। এখানে চিনির, সিমেণ্টের ও কাগজের কল আছে। চূণাপাথরের অঞ্চল বলিয়া এখানে চূণ ও সিমেণ্ট তৈয়ার হয়। ইহারই সন্নিকটে রোটাস নামক স্থানে শেরশাহের প্রসিদ্ধ রোটাস গড় আছে,—এবং সেখানে এখন রোটাস সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। পূর্বে ইহার নাম ছিল—ডেহরি-অন-শোন।

ঝরিয়া—ধানবাদ মহকুমায় অবস্থিত কয়লা-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল। ইহারই নিকট সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

জামসেদপুর—সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা। ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, চূণাপাথর ও উড়িষ্যার লৌহ বিশেষ দূরবর্তী নহে বলিয়া এই অঞ্চলেই এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

উড়িষ্যা—

কটক—মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব রাজধানী ও সর্ববৃহৎ সহর—এখনও রাজধানীর অধিকাংশ কাজকর্ম এখানেই হয়। তাঁতশিল্প, গালা ও শিং-এর এবং হাতীর দাঁতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। রাস্তাপথ, নদীপথ, খালপথ ও রেলপথ দ্বারা ইহা নানা স্থানের সহিত সংযুক্ত। সেজন্য ইহা একটি বড় বাণিজ্যস্থান।

পুরী—হিন্দুদিগের আর-একটি তীর্থস্থল। ইহা পূর্বে **একটি** বন্দর ছিল, এখন ইহার বন্দর-খ্যাতি লোপ পাইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্যস্থল।

মান্দ্রাজ—

মাদুরৈ (পূর্ব নাম—**মাদুরা**), **তিরুচিরাপল্লী** (**ত্রিচিনোপল্লী**) ও **তাঞ্জোর** প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত হিন্দুমন্দির আছে। মাদুরৈর অনেক মন্দির কারুকার্যের জন্য সুবিখ্যাত। ইহাকে "দক্ষিণের কাশী" বলে। লোকসংখ্যায় মান্দ্রাজের পরেই ইহার স্থান। তিরুচিরাপল্লী—চুরুট তৈয়ারির কেন্দ্রস্থল। এখানে ৩০০ ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপরে সুন্দর একটি মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণে **ডিণ্ডিগাল** চুরুটের কারখানার জন্য বিখ্যাত। তাঞ্জোর—ধান্য-উৎপাদন-অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

কইম্বাটুর—নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে একটি উন্নতিশীল স্থান,—কৃষি-অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে গবর্ণমেন্টের কৃষি-কলেজ, কৃষিশিক্ষাক্ষেত্র এবং বনবিজ্ঞান-কলেজ আছে। ইহা সুপারী ও কার্পাসের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। অদূরে পায়কারা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় বলিয়া ইহার শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে।

উতকামন্দ বা **উটি**—মাদ্রাজ স্টেটের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ইহা দার্জিলিং-এর ন্যায় পর্বতোপরি ৭ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা এবং **কুনুর, ওয়েলিংটন** ও **কোদাইকানাল** স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। কোদাইকানালে সূর্যরশ্মি দেখিবার মানমন্দির আছে।

মহীশূর—

বাঙ্গালোর—মহীশূরের রাজধানী—সমুদ্র-সমতল হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ নিকটবর্তী স্থানে গ্রানিট পাথরের প্রাচুর্য থাকাতে, এখানকার গবর্ণমেন্ট-আফিস প্রভৃতি উহাতে গঠিত হইয়াছে;—সেজন্য সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে তুঁতের চাষ প্রচুর হয়, এবং সেজন্য ইহা রেশম-উৎপাদন স্থান। এখানে চন্দনকাষ্ঠের বড় ব্যবসায় আছে—তাছাড়া, এখানে কার্পাস ও পশমদ্রব্যের কারখানা আছে, এবং কার্পেট প্রস্তুত করা হয়।

ভদ্রাবতী—মহীশূরের একটি বড় শিল্পপ্রধান স্থান, এবং ভারতের তৃতীয় প্রধান ইস্পাত-শিল্পের স্থান; জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া এখানে কারখানা চালানো হয়। এখানে লৌহ ও ইস্পাতের, কাগজের, ও সিমেন্টের কল আছে।

কেরল—

ত্রিবান্দ্রম—রাজধানী—ইহা এখানকার রাজবাড়ী, মন্দির ও দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বিশেষ শিল্পপ্রধান স্থান। নারিকেলের নানা ব্যবসায় এখানে বিশেষ প্রচলিত।

অন্ধ্র—

হায়দরাবাদ—ভূতপূর্ব হায়দরাবাদ নামক নিজাম-শাসিত দেশীয় রাষ্ট্রের, এবং বর্তমানে অন্ধ্রের, রাজধানী—লোকসংখ্যায় এই সহর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চম। ইহা হিন্দুপ্রধান স্থান হইলেও বহুকাল ইহার শাসনকর্তা নিজাম-উপাধিক মুসলমান ছিল বলিয়া এখানে মসজিদ প্রভৃতি বেশী—এবং এখানে তুর্ক, আরবীয়, পাঠান ও পারসিক মুসলমানের বাস বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হোসেন সাগর, ও মির আলম নামক জলাশয় হইতে জল সরবরাহ হয়। ইহা ব্যবসায়-স্থল, কিন্তু

এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। তুঙ্গভদ্রা নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

বিজয়ওয়াডা (পূর্বনাম বেজওয়াডা)—উন্নতিশীল সহর, বড় বাণিজ্যস্থান ও রেলস্টেশন।

গুজরাট—

আমেদাবাদ—তিন শত বর্ষ পূর্বে ইহা একটি মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল, এবং তখন ইহা কার্পাস, রেশম, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও কাষ্ঠ সম্পর্কিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ইহার সে-সকল ব্যবসায়ের কোন চিহ্ন নাই। এক্ষণে ইহা কার্পাস-সূত্র, কার্পাস বস্ত্র ও কার্পাস-সংক্রান্ত অন্য দ্রব্য প্রস্তুত করার অন্যতম প্রধান স্থান, এবং কার্পাস-দ্রব্য সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি কারখানা এই স্থানে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে চামড়া ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা গুজরাটের রাজধানী।

বরদা—ভূতপূর্ব বরদা-রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং বিশেষ উন্নত সহর। বহু হিন্দু মন্দির ও বৃহৎ-বৃহৎ আফিস-বাড়ী, লাইব্রেরী, প্রাসাদ, হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজ প্রভৃতিতে এই স্থান একটি অট্টালিকা-পুরী। ভূতপূর্ব দেশীয় রাজার চেষ্টায় বর্তমান কালের বহু শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহারাষ্ট্র—

পুণা—ইহা পশ্চিমঘাটের উপর ১৮০০ ফিট উচ্চ স্থানে অবস্থিত—মহারাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের বর্ষাকালের রাজধানী। এখানে বড় সৈন্যাবাস ও গবর্ণমেণ্টের হাওয়া-আফিস আছে। ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান।

নাগপুর—মারহাট্টা-বংশীয় ভোঁসলা রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানকার কৃষ্ণ মৃত্তিকায় প্রচুর তূলা জন্মে। সেজন্য এখানে কাপড়ের ও তূলার দ্রব্যের কল আছে। ইহা ব্যবসায়-প্রধান স্থান, এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও বিশাখাপত্তনের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত বলিয়া ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

মধ্যপ্রদেশ—

জবলপুর (পূর্ব নাম জব্বলপুর)—ভূতপূর্ব ই. আই. আর. ও জি. আই. পি. রেল-পথদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহারই নিকটে নর্মদা-তীরে মার্বেল পাথরের পাহাড় আছে। নর্মদা সেই পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় প্রধান স্থান।

ওয়ার্দা, ওয়ারোয়া, চন্দা, হিঙ্গনঘাট—বাণিজ্যের, বিশেষতঃ তুলার বাণিজ্যের, জন্য বিখ্যাত—ইহা একটি তুলা-অঞ্চল, এবং এখানে তুলা ছাড়াইবার, সুতা পাকাইবার ও কাপড় প্রস্তুত করিবার মিল আছে। এই অঞ্চলে খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায়;—**ওয়ারোয়াতে** কয়লার ও **চন্দাতে** লৌহের খনি আছে।

গোয়ালিয়র ও ইন্দোর—এই দুই স্থানেই গম, ছোলা, ইক্ষু, সর্ষপ, তুলা প্রভৃতি জন্মে,—খনিজ দ্রব্যও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই এখানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে,—কার্পাসবস্ত্র, ও সুতা-প্রস্তুতের কল, চামড়ার কারখানা, কাচের ও মৃৎপাত্রের কারখানা প্রভৃতি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাজস্থান—

যোধপুর, বিকানীর ও যশল্মীর—প্রসিদ্ধ জিপ্‌সাম-উৎপাদক-স্থান। এখানকার জিপ্‌সাম লইয়া সিন্ধ্রি কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়। কয়লা, উল্‌ফ্রাম প্রভৃতিও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

উত্তরপ্রদেশ—

লক্ষ্ণৌ—পূর্বে অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল, এক্ষণে ইহা এই প্রদেশের দ্বিতীয় সহর ও রাজধানী। মুসলমান রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা মস্‌জিদ, গোরস্থান ও নবাবদিগের নানা প্রাসাদ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এবং এখনও রহিয়াছে। এখানে প্রাচীনকাল হইতেই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও হাতীর দাঁতের ব্যবসায় আছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের অন্য কয়েকটি স্থান যেমন বর্তমান-বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চশ্রেণীর শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে, লক্ষ্ণৌ তাহা পারে নাই। তবে ইহা কৃষিদ্রব্য সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল।

এলাহাবাদ—উত্তরপ্রদেশের রাজধানী ছিল, এবং এখনও ইহাতে কতকাংশে রাজধানীর কার্য হয়। এখনও উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্ট এখানে অবস্থিত। ইহা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেজন্য প্রাচীনকাল হইতেই ইহা উন্নতিশীল স্থান ও হিন্দুদিগের তীর্থ। এখানেই সময়ে-সময়ে মাঘমেলা হইয়া থাকে।

কানপুর—এক্ষণে উত্তর-প্রদেশ শিল্পে ও বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে এখানে সিপাহীগণ কর্তৃক নৃশংস ইংরাজ-হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাহার পরে এই অঞ্চল শাসনে রাখিবার জন্য এই স্থানে একদল সৈন্য সন্নিবেশিত হয়। এই স্থানে শিল্পবৃদ্ধির ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। প্রধানতঃ, এই সৈন্যদিগের প্রয়োজনেই এখানে চর্মশিল্প ও পশমশিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে ক্রমশঃ এই স্থান এত উন্নতি লাভ করে, এবং লোকসংখ্যা এত বাড়িতে থাকে

যে, এখানে বহুপ্রকার শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। চর্মদ্রব্য, পশমীদ্রব্য, কার্পাসদ্রব্য, পাটদ্রব্য, চিনি ও তেল প্রভৃতির কল এখানে অনেকগুলি আছে। এখানে চর্ম রং করা হয়, এবং সতরঞ্চি ও গরম বস্ত্রের জন্য এই স্থান সবিশেষ বিখ্যাত। ইহা উত্তর-ভারতের প্রায় মধ্যস্থলে স্থাপিত,—কলিকাতা ও বোম্বাই—এই উভয় স্থানের সহিতই ইহার মাল আমদানি ও রপ্তানি চলে,—উত্তরের ও উত্তর-পশ্চিমের পশম-উৎপাদন-স্থল হইতে পশম-আমদানিও এখানকার পক্ষে সুবিধাজনক। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমগ্র ভারতের একটি শিল্পোপজীবী নগর।

আগ্রা—বর্তমানকালে উত্তরপ্রদেশের অন্যতম শিল্পপ্রধান স্থান,—এখানে দ্রুত শিল্পোন্নতি হইতেছে। ইহা কিছুদিন মোগল রাজত্বের রাজধানী ছিল। সেই সময়ের মোগল-স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ অনেক অপূর্ব প্রাসাদ এখানে এখনও জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে;—তন্মধ্যে শাহ্‌জাহান-নির্মিত তাজমহল প্রধান। বর্তমানকালে ইহা এই অঞ্চলের শস্য-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল। এখানে কাপড়ের কল আছে, এবং ইহা সতরঞ্চি, কার্পাসদ্রব্য, গালিচা ও চামড়া-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ডেরাডুন—হিমালয় ও শিবালিক পর্বতের মধ্যে যে-উপত্যকা আছে, সেই উপত্যকায় মুসৌরি নামক স্বাস্থ্যকর শৈলসহরে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। এক্ষণে এখানে গবর্ণমেন্টের বন-বিভাগ ও জরিপ-বিভাগ অবস্থিত।

মীরাট—বহু পুরাতন সহর—এখানে অশোকের স্তম্ভ আছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পরে এখানে সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই সৈন্যগণের প্রয়োজনে এখানে ক্রমশঃ শিল্পসৃষ্টি হইতে থাকে। এক্ষণে ইহা উন্নতিশীল, শিল্প প্রধান স্থান।

আলিগড়—মাখন প্রভৃতি দুগ্ধদ্রব্যের ও তালা, ছুরি প্রভৃতি লৌহদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারত-বিভাগের পর ইহা এখন সার্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে।

মির্জাপুর—পশমী গালিচার ও পিতলদ্রব্য নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। তদ্ভিন্ন গালার দ্রব্য, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহদ্রব্য এবং মৃন্ময়দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়।

বনারস বা **বারাণসী** বা **কাশী**—ইহা গঙ্গাতীরে হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থান ও প্রাচীন সহর। ইহা একটি শিল্পপ্রধান স্থান;—এখানে তেলের কল, চিনির কল, ময়দার কল আছে। এখানকার রেশমীদ্রব্য ও পিতলদ্রব্য বিখ্যাত।

পূর্ব-পাঞ্জাব—

অমৃতসর—শিখধর্মের কেন্দ্রস্থল ও বাণিজ্যস্থান। এখানে একটি সরোবরের মধ্যে শিখমন্দির স্থাপিত। কথিত হয় ঐ সরোবরে স্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই ইহার নাম অমৃত"সর" অর্থাৎ সরোবর। ইহা একটি উন্নতিশীল বাণিজ্যস্থান ও শিল্পস্থান ;—রেশমবস্ত্র, কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, পশমীদ্রব্য, গালিচা প্রভৃতি এখানকার শিল্পদ্রব্য।

লুধিয়ানা—পশমীদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত,—কাশ্মীরী শাল, অন্য পশমীদ্রব্য ও কার্পাসদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার পাগড়ীর কাপড় বিখ্যাত।

সিমলা—৭২০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস। ইহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস।

কাশ্মীর—

শ্রীনগর—কাশ্মীর উপত্যকায় বিতস্তা নদীতীরে তুষারশীর্ষপর্বত-বেষ্টিত কাশ্মীরের রাজধানী। তিব্বত, পাঞ্জাব প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থানে যাইবার বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহাও একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার শাল ও কার্পেট বিখ্যাত। এক্ষণে এখানে রেশম-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার কাষ্ঠদ্রব্য ও তাম্রদ্রব্য উৎকৃষ্ট।

জম্মু—দক্ষিণভাগে বহির্হিমালয়ের পাদদেশে কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী। কাশ্মীরের এই একমাত্র সহরে রেলপথের যোগ আছে। ইহা শস্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

দিল্লী—পাঞ্জাব প্রদেশের সীমার মধ্যে যমুনাতীরে অবস্থিত। সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়া পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার সমৃদ্ধিশালিনী অববাহিকার দিকে আসিতে হইলে দিল্লী-অঞ্চল দিয়া আসিতে হয়। কারণ, ইহার দক্ষিণে থার মরু ও আরাবল্লী পর্বত রহিয়াছে বলিয়া সেদিক দিয়া অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক নহে। এই পথের রক্ষণার্থে বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে দিল্লীতে রাজধানী নির্মিত হইয়াছিল। এই নগরের সন্নিকটেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এবং পাঠান ও মোগল-বংশের রাজধানী ছিল। মোগল ও পাঠান স্থপতিবিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন এখনও এখানে বর্তমান আছে। এই সকল বিভিন্ন রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের উপর ইংরাজেরা নূতন দিল্লী গঠন করিয়া বৃটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। সে-রাজত্বেরও অবসান হইয়াছে। এক্ষণে দিল্লী ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী।

পাকিস্তান,—পশ্চিম-পাঞ্জাব—

লাহোর—ইরাবতী নদীতটে পশ্চিম-পাঞ্জাবের রাজধানী। পূর্বে ইহা এই অঞ্চলের শস্য-সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই; কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যের লেস্ ও কার্পাসদ্রব্য এখানে কিছু-কিছু উৎপন্ন হয়।

মুলতান—পশ্চিম-পাঞ্জাবের দক্ষিণভাগে একটি প্রাচীন বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। আফগানিস্তান হইতে বাণিজ্যপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ আফগানিস্তান হইতে ফল, হিং মশলাদি আনিয়া এখানে বিক্রয় করে, এবং ফিরিবার সময়ে চিনি, খাদ্যদ্রব্য, ও বস্ত্রাদি লইয়া যায়। ইহা গম, তূলা, তৈলবীজ ও চিনি প্রভৃতি সংগ্রহের ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

লায়ালপুর—রেচনা-দোয়াবে অবস্থিত একটি বাণিজ্যস্থান। পূর্বে ইহা শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে একটি জনবিরল গ্রাম ছিল। পাঞ্জাবে খাল কাটিয়া শস্যচাষের উন্নতি হইলে ইহা শস্য-সংগ্রহ-কেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে।

পেশোয়ার—রাওয়লপিণ্ডি—পাকিস্তানের রাজধানী। আফগানিস্তান হইতে পাঞ্জাবে আসিবার একটি পথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে। সেজন্য ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। সীমান্ত-রক্ষার জন্য এখানেও সেনানিবাস আছে। এইরূপ,—

ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ—গোমাল গিরিপথের নিম্নে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

পূর্ববঙ্গ—

ঢাকা—বুড়ীগঙ্গাতীরে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। ইহা পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এখানকার সূক্ষ্মবস্ত্র, শঙ্খদ্রব্য, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্য বিখ্যাত। এই স্থানে 'মস্‌লিন' নামে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মসূত্রে প্রস্তুত বস্ত্র হইত;—তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ, মৈমনসিং, সিরাজগঞ্জ—পাটের ব্যবসায়ের এবং **রঙ্গপুর** তামাকের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল।

গোয়ালন্দ—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলনস্থলে ব্যবসায়স্থল, এবং পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার রেলপথের দ্বারস্বরূপ। **শ্রীহট্ট**—সুরমা নদীতীরে কমলালেবু ও বেতের দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। **চাঁদপুর**—মেঘনা-তটে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থল।

Questions

1. What do you understand by trade centre, ports, harbour and hinterland? What are the different classes of ports? Give illustrations.

2. State the necessary conditions for the development of sea-ports. Illustrate your answer with suitable examples. (C. U. 1925, '26, '47, '53).

3. Explain the factors responsible for the growth and development of the following ports :—New York, Galveston, Philadelphia, San Francisco, Los Angeles, Vancouver, Chicago. Montreal, Buenos Aires, Montivedio, Antwerp, Hamburg, Marseilles, Alexandria, Cape Town, Bombay, Karachi, Vishakhapatnam, Sydney, Singapore, Honkong, Tokio, Yokohama, Calcutta.

4. What places are suitable for the development of towns and cities? Account for the importance of the following places :—Birmingham, Pittsburg, Winnipeg, Damascus, Cairo, Kanpur, Amritsar, Poona, Jalpaiguri.

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য

সমাপ্ত

উচ্চ মাধ্যমিক

ব্যাপারিক ও আর্থনীতিক ভূগোল

দ্বিতীয় খণ্ড

[একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

দশম পরিচ্ছেদ

সর্জন-শিল্প

১

সর্জন-শিল্পের আবশ্যকীয় উপাদান

শিল্পসৃষ্টির নাম করিলে আজকাল আমাদের মানস-চক্ষে কলকব্জা, কারখানা, শ্রমিক প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট ও বিস্ময়কর দৃশ্য ফুটিয়া উঠে। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি ক্ষুদ্রভাবে এবং বৃহৎভাবেও হইতে পারে। স্বভাবজ কোন জিনিষের, মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য, যে রূপ-পরিবর্তন তাহাই **শিল্পসৃষ্টি**। প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন জিনিষ মানুষের যে-অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারে, শিল্পীর কর্মদক্ষতায় তাহা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের সেই অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে। সুতরাং এই সৃষ্টি-ব্যাপার বিরাটও হইতে পারে—সরল ও সহজও হইতে পারে।

আদিম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অন্ন ও পরিধেয়ের অভাব নিজেরাই মিটাইত। ইহাও শিল্পসৃষ্টি। পরে **ক্রমশঃ** কোন-কোন অঞ্চলে দক্ষ শিল্পীরা দলবদ্ধ হইয়া কারখানা স্থাপন করিয়া যৌথভাবে কাজ করিতে লাগিল এবং এই সকল শিল্পদ্রব্য হাটে ও বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। সভ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মানুষের রসবোধের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল কারখানা লোকবহুল অঞ্চলে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, ক্রমশঃ নূতন-নূতন আবিষ্কার হইতে লাগিল, এবং শিল্পরচনা নিত্য নূতনভাবে পরিণতি লাভ করিয়া বর্তমানের বিরাট ও জটিল সর্জন-শিল্পে পরিণত হইল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা অধ্যুষিত দেশে—অথবা ইহার প্রভাবে প্রভাবিত স্থানে,—এই বৃহৎ সর্জন-শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সকল স্থানে, এমন কি সর্জন-শিল্পে উন্নত অঞ্চলেও,—এখনও গৃহশিল্প ও মধ্যযুগের কারখানা-শিল্প প্রচলিত আছে,—এখনও স্থানীয় লোকে স্থানীয় উপকরণ অবলম্বন করিয়া হস্ত-শক্তিতে শিল্প উৎপাদন করিতেছে। কোন-কোন স্থানে এইসকল গৃহশিল্প ও কারখানা-শিল্প বিরাট্ আধুনিক বৃহৎ শিল্পের পরিপূরকভাবে কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে এখনও জোলা ও তাঁতী কাপড় বুনে, মুচি জুতা প্রস্তুত করে, এবং বাড়ীতেই চাউল প্রস্তুত হয়। এইসকল দ্রব্য যন্ত্রে

প্রস্তুত করার জন্য কারখানাও আছে। আবার, তাঁতী যখন কাপড় বুনে, তাহার সূতা প্রস্তুত হয় কলে। এইরূপে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই শিল্প পাশাপাশি চলিতেছে বটে, কিন্তু বৃহৎভাবে শিল্পরচনার দিকে সকল দেশেই এখন আকর্ষণ বেশী।

সর্জন-শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।—(১) **কাঁচামাল** (Raw Material), (২) **শক্তি** (Power resources), (৩) **উপযোগী জলবায়ু** (Climate), (৪) **পরিবহন-সুবিধা** (Transport), (৫) **শ্রমিক** (Labour), ও (৬) **বিক্রয়-স্থান** (Market).

(১) **কাঁচামাল** (Raw Material)।—**সর্জন-শিল্পের উপকরণ সহজলভ্য ও সুলভপ্রাপ্য হওয়া দরকার।**—প্রাচীনকালে পরিবহনের সুবিধা ছিল না। সেজন্য স্থানীয় উপকরণের দ্বারাই শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু এক্ষণে পরিবহনের সুবিধা হইয়াছে। সেজন্য দূরদূরান্তর হইতে নূতন-নূতন উপকরণ আনিয়াও শিল্পসৃষ্টি হইতেছে,—বহুদূরের বনজঙ্গল, কৃষিক্ষেত্র বা খনি হইতে বনজ দ্রব্য, কৃষিদ্রব্য বা খনিজ দ্রব্য আনিয়া এখন সুবিধাজনক স্থানে শিল্পোৎপাদন করা হইতেছে। আনিবার খরচ যতই কম হইতেছে, এবং যে-দেশে অল্পমূল্যে শিল্পোপকরণ পাওয়া যায়, সেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করার জন্য দ্রব্যমূল্য যতই কম হইতেছে, ততই বিভিন্ন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব হইতেছে। কিন্তু যে-সকল শিল্পের উপাদানের মূল্য **অত্যন্ত কম**, বা উহা **অত্যন্ত** ভারী, অথবা **সহজে নষ্ট হইয়া যায়**, সে-সমস্ত শিল্পদ্রব্য, উপকরণের উৎপাদন স্থানেই প্রস্তুত করিতে হয়। এজন্য কাঠচেরাই বনের মধ্যেই বা পার্শ্বেই হয়, মাখন, পনির ও ঘৃত প্রভৃতি গোচারণ স্থানেই প্রস্তুত হয়, ইষ্টক উপযোগী মৃত্তিকাক্ষেত্রেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, ফলের ব্যবসায় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশেই হয়।

(২) **শক্তি** (Power Resources)।—১। মনুষ্যশক্তি (man-power), ২। পশুশক্তি (quadruped-power), ৩। কাষ্ঠশক্তি (wood or charcoal power) ৪। বায়ুশক্তি (wind-power), ৫। জলশক্তি (water-power), ৬। বিদ্যুৎশক্তি (electric power), ৭। কয়লা (coal), ৮। খনিজ তৈল (petroleum) ও ৯। প্রাকৃত গ্যাস (natural gas)—এই নয়টি শক্তি দ্বারা যন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে। মনুষ্য হস্ত বা পদ দ্বারা পরিচালিত মুদ্রাযন্ত্র, শাণযন্ত্র, তাঁত প্রভৃতি পরিচালনা করে। গরু প্রভৃতি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কূপ হইতে জল তোলে ও ঘানি টানে। কাঠ বা কাষ্ঠকয়লা জ্বালাইয়া শক্তি উৎপাদন করিয়া যন্ত্রাদি চালানো যায়, এমন কি রেলগাড়ীও চালানো যায়। বায়ুর দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া তাহারই দ্বারা শক্তি উৎপাদন করিয়া যন্ত্র চালিত হয়। এখনও হল্যাণ্ডে বায়ুচালিত যন্ত্রের

ব্যবহার আছে। আবার কয়লা হইতে উৎপন্ন বাষ্পশক্তি বা বর্তমান জল দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির পূর্বে, জলশক্তিরই প্রধান ব্যবহার ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ডের রাজ্যসমূহে এবং ইংলণ্ডের মাঞ্চেষ্টর অঞ্চলে শিল্পযন্ত্র সর্বপ্রথম জলশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইত। এইসকল যন্ত্র নদীতীরেই জলপ্রপাতের কাছেই স্থাপন করা হইত। এ-সকল এখন অপ্রচলিত হইয়াছে বা ক্ষুদ্র শিল্পে অল্প প্রচলিত আছে। এক্ষণে শেষোক্ত পাঁচটি, বৃহৎ সর্জনশিল্প-যন্ত্র চালাইবার জন্য ব্যবহৃত প্রধান শক্তি। ইহাদের মধ্যে আবার প্রাকৃত গ্যাস কেবল আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া দেশেই কতক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখনকার প্রধান যন্ত্রবল কয়লা, খনিজ তৈল, জলশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি, এবং বিশেষভাবে কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎশক্তি জলশক্তি দ্বারা বা তাপ দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং ইহাই ক্রমশঃ প্রধান শক্তি হইয়া পড়িতেছে। তবে বিদ্যুৎশক্তি ইহার উৎস হইতে ৩০০ মাইল অপেক্ষা বেশী দূরে বহন করিয়া যন্ত্র পরিচালনা করা যায় না।

(৩) **উপযোগী জলবায়ু** (Climate)।—স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যকর, তেজস্কর ও কার্যে প্রেরণাকর জলবায়ুতে শ্রমিকেরা উৎসাহের সহিত বেশী কাজ করিতে পারে। এইজন্য উষ্ণ-শীতোষ্ণ মণ্ডলেই শিল্প-কারখানা বেশী, এবং উষ্ণমণ্ডলে ও অত্যধিক শীতপ্রধান দেশে শিল্প-কারখানা কম।

কখনও-কখনও কোন-কোন শিল্পদ্রব্যের জন্য বিশেষত্বযুক্ত জলবায়ু দরকার। যেমন, বয়ন-শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ু দরকার, ইহাতে শীঘ্র-শীঘ্র সুতা ছিঁড়িয়া যায় না। এইজন্য ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশিয়ার এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বয়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে বয়ন-কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে আর্দ্রতা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আবার, কোথায় কি-শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, তাহা অনেকাংশে জলবায়ুর দ্বারাই নির্ণীত হয়। যেমন, উষ্ণমণ্ডলে পশমের দ্রব্য নির্মাণ, কিংবা শীতপ্রধান স্থানে কার্পাস বস্ত্র বয়ন করা হইলে, তাহাকে বিক্রয়-স্থানের জন্য সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

(৪) **পরিবহন সুবিধা** (Transport)।—শিল্প-কারখানার জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে-দেশে, বা যে-অঞ্চলে রেলপথ, রাজপথ, জলপথ বিস্তৃতভাবে পরিচালিত হয় নাই, সে-স্থানে শিল্পোন্নতি সম্ভবপর নহে। কারণ, শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন দেশ হইতে বহু সংখ্যক শ্রমিক আনাইতে হয়। এইসকল শ্রমিকের আহার্য এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হয় যে, এক

স্থানে তাহা পাওয়া যায় না; অথবা বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকের জন্য এত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য আবশ্যক হয় যে, বিভিন্ন দেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। তাছাড়া, অনেক শিল্পযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হয়, এবং সেই সকল বিভিন্ন অংশ এক কেন্দ্রীয় স্থানে মিলাইলে যন্ত্রটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নত না হইলে কখনও শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হয় না।

(৫) **শ্রমিক** (Labour)।—সর্জন শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক বিশেষ দরকারী। এইসকল শ্রমিক বুদ্ধিমান্, স্বাস্থ্যবান্, উৎসাহী, এবং সুলভ হওয়া দরকার। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশও শ্রমিকের মহার্ঘতার জন্য অনেক শিল্পদ্রব্য বিদেশ হইতে লওয়া সুবিধাজনক মনে করে। শিল্পক্ষেত্রে জাপানের দ্রুত উন্নতির অন্যতম কারণ তাহার শ্রমিকের সুলভতা।

যন্ত্র চালনার ভিন্ন-ভিন্ন কার্যের জন্য অভিজ্ঞ শ্রমিকই দরকার। পাটের গাছ হইতে তন্তু ছাড়াইবার কাজ, কিংবা অভ্রের চাঙড়া হইতে পাত খুলিবার কাজ ভারতে যেমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয়, এমন কোন দেশে হয় না। সেজন্য বিদেশ হইতে এদেশে পাত খুলিতে অভ্র প্রেরিত হয়।

লোকবহুল অঞ্চলে বিশেষতঃ সহর অঞ্চলে শ্রমিক বেশী পাইবার ও সুলভে পাইবার সম্ভাবনা বেশী। সেজন্য বড়-বড় কল-কারখানা লোকবহুল অঞ্চলেই স্থাপিত হয়। তবে পরিবহনের সুবিধাবশতঃ এবং আর্থনীতিক চাপের জন্য এখন দূর দেশ হইতেও দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়।

(৬) **বিক্রয় স্থান** (Market)।—যেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নাই, সেখানে শিল্পোৎপাদনে বিশেষ ফললাভ হয় না,—সেখানে পরিমাণেও বেশী দ্রব্য বিক্রীত হয় না—মূল্যও বেশী পাওয়া যায় না। সেজন্য যে-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন, এবং লোকের ক্রয়-ক্ষমতাও বেশী, যেখানে অভাব কম, কিন্তু ক্রয়শক্তি বেশী, এবং পরিবহনের সুবিধা, সেইরূপ অঞ্চলই শিল্পোৎপাদনের ও শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের প্রকৃষ্ট স্থল। বৃহৎ-বৃহৎ কারখানার শিল্পদ্রব্য দূর দেশে বিক্রীত হয় সত্য, কিন্তু স্থানীয় লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপরও শিল্পোৎপাদন নির্ভর করে। লোকবহুল উত্তর-পূর্ব আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের শিল্পদ্রব্য প্রেরিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজ-নিজ অঞ্চলও তাহাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের স্থল।

লোকবিরল অনুন্নত দরিদ্র স্থানে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম। এরূপ স্থানে স্থানীয় লোকে স্থানীয় কাঁচামাল দ্বারা নিজ-নিজ বাটীতে আবশ্যকীয় দ্রব্য

প্রস্তুত করিয়া লয়। এজন্য বনাঞ্চলে, পার্বত্য প্রদেশে বা যাযাবরদিগের দেশে উচ্চ ধরণের কারখানা-শিল্প-গড়িয়া উঠে না।

বিক্রয়-স্থল দূরে থাকিলেও সর্জন-শিল্প ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেজন্য অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিলণ্ড দেশে বিশেষভাবে সর্জনশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এক্ষণে পরিবহনের সুবিধা হওয়াতে এ সকল স্থানে শিল্পের উন্নতি হইতেছে। বিক্রয়-স্থানের সহিত যদি পরিবহনের সুবিধা থাকে, তবে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়।

---

②

পৃথিবীর কয়েকটি সর্জন-শিল্প

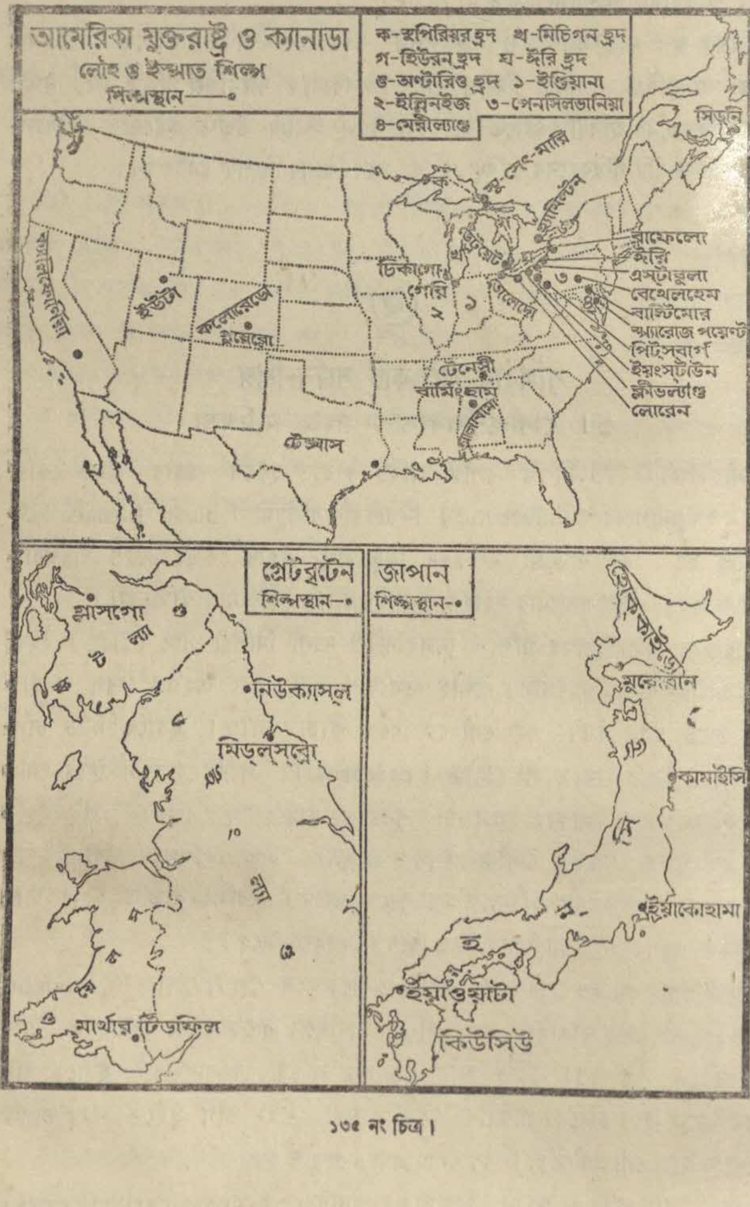
১। লৌহ-বিষয়ক সর্জন-শিল্প

লৌহপ্রস্তর হইতে বিশুদ্ধ লৌহ বাহির করিতে হইলে উহার সহিত কোক কয়লা ও চুনাপাথর (limestone) মিশাইয়া বাতচুল্লী (blast furnace)-তে গলাইতে হয়। এই বাতচুল্লী ৯০-১০০ ফিট্ দীর্ঘ,—ইহার ভিতর প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করাইয়া লৌহ গলানোর সহায়তা করা হয় বলিয়া ইহার নাম **বাতচুল্লী**।

প্রচণ্ড তাপে লৌহপ্রস্তর গলিলে চূনের সহিত ময়লা মিশিয়া গাদ (slag) হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে এবং গলিত লৌহ তলদেশে জমে, এবং এইরূপ তরল অবস্থায় লৌহ ছাঁচে ঢালা হয়। এই লৌহকে বলে **কাঁচা লৌহ**। ইহাকে ছাঁচে ঢালা হয় বলিয়া ইহার নাম **ঢালা লৌহ** (cast iron)। পূর্বে যে-সকল ছাঁচে লৌহ ঢালা হইত তাহার আকার অনেকটা শূকরের ছানার মত ছিল। তাই ইহার নাম হইয়াছিল **পিগ্ লৌহ** (pig iron)। এখনও পিগ্ আয়রন ইহার প্রচলিত নাম। এই লৌহ কঠিন, কিন্তু সহজে ভাঙ্গে। রেলিং প্রভৃতি ইহার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়; এই পিগ্ লৌহ কিন্তু একেবারে বিশুদ্ধ নহে।

ঢালা লৌহ আরও শোধন করা হইলে তাহাকে বলে **পেটা লৌহ** (wrought iron)। এই লৌহ তাতাইয়া লাল করিয়া পিটাইলে বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না, এবং ইচ্ছা করিলে এক খণ্ডের সহিত আর এক খণ্ড জুড়িয়া দেওয়া যায়। ইহাতে খাদ খুব কম থাকে এবং কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা ০·১২ ভাগ হইতে ০·২৫ ভাগ। এই লোহা দ্বারা লোহার কড়ি, শিক, লোহারপাত প্রভৃতি হয়।

ঢালা লৌহ হইতে কার্বন (অঙ্গার) কমাইয়া ইস্পাত (carbon steel) তৈয়ার করা হয়। ইস্পাতে, ঢালা লৌহ অপেক্ষা কম, কিন্তু পেটা লৌহ অপেক্ষা


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
শিল্পস্থান——•
ক-সুপিরিয়র হ্রদ খ-মিচিগন হ্রদ
গ-হিউরন হ্রদ ঘ-ঈরি হ্রদ
ঙ-অণ্টারিও হ্রদ ১-ইণ্ডিয়ানা
২-ইল্লিনইজ ৩-পেনসিলভানিয়া
৪-মেরীল্যাণ্ড
সু-সেণ্ট-মারি
সিডনি
হ্যামিলটন
বাফেলো
ঈরি
এস্টাবুলা
বেথেলহেম
বাল্টিমোর
স্প্যারোজ পয়েণ্ট
পিট্‌সবার্গ
ইয়াংসটউন
ক্লীভল্যাণ্ড
লোরেন
ডেট্রয়েট
চিকাগো
গেরি
টলেডো
ক্যালিফোর্নিয়া
ইউটা
কলোরেডো
পুয়েব্লো
টেক্সাস
টেনেসী
বার্মিংহাম
আলাবামা
গ্রেটব্রিটেন
শিল্পস্থান-•
গ্লাসগো
নিউক্যাস্‌ল
মিড্‌লসব্রো
মার্থার টিডফিল
জাপান
শিল্পস্থান-•
মুরোরান
কামাইসি
ইয়োকোহামা
ইয়াওয়াটা
কিউসিউ

১৩৫ নং চিত্র।

বেশী কার্বন থাকে। সুতরাং পেটা লৌহে পুনরায় কিছু কার্বন মিশাইয়া উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। পিগ লোহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ মিশাইয়া সাধারণ ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। তা' ছাড়া ক্রোমিয়ম, নিকেল, এ্যালুমিনিয়ম, তামা, টাংস্টেন প্রভৃতি খাদ (alloy) মিশাইয়া নানাপ্রকার ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইহাদিগকে **সঙ্কর ইস্পাত** (alloy steel) বলে।

পূর্বে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে বেশী সময় লাগিত, খরচও বেশী পড়িত, এবং এক সঙ্গে বেশী ইস্পাত প্রস্তুত করা যাইত না। প্রথমে স্বল্প মূল্যে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার কৌশল ১৮৫৫ সালে বাহির করিলেন হেন্‌রি বেসেমার। এই পদ্ধতির নাম "বেসেমার" পদ্ধতি। এক্ষণে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ বেসেমার (Bessemer), সীমেন্স (Siemens), মার্টিন (Martin) বা প্রকাশ্য চুল্লী (open hearth) ও বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

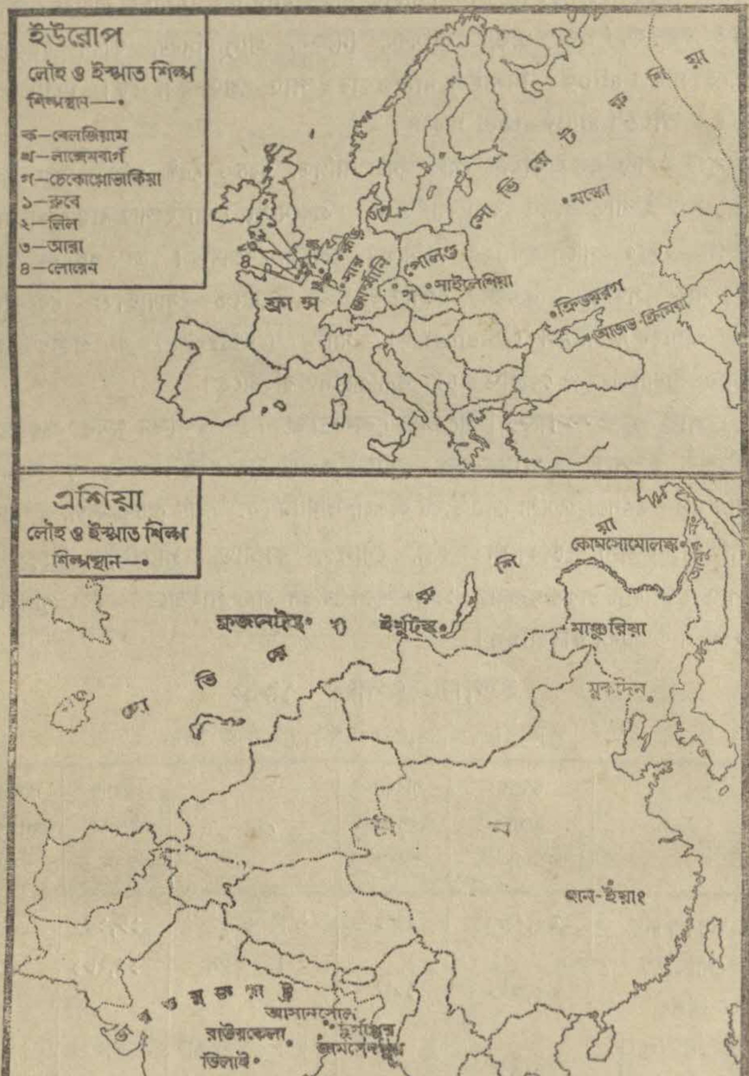
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রস্থল।—উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে **সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্পাত উৎপাদন-স্থল—আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র।** ১৯৬০ খৃ. অব্দের হিসাব মত—তৎপরে, ক্রমশঃ সোভিয়েট রুশিয়া, জার্মানি (প.), গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়ম, ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলণ্ড, ক্যানাডা, লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি। ইস্পাত উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০ সালে ষোড়শ স্থান পাইয়াছে। ইহা পৃথিবীর ০.৯ অংশ উৎপাদন করিয়াছিল।

ইস্পাত-উৎপাদন ১৯৬০

পৃথিবী—৩,৪৪,৫০০ সহস্র মেট্রিক টন

দেশ	উৎপন্ন ইস্পাত (সহস্র মে. ট.)	পৃথিবীর উৎপাদনের শতাংশ	দেশ	উৎপন্ন ইস্পাত সহস্র মে. ট).	পৃথিবীর উৎপাদনের শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৯০,০৬৭	২৬.১	৬। চীন	১৮,১৫০	৫.৩
২। সোভিয়েট রুশিয়া	৬৫,৩০০	১৮.৩	৭। ফ্রান্স	১৭,২৮১	৫.০
৩। জার্মানি (প.) ও সার	৩৪,১০০	৯.৮	৮। ইতালী	৮,২২৯	২.৩
৪। যুক্তরাজ্য	২৪,৬৯৫	৭.১	৯। বেলজিয়ম	৭,১৮৮	২.০
৫। জাপান	২২,১৩৮	৬.৪	১০। পোলাণ্ড	৬,৬৮১	১.৯

দ্রষ্টব্য। আ. যুক্তরাষ্ট্র ও সো রুশিয়া হইতেই ৪৪ ৫ শতাংশ ইস্পাত পাওয়া যায়, এবং আ. যুক্তরাষ্ট্র, সো. রুশিয়া, জার্মানি (প), যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স হইতে ৬৭ শতাংশ অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়।


ইউরোপ
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
শিল্পস্থান—•
ক—বেলজিয়াম
খ—লাক্সেমবার্গ
গ—চেকোস্লোভাকিয়া
১—রুবে
২—লিল
৩—আরা
৪—লোরেন
ফ্রান্স
পোলণ্ড
সাইলেশিয়া
ক্রিভয়রগ
আজভ-ক্রিমিয়া
মস্কো
এশিয়া
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
শিল্পস্থান—•
কোমসোমোলস্ক
মাঞ্চুরিয়া
মুকদেন
হান-ইয়াং
আসানসোল
দুর্গাপুর
রাউরকেলা
জামসেদপুর
ভিলাই

১৩৬ নং চিত্র

পিগ্ লৌহ উৎপাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানও আ. যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরে ১৯৬০ সালের হিসাব মত—**সো. রুশিয়া, চীন, জার্মানি (প.), যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিয়ম-লুক্সেমবুর্গ** প্রভৃতি দেশ।

প্রধান-প্রধান কয়েকটি দেশের পিগ্ (pig) লৌহ উৎপাদন—১৯৬০

পৃথিবী—২,৫৮,০০০ সহস্র মেট্রিক টন (সো. রুশিয়া সমেত)

দেশ	কাঁচা লৌহ উৎপাদন (সহস্র মে টন)	পৃথিবীর উৎপাদনের শতাংশ
১। আ. যুক্তরাষ্ট্র	৬২২৫১	২৪˙০
২। সোভিয়েট রুশিয়া	৪৬৮০০	১৮˙০
৩। চীন	২৭৫০০	১০˙৬
৪। জার্মানি (প.) ও সার	২৫৮৯০	১০˙০
৫। যুক্তরাজ্য	১৬০১৬	৬˙২
৬। ফ্রান্স	১৪৩৪৫	৫˙৪
৭। জাপান	১২৩৪১	৪˙৭
৮। বেলজিয়ম	৬৫৫৩	২˙৫
৯। চেকোশ্লোভাকিয়া	৪৬৯৬	১˙৮
১০। পোলণ্ড	৪৫৬৩	১˙৭
১১। ভারত	৪১৯২	১˙৬

আ. যুক্তরাষ্ট্রে (১) **পিট্‌স্‌বার্গ ও ইয়ংস্‌টাউন অঞ্চল সর্বপ্রধান লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-স্থান।** দেশের কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ লৌহদ্রব্য ও ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রধান স্থল—মিচিগন হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত **চিকাগো ও গেরি অঞ্চল।** পৃথিবীর দুইটি সর্বপ্রধান **লৌহ-কারখানা** এখানে স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) **তৃতীয়** প্রধান উৎপাদন স্থল—**ঈরি-অঞ্চল।** এই অঞ্চলে বাফেলো, ঈরি, ক্লীভল্যাণ্ড, লোরেন, তোলেদো, ডেট্রইট প্রভৃতি স্থান লৌহ-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৪) **চতুর্থ** প্রধান স্থান—উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে আট্‌লান্টিক তীরে **পেন্‌সিলভ্যানিয়া-মেরিল্যাণ্ড-অঞ্চল।** এখানে ক্যানাডা, স্পেন, ব্রাজিল, আলজিরিয়া, চিলি প্রভৃতি স্থান হইতে কাঁচা লৌহ আনানো সুবিধাজনক। বাল্টিমোর সহরের নিকটস্থ স্প্যারোজ পয়েন্ট (Sparrow's point) নামক স্থানের কারখানা সর্বোৎকৃষ্ট। (৮০ নং চিত্রে আ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্পাঞ্চলের সীমা দেখুন)।

এতদ্ব্যতীত আ.-যুক্তরাষ্ট্রে (৫) টেক্সাস্, (৬) টেনেসি-এলাবামা, (৭) কলোরেডো, (পুয়েব্লো), (৮) কালিফোর্ণিয়া ও (৯) ইউটা স্টেটে স্থানীয় অভাব মিটাইবার জন্য লৌহ-কারখানা আছে।

সোভিয়েট রুশিয়া লৌহশিল্পে পৃথিবীতে **দ্বিতীয়** স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার চারিটি শিল্পাঞ্চল বিখ্যাত,

ইউরোপের (১) ডোনেট্স্ অববাহিকা ও ক্রিভয়রগ-অঞ্চল—ডোনেট্স্ অববাহিকার কয়লা ও ক্রিভয়রগের লৌহ লইয়া দুই অঞ্চলেই লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **ম্যাগ্নিটোগোর্স্ক্-অঞ্চল** কেন্দ্র করিয়া ইহার চারিদিকে লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধানতঃ এশিয়ার কুজনেট্স্ক অববাহিকা হইতে কয়লা এবং এ-অঞ্চলে ম্যাগ্নিট্নায়া (Magnitnaya = magnetic mountain = চুম্বকীয় পর্বত) হইতে লৌহ লইয়া এখানে লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ম্যাগনিটোগোর্স্ক-এর কারখানা আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের গেরি সহরের পরেই পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহৎ কারখানা।

এতদ্ব্যতীত (৩) মস্কো-অঞ্চলে, (৪) আজভ-ক্রিমিয়া অঞ্চলে, **রুশিয়াধীন এশিয়ার** অন্তর্গত, (৫) কুজনেট্স্ক অববাহিকায়, (৬) বৈকাল হ্রদের তীরস্থ ইর্খুট্স্ক নগরের নিকট ও (৭) আমুর অববাহিকায় লৌহের কারখানা আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে **চীনে** লৌহশিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। তখন জাপানের অধীনে মাঞ্চুরিয়া লৌহশিল্পে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এক্ষণে মাঞ্চুরিয়া মহাচীনের অংশ। সেজন্য সমগ্র চীন এক্ষণে লৌহশিল্পে বিখ্যাত হইয়াছে।

জার্মানি খনিজ লৌহ-সম্পদে হীন,—তথাপি ফ্রান্স, সার, স্পেন ও সুইডেন হইতে ¾ অংশ প্রয়োজনীয় লৌহ আনাইয়া রাইন-উচ্চভূমির উত্তর ভাগে **রূঢ়-অঞ্চলে** ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই কারখানা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। জার্মানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর **সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য উৎপাদক** এবং **সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য রপ্তানিকারক** স্থান ছিল।

যুক্তরাজ্য-এর লৌহ কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য তাহাকে সুইডেন, স্পেন ও আলজিরিয়া হইতে লৌহ আনাইয়া লৌহশিল্প চালাইতে হয়। ইহার সর্বপ্রধান লৌহশিল্পকেন্দ্র মিডল্স্ব্রো-অঞ্চল। অন্য প্রধান লৌহশিল্প-কেন্দ্র—নিউ ক্যাস্ল, ওয়েল্সের মার্থার টিড্ভিল। স্কটলণ্ডের নিম্নভূমিতে গ্লাসগো-অঞ্চল আর একটি বৃহৎ লৌহশিল্পের স্থান।

ফ্রান্সে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ **লোরেন-লৌহখনি** অবস্থিত। কিন্তু ফ্রান্সে কয়লার নিতান্ত অভাব। সেজন্য গ্রেট্‌বৃটেন, সার, জার্মানির রূড় লৌহখনি হইতে কয়লা আনাইয়া এখানে **লৌহশিল্প** পরিচালিত হয়। ফ্রান্সের প্রায় ৯২ শতাংশ লৌহদ্রব্য লোরেন ও উত্তর ফ্রান্সের লৌহ-কারখানা হইতে পাওয়া যায়।

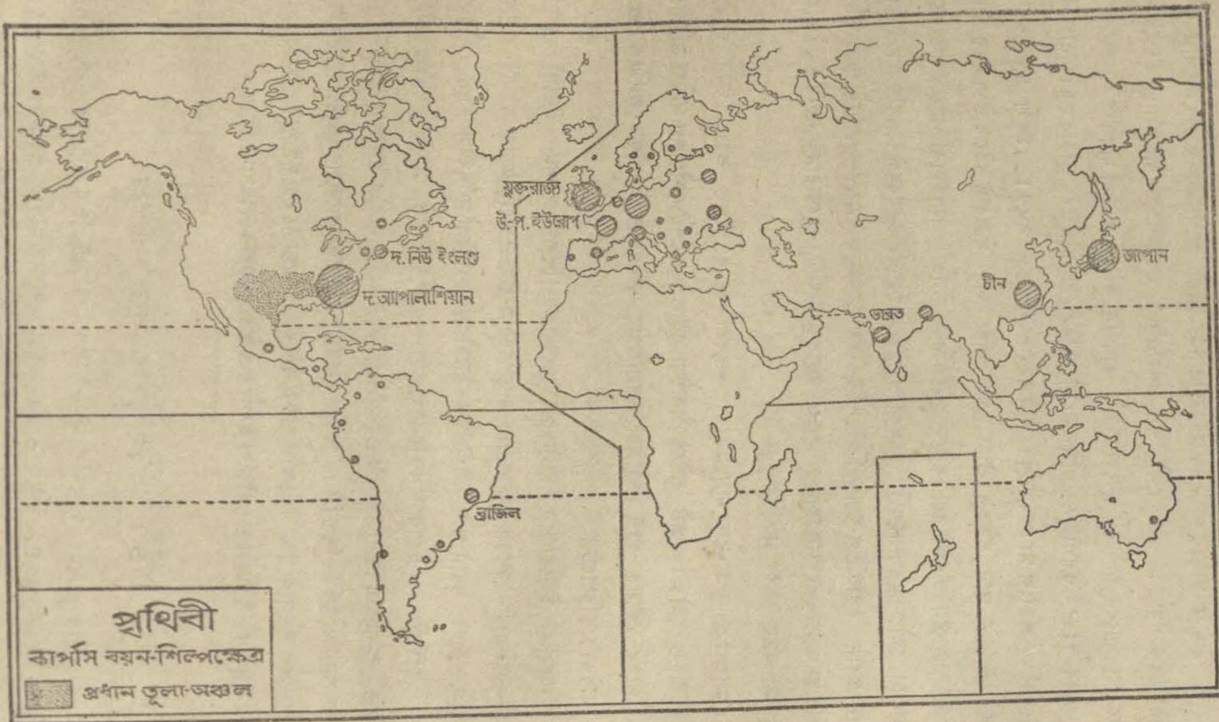
জাপান কয়লা ও খনিজ লৌহ হিসাবে হীন। তাহার দরকারী কাঁচা লৌহের ৩ শতাংশ মাত্র দেশের খনি হইতে পাইতে পারে। সেজন্য চীন, রুশিয়া, ভারত প্রভৃতি স্থান হইতে কাঁচা লৌহ এবং আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইস্পাতের টুকরা, এবং মালয়, চীন ও কোরিয়া হইতে আকরিক লৌহ আনাইয়া ইস্পাত প্রস্তুত করে। জাপানের লৌহ-কারখানাগুলি অধিকাংশ উত্তর কিউসিউ-অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার প্রধান-প্রধান লৌহশিল্প-স্থল—কিউসিউর—ইয়াওয়াটা, হন্‌সুর—কামাইশি প্রভৃতি। উত্তর হন্‌সুতে—ইয়োকোহামা, এবং হোক্‌কাইডোর—মুরোরান সহরেও লোহার কারখানা আছে (১৩৫ নং চিত্র)।

বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ।—বেলজিয়মের আছে কয়লা, আর লুক্সেমবুর্গের আছে লৌহ। এই দুইয়ে মিলাইয়া এই দুই দেশেই লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পরের দেশের মাল আনিয়া বেলজিয়ম পৃথিবীতে ইস্পাত রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইউরোপের পোলণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন, ইতালী প্রভৃতি স্থানে,—এশিয়ার ভারত-যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি স্থানে,—অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে,—এবং ক্যানাডার অন্টারিও হ্রদতীরস্থ হ্যামিল্টন্-অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার দ্বিতীয়-শিল্প-কেন্দ্র—সু-সেৎ-মারি নামক খালের উপর অবস্থিত—সু-সেৎ-মারি (Sault Ste Marie), এবং তৃতীয় কেন্দ্র নোভাস্কোসিয়া-কেপবৃটেনের অন্তর্গত সিড্‌নি। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বিহার প্রদেশের জামসেদপুর সহরে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-তে, উড়িষ্যার রাউরকেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ও বার্ণপুরে এবং মহীশূরের ভদ্রাবতীতে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

২। কার্পাসের সর্জন-শিল্প

১৫৪ পৃষ্ঠায় ৫৩ নং পৃথিবীর তূলা-উৎপাদন স্থানের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তূলা ৩৫° উ. অক্ষাংশ হইতে ৩৫° দ. অক্ষাংশ স্থানের মধ্যেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। কার্পাস-শিল্পদ্রব্যও এই স্থানে জন্মে। কার্পাস-শিল্প মোটামুটি নিম্নলিখিত স্থানে উৎপন্ন হয়,—


পৃথিবী
কার্পাস বয়ন-শিল্পক্ষেত্র
প্রধান তুলা-অঞ্চল
যুক্তরাজ্য
উ-প. ইউরোপ
দ. নিউ ইংলণ্ড
দ. অ্যাপালাশিয়ান
ব্রাজিল
ভারত
চীন
জাপান

১৩৭ নং চিত্র।

১। গ্রেট্‌বৃটেন (ল্যাঙ্কাশিয়ার)
২। আ. যুক্তরাষ্ট্র (নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্র ও দক্ষিণ অ্যাপালাশিয়ান রাষ্ট্র)
৩। মূল ইউরোপ মহাদেশ (ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, জার্মানি, সুইজারলণ্ড, পোলণ্ড, সুইডেন, রুশিয়া প্রভৃতি)।
৪। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান। ৫। জাপান। ৬। চীন।

১। গ্রেট্‌বৃটেন।—সর্বপ্রথম গ্রেট্‌বৃটেনের উত্তর-পশ্চিমে লাঙ্কাশিয়ার কাউন্টির অন্তর্গত **ম্যাঞ্চেস্টর** জেলায় কার্পাস বয়নের কল স্থাপিত হয়। ক্রমে এই অঞ্চলের লিভারপুল ও অন্যান্য স্থান কার্পাস-সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্পকার্যে নিযুক্ত হয়, এবং ম্যাঞ্চেস্টর এই অঞ্চলের শিল্পদ্রব্যের ব্যবসা-স্থল হইয়া উঠে। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস-বয়নস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই স্থানের যন্ত্রযোগে কার্পাস-শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠার ও ইহার শতাধিক বৎসর পৃথিবীতে এই শিল্প সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার কারণ স্বরূপ বলা যায়—

১। কার্পাস-দ্রব্য নির্মাণের কল স্থাপিত হইবার পূর্বে এই অঞ্চলে হাতে-বোনা কাপড় প্রস্তুত হইত। সেজন্য এ-অঞ্চলে দক্ষ কারিগরের অভাব ছিল না।

২। প্রথম যখন কার্পাস-বয়ন-যন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন জলশক্তিতে কল চালানো হইত। পেনাইনের পশ্চিম পার্শ্বে ম্যাঞ্চেস্টর অঞ্চলে জলশক্তি দ্বারা কাজ করিবার উপযোগী প্রপাতবহুল স্থান যথেষ্ট ছিল।

৩। জলশক্তির পর বাষ্পশক্তির প্রচলন হয়। বাষ্পশক্তি জননের জন্য উপযোগী উৎকৃষ্ট ও সুলভ কয়লা ম্যাঞ্চেস্টরের উত্তরে প্রচুর পাওয়া যায়।

৪। কলে প্রস্তুত বস্ত্রাদি শুক্লীকরণ ও রং করণ প্রভৃতির জন্য যেরূপ নির্মল জলের দরকার তাহা পেনাইন-পর্বত অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যাইত।

৫। যন্ত্র বয়ন ও সূতা প্রস্তুত করার জন্য বয়ন-শিল্পের প্রথম অবস্থায় আর্দ্র আবহাওয়ার দরকার ছিল। নতুবা বয়নকালে সূতা কাটিয়া যাইত। ল্যাঙ্কাশিয়ার অঞ্চলের পশ্চিম পার্শ্বেই আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর থাকার জন্য এই অঞ্চলের আবহাওয়া সততই আর্দ্র থাকিত।

৬। লিভারপুল বন্দর ও ম্যাঞ্চেস্টর সহর খাল দ্বারা যুক্ত ছিল। সেজন্য বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে অবস্থিত আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে, তূলা আমদানি করিতে ও কার্পাসশিল্প দ্রব্য বিদেশে চালান দিতে বিস্তর সুবিধা ছিল।

ক্রমশঃ গ্রেট্‌বৃটেন বয়ন-শিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস-দ্রব্য উৎপাদক দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এক শত বৎসরের শিল্প-প্রতিষ্ঠার পরেও এই শিল্প ম্যাঞ্চেস্টর হইতে ৪০ মাইলের বাহিরে যায় নাই। গ্রেট্‌বৃটেনের এই শ্রেষ্ঠত্বেরও বিশেষ কারণ আছে। যেমন,

১। কলে কার্পাস বয়ন কার্যে গ্রেট্‌বৃটেন প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিল।

২। গ্রেট্‌বৃটেনেই প্রথম কার্পাস-বয়ন-যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়, এবং তাহার পরে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে যত নূতন-নূতন যন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশ এখানেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৩। গ্রেট্‌বৃটেনের এই ব্যবসায়ে খাটাইবার মত যথেষ্ট মূলধন ছিল। তাহার ঋণ করিবার দরকার হইত না।

৪। গ্রেট্‌বৃটেন সমুদ্রের সম্রাজ্ঞী ছিল। তাহার নিজের জাহাজ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিত। সুতরাং বয়ন-সংক্রান্ত দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির জন্ম তাহার পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার হইত না।

৫। শিল্পের জন্ম দরকারী লৌহ, কয়লা, উপযুক্ত বন্দর ও পোতাশ্রয় তাহার নিজের দেশেই ছিল। তাহার নিজের দেশে খাদ্যদ্রব্য সুলভ ছিল, এজন্য শ্রমিকের মূল্যও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা কম ছিল। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে সে জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিত।

এই সকল কারণে গ্রেট্‌বৃটেন কার্পাস বয়ন-শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০৪ সালেও পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যত টাকার কার্পাস-দ্রব্য রপ্তানি



১৩৮ নং চিত্র।

হইয়াছিল, তাহার ৬০ শতাংশ গ্রেট্‌বৃটেন হইতেই আসে;—কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইহার দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। অবনতির কারণস্বরূপ বলা যায়,—

১। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অন্য জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ বাড়িতে লাগিল। তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইবার জন্য সকল দেশের মধ্যে চেষ্টা চলিতে লাগিল।

২। ল্যাঙ্কাশিয়ারে দক্ষ কারিগর ছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে বয়ন-যন্ত্রাদির এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রমিকই সহজে কাজ চালাইতে পারে।

৩। এই সময়ে বিজ্ঞান বলে বয়ন ঘরের আর্দ্রতা এরূপ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হইল যে, গ্রেট্‌বৃটেনের শিল্পাঞ্চলে আর্দ্রতার জন্য আট্‌লান্টিকের প্রভাবের যে দরকার ছিল, তাহা আর রহিল না।

৪। গ্রেট্ বৃটেনের ল্যাঙ্কাশিয়ার অঞ্চলে দরকার মত জলশক্তি ও বাষ্পশক্তি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ সুবিধা অনেক স্থলে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা কল চালিত হইতে লাগিল। সুতরাং গ্রেট্ বৃটেনের যে স্বাভাবিক সুবিধা ছিল, তাহার কোন মূল্যই রহিল না।

৫। যে-সকল নূতন-নূতন স্থানে কার্পাসশিল্পের কার্য নূতনভাবে চলিল তাহারা নূতন তেজে, নূতন উৎসাহে, নূতন যন্ত্রাদি লইয়া কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু গ্রেট্‌বৃটেনের রক্ষণশীল মনে সে-উৎসাহের তেজ দেখা গেল না।

এই সকল কারণে গ্রেট্ বৃটেনের কার্পাস-বয়নশিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে,—মোটা ও মধ্যম রকমের কাপড়ের জন্য, অন্য দেশের, বিশেষতঃ জাপান ও আমেরিকার, সহিত প্রতিযোগিতায় গ্রেট বৃটেন হটিয়া গিয়াছে। সেইজন্য গ্রেট্ বৃটেন এখন উচ্চ শ্রেণীর কার্পাসদ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, মোটা ও মধ্যম শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে না। গ্রেট বৃটেনের কার্পাস-বয়ন-শিল্প সম্পর্কে পূর্বেই বলিয়াছি, ম্যাঞ্চেষ্টর কার্পাস-বয়ন-শিল্পের গুদাম ও বিক্রয়-স্থল ছিল,—সেখানে বয়ন হইত না। বিদেশ হইতে আগত কার্পাস এখানে জমা হয় ও বিতরিত হয় এবং প্রস্তুত করা কার্পাসদ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হয়। লিভরপুল বয়ন-কার্য-সংক্রান্ত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেখানে বস্ত্র-বয়ন-শিল্প ও সূত্র প্রস্তুত করা পৃথক্‌ভাবে হইত। লিভরপুলের সন্নিহিত প্রেষ্টন, ব্লাকবার্ণ, এ্যাকরিংটন (Accrington) ও বার্ণলে সহরে **কার্পাস বস্ত্রাদি** বয়ন করা হয়, এবং রকডেল, বোল্টন, বেরি, ওল্ডহাম, এস্‌টন্, ষ্ট্যালীব্রিজ (Stalybridge), হাইড ও স্টকপোর্ট—এ সকল স্থানে **কার্পাসসূত্র** প্রস্তুত হয়।

২। আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র।—আ. যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি অঞ্চল প্রধান,—(১) মেইন, নিউ হাম্পসায়ার, ভারমন্ট, ম্যাসাচুসেট্‌স, কনেক্‌টিকাট ও রোড আইল্যাণ্ড লইয়া গঠিত আ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত **নিউ ইংলণ্ড ষ্টেট্‌স্**, এবং (২) **দক্ষিণ অ্যাপালাশিয়ান রাজ্যসমূহ**।

নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্রে ইংলণ্ড হইতে ইংরাজেরা আসিয়া প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করে এবং জীবনধারণের জন্য নানারূপ শিল্পসৃষ্টি করে। সেই সময়ে কার্পাসশিল্পেরও প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে জলশক্তি, পরে বাষ্পশক্তি এবং এক্ষণে জল ও কয়লা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা এখানকার শিল্পযন্ত্রাদি পরিচালিত হয়। কিন্তু তুলার জন্য তাহাদের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আ. যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। মেক্সিকো উপসাগর তীরস্থ দক্ষিণ আ. যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তুলা উৎপাদন স্থান। কালক্রমে এই তুলা-অঞ্চলের পূর্ব পার্শ্বে এই দক্ষিণ অ্যাপালাশিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে কার্পাসশিল্প আরম্ভ হয়; এবং সুলভ শ্রমিক, সন্নিকটস্থ তুলাক্ষেত্রের তুলা, সুলভ কয়লা, বিদ্যুৎশক্তিজননের সুবিধা, সস্তা জমি, এবং ট্যাক্সের চাপের ন্যূনতার জন্য দক্ষিণ-অঞ্চলের এই কার্পাসশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিল,—এখান হইতে অধিকতর

অল্পমূল্যে কার্পাসদ্রব্য পাওয়া যাইতে লাগিল,—এবং ক্রমশঃ চীন প্রভৃতি দেশে এখানকার কার্পাসদ্রব্যের চাহিদা বাড়িতে লাগিল। সেজন্য নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলে কার্পাসশিল্পের অবনতি হইল। কিন্তু নিউ ইংলণ্ড বহুকাল ধরিয়া শিল্পকার্য করিতে-করিতে দেশ-বিদেশে যে-প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল, তাহারই ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতার (geographical inertia) জন্য এই অঞ্চল এখনও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আছে। এখানে এখন নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর মোটা কাপড় প্রস্তুত হয় না—এখানে উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্ম বস্ত্র ও বিশেষত্বযুক্ত নানাপ্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়। নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্র, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণভাগে অবস্থিত রোড আইল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেট্‌স্ ও কনেক্‌টিকাট রাষ্ট্রগুলি এই অঞ্চলে কার্পাস-শিল্পের শ্রেষ্ঠস্থান। এই অঞ্চলে রোড আইল্যাণ্ডে প্রথম কার্পাস শিল্পযন্ত্র স্থাপিত হয়।

দক্ষিণ অ্যাপালাশিয়ান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, এবং জর্জিয়া রাষ্ট্রই প্রধান। এক্ষণে তুলা-ক্ষেত্রের পশ্চিমে টেক্সাস প্রভৃতি রাষ্ট্রেও তুলার কল স্থাপিত হইয়াছে। নিউ ইংলণ্ড ষ্টেটগুলির দক্ষিণে মধ্যপূর্ব আট্‌লাণ্টিক তীরে **ফিলাডেলফিয়া**ও নানাপ্রকার কার্পাস-দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত।

৩। **মূল ইউরোপ মহাদেশ**—পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল, দক্ষিণে উত্তর ইতালী, ফ্রান্স, ও স্পেন,—পূর্বে রুশিয়া এবং উত্তরে সুইডেন ও ফিন্‌লণ্ড সমেত ইউরোপ মহাদেশের যে-অঞ্চল, ইহাই এখানকার প্রধান কার্পাস শিল্পের স্থান। এক্ষণে এই অঞ্চল যুক্তরাজ্য অপেক্ষা প্রশস্ততর,—এখানে যুক্তরাজ্য অপেক্ষা বেশী তুলা আমদানি হয়, এবং **ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলণ্ড, জার্মানি** ও **পোলণ্ড** বেশী তুলা আমদানি করে। এখানকার দেশগুলির মধ্যে মোটা ও সরুসূতার—উভয় প্রকারের কাপড়ই প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে **বেলজিয়মে, জার্মানির কতকাংশে, ফ্রান্সে** ও **সুইজর্লণ্ডে** সূক্ষ্ম সূতার কাজ হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার পশ্চিম ভাগে কৃষ্ণ সমুদ্রের উত্তরে তৃণক্ষেত্র অঞ্চলে মস্কো-অঞ্চলে, এবং এশিয়াধীন রুশিয়ার উজবেকিস্তান অঞ্চলে কার্পাস-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় তুলা লইয়া ইহারা ব্যবহার করে, এখানকার শ্রমিক সস্তা, এবং এখানে জল-বিদ্যুৎশক্তিও প্রচুর। সেজন্য এখানে শিল্পদ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

ইতালীর উত্তরভাগেও কার্পাস-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার শ্রমিকও সস্তা এবং জলবিদ্যুৎও সহজপ্রাপ্য।

৪। **ভারত-যুক্তরাষ্ট্র,** ৫। **পাকিস্তান,** ৬। **জাপান,** ৭। **চীন**—এই সকল স্থানেও কার্পাস-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাপান তুলার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইলেও কার্পাস-শিল্প-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, এবং জাপান

তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বয়ন-দেশ গ্রেটবৃটেনকে ও আ. যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জাপানের কার্পাস-শিল্পেরও প্রভূত ক্ষতি হয়,—তাহার ৮০ শতাংশ টাকু (spindle) নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু জাপান এখন অন্য-অন্য শিল্পে অধিক মনঃসংযোগ করিয়াছে বলিয়া কার্পাস-শিল্পে আগের মত উন্নতি করে নাই। তথাপি ১৯৪৬ সালে তাহার টাকু ছিল ২২ লক্ষ, ১৯৫৩ সালে—৭৫ লক্ষ হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে ইহা ৯০ লক্ষ হইয়াছে। জাপানের শ্রমিক—বিশেষতঃ স্ত্রী শ্রমিক তাহার উন্নতির কারণ। ইহারা কর্মপটু, নিয়মনিষ্ঠ, কাজ করে বেশীক্ষণ, কিন্তু পারিশ্রমিক কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা পাইয়া ভারত-যুক্তরাষ্ট্রও কার্পাসশিল্পে উন্নতি করে। কিন্তু পাকিস্তান বিশেষ উন্নতি করে নাই। সে তাহার উদ্বৃত্ত কার্পাস লইয়া নিজের দেশের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারত নিজেদের অভাব নিজেরাই পূরণ করে। জাপান চীনের বাজার অধিকার করিয়াছে, এবং জাপান, ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। চীনও এখন কার্পাস-শিল্পে উন্নতি করিতেছে। **ওসাকা** জাপানের কার্পাস-শিল্পের কেন্দ্রস্থল। **সাংহৈ, হ্যাংচৌ, নান্‌কিন্‌, তিয়েনসিন** চীনের কার্পাস শিল্পের স্থান।

এতদ্ব্যতীত অন্য-অন্য অনেক দেশে কার্পাস বয়নশিল্প প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্যানাডা ও মেক্সিকোর কথা উল্লেখযোগ্য। ব্রাজিলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নিম্নে কেবলমাত্র কার্পাসতন্তু দিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাবে কয়েকটি প্রধান দেশের উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া হইতেছে—

বিশুদ্ধ কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদন ১৯৬০

(মিলিয়ন মিটার *)

‡১।	আ. যুক্তরাষ্ট্র	৮৫৩১	‡৪।	ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৪৬১৬
†২।	সো. রুশিয়া	৬৩৮৭	†৫।	যুক্তরাজ্য	১১৮৩
†৩।	চীন	৭৬০০	‡৬।	জাপান	৩২২২

* ১ মিটার—১·০৯৩৬১৪৩ গজ।

† বিশুদ্ধ কার্পাসতন্তু।

‡ বিশুদ্ধ কার্পাসতন্তু ও অন্য তন্তুর যোগে মিশ্রিত বস্ত্রাদি।

৩। পশমের সর্জন-শিল্প

এখন পশমী জিনিষের দাম বেশী, কার্পাস দ্রব্যের দাম কম। কিন্তু প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না। তখন কার্পাস-দ্রব্যের দাম এত বেশী ছিল যে, সাধারণ লোকে উহা পরিতে পারিত না,—উহা তখন রীতিমত সৌখীনদ্রব্য ছিল। কার্পাস-দ্রব্য প্রস্তুত করার কল সৃষ্টি হইলে, তখন উহা সস্তা হইল, এবং সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে পারিল।

কোন্-কোন্ স্থানে মেষ পালন করিয়া পশম উৎপাদন করা হয়, তাহার বিবরণ পূর্বেই (২১৬ পৃ.) দিয়াছি। মোটামুটি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দক্ষিণ আমেরিকা (আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে), ও দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চল প্রধান মেষপালন-স্থান। দক্ষিণ গোলার্ধের এই স্থানগুলিতেই অধিকসংখ্যক মেষ প্রতিপালিত হয়। উত্তর গোলার্ধে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, তুরস্ক, চীন ও আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগে মেষ প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় এইসকল স্থান নগণ্য। পশম-সম্পর্কে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, **যে-অঞ্চলে পশম বেশী উৎপন্ন হইয়াছে, সে-অঞ্চলে পশমের সর্জন-শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে নাই।** দক্ষিণ গোলার্ধে পশমের সর্জন-শিল্পের কোন উন্নতিই হয় নাই। ইহার কারণ-স্বরূপ বলা যায়,—

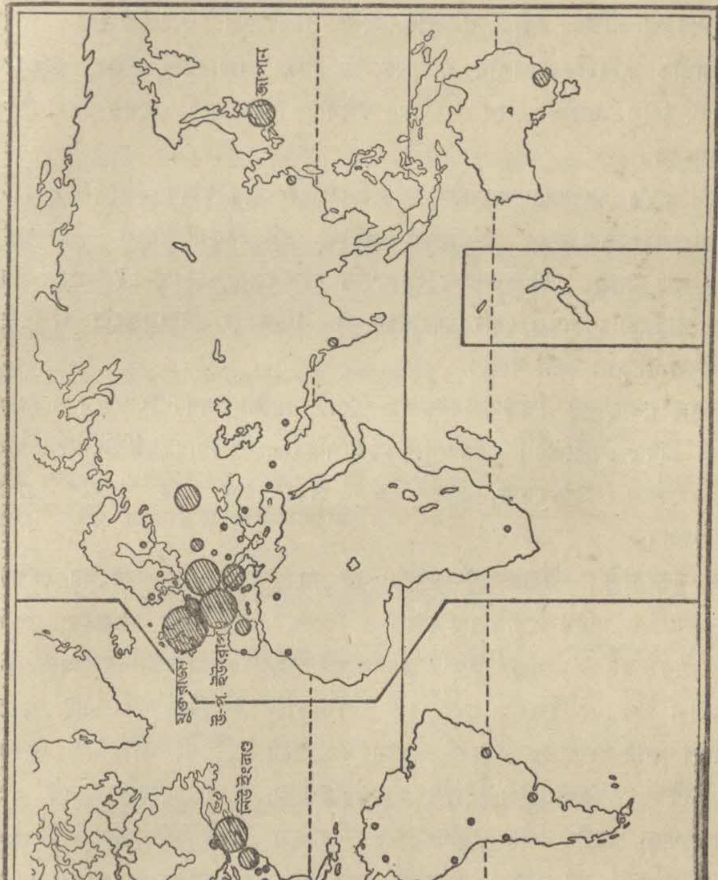
(১) দক্ষিণ গোলার্ধের যে-অঞ্চলে পশম উৎপন্ন হয়, সে-অঞ্চলে লোকবসতি কম। সেজন্য এ-অঞ্চলে শ্রমিক, বিশেষতঃ ভাল শ্রমিক, দুর্লভ। খড়িদারও দুর্লভ। সেজন্য এ-সকল অঞ্চলে শিল্পউৎপাদনের খরচ বেশী হইত।

(২) দক্ষিণ গোলার্ধের যে-অঞ্চলে পশম উৎপন্ন হয়, সেখানে উত্তর গোলার্ধের ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের মত শীতের প্রকোপ বেশী নাই। সেজন্য সেখানে বেশী গরম কাপড়ের কোন দরকার নাই।

(৩) এই সকল অঞ্চলে শিল্প উৎপাদনের যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয় না। যে-সকল দেশে যন্ত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহা এ-স্থান হইতে বহু দূরবর্তী।

(৪) পশম সহজে নষ্ট হয় না। ইহা সহজে দূরদেশে রপ্তানি করা যায়। ইহা ওজনে হাল্কা ;—সুতরাং পরিবহনের খরচও কম। সেজন্য উত্তর গোলার্ধের যে সকল স্থান শিল্পে উন্নত, যেখানে যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, যেখানে লোকবসতি বেশী, ও গরম কাপড়ের দরকার বেশী সেই সকল স্থানেই,—পশম-উৎপাদন স্থান হইতে সহজে পশম আমদানি করিয়া এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পশম শিল্প-কেন্দ্র।—প্রধানতঃ (১) আ. যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণের আটলান্টিক তীরস্থ, **উত্তরে মেইন হইতে দক্ষিণে মেরীল্যাণ্ড পর্যন্ত** রাষ্ট্রগুলিতে,—এবং (২) ইউরোপে **গ্রেট্‌বৃটেন হইতে ইতালী পর্যন্ত**—গ্রেট্‌বৃটেন, বেলজিয়ম,



১৩৩নং চিত্র।

ফ্রান্স, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি ও ইতালী দেশগুলিতে বৃহৎভাবে পশম-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইজর্লণ্ড দেশেও পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত এশিয়ায়—জাপান ও তুরস্ক, ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি প্রভৃতি দেশে ও উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশেও পশমী দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়।

উপরে প্রদত্ত উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি দেখিলে স্পষ্টই মনে হইবে,—কার্পাস-বয়ন ও পশম-বয়ন স্থানগুলির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এই সকল অঞ্চলে লোকবসতি বেশী, জলবায়ু আর্দ্র, এবং কয়লা, ও বিদ্যুৎশক্তি সহজপ্রাপ্য—সেজন্য এই অঞ্চলে শিল্প-সৃষ্টির সুবিধা বেশী। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত যে, **উষ্ণমণ্ডলে পশমের সর্জন-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই।**

প্রধান কেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ:—গ্রেট্ ব্রুটেন—পশম উৎপাদনে ও উৎকৃষ্ট পশমদ্রব্য নির্মাণে সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর-পূর্বে ইয়র্কশিয়ার প্রদেশ ইহার শ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থল। আয়ার নদীতীরে ব্রাড্ফোর্ড, লীড্স্ ও হাডার্সফিল্ড এই প্রদেশে প্রধান উৎপাদন-স্থল।

আ. যুক্তরাষ্ট্র।—উত্তর-পূর্ব-অঞ্চল—এই মহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের টেক্সাস, ওয়াইয়োমিং ও **ওহিও** প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে ও বিদেশ হইতে পশম আনাইয়া এখানে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। আট্লান্টিক-তীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে কাঁচা পশম আমদানির ও শিল্পদ্রব্য রপ্তানির বিশেষ সুবিধা। প্রাচীনকালে ইংরেজরা যখন এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন হইতেই এখানে দক্ষ বয়ন-শিল্পী পাওয়া যায়। তাছাড়া আট্লান্টিকের অপরতীরেই ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী অংশ অবস্থিত। এই সকল কারণে এখানে এই শিল্প সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। পেনসিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যে **ফিলাডেলফিয়া** আ. যুক্তরাষ্ট্রের একটি শ্রেষ্ঠ পশমী দ্রব্য উৎপাদক সহর। এখানে উৎকৃষ্ট কার্পেট উৎপন্ন হয়। অদূরে ওহিও অঙ্গরাজ্যে **ক্লীভল্যাণ্ড** পশম শিল্পে উন্নতি করিতেছে।

তুরস্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কার্পেট উৎপাদন-স্থান।

পৃথিবীর বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত পশমের সর্জন-শিল্পে কয়েকটি প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৫৬

(মিলিয়ন বর্গমিটর)

১।	যুক্তরাজ্য	৩০৭	৩।	জাপান	৩২২
২।	আ. যুক্তরাষ্ট্র	২৬২ মি. মি.	৪।	সো. রুশিয়া	৩৪২*

*বিশুদ্ধ পশম—মিলিয়ন মিটার।

৪। রেশমের সর্জন-শিল্প

(১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)

বহু প্রাচীন কাল হইতে চীন ও জাপানে রেশমবস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। সে-সময়ে পূর্ব এশিয়ার সহিত ভূমধ্যসাগরতীরস্থ গ্রীস ও ইতালীর যে-ব্যবসায় চলিত, রেশমদ্রব্যই ছিল তাহার প্রধান পণ্যদ্রব্য। রেশমশিল্প অত্যন্ত সুকুমার শিল্প,—ইহা অতি সন্তর্পণে সাধন করিতে হয়। সেজন্য ইহা হাতে ও স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রধানতঃ সম্পাদিত হইত। কার্পাস ও পশম শিল্প যান্ত্রিক শিল্প হওয়ার বহু পরে রেশমদ্রব্য প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

পূর্বে: জাপান ও চীন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক রেশম রপ্তানিক্ষেত্রে আসিত। কিন্তু পৃথিবীর রেশমদ্রব্যের অর্ধেকও এই দুই স্থানে উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর প্রধান-প্রধান **রেশম দ্রব্যের উৎপাদন স্থান,—**

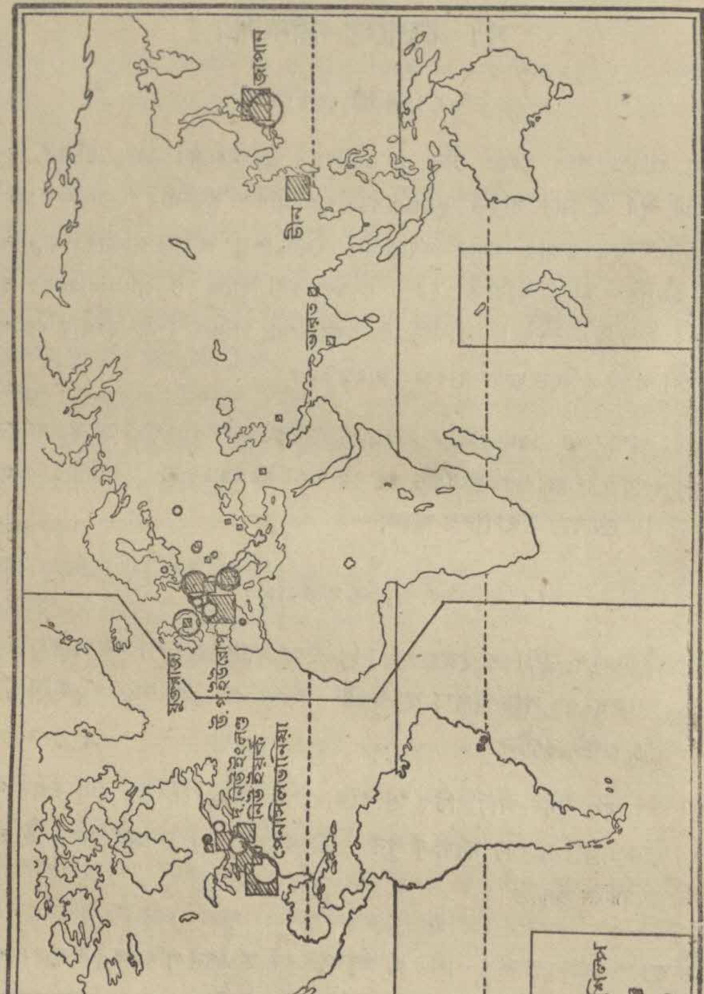
১। এশিয়ায়—**চীন, জাপান, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র।**

২। ইউরোপে—(ক) **সুইজর্লণ্ড,** (খ) উত্তর ইতালীর **পো-অববাহিকা,** ও **আল্পস্-এর পাদদেশস্থ কয়েকটি সহর ;** (গ) **ফ্রান্স,** (ঘ) **জার্মানি,** (ঙ) **গ্রেট ব্রটেন।**

৩। আ. যুক্তরাষ্ট্রে—আট্‌লাণ্টিক তীরে (ক) **পেনসিলভ্যানিয়া,** (খ) **উত্তর-পূর্ব নিউ জার্সি,** (গ) **দক্ষিণ-পূর্ব নিউ ইয়র্ক,** (ঘ) **দক্ষিণ নিউ ইংলণ্ড** অঙ্গরাজ্য প্রভৃতি।

বিস্তৃত বিবরণ।—চীন ও জাপান হইতে এখন পৃথিবীর $\frac{1}{2}$ অংশ রেশম-দ্রব্য পাওয়া যায়। লোকবসতির ঘনত্ব ও সুলভ শ্রমিকই ইহার কারণ। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে **অল্প** রেশমদ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এককালে ইহা রেশমদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

ইউরোপও পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ উৎপন্ন করে। **সুইজর্লণ্ডের জুরিখ** সহর এ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-স্থান। সমগ্র ইউরোপের $\frac{8}{5}$ এখানে উৎপন্ন হয়। **উত্তর ইতালীর মিলান** প্রধান রেশম-ব্যবসায় কেন্দ্র। পো-উপত্যকায় লোকবসতি **খুব** ঘন। সেজন্য এই অঞ্চল এখন ইউরোপে শ্রেষ্ঠ রেশম-উৎপাদন-স্থল। **ফ্রান্স** উনবিংশ **শতাব্দীতে** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেশম দ্রব্য উৎপাদন-স্থল ছিল, এবং **লিয়ঁ** ছিল


জাপান
চীন
ভারত
যুক্তরাজ্য
উ. প. ইউরোপ
নিউ ইংল্যাণ্ড
নিউ ইয়র্ক
পেনসিলভানিয়া
পৃথিবী
রেশম ও রেয়ন বয়নশিল্প
রেশম
রেয়ন

১৪০ নং চিত্র।

শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-কেন্দ্র। **পশ্চিম জার্মানির** রাইন-উপত্যকা ও **পূর্ব জার্মানির** স্যাক্সনি শ্রেষ্ঠ উৎপাদনস্থল। রাইন তীরস্থ **ক্রেফেল্ড** সর্বপ্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। **গ্রেট্ বৃটেন**—রেশমশিল্পে কার্পাস ও পশম শিল্পের মত উন্নতি করে নাই। কার্পাস ও পশম-শিল্পাঞ্চলেই রেশমের সর্জনশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আ. যুক্তরাষ্ট্রে রেশম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু প্রধানতঃ জাপান, চীন ও ইউরোপ হইতে রেশম আনাইয়া এখানে রেশমদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। চীন ও জাপানের রেশম প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভাঙ্কুবর, সিয়াট্‌ল্ ও সান্‌ফ্রানসিস্কো বন্দরে আসে ও সেখান হইতে রেলপথে নিউ ইয়র্ক আসে। নিউ ইয়র্ক রেশমের একটি বড় ব্যবসায়-স্থল। এখান হইতে রেশম সর্জন-শিল্পাঞ্চলে বণ্টিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি পেনসিলভ্যানিয়া, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক ও নিউ ইংলণ্ড স্টেট্‌গুলিই প্রধান রেশমদ্রব্য উৎপাদন-স্থল। নিউ জার্সির **প্যাটারসন** এ-অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ রেশমদ্রব্য উৎপাদন-স্থল। এক্ষণে আ. যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলই শ্রেষ্ঠ রেশমদ্রব্য উৎপাদন-স্থান। পৃথিবীর $\frac{২}{৬}$ অংশ এবং আ. যুক্তরাষ্ট্রের $\frac{৭}{৮}$ অংশ রেশম-দ্রব্য এখানেই উৎপন্ন হয়।

৫। নকল রেশমের (Rayon) বয়ন-শিল্প

রেশমকীটের খাদ্যদ্রব্য তাহার দেহের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ (Cellulose) নামক জেলির মত এক পদার্থে পরিণত হয়। এই জেলি-বৎ সেলুলোজ রেশমকীটের মুখের নীচে যে-দুটি ছিদ্র থাকে সেখান হইতে বাহির হইলে শক্ত হইয়া যায়, এবং রেশম-কীট ঐ সেলুলোজ হইতে রেশমসূত্র প্রস্তুত করিয়া গুঁটি বাঁধে (১৬৬ পৃ. দেখ)। মানুষ ইহা লক্ষ্য করিয়া পাইন কিংবা স্প্রাস গাছের কিংবা তুলার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় "সেলুলোজ" প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রযোগে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আনিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্ত করিয়া তাহা হইতে নকল রেশম-সূত্র প্রস্তুত করিতেছে। এই নকল রেশমসূতার ইংরাজি নাম রেয়ন (Rayon) ;—বাজারে এই সূতায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি রেয়ন-দ্রব্য নামেই পরিচিত। ইহার রং রেশমের মতই উজ্জ্বল, ও ইহা দামে খুব সস্তা। তবে ইহা রেশমের মত শক্ত নহে, এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণও নাই। আবার রেশম ও পশমের সহিত এই সূতার মিশ্রণ ভালভাবেই চলে। এ-সকল কারণে ইহা সবিশেষ জনপ্রিয়,—এবং রেশমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং রেশমের উৎপাদন ক্রমশঃ কমিতেছে। জাপানী মহিলাগণ সাধারণতঃ রেশমবস্ত্র বেশী ব্যবহার

করেন। কিন্তু ইহারা, এমন কি ধনশালী মহিলারাও, এখন রেয়নবস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন।

পূর্বে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য সহজলভ্য ও সুলভপ্রাপ্য শ্রমিক বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেখানে কাষ্ঠমণ্ড বা তূলা সহজে পাওয়া যায়, যেখানে বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ শ্রমিক সুলভ, বিক্রয় স্থান যাহার নিকটে আছে এবং যেখানে প্রচুর মূলধন পাওয়া যায়, সেখানেই রেয়ন-বয়ন-শিল্প সহজে গড়িয়া উঠে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগই তূলা-অঞ্চল, এবং উত্তর-পূর্ব আ. যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা হইতে কাষ্ঠমণ্ড সংগ্রহ করা সহজ। সেজন্য এই দুই অঞ্চলে রেয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানে শ্রমিক সুলভ, এবং রেয়নের উপাদান দেশেই পাওয়া যায়। সেজন্য রেয়ন-শিল্পে জাপানের এত উন্নতি।

রেয়ন-বয়ন-স্থান।—ইউরোপে—ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী, গ্রেট্ বৃটেন; **—আ. যুক্তরাষ্ট্রে—**দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে।—টেনেসী, ভার্জিনিয়া, প. ভার্জিনিয়া, উত্তর ক্যারোলাইনা, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে—মেরীল্যাণ্ড, পেন্‌সিলভ্যানিয়া রাষ্ট্র এবং নিউ ইংলণ্ড রাষ্ট্রগুলি। **এশিয়ায়—**জাপান ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রেয়ন-শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তি-স্থান। কিন্তু এক্ষণে অনেক দেশেই রেয়ন-শিল্পের প্রচলন হইয়াছে।

ফ্রান্সে সর্বপ্রথম ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে রেয়ন-সূত্র আবিষ্কার করা হয়। **আ. যুক্তরাষ্ট্রে** শ্রেষ্ঠ তিনটি উৎপাদন স্থল—টেনেসী, ভার্জিনিয়া ও পেন্‌সিলভ্যানিয়া। পেন্‌সিল-ভ্যানিয়া অন্যান্য বয়নশিল্পের মত রেয়নশিল্পেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। **জাপান রেয়ন-রেশম উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ।** তাহার কৃত্রিম রেশমের জন্য অকৃত্রিম রেশমের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে,—এমন কি জাপানের কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কার্পাসের জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, রেয়নের কাঁচামাল সে দেশেই পাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি জাপানের শ্রমিকও সুলভ এবং বয়নশিল্পে অভিজ্ঞ লোকও সেখানে সহজপ্রাপ্য। সেইজন্য জাপানের **হন্‌সিউ** দ্বীপের রেশম শিল্পাঞ্চলেই রেয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। **ইতালীতে** ও **গ্রেট্‌বৃটেনে** কাঁচামাল নাই। কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিক আছে। এই কৃত্রিম রেশম-সূত্র দুই আকারে ব্যবহৃত,—(১) কাপড়াদি বুনিবার যেরূপ সূত্র হয় সেইরূপ **লম্বা সূত্রের আকারে** (filament), এবং (২) তূলার আঁশের মত ছোট-ছোট আকারে (staple)। ক্ষুদ্র আঁশের আকারের রেয়নের সঙ্গে অন্য আঁশও মিশাইয়া দেওয়া হয়। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটি প্রধান-প্রধান দেশের উৎপাদন পরিমাণ দেওয়া হইল,—

প্রধান প্রধান রেয়ন উৎপাদন স্থান—১৯৬০

পৃথিবী—১১৩৯ সহস্র মেট্রিক টন+১১৬৮ স. মে. ট.

দেশ	রেয়ন বুনিবার লম্বা সূতা (Filament yarn স. মে. টন	রেয়ন বুনিবার ছোট-ছোট তুলার আঁশের মত খণ্ড খণ্ড অংশ (Staple) স. মে. টন	মোট
আ. যুক্তরাষ্ট্র	২৯৬.৯	১৬৯.৬	৪৬৬.৫
জাপান	১৪২.৮	২৯০.৭	৪৩৩.৫
সো. রুশিয়া	১০৬.৬	৮৩.৯	১৯০.৫
যুক্তরাজ্য	৮৪.৬	১২৩.০	২০৭.৬
ইতালী	৮১.৫	৮০.১	১৬১.৬
জার্মানি (প.)	৭৪.৭	১৫৪.৯	২২৯.৬
ফ্রান্স	৫৫.০	৬৩.৬	১১৮.৬
হলণ্ড	৩৪.৫	১৪.৮	৪৯.৩
ব্রাজিল	২৯.৮	১০.১	৩৯.৯
জার্মানি (পূ)	২৭.৯	১১০.৬	১৩৮.৫
ভারত	২১.৭	২১.৮	৪৩.৫
ক্যানাডা	১৯.৫	১৫.৪	৩৪.৯

৬। পাট বয়নশিল্প

১৬১ পৃষ্ঠায় পাট উৎপাদন স্থানগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃ. অব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডাণ্ডি সহরে প্রথম পাট বয়নশিল্প আরম্ভ হয়। ডাণ্ডি শণ হইতে ক্ষৌমবস্ত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার যখন শণ পাইতে অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সে ভারতবর্ষ হইতে পাট আনাইয়া পাটের থলে, চট, দড়ি, সূতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। পৃথিবীময় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পাটের থলির চাহিদা হইতে লাগিল। কারণ, ধান্য, গম, ও অন্যান্য শস্য থলি দিয়া বহন করিতে কিংবা পশম প্রভৃতি পাটের চট দিয়া গাঁট বাঁধিতে বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। ইহাতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে, গ্রেট্‌বৃটেনের অন্যান্য স্থানে, মূল ইউরোপে, আ. যুক্তরাষ্ট্রে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও পাট-বয়নশিল্প আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ তখন একমাত্র পাট-উৎপাদন-স্থান ছিল। সেজন্য ভারতবর্ষে ইহা শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিল। এক্ষণে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অল্প পাটদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, পাট-বয়ন-শিল্প চলিতেছে।

পাট-বয়ন স্থান। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাট-দ্রব্য-বয়ন-স্থান ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫৬ সালে ভারতে ১১৩টি পাটের কল ছিল। পৃথিবীর ৫৭% পাটবয়নের তাঁত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আছে। অন্য পাট-বয়ন স্থান—গ্রেট্‌বৃটেন (৯০%), ফ্রান্স (৭%), পাকিস্তান (৫%), ইতালী (৩.৯%), ব্রাজিল (৩.৯%), পশ্চিম জার্মানি (৩.৭%), স্পেন (৩.২%), জাপান (০.৮%) প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রায় ২০টি দেশে পাটবয়ন হইয়া থাকে।

৭। কাগজ শিল্প

১০৫ খৃ. অব্দে চীনদেশে সর্বপ্রথম ছিন্নবস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ক্রমশঃ মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া এই কাগজ শিল্প ৯০০ খৃ অব্দে ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে এবং জীর্ণ বস্ত্র হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সর্বত্র এইরূপ জীর্ণ বস্ত্রই কাগজের প্রধান উপাদান ছিল। তাহার পর কাষ্ঠমণ্ড হইতে এবং ক্রমশঃ নানাদ্রব্য হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে। কাগজ-শিল্প প্রথমে গৃহশিল্প ছিল। এখন ইহা প্রধানতঃ মিলে প্রস্তুত হইতেছে। ইউরোপে জার্মানিতে ১৮৪০ খৃ. অব্দে ছিন্নবস্ত্রের সহিত কাষ্ঠমণ্ডের মিশ্রণ আরম্ভ হয়। ১৮৫৭ খৃ. অব্দে ইংলণ্ডে ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত হয়। ১৮৬৫ খৃ. অব্দে আ. যুক্তরাষ্ট্রে কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়। এক্ষণে পৃথিবীর $\frac{৯}{১০}$ অংশ কাগজ কাষ্ঠমণ্ড হইতে প্রস্তুত হইতেছে। তবে পাটনির্মিত পুরাতন চট, ম্যানিলা নির্মিত জীর্ণ দড়াদড়ি, তূলা, ধানের খড়, আকের ছিবড়া প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য হইতে খুব শক্ত কাগজ, লেখার ও ছাপার কাগজ, পেটা কাগজ (paste board), প্যাক করার ও মলাটের কাগজ প্রভৃতি নানাপ্রকারের কাগজ প্রস্তুত করা হয়। বেওবাব গাছের মণ্ড হইতে নোট ছাপিবার কাগজ হয়।

পাইন জাতীয় স্প্রাস, হেমলক, পীত পাইন প্রভৃতি নরম গাছ পিষিয়া, বা বড়-বড় কাঠ টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে উহা হইতে কাগজ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ সেলুলোজ আঁশ (Cellulose fibres) ব্যতীত কাঠের অন্য অংশ বাহির করিয়া লইয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। যে-পদার্থ হইতে বৃক্ষের কঠিন অংশের সারভাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে "সেলুলোজ"।

কাগজ উৎপাদন স্থান।—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাগজ উৎপাদন-স্থান আ. যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্য কয়েকটি কাগজ উৎপাদনকারী দেশের নাম পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

কাগজ উৎপাদনকারী দেশ, ১৯৬০

দেশ	উৎপন্ন কাগজ স. মে. টন	দেশ	উৎপন্ন কাগজ স. মে. টন
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১৩৩৪২	সুইডেন	১২৩১
যুক্তরাজ্য	২১৬৪	ক্যানাডা	৮৬১
জার্মানি (প.)	২৩২১	ইতালী	৯৯০
সো. রুশিয়া	২০০০	ফিন্‌লণ্ড	৬৭১
জাপান	২১৩৭	নরওয়ে	৪৮৭
ফ্রান্স	১৬৭৯	ব্রাজিল	৩৩৪

আ. যুক্তরাষ্ট্র।—যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা, কাগজের উপকরণ এবং নির্মল জল সহজপ্রাপ্য, ও বিক্রয়স্থলের সুবিধা সেই অঞ্চলেই কাগজের কল স্থাপিত হয়। সেজন্য **আ. যুক্তরাষ্ট্রের** তিনটি অঞ্চল কাগজের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ;—

(১) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের **নিউ ইংলণ্ড রাজ্যগুলি ও নিউ ইয়র্ক ষ্টেট** ;—(২) **হ্রদ-অঞ্চলের ষ্টেটগুলি** ;—এবং (৩) **উত্তর-পশ্চিম ভাগের প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলি**। এই সকল স্থানই দেশের উত্তর ভাগের বনাঞ্চলের সন্নিকটবর্তী ;—এই অঞ্চলের বনে কাগজের মণ্ডের উপযোগী স্প্রাস ও হেমলক গাছ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে,—বিক্রয়-স্থানের ও কাগজ রপ্তানি করার সুবিধাও এই অঞ্চলে বেশী। কিন্তু আ. যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা কাগজ ব্যবহারে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। আ. যুক্তরাষ্ট্রের বৎসরে জনপ্রতি কাগজ লাগে ৩৮২ পাউণ্ড, ক্যানাডার লাগে ২৬০ পা.। আমেরিকা পৃথিবীর উৎপন্ন কাগজের ৪৪ শতাংশ নিজেই উৎপন্ন করে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে কাষ্ঠমণ্ড ও কাষ্ঠ, ইউরোপ,—বিশেষতঃ নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্‌লণ্ড,—ও ক্যানাডা—হইতে আমদানি করিতে হয়।

ক্যানাডার বন সম্পদ্‌ ও জলপ্রপাত অতুলনীয়। সেজন্য ক্যানাডা বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডা কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড, ও কাষ্ঠ রপ্তানির জন্য বিখ্যাত।

ইউরোপে **ফিনলণ্ড, সুইডেন ও নরওয়ের** কাষ্ঠ, কাষ্ঠদ্রব্য ও কাষ্ঠমণ্ডই প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। এখানে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ খুব বেশী নহে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বেশী। ইহারা যে-পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা জনপ্রতি যথাক্রমে ২৬৪,২৭৯ ও ২২৪ পাউণ্ড হিসাবে পড়ে। কিন্তু কাগজ এখান হইতে রপ্তানি হয় বেশী।

জার্মানিতে ছেঁড়া কাপড় হইতে বেশী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। স্পেনে এস্পার্টো ঘাস হইতে কাগজ হয়। গ্রেট্‌বৃটেন পৃথিবীর ছয় শতাংশ কাগজ উৎপাদন করে। কিন্তু তাহার বিদেশী কাষ্ঠমণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুইডেন ও নরওয়ে হইতে সে প্রধানতঃ মণ্ড আমদানি করে।

এশিয়ার মধ্যে **চীনে** খড়ের সস্তা কাগজই বেশী প্রস্তুত হয়। চীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে কাষ্ঠমণ্ড আনায়, দেশের মধ্যেও অল্প কাষ্ঠমণ্ড পায়।

জাপানে কৃষিক্ষেত্র প্রচুর নাই। সেজন্য গৃহশিল্প হিসাবে যে-কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার জন্য সমুদ্রে ভাসমান জঞ্জাল, ও উডো (Udo) নামক একপ্রকার গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়। জাপানে পাখা, ছাতা, লণ্ঠনের আবরণ, ব্যাগ, গামোছা, রুমাল, ঘরের দেওয়াল প্রভৃতি কাগজেই প্রস্তুত হয়। সেজন্য এদেশে শক্ত কাগজ, চামড়ার মত কাগজ, নরম কাগজ, লিখিবার কাগজ, গা মুছিবার কাগজ প্রস্তুত হয়। সুতরাং তাহাদের কাগজের দরকার খুব বেশী। অথচ জাপানে তৃণ নাই। জাপান তাহার হোক্‌কাইডো দ্বীপ হইতে কাষ্ঠমণ্ড পায়, এবং ক্যানাডা, আ. যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করে।

কয়েকটি দেশে খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই কাগজ দীর্ঘস্থায়ী নহে। অতি অল্প দিনে ইহা লাল হইয়া যায় ও ঘিয়ে ভাজা জিনিষের মত গুঁড়া হইয়া যাইতে থাকে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুতকারী দেশের নাম করা হইল,—

খবর ছাপিবার কাগজের উৎপাদন ১৯৬০
পৃথিবী—১৩৭৩০ স. মে. টন

দেশ	উৎপাদন স. মে. টন	দেশ	উৎপাদন স. মে. টন
১। ক্যানাডা	৬১১৪	৬। সুইডেন	৫৮২
২। আ. যুক্ত-রাষ্ট্র	১৮২৩	৭। ফ্রান্স	৫৫১
৩। ফিনলণ্ড	৭৮১	৮। সো. রুশিয়া	৪২১
৪। যুক্তরাজ্য	৭৫৩	৯। ইতালী	২৫৯
৫। জাপান	৭৩২	১০। জার্মানি (প.)	২৩০

৮। রাসায়নিক শিল্প

পৃথিবীতে এক্ষণে শিল্পের যুগ চলিতেছে। যে-সকল জাতি এক্ষণে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, তাহারা সকলেই শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্প শিল্পসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। লোহা জুড়িবার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য দরকার। ছাপাখানা প্রস্তুত করিলেই ছাপার কার্য হয় না,—সেজন্য কালি দরকার,—কৃষিকার্যের জন্য সার দরকার,—রোগমুক্তির জন্য ঔষধাদি দরকার, কাপড় পরিষ্কার করিতে ও রং করিতে নানারূপ দ্রব্য দরকার। জীবন ধারণের জন্য মানুষের এইরূপ যে-সকল দ্রব্যের আবশ্যক তাহার অধিকাংশই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিতে হয়।

রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদন।—রাসায়নিক শিল্পের জন্য দরকার —প্রধানতঃ গন্ধক, লবণ, পেট্রোলিয়াম, পটাশ (যবক্ষার), নাইট্রেট (লবণবিশেষ), এবং কাষ্ঠ ও তূলার "সেলুলোজ" (৪৬৮ পৃঃ) প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত এই দ্রব্যগুলি রাসায়নিক শিল্পে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা উপাদানের প্রথম স্তর। সাক্ষাৎভাবে রাসায়নিক শিল্পের প্রধান উপাদান **এসিড** (Acid—অম্ল, দ্রাবক) ও **এল্‌কালি** (Alkali—যবক্ষার);—ইহারা উপাদানগুলির দ্বিতীয় স্তর,—প্রথম স্তরের দ্রব্যগুলির ভিত্তিতে এই দ্বিতীয় স্তরের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়, এবং এই দ্বিতীয় স্তরের অম্ল ও ক্ষারদ্রব্য হইতে নানাপ্রকার ব্যবহারোপযোগী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

রাসায়নিক দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—(১) **গুরুপরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ অমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Heavy Chemicals), ও (২) **লঘু-পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ সুমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Fine Chemicals)। প্রথমটি এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়, এবং অসংস্কৃত ও স্থূলভাবেই প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে খরচও বেশী পড়ে না, এবং ইহা অবলম্বনে অন্য আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এসিড, সোডা ও পটাশ এবং জমির উর্বরতাবর্ধক সার প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। ঔষধাদি, ফটোগ্রাফ কার্যের জন্য আবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রং, বার্নিশ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

এক্ষণে নিম্নে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে,—

১। **সালফিউরিক অ্যাসিড** (Sulphuric Acid—গন্ধকদ্রাবক) —ইহা এসিড-পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এসিড, এবং রাসায়নিক শিল্পের সর্বপ্রধান উপাদান।

ইহার সর্বপ্রধান উৎপাদক স্থান—**আ. যুক্তরাষ্ট্র** (৪৫%)। অন্য প্রধান উৎপাদন-স্থান ক্রমান্বয়ে—২। **জাপান**, ৩। **সো. রুশিয়া**, ৪। **প. জার্মানি**, ৫। **যুক্তরাষ্ট্র**, ৬। **ইতালী**, ৭। **ফ্রান্স**, ৮। **ক্যানাডা**, ৯। **বেলজিয়ম**, ১০। **স্পেন**, ১১। **অষ্ট্রেলিয়া** প্রভৃতি।

২। **সোডা এ্যাশ** (Soda Ash—সাজ্জি)।—সোডা এ্যাশ ক্ষারজাতীয় দ্রব্য। ইহা প্রস্তুত করিতে লবণ, কয়লা, কোক ও চুনাপাথর দরকার। সেইজন্য যে-অঞ্চলে লবণ ও চুনাপাথর দুইই পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলেই ইহা প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপন করা হয়। কাগজ, সাবান, কাচ প্রস্তুত করিতে ও পেট্রোলিয়ম শোধন করিতে ইহা দরকার করে। প্রধান উৎপাদক দেশ **আ. যুক্তরাষ্ট্র**। অন্য স্থান—**সোভিয়েট রুশিয়া, প. জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, পূর্ব জার্মানি, পোলণ্ড**, ইতালী, স্পেন ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

৩। **কষ্টিক সোডা** (Caustic Soda) এবং ৪। **ক্লোরিণ** (Chlorine)-ও সোডা এ্যাশের মত লবণ হইতে প্রস্তুত দরকারী ক্ষারদ্রব্য। কষ্টিক সোডা কাগজ, সাবান, রেয়ন প্রভৃতি শিল্পের জন্য আবশ্যক হয়। ক্লোরিণ কাপড় শুভ্রীকরণে, জল পরিষ্করণে, রং প্রস্তুত করিতে ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতে আবশ্যক হয়।

কস্টিক সোডা প্রধানতঃ পাওয়া যায় আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে। অন্য স্থান—সো. রুশিয়া, জাপান, প. জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, ক্যানাডা।

৫। **সাবান**—চর্বির সহিত সোডা ও পটাশ মিশাইয়া সাবান করা যায়। এজন্য চর্বি, জলপাই তৈল, তিল তৈল, নারিকেল তৈল, তুলা তৈল, বাদাম তৈল, তাল তৈল প্রভৃতি লাগে। চর্বি প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার পশুপালন ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যায়। নারিকেল তৈল পাওয়া যায় ফিলিপাইন দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে। কঙ্গো, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় হইতে তাল তৈল পাওয়া যায়। জলপাই তৈল ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে উৎপন্ন হয়, এবং মার্সেল্স্ ইহার প্রধান রপ্তানি বন্দর। সাবান উৎপাদনে যদিও আ. যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশেই উৎপন্ন হয়।

৬। **কয়লার আল্‌কাত্‌রা হইতে রং** (Coal tar Dyes):—কাপড়ের পাড় করিবার জন্য ও কাপড় রং করিবার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতে রং ব্যবহার করা হইয়াছে। গাছের ছাল, নানাপ্রকার ওষধি ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি

দ্বারা এইরূপ রং-করার কাজ বহুদিন হইতে সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু কয়লা হইতে যে-আল্‌কাতরা পাওয়া যায়, তাহা হইতে এক্ষণে উৎকৃষ্ট ও সস্তা রং প্রস্তুত করা হইতেছে। আলকাতরা হইতে সর্বপ্রথম রাসায়নিক রং করার চেষ্টা হয় ইংলণ্ডে। কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। তৎপরে জার্মানি আল্‌কাত্‌রা হইতে উৎকৃষ্ট ও সুলভ রং প্রস্তুত করিয়া জগৎ জয় করিয়া লয়। প্রথম মহাযুদ্ধ কালে জার্মানির রং অপ্রাপ্য হইলে নানা দেশে এইরূপ রং প্রস্তুত করার আবশ্যকতা হয়। এই সময়ে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র এই রাসায়নিক রং প্রস্তুত করে। এক্ষণে জার্মানি, আ. যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট্‌বৃটেন প্রভৃতি আল্‌কাত্‌রা হইতে রং প্রস্তুত করিতেছে।

৭। **কৃষিসার** (Fertilizer)।—**ফস্‌ফরাস, পোটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন** গাছের খাদ্য। কৃষির জমিতে এগুলি না থাকিলে গাছ বৃদ্ধি পায় না। ভাল ফসল পাইতে হইলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার দিতে হয়। গোবর, হাড়ের গুঁড়া, চিলির পক্ষি-পুরীষ প্রভৃতি জমিতে দিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ তিনটি দ্রব্য অবলম্বনে রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হইতেছে।

জীবজন্তুর হাড় হইতে, এবং ফস্ফেট-অশ্ম (Phosphate rock) নামক জীবাশ্ম হইতে এখন প্রচুর ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায়। শেষোক্ত ফসফেট-টির নাম জীবাশ্ম ফসফেট (Fossil Phosphates)। সো. রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপে ও উত্তর কাজাকস্তানে, এবং টিউনিশিয়া ও মরক্কো দেশ হইতে ফসফেট রপ্তানি হয়। এই ফস্‌ফরাস হইতে সালফিউরিক এসিডের যোগে যে-কৃষিসার প্রস্তুত হয় তাহার নাম **এসিড ফস্‌ফেট** বা **সুপার-ফস্‌ফেট** (Superphosphate)। সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারফস্‌ফেট-সার প্রস্তুতকারী দেশ—**আ. যুক্তরাষ্ট্র**। তৎপরে ক্রমান্বয়ে **জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য** প্রভৃতি।

পটাশ নামক লবণ-দ্রব্যও কৃষিসার উৎপাদনে বিশেষ দরকারী। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পটাশ-উৎপাদক দেশ ছিল। উত্তর জার্মানির হার্‌ৎজ নামক (Harz) পার্বত্য অঞ্চলের চারিদিকে জার্মানির পটাশের খনি অবস্থিত। এই পটাশ একটি কৃষিসার। এই পটাশ অবলম্বনে অন্য দ্রব্যের সংযোগে রাসায়নিক কৃষি-সার প্রস্তুত করা হয়। এক্ষণে (১৯৬০) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পটাশ-উৎপাদক দেশ **আ. যুক্তরাষ্ট্র**। তৎপরে ক্রমান্বয়ে **প. জার্মানি, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানি, স্পেন**। পৃথিবীর মোট উৎপাদন—৮৫৫০ স. মে. টন।

তৃতীয় আর এক প্রকার কৃষিসার—নাইট্রেট। ১৯০০ খৃ. অব্দে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ নাইট্রেট্ পাওয়া যাইত চিলির আটাকামা মরুর পুরীষ-সঞ্চয় হইতে এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া যাইত—কয়লা হইতে। চিলির পক্ষি-পুরীষকে বলা হয় প্রাকৃতিক

সোডিয়াম নাইট্রেট (Natural Sodium Nitrate)। এক্ষণে আবশ্যকীয় নাইট্রেটের তিন চতুর্থাংশ পাওয়া যায় বাতাস হইতে, এক-পঞ্চমাংশ কয়লা হইতে, এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{২০}$ অংশ পাওয়া যায় চিলি হইতে। ১৯০০ খৃ. অব্দে জার্মানিতে নাইট্রোজেন উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করা হয়। তাহাতে প্রথমে কোক ও চুনাপাথর যোগে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগে ক্যালসিয়ম কারবাইড প্রস্তুত করা হয়;—তাহা হইতে ক্যালসিয়ম, সাইয়ানাইড, এবং শেষে তাহা হইতে এমোনিয়া (Ammonium Sulphate) প্রস্তুত করা হয়। এগুলি কৃষিসার উৎপাদনে বিশেষ আবশ্যকীয়।

নাইট্রোজেন যুক্ত কৃষিসার উৎপাদনের শ্রেষ্ঠস্থান আ. যুক্তরাষ্ট্র (২৮%)। শ্রেষ্ঠস্থান ক্রমান্বয়ে—প. জার্মানি (১২%), জাপান (১১%), ফ্রান্স (৬%), ইতালী (৫%), যুক্তরাজ্য (৪·৬%), হল্যাণ্ড (৪·৬%) ইত্যাদি। পৃথিবীর উৎপাদন (১৯৬০-৬১)—১০৫০০ স. মে. টন। ভারত (১%)।

এক্ষণে নানাস্থানে অসংখ্য রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এখানে কয়টিমাত্র প্রধান শিল্পের পরিচয় দেওয়া হইল।

Questions

1. What are the essential factors influencing the development of industries ? Discuss them with illustration.

2. Describe the localisation and indicate the present position of the steel industry either of U. K. or of U. S. A,

3. Account for the rise and fall of the cotton industry of U. K. Why was Lancashire selected for localisation of the cotton industry ?

4. Describe the regional distribution and present position of the Cotton industry of the U. S. A.

5. Though the southern Appalachians now out-rank New England in number of spindles, consumpion of cotton and value of cotton textiles manufactured, the cotton textile industry is still an important one in New England,—Explain and account for this.

6. Give a short account of the cotton industry of Japan and continental Europe. "Japan has to depend for her cotton on the foreign countries. Still she could out-rank Great Britain in the cotton market." Account for this.

7. "Local condition, that provided an ideal setting for the cotton industry for more than a century, have failed to maintain Lancashire's position in cotton manufacturing."—Account for this.

8. In which parts of Europe and also in which parts of the U. S. A. the woollen manufacture has greatly developed? Show that the cotton and the wollen manufacture has developed in the same part of the two regions and give the reason.

9. Write short notes on the silk industry of the U.S.A., U.K., and Japan.

10. Name the principal rayon manufacturing countries of the world.

11. Describe the paper industry of North America. In which parts of the continent the industry has developed and why?

12. Which are the chemical fertilisers used to remove the impoverishment of soils? In which parts of the world they are principally manufactured?

৩

ভারতের কয়েকটি প্রধান সর্জন-শিল্প

১। কার্পাস বয়নশিল্প

ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্প সম্বন্ধে জাতি-সংসদের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কমিটি বলিয়াছেন যে, কি মূলধনের পরিমাণ হিসাবে, কি শ্রমিক বিনিয়োগে, কিংবা কি উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে, ভারতে কার্পাস বয়নশিল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ শিল্প। ইহার মূলধন—১২৭ কোটি টাকা,—৭ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করিয়া থাকে,—এবং উৎপন্ন কার্পাস দ্রব্যের মূল্য মোটামুটি হিসাবে ৪০০ কোটি টাকা। অন্ততঃ, ভারতীয় শিল্পসমূহের মধ্যে প্রধানতঃ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থপ্রসূ শিল্প,—পৃথিবীর বস্ত্র ও সূত্র উৎপাদন শিল্পে ইহার স্থান তৃতীয়, এবং টেকো ও তাঁতের সংখ্যা হিসাবে ইহার স্থান পঞ্চম। ভারত বিভাগের পরে পাটই কেবল কয়েক বৎসর প্রধান অর্থপ্রসূ শিল্প হইয়াছিল।

প্রাচীনত্ব।—ভারতের এই কার্পাসবস্ত্র নির্মাণশিল্প বহু প্রাচীন;—কার্পাস, কার্পাসসূত্র ও কার্পাসবস্ত্রের জন্মস্থানই ভারতবর্ষ। দক্ষিণ-ভারতে কালিকটের (বর্তমান নাম—কোঝিকোড) বস্ত্র হইতেই **ক্যালিকো** নামের কাপড় হইয়াছে। মসলিপত্তনের (বর্তমান নাম—বন্দর) ছিট ইউরোপে সাদরে ব্যবহৃত হইত। ভারতের মসলিন কাপড়ও ইউরোপে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

শেষে বৃটিশ শাসনাধীনে বণিক-বৃত্তি-সম্পন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কল, কৌশল ও অত্যাচারের দ্বারা, এবং আইন করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে, বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত নিজের দেশের মধ্যেই হারিয়া গেল,—ভারতের বয়নশিল্পের লোপ হইল,—ক্রমশঃ সে লৌহশিল্পের মত তাহার বয়নশিল্পের কথাও ভুলিয়াই গেল।

বয়নশিল্পের পুনরুত্থান।—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ড চীন দেশে সূতা চালান দিতে আরম্ভ করে। সেই বাণিজ্যের মধ্যে বোম্বাই-অঞ্চলের পার্শীরা আংশিকভাবে প্রবেশ করে। কিন্তু ইহাই পরিশেষে এই কার্পাস-শিল্পের বীজস্বরূপ হইয়াছিল, এবং কালধর্মে ইহারই চারা বৃহৎ ফলপ্রসূ মহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমে ১৮১৮ খৃ. অব্দে ইংরেজদিগের চেষ্টায় বঙ্গদেশে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৫১ খৃ. অব্দে বোম্বাই সহরে, পরে আমেদাবাদে, এবং তৎপরে শোলাপুরে মিল বসিল। ইহার পরে ক্রমশঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দারাবাদ, মহীশূর, মান্দ্রাজ, ও উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে মিল ছড়াইয়া পড়িল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মিলের সংখ্যা ছিল ১৯৩। এদিকে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান, চীনের কার্পাসসূত্রের বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং ক্রমশঃ ভারতকে হঠাইয়া দিল। এতদিন ভারত সূত্র প্রস্তুত করার কথাই ভাবিত, এক্ষণে সে দেশে বস্ত্রের অভাব-দূরীকরণের দিকে মন দিতে বাধ্য হইল, এবং সূত্রনির্মাণের পরিবর্তে বস্ত্রনির্মাণে মনোযোগী হইল। বঙ্গদেশের স্বদেশী আন্দোলন এই সময়ে কার্পাস-শিল্পকে অনেকাংশে রক্ষা করে।

কার্পাস-শিল্পের উন্নতি।—নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কার্পাস-শিল্পের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে ;—

১নং তালিকা

ভারতের কার্পাস-শিল্পের ক্রমোন্নতি*

খৃঃ অব্দ	মিলের সংখ্যা	টাকুর সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা
১৮৫৫	১	২৯,০০০	×
১৮৬৬	১৩	৩০৯,০০০	৩,৪০০
১৮৮০	৫৬	১৪,৬১,০০০	×
১৮৯০	১৩৭	৩২,৭৪,১৯৬	২৩,৪১২
১৯০০	১৯৩	৪৯,৪৫,৭৮৩	৪০,১২৪
১৯১০	২৬৩	৬১,৯৫,৬৭১	৮২,৭২৫
১৯২০	২৫৩	৬৭,৬৩,০৭৬	১১৯,০১২
১৯৪০	৪২৫	১০৮,৪৯,০৩৬	১৯৯,০৭৫
১৯৫৩	৪৫৭	১,১৭.২১,১৩৯	২০৭,২৫০
১৯৫৭	৪৯৯	১,২৯,০৬,৬২২	২০৬,১২৬
১৯৫৯	৪৭৯	১,৩৪,০৬,৪৬৬	২,০১,০৬৩
১৯৬১	৪৭৫	১,৩.৬৬৩,৩৬৪	১৯৮,৭৮৫

* The Times of India Directory & Year Book, 1961-62.

তুলার কল :—প্রদেশভেদে মিলগুলি নিম্নলিখিত ভাবে অবস্থিত :—

২নং তালিকা

প্রদেশভেদে মিলগুলির অবস্থান (১৯৫৮—১. ৪. ৫৮

স্টেট	মিলের সংখ্যা
গুজরাট স্টেটে মোট	১০৩
(ক) আমেদাবাদ শহর—৬৬	
(খ) অবশিষ্ট গুজরাট—৩৭	
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৪
মান্দ্রাজ	১৩৫
মহারাষ্ট্র	৯০
বোম্বাই শহর—৬০	
অবশিষ্ট মহারাষ্ট্র—৩০	
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩
উত্তরপ্রদেশ	২৫
রাজস্থান	১১
মহীশূর	১৮
মধ্যপ্রদেশ	৮
পাঞ্জাব	৩
দিল্লী	৪
কেরল	১৩
পণ্ডিচেরী	৩
বিহার	৩
উড়িষ্যা	২
মোট	৪৭৫

কিন্তু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস বয়নশিল্প-সংক্রান্ত আরও ছোট-বড় অনেক কারখানা প্রভৃতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে তাহাদের সংখ্যা লিখিত আছে ২২৪৬ মাত্র। কার্পাস-শিল্পে প্রথম স্থান—মহারাষ্ট্র ও দ্বিতীয় স্থান গুজরাট স্টেটের। (১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র স্টেটের বস্ত্র উৎপাদন ১৬৭৪, ৭০২ মিটর, এবং গুজরাট স্টেটের বস্ত্র ১৩৭৫৬১৪ মিটর, সূত্র উৎপাদনে ১৯৬০ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে মহারাষ্ট্র—২৪২২৬৭ কিলোগ্রাম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মান্দ্রাজ—১৪২১১৫ কিলোগ্রাম, তৃতীয় স্থান অধিকার করে গুজরাট—১৩৫৬৪১ কিলোগ্রাম।

বোম্বাই,—ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।—উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সর্বপ্রথম তূলার কারখানা বঙ্গদেশে স্থাপিত

হইয়াছিল, এবং অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজের কার্পাসবস্ত্র বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তথাপি ভূতপূর্ব বোম্বাই স্টেট কার্পাসশিল্পে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। মোটামুটি অর্ধেক কার্পাসদ্রব্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্র স্টেটে প্রস্তুত হয়। কোন স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে বিচার করা দরকার—(১) অবস্থান, (২) মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা, (৩) শ্রমিক, (৪) কাঁচামাল পাইবার সুবিধা, (৫) পরিবহনের সুবিধা ও (৬) বিক্রয়স্থান। এই হিসাবে ভূতপূর্ব বোম্বাই-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যাউক।

(১) অবস্থান।—(১) সুরাট বন্দরের অবনতি হইলে, নর্মদা ও তাপ্তী নদী মজিয়া গেলে, এবং বিশেষভাবে এই সময়ে বাণিজ্য-জাহাজগুলির আয়তন বৃদ্ধি হইলে,—বোম্বাই দ্বীপ বন্দররূপে গৃহীত হয়। বন্দর করিবার পক্ষে এ-অঞ্চলে এরূপ সুবিধাজনক স্থান আর ছিল না।

(২) বোম্বাই বন্দর সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিম-উপকূলে, শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়,—ও বাণিজ্যপ্রধান ইউরোপের নিকটবর্তী বন্দর এবং ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যপথে অবস্থিত প্রধান স্থান। সেজন্য ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে যে কার্পাস-সূত্রের বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের লোকে,—বিশেষতঃ পার্শী-সম্প্রদায়,—বাণিজ্যকুশল ও ধনী হইতে পারিয়াছিল।

(৩) ইংলণ্ডে তুলা-রপ্তানির ইহাই প্রধান বন্দর হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমেরিকার গৃহযুদ্ধকালে যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলা-রপ্তানি বন্ধ হয়, তখন ইংলণ্ডের কার্পাসশিল্পের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল, এবং এজন্য বোম্বাই বন্দর ক্রমশঃ প্রসিদ্ধ তুলা-বন্দরে পরিণত হইয়াছিল। তাই তুলার কল নির্মাণকল্পে প্রথমে বোম্বাই সহরই নিরূপিত হইয়াছিল।

(৪) বিলাত হইতে মিলের যন্ত্রপাতি আনিবার পক্ষে এই স্থানই ইউরোপের নিকটতম উপযুক্ত বন্দর।

(২) মূলধন।—বোম্বাই অঞ্চলের পার্শী-সম্প্রদায় তুলাসংক্রান্ত ও অন্যান্য বাণিজ্যে অর্থসঞ্চয় করিয়া বিশেষ ধনী হইয়াছিল, ও ইংলণ্ডের ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের সংস্রবে ব্যবসায়-কার্যের মূল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল এবং ব্যবসায়সূত্রে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িগণের সংস্রবে আসিয়া সহজে কল স্থাপনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার ও তাহা আনিবার অনুমতি যোগাড় করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এই পার্শী-সম্প্রদায়ই যখন সূতার কল স্থাপন করে, তখন তাহারা বোম্বাই সহরই যোগ্যস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল।

(৩) শ্রমিক।—তদানীন্তন বোম্বাই স্টেট ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশ হইতে সুলভ শ্রমিক সংগ্রহ করা সহজ হইয়াছিল।

(৪) **কাঁচামাল**।—বোম্বাই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমিই তুলা-উৎপাদনের প্রধান স্থান। তদুপরি বোম্বাই তুলা-রপ্তানির প্রধান বন্দর ছিল বলিয়া কলে ব্যবহারের জন্য এখানে তুলাপ্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা ছিল।

(৫) **পরিবহন**।—সে-সময়ে বোম্বাই-এর সহিত ইউরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, উৎপন্ন কার্পাসদ্রব্য বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে ইহাই উপযুক্ত স্থান ছিল।

(৬) **বিক্রয়-স্থান**।—বিদেশে কার্পাস-দ্রব্য রপ্তানি করার পক্ষে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ বন্দর।

অন্যান্য।—তখন কার্পাস-সূত্রাদি নির্মাণের জন্য আর্দ্র বাতাসের আবশ্যকতা ছিল। সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া বোম্বাই-এর জলবায়ু কার্পাস-শিল্প গঠনের উপযোগীই ছিল।

তদানীন্তন বোম্বাই স্টেটের মধ্যে এবং বর্তমান গুজরাট স্টেটে কার্পাস-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান **আমেদাবাদ**। কারণ,—প্রাচীনকালে এই অঞ্চলেই কার্পাস-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং এই অঞ্চলেই তাঁতের কার্যে দক্ষ বয়নশিল্পী যথেষ্ট ছিল,—এই অঞ্চলেই কার্পাস উৎপন্ন হয়,—ইহা সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, সুতরাং আমদানি-রপ্তানির সুবিধা এখানে প্রচুর ছিল,—এবং উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় করিবার স্থানও ইহার চারিদিকে ছিল। কারণ,—তখন এ-অঞ্চলে কল স্থাপিত হয় নাই। অধিকন্তু মূলধন সংগ্রহের পক্ষেও আমেদাবাদ উপযুক্ত স্থান। এইজন্য বোম্বাই সহরের বাহিরে কল স্থাপনের প্রয়োজন হইলে আমেদাবাদই মনোনীত করা হইয়াছিল। এক্ষণে সমগ্র ভারতে আমেদাবাদ কার্পাস-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সহর। এখানে ৬৬টি কল আছে।

অন্যান্য স্থানে কার্পাস-শিল্প।—গুজরাট স্টেটের আমেদাবাদের পর **মধ্যপ্রদেশের** ভূতপূর্ব রাজধানী অঞ্চলের নাগপুরে কার্পাস কল স্থাপিত হয়। বোম্বাই অঞ্চলের বাহিরে এই প্রথম কল স্থাপিত হইল। প্রাচীনকালে মধ্যপ্রদেশ সোনালী সূতার বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুতরাং এস্থানে তাঁতীর অভাব ছিল না। এইস্থানে বিস্তর তুলা উৎপন্ন হয়, এখানকার শ্রমিক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য, মাল আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে রেলপথেরও সংযোগ আছে। সর্বোপরি এখানে কয়লার খনি আছে। সেজন্য এস্থলে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ-ভারতে কার্পাস-শিল্প।—মান্দ্রাজে ও মহীশূরে তাঁতশিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। কথিত আছে ভারতের তাঁতশিল্পে যত সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয় মান্দ্রাজে। প্রকৃতপক্ষে তাঁতশিল্পের সূতা সরবরাহের

জন্যই এ-অঞ্চলে, বিশেষতঃ তিরুনেলভেলি (তিন্নেভেল্লী), মান্দ্রাজ ও কইম্বাটুর প্রভৃতি জেলায়, প্রথম সূতার কল স্থাপিত হইল। কিন্তু কয়লার অভাবে এ-অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এবং শেষে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনই এ-অঞ্চলে কার্পাস-শিল্প প্রতিষ্ঠার মূল। এখানকার জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-স্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলি তূলা-উৎপাদন-অঞ্চলে বা তৎসন্নিকটে অবস্থিত। এজন্য ঐরূপ স্থানেই অনেক কল স্থাপিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে শ্রমিক সস্তা।

মহীশূর—রাষ্ট্রের রাজধানী বাঙ্গালোরে কয়েকটি কল আছে। এখানে শ্রমিক—সুলভ ও প্রচুর, মূলধনের সম্ভাবনা বেশী, কাঁচামাল সন্নিকটেই পাওয়া যায়, কাঁচামাল আমদানির ও উৎপন্নদ্রব্য রপ্তানির সুবিধা বিস্তর, এবং সর্বোপরি জলবিদ্যুৎ-শক্তির জন্য সস্তায় কল চালাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। সেজন্য এখানে কতকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ—প্রাচীনকাল হইতেই তাঁতশিল্পে বিশেষ অগ্রসর। তাঁতবস্ত্রের আবশ্যকতাও এ-অঞ্চলে বেশী। এ-অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী নহে বলিয়া সাধারণের নিকট তাঁতবস্ত্রই শীতবস্ত্র। এখানে কলগুলি কয়লা-অঞ্চলের নিকটবর্তী হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলায় প্রধানতঃ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরটি কাঁচা তূলা ও কলের যন্ত্রপাতি আমদানির ও উৎপন্নবস্ত্র রপ্তানির শ্রেষ্ঠ বন্দর। ভাগীরথী নদী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিবার ও পাঠাইবার পক্ষে সুবিধাজনক, এবং কলিকাতা সহর উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয়ের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার। ইহার জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ, এবং এখানকার শ্রমিকও সুলভ ও সহজপ্রাপ্য। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহর আবার বহু ব্যাঙ্কের এবং বহু ধনীর ও ব্যবসায়ীর সঙ্গমস্থল;—সুতরাং এখানে মূলধনের অভাব হয় না। কিন্তু এখানে তূলার বিশেষ অভাব,—পশ্চিম ভারত হইতে বা বিদেশ হইতে রেল ও জলপথে তূলা আনাইয়া এখানে কাজ চালাইতে হয়। এই বাধার জন্য এদেশে কার্পাসশিল্পের প্রয়োজনানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

উত্তরপ্রদেশ—এখানে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, এখান হইতে পূর্বে ও পশ্চিমে জিনিষ রপ্তানির বিশেষ সুবিধা। প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতের বিশেষতঃ বাণিজ্যপ্রধান উত্তর-ভারতের, কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহাই কানপুরের উন্নতির অন্যতম কারণ এবং এই কারণেই উত্তরপ্রদেশে প্রথম কল স্থাপিত হয় কানপুরে। উত্তরপ্রদেশে কয়লা নাই, কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি আছে—প্রচুর শ্রমিক আছে, তূলাও এখানে কিছু উৎপন্ন হয়, এবং পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করা যায়,—সেজন্য উত্তরপ্রদেশে অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে।

উৎপাদন।—নিম্নে কয়েক বৎসরের উৎপাদন* দেওয়া হইল,—

খৃঃ অব্দ	বস্ত্র (১০ লক্ষ গজ)	সূতা (১০ লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৫৪	৫০১১	১৫৬৫
১৯৫৫	৫০৯৮	১৬৩৭
১৯৫৬	৫৩০৬	১৬৭১
১৯৫৭	৫৩১৭	১৭৮০
১৯৫৮	৪৯২৬	১৬৮৫
১৯৫৯	৪৯২৫	১৭২৩
১৯৬০	৫০৪৮	১৭৩৭
১৯৬১	৫১২৭	১৮৮৭

* *The Times of India Directory & Year Book—1961-62,*

রপ্তানি—নিজের দেশের মধ্যে বিক্রয় করা ছাড়াও ভারত-যুক্তরাষ্ট্র—মধ্য প্রাচ্য, ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে কাপড় রপ্তানি করে। পাকিস্তানও এক্ষণে ভারতের খরিদ্দার।

১৯৫০ সালে এই রপ্তানি-কার্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার প্রধান খরিদ্দার ছিল—সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, আ. যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রহ্মদেশ।

রপ্তানি * (জলপথে)

খৃ· অব্দ	সূতা		বস্ত্র	
	পরিমাণ (লক্ষ পাউণ্ড)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (লক্ষ গজ)	মূল্য (কোটি টাকা)
১৯৫২-৫৩	১৭৯	৪·২	৬১৫৭	৬১·৫
১৯৫৩-৫৪	২২২	৪·৭	৭৬৫৫	৬৩·১
১৯৫৪-৫৫	১২	০·৩	৮১৯০	৬৩·২
১৯৫৫-৫৬	১৩১	৪·২১	৭৪০০	৫৬·৬
১৯৫৬ (এপ্রিল-ডিসেম্বর)	৬৯	১·৫০	৫৫৭০	৪২·৭১
১৯৫৭ (জানু-ডিসে)	১৬৫	৩·১০	৮৩৯	৫৯·০০
১৯৫৮ (জানু-ডিসে)	৩১৬	৫·৮০	৫৮১	৪০·০০
১৯৫৯ (জানু-ডিসে)	২৪৩	৪·৩০	৮৫০	৫৯·০০
১৯৬০ (জানু-ডিসে)	১৪২	৩·৭০	৬৯৫	৫৪·০০

* *The Times of India Directory and Year Book—1962-63.*

আমদানি—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেবল কয়েকটি বিশেষ ধরণের কাপড় আমদানি করা হয়। যেমন সাদা ধোওয়া-ধুতি, কোরা কাপড়, রঙীন কাপড়, ছাতার কাপড় ও ছাপানো কাপড় ইত্যাদি। ১৯৫৮ সালে আমদানি হয়—যুক্তরাজ্য, জাপান, সুইজর্লণ্ড, ব্রহ্মদেশ, হলণ্ড, বেলজিয়ম, ইতালী, জার্মানি, মালয় ও সিঙ্গাপুর হইতে। মোট ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি আমদানি করা হয়।

তাঁতশিল্প

(শক্তি ও হস্ত-চালিত)

তাঁতশিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায় এই শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ইহার পুনরুন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

তাঁত—ভারতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৭.৫৪ লক্ষ তাঁত আছে। তাহাতে প্রায় ২ কোটি লোকের অন্ন সংস্থান হয়। তাহার মধ্যে মাদ্রাজে আছে ৮,৪১,১৪০ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের সংখ্যার ২৯.৫ শতাংশ। ইহার পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তরপ্রদেশ; তাঁতসংখ্যা ২,৫৩,৩১১। গবর্ণমেন্টের হিসাবে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৬.৫ কোটি, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯১ কোটি এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬০ কোটি গজ, তাঁতবস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

শক্তি-চালিত তাঁত-কারখানা (establishment) ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আছে ৩½ হাজার, তাহাতে তাঁত চলে মোটামুটি ২০ হাজার;—ইহার অধিকাংশই মহারাষ্ট্র স্টেটে আছে। ইহার বার্ষিক উৎপাদন মোটামুটি ৯ কোটি গজ।

১৯৫৮ সালে মোটের উপর ৩৫০ লক্ষ গজ তাঁতবস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছিল।

তাঁতশিল্পের অবনতির কারণ। (১) পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের তাঁতবস্ত্রের বাজার নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাজারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের যত ক্ষতি হইয়াছে, অন্য প্রদেশগুলির ততটা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ ক্ষতি যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা এতদিনে শুধরাইয়া লওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

(২) মিলের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁতের ক্ষতি হইয়াছে। ইহা প্রচলিত কারণ। কিন্তু ১৯৪৮ খৃ. অব্দে মিলগুলি ধুতি শাড়ী প্রস্তুত করা স্বেচ্ছায় কমাইয়া দিয়াছিল। তাহাতে তাঁতবস্ত্রের বিক্রয় বাড়ে নাই।

(৩) সূতার অভাবও তাঁতশিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ-কেহ উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানকালে এই কারণ বিশেষ যুক্তিসহ নহে। সুতরাং তাঁত-শিল্পের অবনতির কারণ অন্য কোথাও রহিয়াছে। হয়ত—

(৪) তাঁতবস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি তাঁতশিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ। তাঁতবস্ত্রের মূল্য যে-হিসাবে বাড়িয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের ক্রয়মূল্যের বহির্ভূত। যুদ্ধ-পূর্বে প্রত্যেক বৎসরে গড়ে যে-কয়খানা কাপড় একজন পরিত, এখন সে বাধ্য হইয়া তাহা অপেক্ষা কম কাপড় ব্যবহার করে এবং তজ্জন্য কমমূল্যের বস্ত্রই কিনিয়া থাকে। মিলের বস্ত্র তাঁতবস্ত্র অপেক্ষা কম মূল্যে পাওয়া যায়।

(৫) পূর্বে পূজাপার্বণে তাঁতবস্ত্র খরিদ করা বা সামাজিক উপহারাদিতে তাঁতবস্ত্র দেওয়া একটা আবশ্যকীয় গৌরবজনক প্রথা ছিল। এখন তাঁতবস্ত্রের উপর সে-টান আর নাই—কতক আর্থিক দুর্দশায়, কতক পছন্দের কালোচিত পরিবর্তনে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

(৬) তাঁতের কাপড়ের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়াছে। বর্তমান কালের মুদ্রামূল্য হিসাবে যে-মূল্যের কাপড়ের যে প্রকার উৎকর্ষ আশা করা যায়, এখন তাহা নাই। ইহাও চাহিদা কমিবার একটি বিশেষ কারণ।

২। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পৃথিবীতে লৌহশিল্পই সর্বপ্রধান শ্রমশিল্প এবং অন্য শিল্পপ্রচেষ্টার দ্বারস্বরূপ। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ এই শিল্পে সবিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহশোধন, উত্তাপ-প্রয়োগে লৌহের সহিত লৌহের সংযোগসাধন, ইস্পাতপ্রস্তুতকরণ প্রভৃতি লৌহসংক্রান্ত কার্যে ভারতবর্ষ যখন অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল তখন পৃথিবীর অন্য কোন জাতি ইহার সমকক্ষ ছিল না। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটবর্তী ২৩ ফিট উচ্চ আজও পর্যন্ত কলঙ্কহীন ১৫০০ বৎসরের পুরাতন লৌহস্তম্ভ, মালবস্থিত ৪৩ ফি. ৮ই উচ্চ লৌহস্তম্ভ, রাজপুতানার আবু-পাহাড়স্থিত স্তম্ভ, প্রাচীন মন্দিরাদির নানারূপ থাম বা ছড় প্রভৃতি দেখিয়া বর্তমান-কালে লৌহশিল্পে অগ্রগণ্য পাশ্চাত্ত্য জগৎ প্রাচীন ভারতের লৌহশিল্প প্রতিভার কথা ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। ভারতের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রদেশে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লৌহমল বা গাদ এখনও প্রাচীন লৌহশিল্পের পরিচয় দিতেছে।

কিন্তু কালধর্মে ভারতের সে গৌরব নষ্ট হইয়াছে,—ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল যে, কোনও কালে তাহার লৌহশিল্প, এমন কি লৌহসম্পদ ছিল। আবশ্যকীয় ইস্পাতের

জন্য সে পরপ্রত্যাশী হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে ভারতের এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। উত্তরভারত এখন ভারতের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাঞ্চল হইয়াছে। ইহার কারণ নিম্নে আলোচিত হইল।

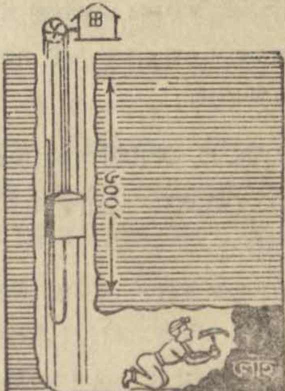
উত্তরভারত প্রধান লৌহ-শিল্পাঞ্চল কেন? লৌহশিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান উত্তরভারতে সহজে ও সুলভে পাওয়া যায়,—(১) **লৌহখনি।** —ভারতে যে-সকল লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ উত্তরভারতেই আছে।

বিহারের সিংহভূম, এবং উড়িষ্যায়—কেওনঝর, ময়ূরভঞ্জ ও বোনাই অঞ্চলে প্রচুর লৌহসম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ খনি-অঞ্চলে লৌহ-প্রাচুর্যও সর্বশ্রেষ্ঠ,—ইহার আরও এক বিশেষত্ব এই যে, পর্বতের উপরে (১৪১নং চিত্র) এই লৌহ প্রচুর সঞ্চিত আছে,—গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশের মত খনি খুঁড়িয়া (১৪২ নং) লৌহ সংগ্রহ করিতে হয় না,–খনিকার্যে অশিক্ষিত সাধারণ



ভারতে লৌহের অবস্থিতি

১৪১ নং চিত্র।



গ্রেটবৃটেনে লৌহের অবস্থিতি

১৪২ নং চিত্র।

শ্রমিক দিয়াই লৌহ কাটিয়া বাহির করা যায়—আবার এখানকার লৌহপ্রস্তরে লৌহের অংশও বেশী। প্রস্তরে লৌহ অংশ ৬০-৬৯ শতাংশ (ইউরোপে ৪০%, আ. যুক্তরাষ্ট্রে ৫০%)।

(২) **কয়লার খনি**।—কয়লাখনির অবস্থিতিসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই (২৮৩ পৃষ্ঠায়) করা হইয়াছে। আসাম, কাশ্মীর, রাজপুতানা, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে অল্পবিস্তর কয়লার খনি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লার খনি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত।

(৩) ধাতুশোধনের জন্য সাক্ষাৎভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—কোক-কয়লা। এই কোক-কয়লা প্রাপ্তির প্রধান স্থান—এই অঞ্চলের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি ও বোকারো কয়লাখনি। কিন্তু কোক-কয়লা ভারতে বেশী নাই। মাত্র ২০০ কোটি টন আছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

(৪) লৌহ গলাইবার জন্য আবশ্যক বিদ্রাবক—**চূণাপাথর ও ডলোমাইট** এই অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানেই পাওয়া যায়।

(৫) **সিলিকা, ও ম্যাঙ্গানিজ** প্রভৃতি অন্য যে সকল খনিজ দ্রব্য এই শিল্পের জন্য আবশ্যক, তাহাও নিকটে-নিকটেই পাওয়া যায়।

(৬) এই শিল্পের জন্য যে-সকল তাপসহনক্ষম (refractory) ধাতু দরকার তাহাও এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত

(৭) এই অঞ্চলের নিকটবর্তী সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কর্মপ্রার্থী, সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। এই সকল কারণে বঙ্গ-বিহারের খনি-অঞ্চল লৌহশিল্পের সবিশেষ উপযোগী।

ভারতে লৌহশিল্প।—ভারতে লৌহশিল্প এখন দুই শাখায় বিভক্ত ;—

(ক) মৌলিক লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ও (খ) পুনর্গঠন লৌহ ও ইস্পাতশিল্প।

লৌহপ্রস্তর হইতে যে কাঁচা লৌহ ও ইস্পাত পাশ্চাত্ত্য প্রথায় মিলে তৈয়ার করা হয়, তাহাই মৌলিক লৌহ শিল্পদ্রব্য, এবং বৃহৎ ইস্পাত শিল্পযন্ত্রের ছাট ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাট (billet) লইয়া, অথবা ভাঙ্গা গাড়ী, ভাঙ্গা লৌহদ্রব্য, ভাঙ্গা রেলের পাটি প্রভৃতি লইয়া তাহা হইতে যে-সকল লৌহ-দ্রব্য পুনরায় গঠন (Re-rolling) করা হয় তাহাকে পুনর্গঠন লৌহশিল্পদ্রব্য বলা হয়।

(ক) মৌলিক লৌহ ও ইস্পাতশিল্প

লৌহশিল্পের পুনরুত্থানের ইতিহাস।—ভারত যুক্তরাষ্ট্রে এখন লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পই অন্যতম প্রধান শিল্প ;—ইহাতে ৬০ হাজার লোক খাটে, এবং ৬১ কোটি টাকা এই শিল্পে নিয়োগ করা হইয়াছে। [illegible]ূর জানা যায়, এদেশে

পাশ্চাত্ত্য প্রথায় এই শিল্পের কারখানা-স্থাপনের **প্রথম চেষ্টা** করেন,—মটি ও ফার্কার (Mottee & Farquhar) ১৭৭৯ খৃ. অব্দে। তাঁহারা বীরভূমের লৌহ অঞ্চলের ইজারা লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিফলমনোরথ হন।

ইহার বহু পরে, ১৮৩০ খৃ. অব্দে মিষ্টার জে. এম, হীথ নামে মাদ্রাজের এক অবসর--প্রাপ্ত গবর্নমেন্ট কর্মচারী পোর্টো নোভো নামক স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে লৌহশিল্পের কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হইল বলিয়া ১৮৬৯ খৃ. অব্দের পর এই কোম্পানি আর চলিল না।

ইহার পরে বীরভূমে কয়েকবার লৌহশোধনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ ফললাভ হয় নাই। লৌহশিল্প সম্পর্কে ১৮৭৪ খৃ. অব্দে **তৃতীয় চেষ্টা** করে বরাকর লৌহ ফাউণ্ডি (Barakar Iron Foundry)। কুল্‌টিতে ইহার কারখানা স্থাপিত হয়, এবং ইহা এই ব্যবসায়ে বেশ সফলতাও লাভ করে। কিন্তু ১৮৮৭ খৃ. অব্দে ইহা বরাকর আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানির হস্তগত হয়, এবং দুই বৎসর পরেই ইহার নামা পরিবর্তন ঘটে, ও ইহা ১৮৮৯ খৃ. অব্দে বেঙ্গল আয়রন এবং ষ্টীল কোং (Bengal Iron and Steel Co.) এবং পরে ১৯১৯ খৃ. অব্দে বেঙ্গল আয়রন কোং (Bengal Iron Co.) নামে পরিচিত হয়। এই কারখানাই ভারতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য প্রথায় **কাঁচা লৌহ** (pig iron) প্রস্তুত করিবার সফল কারখানা। ইহার পরে ১৯১৮ খৃ. অব্দে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কোম্পানী আসানসোল হইতে মাত্র ৪ মা. দূরে **হীরাপুরে** গঠিত হয়। ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য বেঙ্গল আয়রন কোং হইতে কাঁচা লৌহ এখানে পাঠানো হইত। পরে ১৯৩৬ খৃ. অব্দে কুলটি আয়রন কোং ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের সংযুক্ত নাম হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি লিঃ (Indian Iron & Steel Co. Ltd.)

লৌহ-ইস্পাতের কারখানা এইস্থানে স্থাপন করার অনেক সুবিধা ছিল। যেমন—

(১) ইহা কয়লা-অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য কয়লা আনিবার কোন খরচ নাই।

(২) লৌহখনি ইহার কিছু দূরে অবস্থিত বটে, কিন্তু সে দূরত্ব খুব বেশী নহে। বিশেষ, কয়লা আনিবার কোন খরচ না থাকাতে লৌহ আনিবার জন্য যে বেশী খরচ হয় তাহা বিশেষ ক্ষতিকর নহে।

(৩) ম্যাঙ্গানিজ ও ডলোমাইট এখান হইতে বিশেষ দূরে অবস্থিত নহে। ম্যাঙ্গানিজ আসে মধ্যপ্রদেশ হইতে, চুনাপাথর ও ডলোমাইট আসে বিস্‌রা ও গাংপুর হইতে।

(৪) কলিকাতা-সন্নিহিত লোহার বাজার ও কলিকাতা বন্দর নিকটেই অবস্থিত।

(৫) দামোদর হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইবার সুবিধা আছে।

(৬) শ্রমিক এ-অঞ্চলে প্রচুর ও সুলভ।

ইহার পরে ১৯৩৭ খৃ. অব্দে বার্ণপুরে এই কোম্পানির সহিত সংস্থষ্ট এক নূতন কোম্পানির স্থষ্টি হয়। তাহার নাম হয় ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল (Steel Corporation of Bengal)। ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি হইতে ইস্পাত লইয়া এখানে ইস্পাতদ্রব্য (Steel structurals) প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু ১৯৫২ খৃ. অব্দের ১৪ই অক্টোবর ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টীল কোং ও ষ্টীল কর্পোরেশন কোম্পানি এক হইয়া যায় ও উহার মিলিত নাম হয় ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিভিন্ন কোম্পানীর স্থানে **ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং** নামে একটি ইস্পাত শিল্পের কারখানা হইল।

কিন্তু ভারতে এক্ষণে সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিহারের জামসেদপুরের **টাটা কোম্পানী**। বোম্বাইয়ের ধনকুবের জে. এন. টাটা উড়িষ্যার গুরুমহিষানি পাহাড়ের লৌহসম্পদের সন্ধান পাইয়া ১৯০৭ খৃ. অব্দে সিনিতে কারখানা স্থাপন করেন। এই স্থানে জমিসংক্রান্ত অসুবিধা হইলে ইহা সাকৃচি নামক এক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই সাকৃচি-ই এক্ষণে টাটানগর বা জামসেদপুর। ১৯০৮ খৃ. অব্দে এই কারখানা কার্য আরম্ভ হয় এবং প্রথমে ১৯১১ খৃ. অব্দে কাঁচা লৌহ প্রস্তুত হয় ও পরে ১৯১২ খৃঃ অব্দে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইহাই ভারতে লৌহশিল্পের পুনরুত্থান-যুগের **প্রথম ইস্পাত নির্মাণ**। গত ৪০ বৎসরে টাটা কোম্পানি লৌহশিল্পে অপূর্ব সফলতা লাভ করিয়াছে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইহা শ্রেষ্ঠ লৌহ কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি টাটাজি এই অঞ্চলে লৌহশিল্পস্থষ্টির নানা সুবিধা দেখিয়াছিলেন। পূর্বেই দেখাইয়াছি, লৌহশিল্পস্থষ্টির পক্ষে বঙ্গ-বিহারের এই কয়লা-অঞ্চল আদর্শ স্থান। প্রকৃতপক্ষে জামসেদপুরে কারখানা স্থাপন করিয়া তিনি শিল্পোন্নতির বিশেষ সুবিধা হইবে মনে করিলেন। তিনি মনে করিলেন,—

(ক) ইহার জন্ম আবশ্যক লৌহপ্রস্তরের প্রাপ্তিস্থান গুরুমহিষানি, সুলাইপেত, নোয়ামুন্দি, বাদাম পাহাড় অঞ্চল মাত্র ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

(খ) ইহার কয়লাপ্রাপ্তির স্থান—ঝরিয়া অঞ্চল। ইহা মাত্র ১১২ মাইল দূরবর্তী।

(গ) ইহার জন্ম ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট ও চুনাপাথর প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান হইতে পাওয়া যায়। এইসকল দ্রব্য প্রাপ্তির স্থান নূনাধিক ১১০ মাইল অপেক্ষা দূরবর্তী নহে।

এইসকল নিকটবর্তী স্থান হইতে শিল্প-উপাদান আনিবার খরচ কম।

(ঘ) ইহার মাত্র ১৫২ মাইল দূরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। সুতরাং রপ্তানির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। তদুপরি কলিকাতার চতুর্দিকেও একটি লৌহের বাজার আছে।

তাহাতে লৌহদ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে এবং অতিরিক্ত লৌহ কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি করারও বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ঙ) বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অবস্থিত। সুতরাং কারখানার জন্য শিল্প-উপাদান আনিবার ও কারখানা হইতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য দেশের অন্যত্র ও বিদেশে রপ্তানির জন্য বিশাখাপত্তন বন্দরে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

(চ) নিকটবর্তী সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থান হইতে সুলভে বিস্তর শ্রমিক পাওয়া যাইবে।

(ছ) শিল্পকারখানার জন্য নিকটবর্তী খরখৈ ও সুবর্ণরেখা নদী হইতে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে।

হীরাপুর ও টাটানগর এই দুই স্থানের কোম্পানিরই নিজ-নিজ লৌহ, কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির খনি আছে।

এক্ষণে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য লৌহ-কারখানা আছে,—উহা মহীশূরের অন্তর্গত **ভদ্রাবতী লৌহ-কারখানা**। ইহার জন্য—

(১) লৌহ পাওয়া যায় বাবাবুদান পাহাড়স্থিত কেম্মানগুণ্ডি খনি হইতে। ইহা মাত্র ২৫ মা. দূরে অবস্থিত।

(২) কোক-কয়লার পরিবর্তে নিকটবর্তী বন হইতে কাঠকয়লা এবং জগ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। কারণ, এ-অঞ্চলে কোক কয়লার অভাব।

(৩) চুনাপাথর মাত্র ১৪ মা. দূরবর্তী ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে পাওয়া যায়।

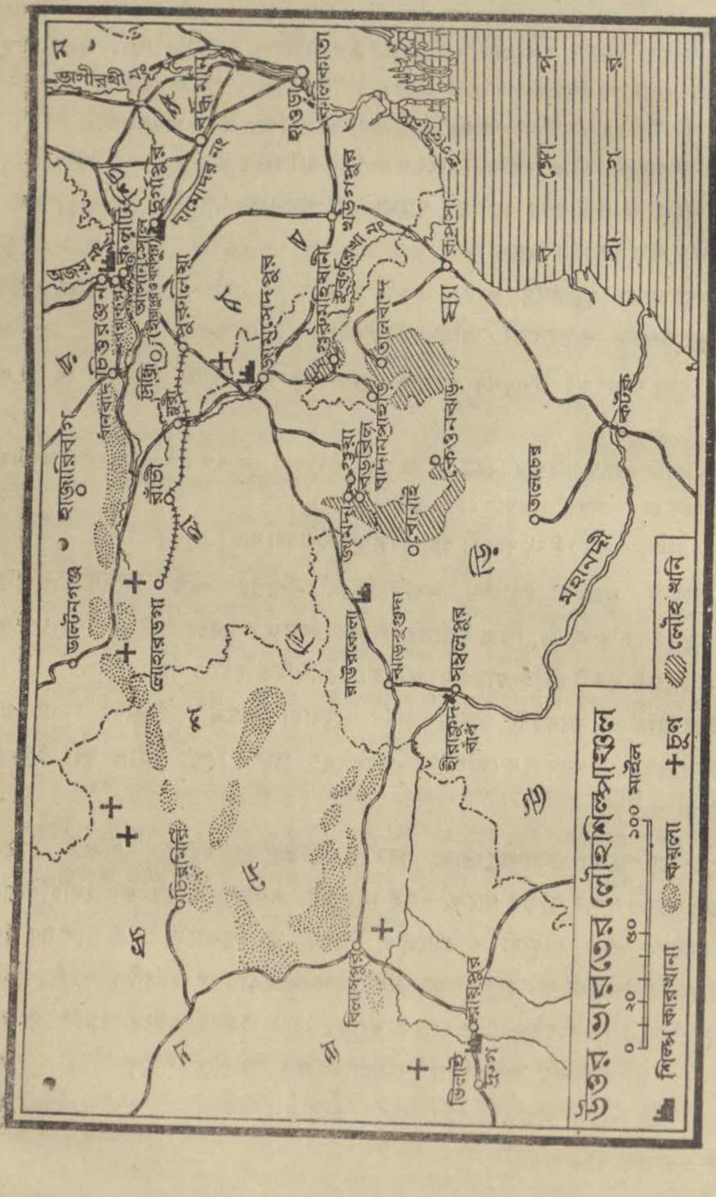
এইসকল কারণে ইহারও অবস্থিতি লৌহ-শিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মান্দ্রাজে লৌহ আছে, কিন্তু ইন্ধনের অভাব আছে। তবে এই জলবিদ্যুৎশক্তির যুগে মান্দ্রাজেও একটি লৌহ-কারখানা অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ইহা ব্যতীত কয়েকটি ছোট-ছোট কারখানা আছে। উহাদের সংখ্যা প্রায় ১৩২টি হইবে। এক্ষণে যে-লৌহদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা সম্পূর্ণ হইলে মূল্য হয় ৭৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

লৌহশিল্পে ভারতের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। বিপদের সঙ্গেও সম্পদ্ জড়িত থাকে,—দুই মহাযুদ্ধই অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্পেরও উন্নতিবিধানে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে, এই শিল্পের শিশু অবস্থায়, ইহার উন্নয়ন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করেন, এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ২৩ বৎসর যাবৎ এই শিল্প সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই শিল্পের উন্নতিসাধনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সেজন্য ইহার উন্নতিও দ্রুত হইয়াছিল।

ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র—উপরে বর্ণিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে, এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য তিনটি প্রধান কেন্দ্র



১৪৩ নং চিত্র।

আছে,—১। পশ্চিমবঙ্গে হীরাপুর, কুলটি ও বার্ণপুরে **ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি**, ২। বিহারে জামসেদপুরে **টাটা কোম্পানি** ও ৩। মহীশূরের অন্তর্গত ভদ্রাবতী নামক স্থানে **মহীশূর আয়রন এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস অব ভদ্রাবতী**।

এই কারখানা তিনটির বৎসরে ২২ লক্ষ ২১ হাজার টন কাঁচা লৌহ (pig iron) ও ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন পাকা ইস্পাত (finished steel) প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে।

এতদ্ব্যতীত জার্মানীর ক্রুপ-ডেমাগ কোম্পানির সহযোগে ভারত সরকার উত্তর ভারতে উড়িষ্যার **রাউরকেলায়** হিন্দুস্থান ষ্টীল কোং লিঃ নামে একটি ইস্পাত নির্মাণের কারখানা খুলিয়াছেন। ১৯৫৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এই কারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মধ্যপ্রদেশে **ভিলাই** নামক স্থানে একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভিলাই-মিলের কাজ ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। রাউরকেলা মিলের জন্য লৌহ আসিবে ৫০ মা. দূরবর্তী বারসুয়া খনি হইতে;—কয়লা আসিবে কারগলি ও বোকারো খনি হইতে;—চূনাপাথর আসিবে বীরমিত্রপুর-হাতিবাড়ী অঞ্চল হইতে;—এবং অফুরন্ত জল পাওয়া যাইবে শঙ্খনদীর মন্দিরা-বাঁধের জল হইতে। মিল চালাইবার শক্তির জন্য মিল-অঞ্চলের মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি প্রজনন করা হইতেছে, এবং হীরাকুণ্ড বিদ্যুৎ-প্রজনন স্থান হইতেও ইহা পাওয়া যাইবে।

ভিলাই-এর লৌহমিলের কয়লা পাওয়া যায় ৬০ মাইল দূরবর্তী রাজহারা খনি হইতে,—কয়লা আসে কারগলি-বোকারো, বরিয়া ও কোর্বা নামক নূতন খনি হইতে,—চূণাপাথর আসে ১২ মাইল দূরবর্তী নন্দিনী-অঞ্চল হইতে; মিল চালাইবার শক্তির জন্য মিল-অঞ্চলেই তাপিক শক্তি (thermal power) উৎপন্ন করা হইতেছে, এবং কোর্বা হইতেও তাপিক শক্তি পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরেও একটি লৌহ-ইস্পাত মিল গঠিত হইতেছে। **দুর্গাপুরের লৌহ** পাওয়া যাইবে উড়িষ্যার বোলানি খনি হইতে;—কয়লা পাওয়া যাইবে ঝরিয়া ও বরাকর হইতে;—চূনাপাথর পাওয়া যাইবে বীরমিত্রপুর-হাতিবাড়ী অঞ্চল হইতে;—জল পাওয়া যাইবে দামোদর হইতে;—এবং মিল চালাইবার শক্তি আসিবে দামোদর উপত্যকার তাপিক বিদ্যুৎ প্রজনন কেন্দ্র হইতে। পশ্চিম জার্মানির ক্রুপ ও ডেমাগ (Krupp and Demag) কোম্পানিদ্বয়ের সাহায্যে রাউরকেলার মিল, সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভিলাই-এর মিল এবং কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানির সাহায্যে দুর্গাপুর লৌহশিল্প গঠিত হইতেছে।

এই কয়টি লৌহমিল সম্পূর্ণ হইলে ভবিষ্যতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ লক্ষ টন লৌহ প্রতি বৎসরে উৎপন্ন হইবে। ১০ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড হইতে ৭'৫ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের লৌহ-উৎপাদন এইরূপ।—

ইস্পাত ও লৌহমিল	উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত (লক্ষ মে. টন)*	
	১৯৫৮	১৯৫৯
১। টাটা আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস	৪'৭৭	৭'০৯
২। ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস (পশ্চিমবঙ্গ)	৩ ০৪	৩'৮৪
৩। মহীশূর আয়রন ও ষ্টিল ওয়ার্কস	০'৩৬	০'৩৪
৪। অন্যান্য রেজেষ্ট্রীকৃত, কিংবা অ-রেজেষ্ট্রীকৃত গৌণ উৎপাদক কারখানা	৫'০৩	৬'৬৯
মোট	১৩'২০	১৭'৯৬

* Indian Minerals Yearbook 1959.

লৌহ-উৎপাদন।—নিম্নের হিসাব দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ভারতের লৌহ-উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে :—

লৌহ	১৯৫৮ (হাজার টন)	১৯৫৯ (হাজার টন)	১৯৬০ (হাজার টন)	১৯৬১ (হাজার টন)
কাঁচা লৌহ (Pig Iron)	২০০৩	২৯৫৮	৪১৫০	৪৯৬৫
ইস্পাত (পিণ্ড ও ঢালাই) (Ingots and Casting)	১৮১৩	২৪৪৪	৩২৪১	৪০৭২
অসমাপ্ত ইস্পাত (Semi-finished Steel)	১৬০০	২২২০	৩৪২৫	১২০১
পাকা ইস্পাত (Finished Steel)	১৩০০	১৭৩৬	২২০৮	২৮৫২

এক্ষণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—ভারী ও পাতলা কড়ি প্রভৃতি গঠন কার্যের লৌহদ্রব্য, ভারী রেলের পাটি ও পাটিসংক্রান্ত দ্রব্য, টিন প্লেট, লোহার তার, ছড় (bar),

লাঠি (rod), চাকা, স্প্রিং প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এদেশে পাকা সম্পূর্ণ (finished) ইস্পাতের প্রয়োজন বৎসরে ২৪'৪ লক্ষ টন। কিন্তু এদেশে প্রয়োজনের প্রায় অর্ধেক অংশ মাত্র আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। অবশিষ্ট আমদানি করিতে হয়।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত লৌহদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি এইরূপ—

লৌহ ও ইস্পাতের আমদানি ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৯

দ্রব্য	১৯৫৭		১৯৫৮		১৯৫৯	
	পরিমাণ স.মে. টন	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ স.মে. টন	মূল্য (লক্ষ টাকা)	পরিমাণ স.মে টন	মূল্য (লক্ষ টাকা)
পিগ্‌লৌহ ও স্পঞ্জ লৌহ	১১৫	৫১২	১০২	৪৭৪	৬৯	৩২৭
লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য	১৭০৪	১৪২২৯	১১২৯	৯৩১৪	১০৭৬	৮১৮

১৯৫৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫৮ সালে ৫৭৫ স. মে. টন লৌহদ্রব্য কম আমদানি হয় এবং মূল্যও ৪৯১৫ লক্ষ টাকা কম লাগে। পিগ্ আয়রন ইত্যাদিও ১৩ স. মে. টন কম আমদানি করা হয়।

রপ্তানি ১৯৫৭ ও ১৯৫৮*

১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২২ লক্ষ ৫১ হা. ২৯১ মে. টন (মূল্য ১১ কো. ৭৬ ল. টাকা), ১৯৫৮ সালে ১৮ লক্ষ ৯৬ হা ২০৩ মে. টন (মূল্য ৯ কো. ৯৯ ল. টাকা) ও ১৯৫৯ সালে ২৫ লক্ষ ১০ হ. ৯৯৭ মে. টন (মূল্য) ১২ কো. ৯৩ লক্ষ টাকা লৌহ প্রস্তর রপ্তানি করা হইয়াছিল। জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া ও পোলণ্ড ইহার প্রধান খরিদ্দার। ১৯৫৮ সালে ভারতের সহিত জাপানের বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, ভারত প্রতি বৎসর জাপানকে ১৬ লক্ষ টন লৌহ প্রস্তর সরবরাহ করিবে। অন্য খরিদ্দার জার্মানি, রুমানিয়া, হলণ্ড প্রভৃতি।

লৌহ প্রস্তর রপ্তানির বন্দর—কলিকাতা (১৯৫৯ সালে ২৪'৮), মাদ্রাজ (১৮'২%), বোম্বাই (৮'৯%), রেডি (১০'৫%), মসলিপত্তন (২৪'৮%), কাকিনাদ (৪'১%), কারওয়ার (৩'৯%), কান্দলা (৫'৩), বিশাখাপত্তন (৫'৪%) কোচিন (১'১%), কাড্ডালোর (৮'২%), বেলেকেরি (১'২%), মাঙ্গালোর (৪'৮%) ইত্যাদি।

* *Statistics of Foreign Trade of India.*

লক্ষ্য করিতে হইবে ভারতের পূর্ব উপকূলের বন্দর হইতেই বেশী রপ্তানি হয়। কারণ, যে-সকল স্থানে লৌহ প্রস্তর প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়, সে-সকল স্থান হইতে পূর্বদিকের বন্দরগুলি নিকটবর্তী। নূতন বন্দর পরাদিপ হইতে উড়িষ্যার প্রস্তর রপ্তানি হয়। ভদনগর ও কাণ্ডলা হইতে রাজস্থানের প্রস্তর রপ্তানি হয়।

লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য **আমদানি** হয় প্রধানতঃ জাপান, যুক্তরাজ্য, সো. রুশিয়া, বেলজিয়ম, প. জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি ২২৮৩ পিস্ ও স্পঞ্জ লৌহ ক্যানাডা, সো. রুশিয়া, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি হইতে।

১৯৫৮ খৃঃ অব্দে ক্যানাডা ভিন্ন অন্য সকল দেশ হইতে লৌহ ও ইস্পাত কম আসিয়াছিল। আ. যুক্তরাষ্ট্র হইতে খুবই কম,—১৯৫৭ সালে ১০ কোটি ৪৯ ল. টাকার এবং ১৯৫৮ সালে মাত্র ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার।

(খ) পুনর্গঠন লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্প

পূর্বেই বলিয়াছি, ইস্পাতযন্ত্র হইতে ছোট ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাট (billets) লইয়া অন্য-অন্য যেসকল নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাই গৌণ দ্রব্য। যেমন, টিনপ্লেট, —লৌহপাত লইয়া তাহার উপর টিন লাগাইতে হয়। দস্তামণ্ডিত লৌহদণ্ড (galvanised iron bar), রেলপাটির বল্টু (bolt and nuts), ওয়াগন, ইঞ্জিন, আড়াআড়ি পাটি (Crossing rail) ইত্যাদি। এজন্য প্রায় ১৪২টি গৌণ-লৌহশিল্প কারখানা (Re-rolling mills) আছে। ইহাদের মধ্যে ২০টি রেজেষ্ট্রিভুক্ত ও ১২২টি রেজেষ্ট্রি-বহির্ভূত (unregistered)।

লৌহ- ও ইস্পাত-শিল্পের ভবিষ্যৎ।—ভারতে ইস্পাত-শিল্পের যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে—এই দেশেই এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইহার যেরূপ বিক্রয়স্থান আছে, এবং ভারত গভর্ণমেন্ট লৌহের অভাব দূর করিবার জন্য ও ঐ শিল্পের উন্নতিকল্পে যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, যদি এদেশের কয়লা- ও লৌহ-ভাণ্ডার সুরক্ষিত থাকে,—যদি তাহার অপব্যয় না হয়,—তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লৌহদ্রব্য-উৎপাদক দেশ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। পাটশিল্প

পাটশিল্প—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প;—অর্থপ্রসূ শিল্প হিসাবে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক সময় ইহার স্থান প্রথম, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের মধ্যে পাটশিল্পের স্থান প্রধানতঃ দ্বিতীয়, ও ডলার অর্জনকারীদের ভিতর ইহার

স্থান প্রথম।—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে পৃথিবীতে রপ্তানি দ্রব্যের ১৭·৫% পাটদ্রব্য। মোটামুটি মোট রপ্তানির ১৮-১৯ শতাংশ পাট ও পাট-দ্রব্য। এদেশে কেবল পাকিস্তান হইতে ইহার আমদানি আছে, অন্য কোন দেশ হইতে ইহার আমদানি নাই,—১৯৫৯-৬০ সালে পাকিস্তান হইতে ৬·১৪ লক্ষ বেল পাট আমদানি হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে কমিয়া ইহা ৪·১০ লক্ষ বেল হয়। এদেশ হইতে সর্বত্র ইহার রপ্তানি আছে। সুতরাং ইহা এদেশে বিদেশ হইতে অর্থ লইয়া আসে। ইহা বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের একচেটিয়া সম্পদ্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, যদিও পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে পাট জন্মে (১৬১ পৃ.), উৎপাদন পরিমাণ বা বাণিজ্যদ্রব্য হিসাবে তাহা নগণ্য।

ভারতে পাট-উৎপাদন।—ভারতবর্ষে ছয়টি মাত্র স্টেটে পাট জন্মে, তন্মধ্যে প. বঙ্গদেশেই শ্রেষ্ঠ ;—১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮৯ হেক্ট এয়র পাটের জমি আছে, (১ একর = ০·৪০৪৭ হেক্ট এয়র), এবং তাহার ৪৮·৩ শতাংশ পাটের জমি পশ্চিমবঙ্গে ও ২৪·৬ শতাংশ বিহারে অবস্থিত।

পুর্বকথা।—পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া সম্পদ্ হইলেও প্রাচীনকালে পাটের কোন মূল্য ছিল না। তখন প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে-ঘরে টাকুতে পাটের মোটা সূতা কাটা হইত, এবং সেই সূতায় প্রয়োজনমত দড়ি প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থালীর কাজ করা হইত। ইহার পরে, ক্রমশঃ হাতের তাঁতে চট, এবং শস্যাদি, চিনি ও লবণ প্রভৃতি চালান দিবার থলে, এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হইল। পরে কুটির-শিল্পরূপে ইহার উন্নতি হইলে বিদেশে পাট ও পাটদ্রব্য রপ্তানি হইতে লাগিল। ১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, উ. আমেরিকা, ব্রহ্মদেশ যবদ্বীপ ও অষ্ট্রেলিয়াতে ৪১ লক্ষ টাকার পাট, চট ও থলি রপ্তানি করা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্কটলণ্ডের ডাণ্ডি সহরে পাট পাঠাইয়া পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে লাগিল ;—ভারতবর্ষেও এই পাটদ্রব্য আমদানি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রাচীন পাটশিল্প আহত হইল, কাঁচা পাটের রপ্তানি বাড়িয়া গেল।

ভারতে পাটশিল্প।—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ অক্ল্যাণ্ড বঙ্গদেশে, রিষড়া গ্রামে সর্বপ্রথম চটকল স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিশ্বম্বর সেন (Bysumber Sen) নামে জনৈক বাঙ্গালী এই কল স্থাপনে অর্থসাহায্য করিয়া ভারতে পাটশিল্পের ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৫৯ সালে বরাহনগরে প্রথম বিদ্যুৎচালিত কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরে ইউরোপীয় বণিকগণ এই লাভজনক ব্যবসায় অধিকার করিয়া হুগলী নদীর দুই পার্শ্বে চটকল স্থাপন করিয়া ডাণ্ডির ব্যবসায় নষ্ট

করিয়া দিয়াছে। ডাণ্ডিতে এখন পাটের কেবল সূক্ষ্ম সূত্রের ও বিশেষ ধরণের দ্রব্য প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কলিকাতার সন্নিকটে এখন (১৯৫৬) ১১৩টি চটের কল আছে;—১০১টি পশ্চিমবঙ্গে, ৪টি অন্ধ্রপ্রদেশে, ৩টি বিহারে, ৩টি, উত্তরপ্রদেশে, ১টি মধ্যপ্রদেশে এবং ১টি নেপালে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র ভারতের ৮৯ শতাংশ চটকল অবস্থিত। হুগলী নদীর তীরে ৫৫ মা. দীর্ঘ ও ২ মা: প্রশস্ত স্থানে এই কলগুলি অবস্থিত। টিটাগড়, জগদ্দল, বজবজ, শিবপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান চটকলের জন্য বিখ্যাত। কলিকাতার সন্নিহিত ১০১টি পাটকলের মধ্যে ৬৯টি চট ও হেসিয়ান তৈয়ারির কল, ও ৩২টি চাপ দিয়া গাঁইট বাঁধার কল।

কিন্তু এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে **হাতে-প্রস্তুত পাটদ্রব্য** একেবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও মালদহ জেলায় ধান্য ও চাউল বহনের জন্য এবং প. দিনাজপুর জেলায় তামাক চালান দেওয়ার জন্য হাতে-প্রস্তুত মোটা সূতায় পাটের বস্ত্র, এবং চট প্রস্তুত করিয়া থলে তৈয়ারী করা হয়;—এখনও স্থানে-স্থানে দড়ি, চেয়ারের চট, চটের ব্যাগ, বসিবার চট প্রভৃতি হাতে প্রস্তুত করা হয়।

এক্ষণে দুইটি বিষয় বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ;—(১) কলিকাতার সন্নিহিত হুগলী নদীর দুই তীরই পাটশিল্পের কেন্দ্র হইল কেন? এবং (২) পূর্ববঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মানো সত্ত্বেও সেখানে একটিও পাটের কল ছিল না কেন?

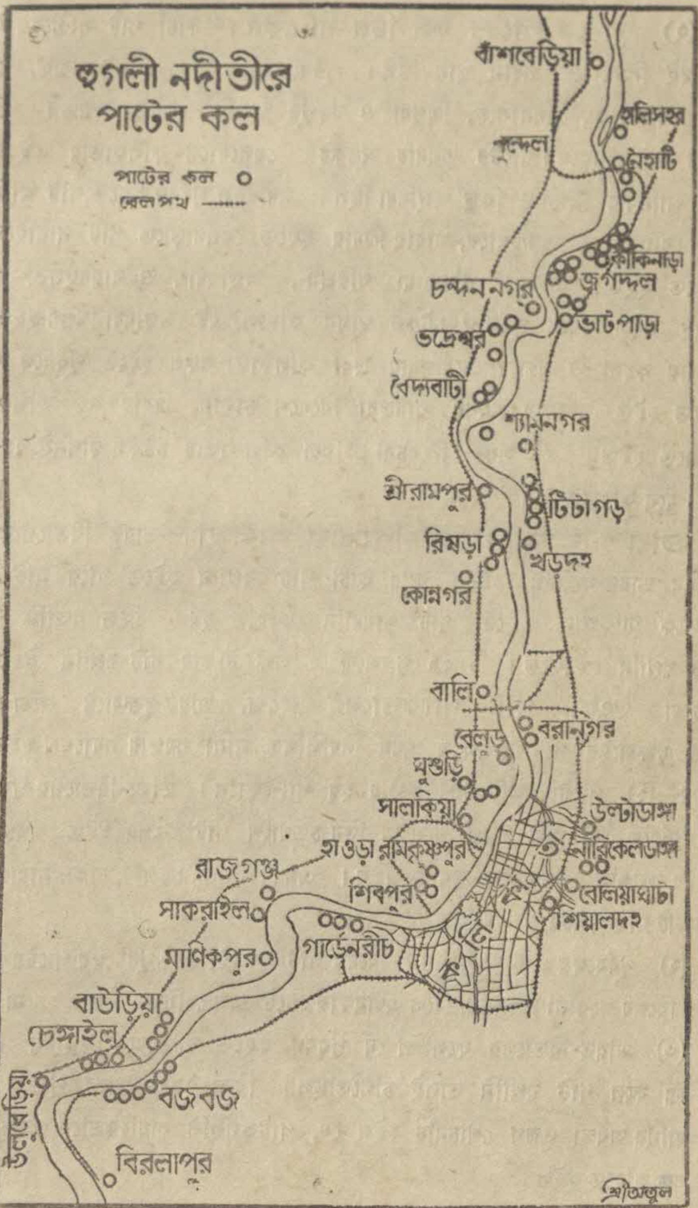
(১) পাটশিল্পে কলিকাতা-কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির কারণ।—হুগলী নদীর দুই ধারেই চটের কল এত বেশী হইয়াছে যে, কতকটা সেই কারণেই শিল্পস্থান হিসাবে ইহা জার্মানির **রাইন-অঞ্চলের সহিত তুলনীয়**। এখানে পাট-শিল্পের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ এই যে,—(১) পাটশিল্প প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকদের করতলগত। পাটশিল্পের উন্নতির প্রাক্কালে কলিকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ছিল বলিয়া তাহারা কলিকাতার সন্নিকটেই নানাপ্রকার শিল্পস্থাপন আরম্ভ করিয়াছিল।

(২) কলিকাতা বন্দর তখনই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য সেখান হইতে পাট রপ্তানি করার সুবিধা ছিল।

(৩) পাটকলের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই বঙ্গ ও বিহার,—তখনকার বঙ্গ-প্রদেশ,—হইতে পাওয়া যাইত। পূর্ববঙ্গে কয়লা নাই।

(৪) কলিকাতার ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ লওয়ার এবং ব্যাঙ্কের সহিত আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল।

(৫) শ্রমিক হিসাবেও কলিকাতা-অঞ্চলে বিশেষ সুবিধা ছিল। উত্তরভারতের শ্রমিক এখানে প্রচুর আসিয়া থাকে। একে ত শ্রমিক সুলভ ছিল, অন্যতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ শ্রীরামপুর-অঞ্চলে তাঁতশিল্পে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিক পাওয়া যাইত।


হুগলী নদীতীরে
পাটের কল
পাটের কল
রেলপথ
বাঁশবেড়িয়া
হালিসহর
পুন্দেল
নৈহাটি
কাঁকিনাড়া
জগদ্দল
চন্দননগর
ভাটপাড়া
ভদ্রেশ্বর
বৈদ্যবাটী
শ্যামনগর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
খড়দহ
কোন্নগর
বালি
বরানগর
বেলুড়
ঘুসুড়ি
সালকিয়া
উল্টাডাঙ্গা
হাওড়া
রামকৃষ্ণপুর
নারিকেলডাঙ্গা
রাজগঞ্জ
শিবপুর
বেলিয়াঘাটা
সাকরাইল
শিয়ালদহ
মানিকপুর
গার্ডেনরীচ
বাউড়িয়া
চেঙ্গাইল
উলুবেড়িয়া
বজবজ
বিরলাপুর
শ্রীঅতুল

১১৪ নং চিত্র।

এই সকল কারণে পাটের শিল্প কলিকাতা-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(২) পূর্ববঙ্গে পাটের কল ছিল না কেন?—কাঁচা পাট সংগ্রহের পক্ষে পূর্ববঙ্গই নিঃসন্দেহে প্রধান স্থান ছিল। পূর্ববঙ্গে একে ত প্রচুর পাট জন্মিত, তদুপরি উৎকৃষ্ট পাট ঢাকা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানেই জন্মিত। পশ্চিম-বঙ্গের পাট পূর্ববঙ্গের পাটের তুলনায় অপকৃষ্ট। রেলযোগে কলিকাতায় এই সকল পাট আনিবার নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা ছিল। নদীবহুল পূর্ববঙ্গ হইতে পাট আনিবার সময়ে রেলগাড়ী হইতে স্টিমারে, আবার স্টিমার হইতে রেলগাড়ীতে পাট নামাইতে ও তুলিতে হইত। এইরূপ ওঠা-নামা পরিশ্রম-, অসুবিধা-, ও ব্যয়বহুলতা-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে চটকল স্থাপন করিলে এই অসুবিধা দ্বিগুণ হইত;—একবার কয়লা ও যন্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতা-অঞ্চল হইতে পূর্ববঙ্গে লইয়া যাইতে হইত, আবার উৎপন্ন পাটদ্রব্য বিদেশে চালান দিবার জন্য কলিকাতায় আনিতে হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় চটকল স্থাপনই বণিকগণ শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন।

ভারত-বিভাগে পাট-শিল্পের অবস্থা।—ভারত বিভাগের ফলে বহুদিন ভারত-যুক্তরাষ্ট্র হইতে আর কাঁচা পাট রপ্তানি হইতে পারে নাই, বরং তাহাকে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি করিতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি কিছু-কিছু রপ্তানি হইতেছে। ১৯৫৭ খৃ.-অব্দে ৯ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তাছাড়া **উৎকৃষ্ট পাট পাকিস্তানেই জন্মে,** ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে না। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পাটশিল্প-ক্ষেত্রে এখন নিম্নলিখিত নানা সমস্যার সমাবেশ হইয়াছে। যেমন—(১) পাটের অধিকাংশ উৎপন্ন হয় পাকিস্তানে। ভারত-বিভাগের পর দেখা যায় পূর্ববঙ্গে মোটামুটি সমগ্র ভারতের তিন-চতুর্থাংশ পাট উৎপন্ন হইত অথচ সমস্ত পাটের কলগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা. নারায়ণগঞ্জে কয়েকটি মাত্র পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে।

(২) পূর্ববঙ্গের পাট উৎকৃষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের পাট অপকৃষ্ট, এবং পূর্ববঙ্গের পাটের উৎকৃষ্ট আঁশ বিশেষভাবে না মিশাইয়া দিলে এখানকার পাটে ভাল হেসিয়ান প্রস্তুত হয় না।

(৩) ভারত-বিভাগের ফলে প্রথমে পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন বাণিজ্য-চুক্তির ফলে পাট রপ্তানি ভালই চলিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে আমদানির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, পাটকলগুলি সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিতে হইল।

(৪) স্টার্লিং মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হইলে তাহার সহিত সমতা রক্ষার জন্য ভারত যখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করিল, কিন্তু পাকিস্তান করিল না,—তখন অবস্থা আরও গুরুতর

হইল। ইহাতে পাটের মূল্য বাড়িয়া গেল, পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন-মূল্যও বাড়িল। সুতরাং পাট আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

(৫) পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকালে এক নূতন সীমান্ত-ট্যাক্সের প্রবর্তন করিলেন। ইহাতেও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পাটের আমদানি-রপ্তানির বাধা ঘটিল।

(৬) পাটপ্রাপ্তির অসুবিধাহেতু পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি ৬ মাসের জন্য শতকরা ১২½টি তাঁতের কাজ বন্ধ করিয়া দিল, পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গেল।

এই সময়ে যুক্তরাজ্য পাকিস্তান ও অন্য স্থান হইতে পাট কিনিয়া পাটদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিতে থাকে।

এই গোলযোগের পরিসমাপ্তির জন্য পাকিস্তানের সহিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে সাময়িক সুবিধা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অবিভক্ত ভারতে **রপ্তানি দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ছিল কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য।** পৃথিবীর ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এক্ষণে "ডলার" সংগ্রহের প্রয়োজন অধিক। আমেরিকা পাটের সর্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। সুতরাং ডলার উপার্জনে পাটশিল্পের স্থান অতি উচ্চে। পশ্চিমবঙ্গ স্টেটেও মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে পাটের উপর। চাষী, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক এখানে সকলেরই কোন-না-কোনরূপে পাটের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য পাটশিল্পকে পরনির্ভরতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

পাটদ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি।—এদেশে পাট-দ্রব্যের উৎপাদনে কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইতেছে তাহা নিম্নের হিসাবে দেখা যাইবে :—

পাট-দ্রব্যের উৎপাদন

উৎপাদন (সহস্র মে. টন)

বৎসর	হেসিয়ান	থলি	অন্যান্য	মোট
১৯৫৭	৪২০	৫৫৮	৬৮	১০৪৬
১৯৫৮	৪১৩	৫৯১	৭৩	১০৭৭
১৯৫৯	৪৬৫	৫১২	৯৩	১১০০
১৯৬০	৪৩০	৫৫০	১০৫	১০৮৫

১৯৬২ সালে চট ও বস্তার শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল ভারতে। অবশিষ্ট ৪৩ ভাগ ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে। অন্য সকল দেশের মধ্যে পাকিস্তান দ্রুত পাটদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। ১৯৬২ সালে ভারতের বাহিরে যত দেশে পাটদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল তন্মধ্যে পাকিস্তান প্রধান। ১৯৬২ সালে ভারতের চটকলগুলিতে তাঁত ছিল ৭৩ হাজার, পাকিস্তানে ৮ হাজার ৭ শত। এই এক-নবমাংশ তাঁত লইয়া পাকিস্তান এক্ষণে ভারতের অর্ধেক পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে। যেরূপ দ্রুতবেগে তাহারা তাঁত বাড়াইতেছে তাহাতে তাহারা ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভারতের অপেক্ষা অধিক রপ্তানি করিলে তাহা বিস্ময়কর হইবে না।

আ. যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শিল্পপ্রবণ দেশে ইহা প্রেরিত হয়।

৪। কাগজ-শিল্প

হস্তে-প্রস্তুত কাগজ-শিল্প বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কলিকাতার অনতিদূরে বালী গ্রামে এক কাগজের কল স্থাপিত হয়। এই কাগজ প্রথমে ডিমাই আকারে প্রস্তুত হইত, এবং তাহার রং ছিল বাদামী। এই কাগজ এরূপ প্রচলিত ছিল যে, এখনও বাদামী রংএর ডিমাই আকারে কাগজ যেখানেই প্রস্তুত হউক না কেন, তাহাকে "বালির কাগজ" বলে। কাগজ-শিল্প অতি ধীরে-ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দেও মাত্র ১৯টি কাগজের কল সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল। ১৯৫৬ সালে ছিল ২০টি। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে—৪টি, উত্তরপ্রদেশ——২টি, বোম্বাই স্টেটে—৪টি, বিহারে—১টি, উড়িষ্যায়—১টি মাদ্রাজে—১টি, অন্ধ্রপ্রদেশে—২টি, মহীশূরে—২টি, ও কেরলে—১টি, মধ্যপ্রদেশে—১টি, পে. প. স্থ. ও পাঞ্জাবে—১টি। ১৯৫৮ সালে উইম্ কো (WIMCO) দেশলাই কোং কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র মিলে কেবল স্বচ্ছ কাগজ প্রস্তুত হয়, এবং মধ্যপ্রদেশের নেপা মিল্‌স্-এ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে খবরের কাগজের কাগজ কিছু প্রস্তুত হইতেছে।

কাগজের উপাদান।—ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তর-আমেরিকায়, বিশেষভাবে ক্যানাডায়—পাইন ও ফার

জাতীয় নরম কাঠের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এই সকল স্থান বিশেষতঃ ক্যানাডা ও ফিন্‌লণ্ড, হইতে কাগজের জন্য মণ্ড আমদানি হয়। কিন্তু এক্ষণে উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যে **সাবাই ঘাস** জন্মে তাহা হইতে এবং বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হইতেছে। **ছেঁড়া কাপড়, কাগজের টুকরা,** শণ, শণের দড়ির টুকরা, পাট ও পাটদ্রব্যের টুকরা, কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি হইতেও নিকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। হিমালয়-অঞ্চলে যে পাইনজাতীয় গাছ আছে, তাহা হইতেও মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে, এবং অল্প পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু হিমালয়-অঞ্চলের মণ্ডের উপর নির্ভর করিতে গেলে মণ্ডের উপকরণ আনিবার খরচ বেশী পড়ে। সেজন্য সেই অঞ্চলে মণ্ড প্রস্তুত করার কল স্থাপন করা বিধেয়। কিন্তু সে-অঞ্চলে কল চালাইবার কয়লা নাই। ঐসকল অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া গেলে সহজে কাগজের কল স্থাপন করা যাইবে। ডালমিয়া নগরে একটি যে নূতন কল স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে **আকের ছিবড়া** হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এইরূপ কলে খড় হইতেও কাগজ প্রস্তুত হয়।

উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব-পাঞ্জাব ও হিমাচল-প্রদেশে যেরূপ ফার গাছ প্রচুর পাওয়া যায়, তাহাতে এদেশে খবরের কাগজের উপাদানের অভাব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে, এদেশে কাগজের উপাদান প্রচুর আছে। কাগজের উপাদানের আমদানি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। এখন আবশ্যকীয় উপাদানের ১০ শতাংশও আমদানি হয় না।

ভারতে প্রস্তুত কাগজের প্রকারভেদ।—এক্ষণে ভারতে সবরকম কাগজ প্রস্তুত হয় না। লেখার ও ছাপার কাগজ, এবং মোড়কের কাগজ (wrapping paper), শক্ত মলাটের কাগজ (paper board), ও শক্ত প্যাকিংএর কাগজ (kraft paper) প্রধানতঃ প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া খতপত্রের কাগজ (bond paper), খতিয়ানের কাগজ (ledger paper), দেওয়ালে বিজ্ঞাপনের কাগজ (poster paper) প্রভৃতিও কিছু কিছু হয়। সিগারেটের কাগজ (cigarette paper) ও হাওয়া কাগজ (tissue paper) এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি নেপা কাগজের মিল হইতে খবরের কাগজের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৪০০ টন খবর ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু নোট ছাপিবার কাগজ (currency note paper), তৈলাক্ত দ্রব্য মোড়কের কাগজ (grease proof paper), চর্মপত্র (parchment paper) ও অন্য কয়েক প্রকারের বিশেষ শ্রেণীর কাগজ আমদানি করিতে হয়।

উৎপাদন।—বর্তমান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের উৎপাদন নিম্নলিখিতরূপ—

কাগজের উৎপাদন

সাল	আবরণের কাগজ স. মে. ট.	বিশেষ কাগজ স. মে. ট.	উৎপন্ন কাগজ ও কাগজের বোর্ড স. মে. ট.	ছাপিবার কাগজ স. মে ট.
১৯৫৫	২৮৯	৫	১৮৯	১২১
১৯৫৬	৩১৪	৫	১৯৬	১২৫
১৯৫৭	৩৮৬	৭	২১৩	১২৯
১৯৫৮	৪০৭	৬	২৫৭	১৫৭
১৯৫৯	৫৬৫	৫	২৯৮	১৮০
১৯৬০	৬৪৯	৮	৩৪৫	২১৬

উপরের হিসাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে কাগজ-শিল্পে এদেশ দ্রুত উন্নতি করিতেছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের কাগজের মোট চাহিদা (requirements) ৩½ লক্ষ টন। সুতরাং এখনও কাগজের অভাব আছে। তবে অন্যান্য শিল্পের মতই দুইটি মহাযুদ্ধ কাগজ-শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যে কাগজ উৎপাদন।—ভারতে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, বিহারে ১টি, উড়িষ্যায় ২টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, পাঞ্জাবে ২টি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ৬টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ২টি, মহীশূরে ২টি, ও কেরলে ১টি কাগজের কল আছে। দারভাঙ্গা, সমাস্তিপুর, সকরিগলিঘাট প্রভৃতি স্থানে উত্তরবঙ্গে আরও ১০টি কাগজের কল স্থাপিত হইবে। মহারাষ্ট্র রাজ্যেও আরও ২টি কল স্থাপিত হইবে।

আমদানি ও রপ্তানি।—১৯৬০-৬১ সালে ভারত ১১·৭৪ কোটি টাকার কাগজ আমদানি করিয়াছিল। এক্ষণে কিছু কাগজ রপ্তানিও হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সালে ৬৩·১৪ লক্ষ টাকার কাগজ রপ্তানি হইতেছিল।

এক্ষণে এদেশে খবর ছাপিবার কাগজও প্রস্তুত হইতেছে। মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে এইরূপ কাগজের কল প্রথম স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি হইতে ইহার

কাজ চলিতেছে। ১৯৬০ সালে আরও দুইটি এইরূপ কাগজের কল বসাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

খবর ছাপিবার কাগজের উৎপাদন

বৎসর	উৎপাদন টন
১৯৫৫-৫৬	৩,৪৫৫
১৯৫৬-৫৭	১৩,৫৩৪
১৯৫৭-৫৮	১৪,১৪৫
১৯৫৮-৫৯	২১,৮৩৮
১৯৫৯-৬০	২২,৪১১
১৯৬০-৬১	২৩,৩৯৮

৫। চিনি-শিল্প

চিনি-শিল্প।—জাতীয় গুরুত্ব হিসাবে চিনি-শিল্প তুলা- ও পাট-শিল্পের পরেই ভারতের শিল্পসমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। চিনি-উৎপাদনে পৃথিবীতে কিউবার ও ব্রাজিলের পরে ইহার তৃতীয় স্থান, ইক্ষু উৎপাদনে তৃতীয় এবং পৃথিবীর ইক্ষুজাত চিনির শতকরা ৫ ভাগ ভারতে উৎপন্ন। ইহা কৃষিজাত শিল্প। সুতরাং এই শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দরিদ্র চাষী পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোক উপকৃত হয়।

বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক উপায়ে চিনি প্রস্তুত করার জন্য, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে সর্বপ্রথম চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ খৃ. হইতে এদেশে বিদেশী চিনি আমদানি আরম্ভ হয়। তাহার পূর্বে জার্মানি হইতে বীট চিনি আসিত। কিন্তু এদেশেও খেজুর ও ইক্ষুর গুড় হইতে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে খেজুর-চিনিই উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হইত। উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইত। বহু পূর্বেও যে এদেশ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানি হইত, তাহাও জানা গিয়াছে। কিন্তু এদেশেও বোধহয় বহু প্রাচীনকালে চীন ও মিশর হইতে চিনি আসিত। বোধহয় চীন হইতে চিনি ও মিশর হইতে মিশরি নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাভা প্রভৃতি দেশের আমদানি-করা চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশের চিনির কলে প্রস্তুত চিনি বিশেষ মাথা তুলিতে পারিল না। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯০৩ খ্রী. হইতে ১৯৩২-৩৩ খ্রী. পর্যন্ত ন্যূনাধিক ৩০ বৎসরে মাত্র ৫৬টি চিনির কলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমদানি চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য হইলে চিনি-শিল্পের এমন দ্রুত উন্নতি হইল যে, পৃথিবীর শিল্পোন্নতির ইতিহাসে সেরূপ উন্নতির দৃষ্টান্ত কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এক্ষণে পৃথিবীর চিনি-শিল্পে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্থান।

১৯৩২-৩৩ সালে চিনির জন্য সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য হওয়ার পর চিনির আমদানি কমিয়াছে; এবং ভারতে চিনি-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলের সংখ্যা ছিল ১১২,—১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৩। ১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল—১৬৮ সহস্র টন এবং আমদানি চিনির পরিমাণ ছিল ৫৩৬ সহস্র টন। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ছিল ২৯৮০ সহস্র টন, আমদানি নগণ্য। অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাজনৈতিক বা আবহাওয়া-সম্ভূত কারণে উৎপাদনের উত্থানপতন হইয়াছে। নিম্নে কয়েক বৎসরের কলের চিনি-সংক্রান্ত একটি হিসাব দেখানো হইল,—

চিনির উৎপাদন *

খ্রীষ্টাব্দে (নভে-অক্টো)	ফ্যাকটরি হইতে প্রাপ্ত চিনি (লক্ষ টন)
১৯৫৬-৫৭	২০·২৯
১৯৫৭-৫৮	১৯·০৮
১৯৫৮-৫৯	১৯·১৯
১৯৫৯-৬০	২৪·৪৩
১৯৬০-৬১	২৯·৮২

* *Agricultural Situation in India, Annual Number, 1962.*

সুতরাং ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ১৯৫৯-৬০ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ২২·০৬ শতাংশ বেশী।

সর্বাপেক্ষা অধিক চিনি উৎপন্ন হয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে। উপরি-উক্ত বার্ষিক

উৎপন্ন চিনির মধ্যে কোন প্রদেশে কত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিম্নের হিসাবে দেখা যাইবে—

রাজ্য	উৎপন্ন চিনি ... টন	
	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
১। উত্তরপ্রদেশ	১২২১	১৪০৪
২। মহারাষ্ট্র	৩৯২	৫১৫
৩। বিহার	৩২৫	৩৭৯
৪। অন্ধ্র	১৩৭	১৮০
৫। পাঞ্জাব	১০১	১২১
৬। মহীশূর	৮৬	১১৯
৭। মান্দ্রাজ	৮৫	১৩০
৮। মধ্যপ্রদেশ	২৮	৩৫
৯। গুজরাট	৯	২৭
১০। অন্যান্য	৩৮	৭২
	২৪২২	২৯৮২

উপরি-প্রদত্ত হিসাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা :—

(১) নভেম্বর মাসে ইক্ষু কাটা হইতে থাকে। তাই ইক্ষুর সাল নভেম্বর হইতে অক্টোবর।

(২) গুড় হইতে কলে যে-চিনি হয়, তাহা জানুয়ারিতে আরম্ভ হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে।

(৩) **চিনির প্রকার ভেদ**।—চিনি তিন প্রকারের উৎপন্ন হয়,—(ক) আক হইতে কলে প্রস্তুত চিনি। এই চিনি প্রস্তুতকালে আক টুক্‌রা করা, পেষণ করা, রস হইতে নানাপ্রকার মিশ্রিত বস্তু বা ময়লা দূর করা, গন্ধকের ধোঁয়া দিয়া বর্ণহীন করা প্রভৃতি সবই কলে হয়। চিনির রস বায়ুশূন্য পাত্রে (vacuum pan) আনিয়া তাহাতে চিনি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় চিনির উৎপাদন-শীর্ষক টেব্‌লে যে চিনির হিসাব দেওয়া হইল তাহা এই চিনি। এই চিনিই প্রধান

চিনি। রপ্তানি-কার্যে এই চিনিরই প্রধানতঃ দরকার হয়। পৃথিবীর অন্য দেশের উৎপাদনের সঙ্গে তুলনাকালে এই চিনিই ধরা হয়।

(খ) অন্য একপ্রকারের চিনি গুড় হইতে কলে প্রস্তুত হয়।

(গ) অনাবৃত পাত্রে আকের রস জাল দিয়া হরিদ্রাভ রঙের আর এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। তাহার নাম খন্দসরী বা খণ্ডেশ্বরী চিনি। প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড অঞ্চলে এই চিনি প্রস্তুত হয়। গুড়, খন্দসরী ও কলের চিনি হইতে গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৩০০ হইতে ৩৫০ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। উৎপন্ন আকের শতকরা ৩০ অংশ দিয়া সাদা দানাদার চিনি প্রস্তুত হয়। অবশিষ্ট ইক্ষুতে গুড় ও খন্দসরা চিনি হয়।

(৪) উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে চিনির উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িতেছে, মিলের সংখ্যাও বাড়িতেছে, এবং আমদানি ক্রমশঃ কমিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি চিনিসংরক্ষণ-আইন চিনি-শিল্পে যুগান্তর আনিয়াছে। সেই সংরক্ষণ-নীতি আজও চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২৫ বৎসর সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয়ে থাকিয়াও ভারতের চিনি-শিল্প স্বনির্ভর হইতে পারিল না—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত উন্নত ধরণের কলকব্জাও বসাইতে পারিল না। চিনির কল হইতে প্রয়োজনীয় চিনিও পাওয়া যাইতেছে না, চিনির মূল্যও বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না, এবং নিজশক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ভারতের চিনি-শিল্প সাহস পাইতেছে না।

জনপ্রতি চিনির ব্যবহার—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান দেশে চিনির ব্যবহার জনপ্রতি নিম্নলিখিত রূপ ছিল—

জনপ্রতি চিনির ব্যবহার

অস্ট্রেলিয়া	১২৪ পা.	জার্মানি	৫২ পা.
যুক্তরাষ্ট্র	১০৬ ,,	দঃ আফ্রিকা সম্মেলন	৯৮ ,,
আ. যুক্তরাষ্ট্র	৯৭ ,,	ব্রাজিল	৩৪ ,,
কিউবা	৮৮ ,,	জাপান	৩৩ ,,
হলণ্ড	৮৫ ,,	যবদ্বীপ (জাভা)	১১ ,,
ফ্রান্স	৫২ ,,	মরিসশ	৯০ ,,
		ভারতবর্ষ	১২ ,,

কিন্তু এদেশে গুড়ের ব্যবহার খুব বেশী। গুড় সমেত জনপ্রতি চিনির ব্যবহার ৩০ পাউণ্ড। কতক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য, কতক মানুষের আয়বৃদ্ধির জন্য এবং কতক পরিমাণে মানুষের খাদ্যরুচির পরিবর্তনের জন্য এদেশের লোকেরও চিনির ব্যবহার বাড়িয়াছে। এদেশে প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে এদেশে চিনি লাগিত ৯'৪৫ লক্ষ টন ;—১৯৫৭-৫৮ সালে ২০'৪ লক্ষ টন; ১৯৫৮-৫৯ সালে ২০'৮ লক্ষ টন, ১৯৫৯-৬০ সালে ২০'২ লক্ষ টন, এবং ১৯৬০-৬১ সালে খরচ হইয়াছিল ২০'৯ লক্ষ টন।

চিনির কল—চিনির কল ১৯৫৫-৫৬ খৃ. অব্দে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে ১৭২টি। কলগুলি নিম্নলিখিত স্টেটগুলিতে নিম্নলিখিত সংখ্যায় অবস্থিত,—

চিনির কল

১৯৫৩-৫৪	খৃ. অব্দে	১৫৭
১৯৫৪-৫৫	,,	১৬০
১৯৫৫-৫৬	,,	১৭২
১৯৬০-৬১	,,	১৭৩

প্রদেশভেদে চিনির ও চিনি-সংক্রান্ত কলের সংখ্যা (১৯৬০-৬১)

স্টেট	কলের সংখ্যা	স্টেট	কলের সংখ্যা
উত্তরপ্রদেশ	৭০	মধ্যপ্রদেশ	৫
বিহার	২৮	রাজস্থান	৩
মহারাষ্ট্র	২৮	পশ্চিমবঙ্গ	২
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩	উড়িষ্যা	১
মাদ্রাজ	৭	কেরল	১
পাঞ্জাব	৬	আসাম	১
মহীশূর	৭	মোট	১৭২

দ্রষ্টব্য।—চিনির কল ১৯৬১ সালে ছিল ১৭৪। তন্মধ্যে ২০টি ছিল যৌথ।

উপরি-**উক্ত** তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা দেখা যায় যে, উত্তরপ্রদেশ চিনি-উৎপাদনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত—বিহার। এই দুইটি পাশাপাশি-অবস্থিত স্টেট একত্রে একটি **শ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদন কেন্দ্রের** সৃষ্টি করিয়াছে।

এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ চিনি-উৎপাদন-স্থান হইবার প্রধান কারণ এই যে,—ভারতের ইক্ষুর ৬০ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে এবং ১২ শতাংশ বিহারে উৎপন্ন হয়। **ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষু-উৎপাদন-স্থান**। সুতরাং কাঁচা মাল প্রাপ্তির পক্ষে ইহাই সুবিধাজনক স্থান। বিশেষতঃ চিনির কল স্থাপনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় কাঁচা মাল প্রাপ্তির সুবিধা কারণ, মাড়াই করিবার সময় ইক্ষু যত বেশী টাট্‌কা থাকে, রসে চিনির অংশ ততই বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া, বহুদূর হইতে ইক্ষু আনিতে হইলে উৎপাদন-খরচা বেশী হয়। সেজন্য ইক্ষুক্ষেত্রের সন্নিকটেই চিনির কল স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার চিনির কল স্থাপনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থকরী শিল্পগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশে একমাত্র চিনি-শিল্পই সর্বপ্রধান ও নির্ভরযোগ্য। সেজন্য যত শীঘ্র এ-প্রদেশে চিনি-শিল্পের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা যায়, এত শীঘ্র অন্য স্টেটে সংগ্রহ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ইক্ষুর রসে চিনির অংশ বেশী।

এই সকল কারণে এই অঞ্চল **সর্বশ্রেষ্ঠ চিনি-অঞ্চল**। ভারতের উৎপন্ন চিনির মোটামুটি ৮৬'৪ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে ও ১৬'২ শতাংশ বিহারে উৎপন্ন (১৯৫৮-৫৯) হয়।

পশ্চিমবঙ্গে—চিনির কল বেশী নাই। ইহার প্রধান কারণ—(১) এখানে **ইক্ষু কম জন্মে**। এখানকার জলবায়ু ও মাটি হিসাবে এখানে ইক্ষুর চাষ অধিকতর ব্যাপক হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হওয়ার কারণ ১৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে চিনি বেশী না হওয়ার অন্য কারণ এই যে, (২) পাট এখানে প্রধান অর্থপ্রসূ শিল্প,—সেজন্য মূলধন, জমি ও উৎসাহ—সমস্তই পাট-শিল্পে নিয়োজিত হয়। ইহার তৃতীয় কারণ এই যে, (৩) পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ কম। চতুর্থ কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—(৪) ইক্ষুক্ষেত্র এখানে এক অঞ্চলে অধিক পরিমাণে নাই,—ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে দূরে-দূরে অবস্থিত এবং ইক্ষুও সর্বত্র এক জাতীয় নহে। এরূপ স্থলে চিনির কল স্থাপনের অসুবিধা আছে। এইরূপ নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গে চিনি-শিল্প পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই।

চিনির রপ্তানি।—চিনির রপ্তানি অতি অল্পই হয়। যেমন,—

খৃঃ অব্দ	পরিমাণ (টন)
১৯৪৮-৪৯	২৫,৫৯০
১৯৪৯-৫০	৭,১৯৫
১৯৫০-৫১	২,৫০০

খৃঃ অব্দ	পরিমাণ (টন)
১৯৫১-৫২	৯,৬৬০
১৯৫২-৫৩	১১,৭১৫
১৯৫৩-৫৪	"
১৯৫৬-৫৭	১'৪০ লক্ষ
১৯৫৭-৫৮	৪১ হাজার
১৯৬০-৬১	২'৫০ লক্ষ
১৯৬২	৫০ হাজার টন

১৯৫১-৫২ খৃঃ অব্দে মূল্য পাওয়া গিয়াছিল—৮৯ লক্ষ, ১ হাজার, ১০৬ টাকা।

১৯৫৬-৫৭ সালে মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ১১'৩৩ ক্রোর; ১৯৫৭-৫৮ সালে ২'২৮ কোটি টাকা।

৬। রাসায়নিক শিল্প
(Chemical Industries)

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য-উৎপাদনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বড়ই পশ্চাৎপদ। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইহার উন্নতিকল্পে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল. কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, এদেশে যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও তখনকার গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের স্বার্থবোধে এদেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির জন্য কখনও মনোযোগ দেন নাই। ইহাতে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে। কারণ,—(১) ইহা অনেক শিল্পের মূল বলিয়া সেই সকল শিল্প এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, (২) জমির উর্বরতাবর্ধক সার প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এবং (৩) দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহার যে প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

রাসায়নিক দ্রব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়,—(১) **গুরু পরিমাণে উৎপাদন--সাপেক্ষ অমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Heavy Chemicals), ও (২) **লঘু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ সুমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য** (Fine Chemicals)।

(১) গুরু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ অমার্জিত রাসায়নিক দ্রব্য।—এই দ্রব্য একসঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়, এবং ইহা অসংস্কৃত ও স্থূলভাবেই প্রস্তুত করা হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে খরচও বেশী পড়ে না। অন্য অত্যাবশ্যকীয় অনেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হয়,—এবং কৃষির উন্নতিকল্পে ইহার দরকার খুব বেশী। এক্ষণে **সিন্ধ্রিতে সার** প্রস্তুত করা হইতেছে। তাহার বিবরণ পরেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—সাধারণ এসিড (acid), সোডা, পটাশ প্রভৃতি দ্রব্য এবং জমির উর্বরতাবর্ধক সার প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে,—(ক) সালফিউরিক এসিড্ ও তাহার সাহায্যে প্রস্তুত-করা অন্যান্য দ্রব্য, এবং (খ) অনেক প্রকারের ক্ষার দ্রব্য (soda) ও তাহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি। এতদ্ব্যতীত, এলম্ (ফিট্‌কারী), এপ্‌সম সল্ট (Epsom salt), কপার সালফাইড (Copper Sulphide), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid), ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড (Calcium chloride) প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয় আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল প্রভৃতি স্থানে। ইহার কারখানার সংখ্যা ৫০টি।

(২) লঘু পরিমাণে উৎপাদন-সাপেক্ষ সুমার্জিত দ্রব্যাদি।—ঔষধাদি, ফটোগ্রাফ কার্যের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, রং, বার্ণিশ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দ্রব্যাদি যত্নসহকারে ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা পরিমাণে অল্প করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এসিটিক এসিড, এল্‌কোহল, কার্বন-ডাই-সালফাইড, গ্লিসিরিণ, বেন্‌জিন, ক্রিয়োজোট তৈল, ন্যাপথালিন, ফেনল প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (Organic Chemicals), এবং ক্যাফিন, এমিটিন, মরফিন, কুইনাইন, স্যানটোনিন, স্ট্রিকনিন, মেফাক্রিন, ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়ম, গ্লুকোনেট প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত ঔষধ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়। এক্ষণে মহারাষ্ট্র (পুণা) প্রদেশে ১৯৫৫ সালে একটি পেনিসিলিন প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে গুজরাটে প্রতি বৎসর ৩৬ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষ মেগা ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত হইবার আশা আছে। তাছাড়া D.D.T., ক্লোরোমাইসেটিন, বিস্‌মথ সল্ট, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষে কুইনাইন তৈয়ার হয়—দার্জিলিং অঞ্চলে ৪,৫০০ ফিট্ উঁচু রংবি উপত্যকায়। রংবির এই চাষ মংপুতে বিস্তৃত হইয়াছে। অন্য উৎপাদন স্থান—নীলগিরি। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গড়ে লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ভারতের উৎপাদন পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৪ ভাগ মাত্র,—জাভায় হয় ৯০ ভাগ। ভারতবর্ষের নিজের জন্য যে-কুইনাইনের দরকার, তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট কুইনাইনের জন্য যবদ্বীপের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। এক্ষণে কুইনাইন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। এদেশে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

এক্ষণে ভারতে প্রায় ২৮টি রঞ্জন-দ্রব্যের কারখানা আছে।

কলিকাতা, বোম্বাই, মহীশূর ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুনায় একটি বৃহৎ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের বার্ষিক উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া যাইতেছে,—

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন
(সহস্র মে. টন)

রাসায়নিক শিল্পদ্রব্য	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
সালফিউরিক এসিড	২০০	২৩০	২৯৭	৩৬০
কষ্টিক সোডা	৪৩	৫৮	৬৯	৯৯
ক্লোরিন লিকুইড	১৫	২০	২৪	৩১
ব্লিচিং পাউডার	৫৪	৬৬	৫২	৫৯
বাইক্রোমেট্স্	৩৭	৩৫	৪৪	৫৫
সোডা এস	৯৩	৯১	৯৫	১৪৫
এমোনিয়া সলফেট	৩৮৬	৩৯০	৩৮৫	৩৮৮
গ্লিসারিণ	২	৩	৪	৫
রং ও বার্নিশ	৪৩	৪৯	৫৫	৫১

রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা—নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্য এদেশে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে এদেশের অভাব দূরীভূত হইয়াও—Potassium Bromide, Potassium Bichromate, Calcium Chloride, Magnesium Chloride প্রভৃতি কিছু রপ্তানি হয়।

নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্য, যাহা এদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের অভাব বিদূরিত হয় মাত্র।—Bleaching Powder, Nitric Acid Hydrochloric Acid, Magnesium Sulphate, Chlorine (liquid) প্রভৃতি।

Caustic Soda, সাবান, বয়নশিল্প, কৃত্রিম রেশম, বনস্পতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতে প্রথম রাসায়নিক সারের কারখানা।—১৯৪৪ সালে তদানীন্তন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সিন্ধ্রি নামক স্থানে এমোনিয়া সালফেট প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করেন। এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুর (কেরল) রাজ্যে অলয়ে নামক স্থানে এই রাসায়নিক সার—এমোনিয়া সালফেট প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হয়, এবং সেখানে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার টন এই সার প্রস্তুত

হইতে থাকে। ইহাই ভারতের রাসায়নিক সারের প্রথম কারখানা। সেখানে এমোনিয়া সালফেট সার প্রস্তুত করিতে যে-জিপসাম দরকার হয়, মান্দ্রাজের তিরুচিরাপল্লী-অঞ্চল হইতেই তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ৮টি সার উৎপাদনের কারখানা আছে ও তাহা হইতে ৪২৫,৯০০ টন এমোনিয়া সালফেট বৎসরে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এদেশে বৎসরে ১২০ লক্ষ টন এমোনিয়া সালফেটের প্রয়োজন আছে। ১৯৫৬ সালে ৮৮৯,০১৭ টন এমোনিয়া-সালফেট সার উৎপন্ন হইয়াছে।



১-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ২-কুর্গ, ৩-মহীশূর, ৪-মান্দ্রাজ, ৫-হায়দরাবাদ, ৬-বোম্বাই, ৭-সৌরাষ্ট্র, ৮-কচ্ছ, ৯-আজমীর, ১০-রাজস্থান, ১১ পেপসু, ১২-পাঞ্জাব, ১৩-হিমাচল প্রদেশ, ১৪-কাশ্মীর-ও জম্মু, ১৫-দিল্লী, ১৬-উত্তর প্রদেশ, ১৭ বিন্ধ্য প্রদেশ, ১৮-মধ্য ভারত, ১৯-ভূপাল, ২০-মধ্য প্রদেশ, ২১-উড়িষ্যা, ২২-বিহার, ২৩-পশ্চিম বঙ্গ, ২৪-আসাম, ২৫-ত্রিপুরা, ২৬-মণিপুর, ২৭-সিকিম, ২৮-ভূটান, ২৯-পূর্ববঙ্গ, ৩০-পশ্চিম পাঞ্জাব, ৩১-উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, ৩২-বেলুচিস্তান, ৩৩-সিন্ধু প্রদেশ।

১৪৫ নং চিত্র।

সিন্দ্রি।—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর হইতে এখানে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভারতের রাসায়নিক সারের **দ্বিতীয় বড় কারখানা** এবং **এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানা।** প্রথমে ইহা দৈনিক ৩০০ টন সার উৎপাদন করিতে আরম্ভ

করে। কিন্তু এই কারখানায় প্রতিদিন ১০০০ হাজার টন সার উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। ১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে গড়ে প্রতিদিন ১০৬১ টন এমোনিয়া সালফেট সিন্ধ্রিতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক দৈনিক উৎপাদন। ইহার পরে ১৯৫৯ মার্চ মাসে ইহা অপেক্ষা দৈনিক উৎপাদন অধিক হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এই কারখানা হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন এমোনিয়া সালফেট সার উৎপাদন করা হইয়াছে।

উৎপন্ন সারের প্রচুরতা।—সাধারণতঃ এক একর জমিতে সার দিতে ২½ হন্দর এমোনিয়া সালফেট লাগে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, দৈনিক সহস্র টন এমোনিয়া সালফেট উৎপন্ন হইলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের আবশ্যকীয় সারের এক-সপ্তমাংশ মাত্র সার পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে-অধিক খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহার দ্বারা দেশের এক-চতুর্থাংশ মাত্রা খাদ্যাভাব পূর্ণ হইবে। সুতরাং এ-দেশে সার-কারখানার আরও প্রয়োজন আছে। দুর্গাপুর, নঙ্গল ও রাউরকেলায় সার প্রস্তুত হইবে।

রপ্তানি ও আমদানি।—ভারত এখন ঔষধ-জাতীয় অনেক দ্রব্য রপ্তানি করে। ১৯৫৭ সালে, ১.০১ ক্রোর, ১৯৫৮ সালে ৪৪.৯৫ লক্ষ, ১৯৫৯ সালে ৮২.৮৪ লক্ষ, এবং ১৯৬০-৬১ সালে ৯৮.৭২ লক্ষ টাকার ঔষধাদি রপ্তানি করিয়াছিল। পাকিস্তান, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ইহার খরিদ্দার। **আমদানি**— ১৯৫৮ সালে ১০.২১ কোটি, ১৯৫৯ সালে ৮.৮৩ কোটি ও ১৯৬০-৬১ সালে ১০.৪১ কোটি।

৭। পূর্তশিল্প (Engineering Industry)

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের পর হইতে এদেশে পূর্তশিল্পের আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯৫৫ খৃ. অব্দ হইতে এই শিল্প ব্যবসায় পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই ভারত কোন-কোন পূর্তশিল্প-দ্রব্য সম্পর্কে স্বাধীন হইয়াছে ;—এক্ষণে বৈদ্যুতিক মোটর, মোটর গাড়ীর ব্যাটারি (Batteries), বৈদ্যুতিক পাখা, জলের নল, ধাতু-দ্রব্যনির্মিত পাতলা চাদর ও চাদর-নির্মিত নানা গার্হস্থ্য দ্রব্য প্রভৃতি এদেশেই প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯৫৪ খৃ. অব্দের হিসাব মত এদেশে ৯২ রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্পও তাহার উন্নতির জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিকট ঋণী।

পূর্তশিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কীয়, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, প্রভৃতি নানা দ্রব্যের এদেশে দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। তাছাড়া, নিত্য ব্যবহার্য এবং অন্য শিল্পের

পক্ষে প্রয়োজনীয় নানাদ্রব্য এক্ষণে প্রস্তুত করা হইতেছে। এক্ষণে এদেশে টিনের (Tinplate industry), ইস্পাত ঢালাই (Steel casting), তার (Wires and wire nail industry), স্ক্রু (Screw industry), বল্টু, ও বল্টু আটকাইবার খাঁজ-কাটা ধাতুখণ্ড বা চিবরী এবং রিপিট প্রেক বা জিনারী (Bolts, Nuts and Rivets). বিস্তারীকৃত-ধাতুদ্রব্য (Expanded metal), কৃষিযন্ত্র, গৃহনির্মাণদ্রব্য, বৃহৎযন্ত্রের অংশ, ছোট-ছোট যন্ত্রের অংশ, বয়নশিল্প ও চিনি-শিল্পের যন্ত্রাদি, বনস্পতি ঘি প্রস্তুত করার যন্ত্র, লঘু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার যন্ত্রাদি, কাগজকলের যন্ত্রাদি, ডিজেল ইঞ্জিন (Diesel Engine), রাস্তা করার যন্ত্রাদি, বিদ্যুৎ পাখা, বিদ্যুৎ-বাতি, বিদ্যুৎ মোটর, প্রবাহ পরিবর্তন অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিম্ন বিদ্যুৎ প্রবাহে, কিংবা নিম্ন বিদ্যুৎ প্রবাহকে উচ্চ বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিবর্তনের যন্ত্র (Power and Distribution Transformers), বিদ্যুৎ প্রবাহের তার, শুষ্ক ব্যাটারি, বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্র (meter), জাহাজ নির্মাণ, ব্যোমযান নির্মাণ, ইঞ্জিন নির্মাণ, মোটরগাড়ী নির্মাণ, বাইসাইকেল নির্মাণ, পেষণ যন্ত্র, হেরিক্যান লণ্ঠন, সেলাইয়ের কল, চর্মপট্টি (Belting industry), চক্রদণ্ড ও তৎসংলগ্ন দণ্ডাংশের ঘর্ষণ কমাইবার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ধাতব গোলক (Ball-bearing), বিদ্যুৎ রোধক (Insulator), রেডিও যন্ত্র, ছাতার শিক (umbrella ribs), নানাপ্রকার নল প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে সর্বস্তরের দ্রব্যাদিই এখানে প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পূর্তশিল্পের শৈশব হইলেও প্রশংসার্হ উদ্যোগ।

প্রধানতঃ কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, অমৃতসর, জামসেদপুর, বার্ণপুর, মুরাদনগর, পুণা, ভদ্রাবতী, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানেই এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা **চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস** গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ৬ই জানুয়ারি ইহার প্রথম শত, ১৯৫৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় শত, ১৯৫৫ সালের ২০শে নবেম্বর ইহার তৃতীয় শত, ১৯৫৬ সালের ১২ই আগষ্ট চতুর্থ শত এবং ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ ইহার পঞ্চম শত ইঞ্জিন বাহির হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬২৫ খানি ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে ১৬৫ খানি ইঞ্জিন বাহির হইয়াছে। **টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ ওয়ার্কস** কোং ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৮৬ খানি ইঞ্জিন করিয়াছে। মান্দ্রাজের নিকট গবর্ণমেণ্টের ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (Integral Coach Factory) নামে রেলগাড়ী তৈয়ারির কারখানা আছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫৩ খানি গাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারি এই ফ্যাক্টরি হইতে সহস্রতম রেলগাড়ী বাহির হয়। ব্যাঙ্গালোরে আকাশযান তৈয়ারি ও মেরামতের জন্য **হিন্দুস্থান এয়ার-ক্রাফ্ট** লিমিটেড স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে আরও কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ দেওয়া হইল,—

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্রব্য	পরিমাপের ইউনিট	উৎপাদন			
		১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
হেরিক্যান লণ্ঠন	সহস্র	৪৩৪৫	৩৩৮২	৪৫৬০	৫১৫১
মোটরগাড়ী	একক	১১৬০১	৭৮০৮	১১৯৯৩	১৯০৯৬
জিপগাড়ী	একক	৪০৬৯	৩৫৫০	৪৬৫৫	৫৫০১
দেশলাই	পঞ্চাশ গ্রোস ওয়ালা সহস্র বাক্স	৫৭৮	৬২৬	৫৪৯	৬৬২
ডিজেল ইঞ্জিন	সহস্র	১৬	২৬	৩০	৪২
সেলাইয়ের কল	সহস্র	১৬৭	২০৫	২৫২	২৯৬
শুষ্ক সেল (cell)	লক্ষ	১৬৬৬	১৬৮২	১৮৭৩	২০৭৫
ব্যাটারি	সহস্র	৩২৫	৩৫৬	৪৪২	৫১০
বিদ্যুৎ মোটর	সহস্র অশ্বশক্তি	৪৭০	৬২৩	৫৭৫	৬৮১
শক্তি পরিবর্তক	সহস্র K.V.A.	১২১৯	১১২৭	১০১৬	১২৪৮
বিদ্যুৎ-বাতি	লক্ষ	৩২১	২৯৪	৩৩৭	৩৯৯
বিদ্যুৎ-পাখা	সহস্র	৫২৫	৬৩৬	৭২৬	৯৯১
বাইসাইকেল	সহস্র	৭৯০	৯১২	৯৯০	১০৫০

Questions

1. What do you think of the present position of the Iron and Steel Industry in India ? What steps have been taken by the Government for increasing the Iron and Steel output of India ?

2. Examine the location of the steel plant at (1) Jamshedpur, (2) Rowrkela, (3) Durgapur.

3. Discuss the regional distribution, present position and future prospect of the Iron and Steel Industry of India. (C. U. 35, '38, '39, B.Com. '31, '37)

4. "The most important Iron and Steel Industry is located in the northern part of India."—Discuss this.

5. Describe the regional distribution, present position and the future prospect of the Sugar Industry in India. (C. U. '36, '39, '47)

6. Discuss the regional distribution, present position and the future prospect of the Cotton Industry in India. (Cal. '27, '36, '39, '48)

7. Name the important places in India where Cotton Mills have been established and state reasons for selection of these places. (Cal. I.Com. '49)

8. What special advantages has Bombay Presidency for the establishment of Cotton Mills ? Do you think Bengal and Orissa are not proper places for the development of Cotton Textile Industry ? (Cal. I.Com. '49)

9. Discuss the importance of Jute Industry in the economic life of West Bengal. (Cal. I Com. '48)

10. Pakistan still grows more Jute than India. But the largest number of Jute Mills are in India. Discuss this.

11. Give an idea of the present position of the Jute Industry in India.

12. What do you mean by Chemical Industry ? What are the different classes of this Industry ? Name some of the products of each class.

13. Give an account of the Fertilizer Industry of India ?

14. Jute Industry is highly centralised in the Hooghly River Valley. Give reasons.

15. Give an idea of the present position of the Chemical and the Engineering Industry in India.

16. State briefly the present condition of the Indian Paper Industry. Name the indegenous raw materials used for manufacturing paper, and mention where they are found. (Cal. I.Com. '42)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য

বাণিজ্য।—জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণ হিসাবে একই দেশে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না,—কোন দেশে কোন উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য ঘটিলে, সেই দেশ ঐ দ্রব্যের বিনিময়ে বা অর্থের বিনিময়ে, অন্য দেশ হইতে যে-দ্রব্য সেখানে জন্মে না, অথচ তাহার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা লইয়া আসে। এইরূপ ক্রয়, বিক্রয়, এবং এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের যে-বিনিময় তাহাকে বলা হয় **বাণিজ্য**।

প্রত্যেক দেশেই বাণিজ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) **বহির্বাণিজ্য,** ও (২) **অন্তর্বাণিজ্য**। দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু অনুৎপন্ন বা অপ্রচুর, দ্রব্যের বিদেশ হইতে আনয়ন- এবং বিদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও দেশের পক্ষে অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্যের বিদেশে প্রেরণ-জনিত যে-বাণিজ্য, তাহাকে বলা হয় **বহির্বাণিজ্য**। আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রয়োজনবোধে যে-আদানপ্রদান, তাহাকে বলা হয় **অন্তর্বাণিজ্য**। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে রাজনীতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়। সেই সময় হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য, তাহার পূর্বে ইহা ছিল অন্তর্বাণিজ্য। এইরূপ পাকিস্তানের সহিত ভারতের এখনকার বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য, ভারত-বিভাগের পূর্বে ছিল অন্তর্বাণিজ্য।

বহির্বাণিজ্যের মধ্যে যে-বাণিজ্য স্থলপথে হয়, তাহাকে বলা হয় স্থলবাণিজ্য, এবং যে-বাণিজ্য জলপথে হয় তাহাকে বলে জলবাণিজ্য বা সমুদ্রবাণিজ্য। ভারত,—আফগানিস্তান, তিব্বত, ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলবাণিজ্য, এবং গ্রেট-বৃটেন, আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত জলবাণিজ্য বা আকাশবাণিজ্য করে।

ভারতের বাণিজ্যের হিসাব।—বৃটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কাঁচামাল অর্থাৎ শিল্পকার্যে আবশ্যকীয় প্রধান দ্রব্য বিদেশে, বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যে, চালান দিত, এবং বিদেশ হইতে, প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য হইতে, শিল্পদ্রব্য আমদানি করিত। সে-সময় কিন্তু বাণিজ্যে ভারতের লাভই হইত। প্রথম মহাযুদ্ধ, বিশেষ-ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিল্পোৎপাদন কমিয়া গেলে, এবং পণ্য বহনের জন্য জাহাজের অভাব হইলে, এবং যুদ্ধ-সংস্পৃষ্ট ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের আমদানি অসম্ভব হইলে, তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিল্পসৃষ্টি করিতে থাকেন। সেজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং

ভারতও ক্রমশঃ সেই সময়ে এশিয়া দেশে ও মধ্য-পূর্বে আপনার বাণিজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। তাহার পর হইতে এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতার পর হইতে দেশে নানাদিকে শিল্পোন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে এদেশকে শিল্পে উন্নতিশীল দেশ বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় গ্রেটবৃটেন ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকা ও বহু যুদ্ধোপকরণ খরচ করিয়াছিল। সেজন্যে বৃটেনের নিকট ভারতের টাকা (স্টার্লিং মুদ্রায় ১৬০০ কোটি স্টার্লিং) পাওনা হইয়াছিল। ইহাকে বলা হয় "স্টার্লিং ব্যালান্স" (Sterling Balance)। এই স্টার্লিং-পাওনা গ্রেটবৃটেন প্রায় শোধ করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ভারতের অল্পই পাওনা আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ—ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান—এই দুই বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হইলে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে নানা ওলটপালট হইতে থাকে। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ যে-সকল পাট, কার্পাস, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিত, যুদ্ধের পরে ঐ সকল দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত হইলে, বিশেষতঃ পাট, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন পাকিস্তানে বেশী হইলে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রকে ঐসকল দ্রব্য নিজেরই আমদানি করিতে হয়।

দেশ-বিভাগের পর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে আরও অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে। যেমন খাদ্যদ্রব্যের অনটন হইয়াছে। সেজন্য বিদেশ হইতে খাদ্য কিনিতে বহু টাকা ব্যয় হইতেছে। ভারতবর্ষ এখন শিল্পকার্যে নূতন ব্রতী। সুতরাং সে এখন বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। শিল্পযন্ত্রাদি অনবরত বিদেশ হইতে আনাইতে হইতেছে। সেজন্য আমদানি-অঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে এবং গ্রেটবৃটেনের নিকট স্টার্লিং-পাওনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এই স্থানে জানিয়া রাখা ভাল পৃথিবীর বাণিজ্য ক্ষেত্রে "স্টার্লিং অঞ্চল" ও "ডলার অঞ্চল" * নামে দুইটি প্রধান অঞ্চল আছে। যে-যে দেশ লইয়া স্টার্লিং-অঞ্চল, সে-অঞ্চলের দেনা ভারতের এই গ্রেটবৃটেনের নিকট যে স্টার্লিং-পাওনা আছে, তাহা হইতে দিতে হয়।

---

* আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কিউবা, হেইটি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পোর্টোরিকো, আ. যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ভার্জিন দ্বীপ, মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, কোষ্টারিকা, কলম্বিয়া, পানামা ও পানামা খাল অঞ্চল, ভেনেজুয়েলা ইকুয়েডর, বলিভিয়া, হয়াই, ফিলিপাইন ও লাইবেরিয়া দেশ—ডলার অঞ্চলভুক্ত। কিন্তু ক্যানাডা ব্যতীত কমনওয়েলথের অন্তর্গত অন্য দেশ, আয়র্লণ্ড, আইসলণ্ড, জর্ডন, মস্কট ও ওম্যান, ইরাক ও ব্রহ্মদেশ এবং অবশিষ্ট সকল দেশই স্টার্লিং-অঞ্চলভুক্ত। ডলার অঞ্চলে বিনিময়-মুদ্রা ডলার—ইহাকে দুর্মূল্য বিনিময় বা হার্ড কারেন্সি (hard currency), এবং স্টার্লিং অঞ্চলের বিনিময়কে সহজ বিনিময় (soft currency) বলে। এ-অঞ্চলে বিনিময় পাউণ্ড স্টার্লিং ধরা হয়।

ভারতবর্ষের যুদ্ধপূর্বে আর-এক রকমের বাণিজ্য ছিল, তাহার নাম ছিল "গুদাম-বাণিজ্য" (entrepot-trade)। ভারতবর্ষ ভারতমহাসাগরের মধ্যভাগে বৃহৎ দেশ। ইহা জলবাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ভারতের উত্তরে ও অন্যান্য অংশে অনেক দেশ আছে, যাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে জল-বাণিজ্য সম্ভব নহে। তাই সেখানকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে আসিত ও সেখান হইতে নির্দিষ্ট দেশে পুনঃ রপ্তানি করা হইত। ভারতবর্ষ ইহার জন্য একটা দালালী (middleman's profit) পাইত। ইহাতে তাহার বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লাভের অঙ্ক কিছু বাড়িত। কিন্তু ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের এই অঙ্ক এখন কমিয়া গিয়াছে এবং ইহার বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্য—ভারতের বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রত্যেক বিভাগের মোট মূল্য ঠিক দেওয়া আছে, কিন্তু উহার অন্তর্গত পণ্যদ্রব্যের প্রধান-প্রধানগুলি মাত্র উল্লিখিত হইল।

তালিকা নং ১

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি ১৯৬১-৬২ *

প্রধান-প্রধান পণ্যদ্রব্য	আমদানি (লক্ষ টাকা)	রপ্তানি (লক্ষ টাকা)
১। খাদ্য (জীবন্ত প্রাণী, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধদ্রব্য, মাছ, ধান্যাদি খাদ্য-শস্য, ফল ও তরিতরকারী, চিনি ও চিনির দ্রব্য, কফি, চা, কোকো, মরিচ, মশলা প্রভৃতি, পশুখাদ্য, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য)	১২৬৪৪	২১৪২৫
২। পানীয় দ্রব্য ও তামাক	১৫৮	১৪৯৭
৩। কাঁচামাল, অভক্ষ্য, জ্বালানি ব্যতীত (কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, কাঁচা রবার, কাঠ, কাঠের তক্তা, গুঁজি, কাষ্ঠমণ্ড, ছেঁড়া কাগজ, রেশম, পশম, পাট ও কার্পাস বয়ন-তন্তু, সারদ্রব্য, কাঁচা খনিজ দ্রব্য (কয়লা ব্যতীত) পেট্রোলিয়ম, মূল্যবান্ প্রস্তর, জন্তু ও উদ্ভিদসংক্রান্ত দ্রব্য।)	১২৯৫৩	১১৬১

* *Report of Currency and Finance 1961-62.*

প্রধান-প্রধান পণ্যদ্রব্য	আমদানি (লক্ষ টাকা)	রপ্তানি (লক্ষ টাকা)
৪। খনিজ জ্বালানি দ্রব্য, তরল পিচ্ছিলকারী দ্রব্য (lubricants)	৯৫৮৫	৫৯১
৫। জন্তুর চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল ও স্নেহপদার্থ	৮৫৩	৬৫১
৬। রাসায়নিক দ্রব্য (রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লাজাত আলকাতরা, অপরিশোধিত রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়ম, প্রাকৃতগ্যাস, রং-এর দ্রব্য, ঔষধাদি, অপরিহার্য তৈল, সুগন্ধি, সাবানাদি, পালিশ করা ও পরিষ্কার করার দ্রব্য, সারদ্রব্য বিস্ফোরক দ্রব্য।	৮৮৮০	৭৮৬
৭। শিল্পদ্রব্য (চামড়া, রবার, কাষ্ঠ, শুঁজি, কাগজ, বয়নশিল্পদ্রব্য, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য নির্মিত দ্রব্য।)	২১৩১৩	২৭১৪৫
৮। যন্ত্রপাতি ও পরিবহন-সংক্রান্ত দ্রব্য (রেলগাড়ী, জাহাজ, ব্যোমযান-সংক্রান্ত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।)	৩৪৮৯১	৩৯২
৯। নানাবিধ শিল্পদ্রব্য (বাড়ী ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক দ্রব্য, আসবাবপত্র, ভ্রমণ-সংক্রান্ত দ্রব্য, বস্ত্রাদি, পাদুকাদি, ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক দ্রব্য, ফটোগ্রাফি, চশমা, ঘড়ি, হাতঘড়ি প্রভৃতি।)	২০১৯	২৭১৪৫
১০। নানাবিধ বাণিজ্যকার্য ও পণ্যদ্রব্য পোষ্ট আফিস; জীবিত জন্তু (খাদ্যের জন্য নহে), বিশেষ দ্রব্য	৫৬৬	৪৭৬
মোট	১০৩৮৬২	৬৬১৯৯
অমীমাংসিত মূল্য	৬	৩
মোট মূল্য	১০৩৮৬৮	৬৬২০২
আমদানি দ্রব্যের পুনরায় রপ্তানি		৫১৭

বাণিজ্যে ভারতের লাভ-লোকসান।—পরপৃষ্ঠায় বাণিজ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের লাভ-লোকসানের একটি হিসাব দেওয়া গেল। পরপৃষ্ঠার হিসাবে + চিহ্ন লাভজ্ঞাপক এবং − চিহ্ন লোকসানজ্ঞাপক।

তালিকা নং ২

স্থল, জল ও আকাশপথের বাণিজ্যে কয়েক বৎসরের হিসাব লাভ-লোকসান

বাণিজ্য বৎসর	আমদানি (কোটি টাকা)	রপ্তানি (কোটি টাকা)	মোট বাণিজ্য (কোটি টাকা)	লাভ-লোকসান (কোটি টাকা)
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪'৩৫	৬০৮'৯১	১৩৮৩'২৬	—১৬৫'৪৪
১৯৫৬-৫৭	৯০২'৯১	৬১৯'৬২	১৫২২'৫৩	—২৮৩'২৯
১৯৫৭-৫৮	১০৩৬'৪০	৬৩৫'১৪	১৬৭১'৫৪	—৪০১'২৬
১৯৫৮-৫৯	৯০৩'৬৪	৫৭২'৬৪	১৪৭৬'২৮	—৩৩১'০০
১৯৫৯-৬০	৯৫৬'৩১	৬৩৯'৩৬	১৫৯৫'৬৭	—৩১৬'৯৫
১৯৬০-৬১	১০০৩'৩১	৬৪৮'৩৩	১৬৫১'৫৩	—৩৫৪'৮৫

তালিকা নং ৩

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান আমদানি-দ্রব্য ১৯৫৯-৬১

প্রধান-প্রধান আমদানি-দ্রব্য	মূল্য (কোটি টাকা) ১৯৫৯	মূল্য (কোটি টাকা) ১৯৬০	মূল্য (কোটি টাকা) ১৯৬১
১। যন্ত্রপাতি	১৪৬	১৮৪	২৩১
২। বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি	৫০	৫৫	৬৩
৩। লৌহ ও ইস্পাত	৮৪	১১৭	১০২
৪। খনিজ তৈল	৯	২২	৩২
৫। রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধাদি	৪১	৪১	৩৬
৬। চাউল	৯	২৫	১১
৭। কাঁচা তুলা	৩৫	৭৫	৬৯
৮। বয়ন সূত্র	১৫	১৪	১৩
৯। টাটকা ফল ও বাদাম	১১	১৩	২৩
১০। কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	৯	১২	১৩
১১। রং করার দ্রব্য	৭	৯	১১
১২। পাট	১	৮	৭
১৩। উল ও চুল	৯	১০	২১

তালিকা নং ৪

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান-প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ১৯৫৯-৬১

প্রধান-প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য	মূল্য কোটি টাকা) ১৯৫৯	মূল্য (কোটি টাকা) ১৯৬০	মূল্য (কোটি টাকা) ১৯৬১
১। চা	১২৬	১২০	১২৪
২। পাট ও পাট-দ্রব্য	১১৪'৮৭	১০৩'৮২	১১০'৭৫
৩। কার্পাস সূতা ও দ্রব্য	১১	১১	১৩
৪। কাঁচা ও বাজে তূলা	১৬	১২	১৯
৫। চিনি	৩	২	১৫
৬। উদ্ভিজ্জ; খনিজ ও জান্তব তৈল	৩	৫	৩
৭। ফল ও বাদাম	১৭	২০	২১
৮। তামাক	১৩	১৫	১৫
৯। অভ্র	৮'৬৭	৯'৩৪	১০'৩১
১০। পশম	১২	৯	৯
১১। আঠা, রঞ্জন ও লাক্ষা	৮'৫৯	৭'১৬	৭'৯৫
১২। মশলা	৮'৪৩	৮'৮৩	১০'১৭
১৩। চামড়া (কাঁচা)	১০	১০	৮

উপরে প্রদত্ত ৩নং ও ৪নং তালিকা হইতে দেখা যাইবে ভারতের প্রধান অর্থপ্রস্থ রপ্তানি-দ্রব্য চা, পাটদ্রব্য, বস্ত্রাদি। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের প্রায় ২২'৭ শতাংশই যন্ত্রপাতি। অন্য-অন্য দ্রব্যের তিন বৎসরের আমদানি ও রপ্তানি তুলনা করিলে দেখা যাইবে, কোন্ দ্রব্যের চাহিদা কমিতেছে ও বাড়িতেছে।

বাণিজ্যের গতি (Direction of Trade)

তালিকা নং ৫

প্রধান প্রধান বিদেশী রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলাফল ১৯৫৯

রাজ্যের নাম	রপ্তানি (কোটি টাকা)	আমদানি (কোটি টাকা)	বাণিজ্য ফল (কোটি টাকা)
কয়েকটি কমনওয়েলথ রাজ্যের সহিত বাণিজ্য			
যুক্তরাজ্য	১৬০	১৯৪	−৩৪
সিংহল	১৭	৪	*+১৩
সিঙ্গাপুর	৮	৯	−১
এডেন	৫	২	+৩
হংকং	৩	১	+২
মালয় ফেডা.	৭	১৩	−৬
পাকিস্তান (পশ্চিম)	২	৪	−২
পাকিস্তান (পূর্ব)	৭	৯	−২
বেহ্‌রিন দ্বীঃ	২	৪	−২
কুওয়েট	৪	২	−২
আফ্রিকায়—			
কেনিয়া	৫	১২	−৭
ট্যাঙ্গানাইকা	৩	২	+১
দঃ রোডেশিয়া	২	২	×
উ. আমেরিকা—			
ক্যানাডা	১৭	১৭	×
ওশিয়ানিয়া—			
অষ্ট্রেলিয়া	১৬	২৩	−৭
নিউ জিলণ্ড	৭	১	+৬
কমনওয়েলথ ব্যতীত অন্য-অন্য কয়েকটি রাজ্যের সহিত বাণিজ্য—			
আ. যুক্তরাষ্ট্র	১১৬	২৩৩	−১১৭
জাপান	৪০	৫৮	−১৮
সো. রুশিয়া	৩২	৩৫	−৩
প. জার্মানি	২০	১১৮	−৯৮
ব্রহ্মদেশ	৫	১২	−৭

* '−' চিহ্ন লোকসান-জ্ঞাপক, এবং '+' চিহ্ন লাভ-জ্ঞাপক।

রাজ্যের নাম (পূর্বানুবৃত্তি)	রপ্তানি (কোটি টাকা)	আমদানি (কোটি টাকা)	বাণিজ্য ফল (কোটি টাকা)
মিশর	১৩	১২	+১
ফ্রান্স	৮	১৬	−৮
সুডান	১০	১১	−১
নেদারলণ্ড	৮	১৩	−৫
ইতালী	৯	২৪	−১৫
বেলজিয়ম	৬	১১	−৫
সাউদি আরব	৩	১৯	−১৫
ইন্দোনেশিয়া	৭	২	+৫
ইরাণ	৫	৪৭	−৪২
চীন	৮	৫	+৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	৮	১৪	−৬
ডেনমার্ক	২	২	×
আফগানিস্তান	৫	২	+৩
ইরাক	৩	২	+১
সুইজর্লণ্ড	২	১১	−৯
সুইডেন	২	১৪	−১২
পোলণ্ড	৫	৮	−৩
সমগ্র ভারতের মোট†	৬১৬	৮৮৭	−২৭১

† এইস্থানে মাত্র প্রধান-প্রধান বিদেশী রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের পরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু মোট যোগফল ভারতের সহিত সমগ্র বিদেশী রাজ্যের আমদানি ও রপ্তানি জ্ঞাপক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

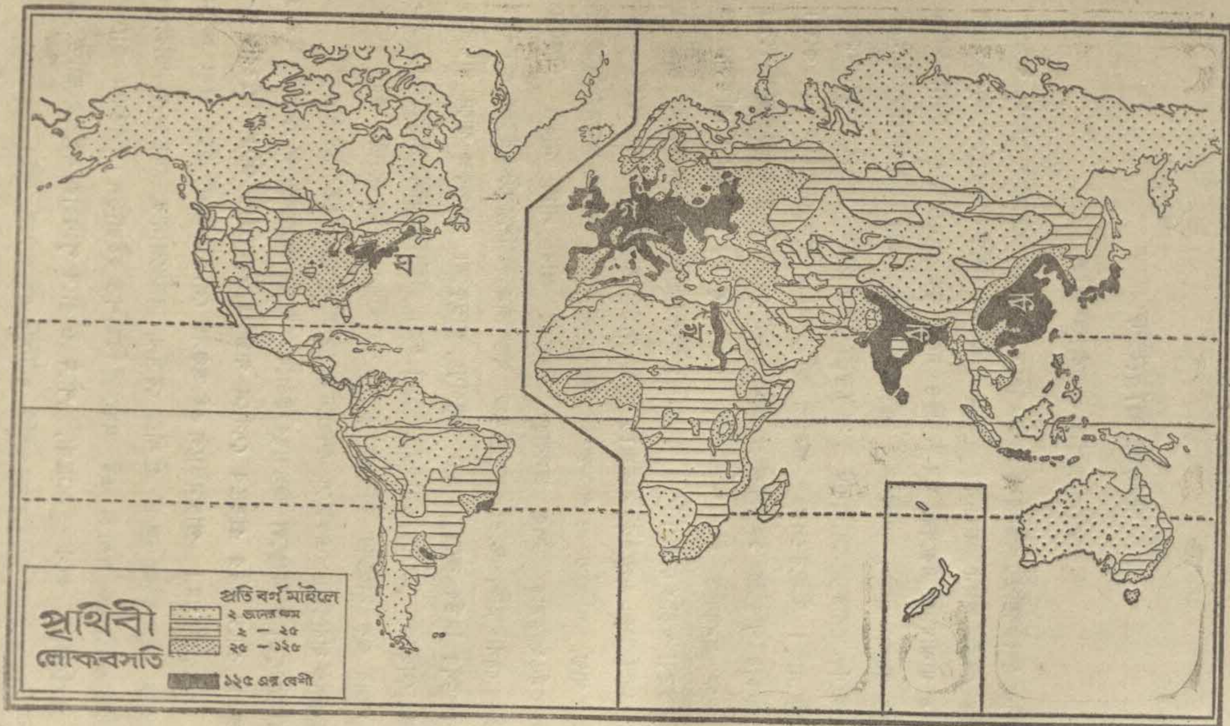
লোকসংখ্যা ও লোকবসতি

পৃথিবীর লোকবসতির চিত্রে (১৪৬নং চিত্রে) স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়,—লোকবসতি কোন স্থানে অতি-ঘন কোন স্থানে বা অতি-পাতলা ;—কোন স্থানে লোকবসতি মাঝামাঝি ধরণের, খুব বেশীও নহে, খুব কমও নহে, কোন স্থানে লোকবসতি আদৌ নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথিবীর মাত্র ১৪ শতাংশ জমিতে পৃথিবীর অর্ধেক লোক (মোটামুটি ১৩৪ কোটি) বাস করে, আবার সাহারা মরুতে লোকবসতি নাই। ইউরোপের ৭ শতাংশ জমিতে ৪১ কোটি লোক বাস করে। কিন্তু আফ্রিকায় পৃথিবীর ১৯ শতাংশ জমিতে ২২ কোটি মাত্র লোক বাস করে। প্রকৃত পক্ষে ঘনবসতি (১) জলবায়ু, (২) **ভূ-প্রকৃতি,** (৩) **মৃত্তিকা,** ও (৪) খনিজদ্রব্য প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

(১) **জলবায়ু।**—পূর্বেই বলিয়াছি (১৮ পৃ.) মানুষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের উপর, পৃথিবীতে বসতি বণ্টনের উপর ও মানুষের কর্মতৎপরতার উপর জলবায়ুর প্রভাবের আর সীমা নাই। ঐস্থানে বিশেষভাবে দেখাইয়াছি, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, পশুপালন ও শিল্পসৃষ্টি প্রভৃতি প্রধানতঃ জলবায়ুর উপর নির্ভর করে ; এবং জলবায়ুর আনুকূল্যে যে-সকল স্থানে খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য, সেইসকল স্থানেই লোকবসতি ঘন হয়। **হিমমণ্ডলে** কৃষিকার্য হয় না, জীবনযাপনের জন্য মানুষের জীবজন্তু ও মৎস্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই সেখানে লোক যাযাবর। একারণে, সেখানে লোকবসতি ঘন হইতে পারে না।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে জলবায়ুর প্রভাবে মানুষের কর্মদক্ষতা ও উৎসাহ অত্যন্ত বেশী হয়। গ্রীষ্মে বৃষ্টির প্রভাবে সেখানে খাদ্যশস্যাদিও প্রচুর জন্মে। সুতরাং এ-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলই লোক সভ্যতায় উন্নত, এবং জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। গ্রীসীয়, রোমীয়, বাবিলোনীয়, ফোনেসীয়, ভারতের সিন্ধুদেশীয় ও চৈনিক সভ্যতা এই অঞ্চলেই বিকশিত হইয়াছিল। বর্তমান কালেও জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, অর্থে ও সামর্থ্যে, শৌর্যে ও বীর্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এই অঞ্চলেই বাস করে। পৃথিবীর ঘন বসতি মোটামুটি এই অঞ্চলে বেশী।

গ্রীষ্মমণ্ডলে মানবগণের জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি প্রচুর সম্পদ্ দিয়াছেন। এ-অঞ্চলে নিয়মিত ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য সহজেই আবশ্যকীয় দ্রব্য



১৪৬ নং চিত্র।

উৎপাদন করা যায়। কিন্তু এই মণ্ডলের যে-যে স্থানে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ অত্যন্ত অধিক সেই সকল স্থানে লোকবসতি ঘন হইতে পারে না।

পৃথিবীর মধ্যভাগে বালুকাময় মরুপ্রদেশে অত্যধিক উত্তাপের জন্য কোন ফসল জন্মে না। সেজন্য সেখানে কোন স্থায়ী লোকবসতি নাই।

অন্ততঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চলেই উপরে-উক্ত গ্রীস, রোম, বাবিলন প্রভৃতি দেশে ও সন্নিকটবর্তী মিশর ও ইরাক প্রভৃতি দেশে জীবনযাপন সুলভ ও সহজ ছিল বলিয়া অতি প্রাচীনকালেও সেখানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল।

আবার, মৌসুমী জলবায়ুর দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সেজন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর ঘনতম বসতির স্থান

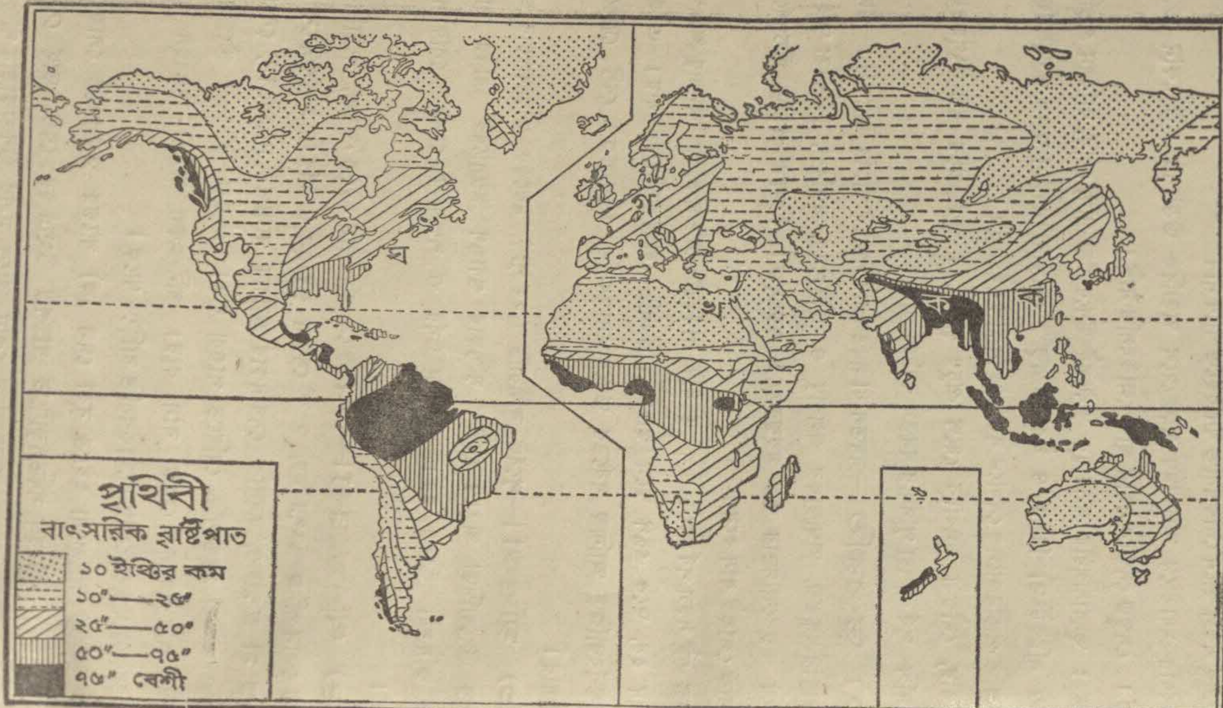
(২) ভূ-প্রকৃতি।—সমতল বা সমতলপ্রায় ক্ষেত্রই বাসের উপযোগী। উচ্চ-পর্বত তাহার বন্ধুরতা, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও পরিবহনের অসুবিধা, বিশেষতঃ তাহার কৃষিকার্যে অনুপযোগিতার জন্য মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত। তিব্বত প্রভৃতি উচ্চপর্বতে অল্পসংখ্যক লোকই বাস করে।

কিন্তু এই সকল পর্বতশীর্ষে জলবায়ু যদি পার্শ্ববর্তী সমতলক্ষেত্রের জলবায়ু অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ হয়, তবে এরূপ স্থলে স্থায়ী লোকবসতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য চিরবসন্ত-বিরাজিত আন্দিজ পর্বতের উপরে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) মৃত্তিকা।—পূর্বেই বলিয়াছি (২২ পৃঃ), মনুষ্যের জীবনধারণের জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী; মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। যে-স্থান উর্বর ও শস্যশালী সেখানে লোকবসতি ঘন হয়।

(৪) খনিজ দ্রব্য।—কোন স্থানে যদি খনি হইতে কয়লা, পেট্রোলিয়ম, বা অন্য কোন খনিজ উৎপন্ন হয়, তবে সেস্থান বৃষ্টিবহুল ও উর্বর না হইলেও, সেখানে খাদ্যশস্য না জন্মিলেও, এমনকি সেখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ না হইলেও, সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মনুষ্যবসতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য চিলি ও অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমির খনি-অঞ্চলেও লোক বাস করে। খনি-অঞ্চল ক্রমশঃ শিল্পবহুল হইয়া উঠে, এবং ক্রমে-ক্রমে সেখানে লোকবসতি বাড়িতে থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল (ক) খাদ্যের স্বচ্ছলতাই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ। বৃষ্টিবহুল সমতলভূমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় বেশী, তাই সেখানে লোকসংখ্যা বেশী। আবার সমতলভূমির কোন অংশে নদীর উপত্যকাভূমি থাকিলে, সেখানে খাদ্যশস্য অতি প্রচুর উৎপন্ন হয়, এবং সেজন্য সেখানে লোকবসতিও ঘন হয়



১৪৭ নং চিত্র।

তুলনা করিলে দেখা যায়,—যবদ্বীপের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে—৮২৫, বেলজিয়মের—৭০০, হলণ্ডের—৬৫৯, জাপানের—৫৭৯, যুক্তরাজ্যের—৫৩৭, জার্মানির—৫০৫, ফ্রান্সের—১৯৩, আ. যুক্তরাষ্ট্রের—৫০।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে গঙ্গার উপত্যকাভূমিতে সমতল প্রদেশে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে—১০৩১, খনি সম্পদে ধনী বিহারে—৬৯১, এবং উত্তর প্রদেশে—৬৫০। কিন্তু বৃষ্টিবিরল ও পর্বতবহুল মধ্যপ্রদেশে—১৮৯, রাজস্থানে—১৫২ প্রভৃতি।

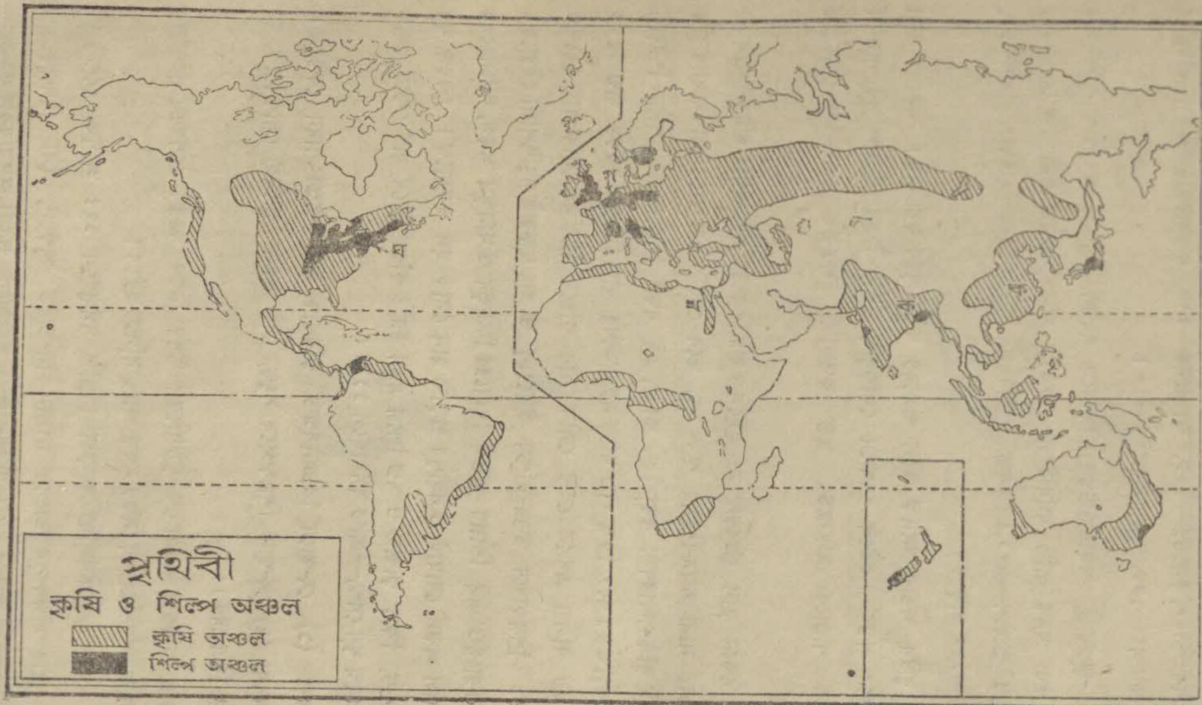
(খ) বৃষ্টির অভাব অনেক স্থলে জলসেচ দ্বারা পূরণ করা যায়। জলসেচ দ্বারা কোন স্থানে শস্যবৃদ্ধি হইলে সেখানে লোকবৃদ্ধি হয়। উত্তর প্রদেশে, পূর্ব পাঞ্জাবে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে জলসেচের জন্য কতকাংশে শস্যবৃদ্ধি ও সেজন্য লোকবৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) কোন স্থান বৃষ্টিবহুল না হইলেও যদি শিল্পবহুল হয়, অর্থাৎ খনিজ শিল্প বেশী থাকে, এবং নানা সর্জন-শিল্পের সৃষ্টি হয়, তবে সেই সকল স্থানে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধি সাধারণতঃ অস্থায়ী। কারণ, এই সকল শিল্পকেন্দ্রিক স্থানে শিল্পবৃদ্ধি হইলে অর্থবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু খাদ্য বাড়ে না। অর্থের দ্বারা বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া এখানে বেশী লোক বাস করিতে পারে না, লোক স্থায়ী হইতেও পারে না। শিল্পকারণে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও আ. যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রেও এই শিল্পের জন্যই বিহারের সিংহভূম ও মানভূম অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল অঞ্চল, বোম্বাই ও মহীশূর প্রভৃতি স্থান লোকবহুল হইয়াছে। কেরল খুব ছোট স্টেট, কিন্তু কৃষিতে ও অন্য শিল্পে এরূপ উন্নতি করিয়াছে যে, এই স্টেটে লোকবসতির ঘনত্ব খুব বেশী,—প্রতি বর্গমাইলে ১১২৫।

সুতরাং (১) যে-স্থানে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য দ্বারা শস্যোৎপাদন বেশী করা সম্ভব, অথবা (২) যে-স্থান শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ, সেই সকল স্থানেই লোকবসতি ঘন (১৪৮ নং চিত্র দেখ)।

আবার কৃষিকার্য বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। সেজন্য বৃষ্টিপাতের সহিত লোকবসতির বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে।

১। **ঘন লোকবসতি অঞ্চল** (প্রতি বর্গমাইলে ১২৫ অপেক্ষা বেশী) :— (ক) এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের জাপান-চীন-ভারত অঞ্চলে, (খ) মিশরের নীল নদের অববাহিকা-অঞ্চলে, (গ) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, ও (ঘ) আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ভাগে, লোকবসতি,—কৃষিকার্য, শিল্পকার্য বা উভয় কার্যের জন্য ঘন।



১৪৮ নং চিত্র

এক্ষণে বৃষ্টিপাতের (১৪৭নং চিত্র), কৃষিশস্যের (১৪৮নং চিত্র) ও লোকবসতির ঘনত্বের (১৪৬নং চিত্র) ম্যাপ লইয়া ইহা হইতে (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত স্থান তুলনা করিয়া দেখ,—

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে উপরি-উক্ত চিত্রগুলির **(ক) চিহ্নিত অঞ্চলে** জাপান, চীন, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষ লইয়া যে-**দক্ষিণ-পূর্ব অংশ,**—সেখানে মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে বৃষ্টিপাত বেশী (১৪৭নং চিত্র), সুতরাং সেখানে **খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় বেশী**—সেজন্য সেখানে লোকবসতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘন।

(খ) চিহ্নিত স্থানে মিশর দেশে নীল নদের অববাহিকায় যেখানে জলসেচন দ্বারা প্রচুর **শস্য** উৎপন্ন হয়, সেখানেও লোকবসতি ঘন।

(গ) চিহ্নিত স্থানে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে গ্রেট্ বৃটেন, উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, ও উত্তর ইতালী লইয়া যে-অঞ্চল—তাহা পৃথিবীর অন্যতম **শিল্প-সমৃদ্ধ স্থান**। এ-অঞ্চলে প্রগাঢ় চাষ দ্বারাও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। সেজন্য এ-অঞ্চলে লোকবসতি ঘন। উত্তর ইতালীতে কৃষিকার্য দ্বারা প্রচুর শস্যোৎপাদন হয়, এবং জলবিদ্যুৎযোগে শিল্পসৃষ্টি হয়।

(ঘ) চিহ্নিত স্থানে আমেরিকীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ভাগে 'পঞ্চহ্রদ'-এর দক্ষিণে,—চিকাগো হইতে নবইংলণ্ড পর্যন্ত স্থান **শিল্পসমৃদ্ধ**। সেজন্য এ-অঞ্চলেও লোকবসতি ঘন।

২। **মধ্যবিধ বা পরিমিত (moderately populated) লোকবসতি অঞ্চল** (প্রতি বর্গমাইলে ২৫—১২৫)—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে, এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের উচ্চ আন্দোলিত মালভূমি অঞ্চলে যেখানে লোকপালনের উপযুক্ত কৃষিকার্য, খনির কার্য, শিল্পকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হয় সেখানেই লোকবসতি মধ্যবিধ হয়।

এইরূপ ইউরোপের পূর্বভাগে যেখানে কৃষিকার্যের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয়, এবং খনির কার্য ও শিল্পকার্য হয়, সেখানেও লোকবসতি মধ্যবিধ।

আফ্রিকার গিনি উপকূলে ও দক্ষিণভাগে কৃষিদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য এবং পশুপালনের জন্য লোকবসতি কিছু বেশী—মধ্যবিধ—হয়।

৩। **স্বল্পবসতির অঞ্চল** (২-২৫)। এশিয়ার মধ্যভাগের উত্তাপপ্রধান ও বৃষ্টিবিরল স্থানে লোকপালনের উপযোগী কৃষিকার্য হয় না, পশুপালনই সেখানকার প্রধান জীবনোপায়। এরূপ স্থলে লোকবসতি অতি কম।

ইউরোপের উত্তরভাগে বনবহুল শীতল অঞ্চলেও লোকবসতি কম।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সুবিস্তৃত মধ্যভাগে অধিকাংশ স্থলে কৃষিকার্য হয়, এবং ব্যবসায় হিসাবে পশুপালন হয়, পশুমাংস ও পশুসংক্রান্ত অন্য দ্রব্যও বিদেশে রপ্তানি করা হয়; এবং স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য অবলম্বনেও শিল্পকার্য হয়। এস্থানে স্বল্প (২-২৫) লোকবসতি আছে।

আফ্রিকার মধ্যভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও, মালভূমি বলিয়া এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। জলবায়ুও অপেক্ষাকৃত শীতল ও আমাজন অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষা দুর্বল বনভূমিও আমাজন-অঞ্চলের মত ঘনসন্নিবিষ্ট নহে, ইহা স্থানে-স্থানে বিচ্ছিন্ন। সেজন্য এখানকার লোক জীবনধারণের জন্য পশুপালন, অল্প কৃষিকার্য ও স্থানীয় দ্রব্যাদি অবলম্বনে ব্যবসায় করিতে পারে। এজন্য এখানে স্বল্প পরিমাণে লোক বাস করিতে পারে।

৪। **লোকশূন্য ও প্রায়-লোকশূন্য অঞ্চল**। হিমমণ্ডলে অবস্থিত **আণ্টার্কটিক** মহাদেশে জনবসতি আদৌ নাই।

উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের উত্তর ভাগে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত উত্তাপ নাই। সুতরাং সেখানে লোকবসতি নাই বলিলে হয়।

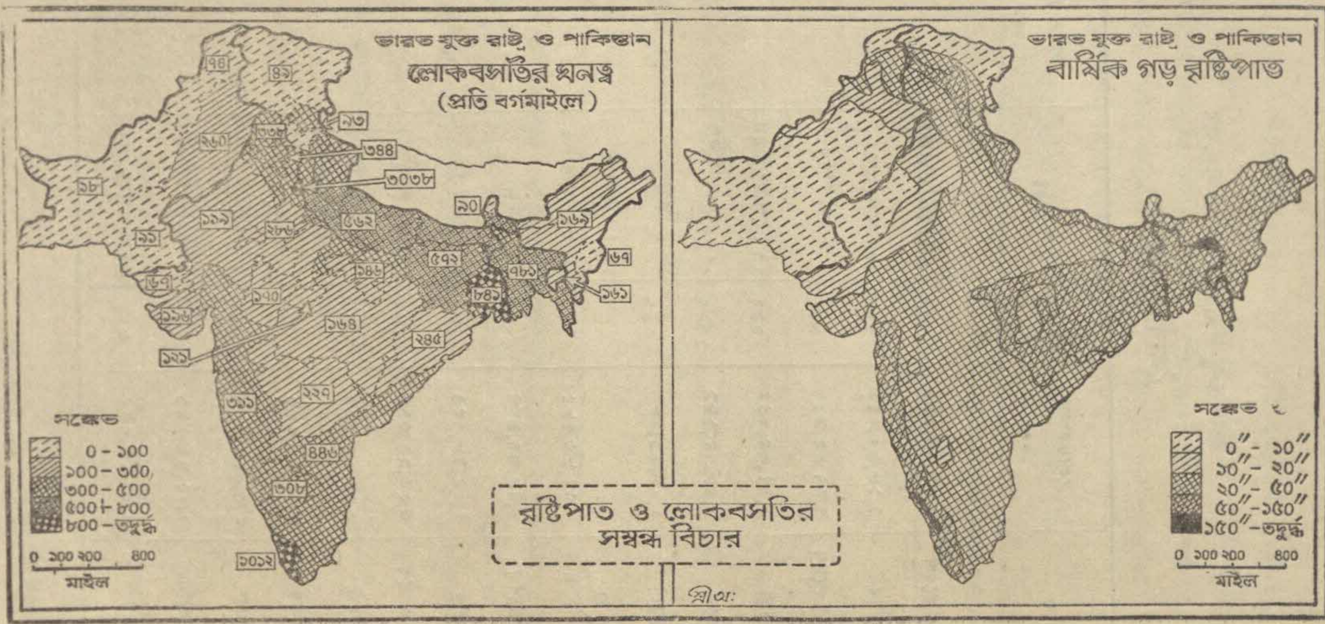
আফ্রিকার মধ্যভাগে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমে কালাহারি মরুভূমি,— অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগ বৃষ্টিবিরল মরুবৎ; এশিয়ার মরুবৎ আরব দেশ ও ইরাণ দেশের কতকাংশ বৃষ্টিবিরল শুষ্ক স্থান। সেখানে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সেখানে লোকবসতি নাই; যে-সকল লোক আছে তাহারা যাযাবর।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অংশ হিমমণ্ডলের সন্নিকটবর্তী বটে, কিন্তু ইহার এই অংশ সঙ্কীর্ণ বলিয়া সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে এখানকার শীত অনুগ্র। সেজন্য ইহার দক্ষিণ প্রান্তে কিছু লোক বাস করিতে পারে। তবে প্রতি বর্গমাইলে দুই জন অপেক্ষাও কম লোক বাস করে।

এশিয়ার মধ্যবর্তী **উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে,** আ. যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে অবস্থিত রকি-পর্বত-অঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কতকাংশে উচ্চতার জন্য, কৃষির উপযোগী সমতলক্ষেত্রের অভাববশতঃ, এবং বৃষ্টির অল্পতাপ্রযুক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। সেজন্য সেখানে লোকবসতি অতিবিরল —নাই বলিলেই হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বিষুবরৈখিক প্রদেশ অত্যধিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য বনাচ্ছন্ন এবং লোকবসতির অযোগ্য।

এইরূপে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক অংশ লোকবিরল, প্রতি বর্গমাইলে বসতি গড়ে ২ জন অপেক্ষাও কম।


ভারত যুক্ত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান
লোকবসতির ঘনত্ব
(প্রতি বর্গমাইলে)
সঙ্কেত
0 - ১০০
১০০ - ৩০০
৩০০ - ৫০০
৫০০ - ৮০০
৮০০ - তদুর্দ্ধ
0 ১০০ ২০০ 800
মাইল
বৃষ্টিপাত ও লোকবসতির
সম্বন্ধ বিচার
ভারত যুক্ত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত
সঙ্কেত ২
0" - ১০"
১০" - ২০"
২০" - ৫০"
৫০" - ১৫০"
১৫০" - তদুর্দ্ধ
0 ১০০ ২০০ 800
মাইল
শ্রীঅ:

১৪৯ নং চিত্র।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬১ সালের

লোকগণনার ফল

স্টেট	লোকসংখ্যা ১৯৬১	প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি	স্টেট	লোকসংখ্যা ১৯৬১	প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির ঘনত্ব
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	৩,৫৯,৭৭,৯৯৯	৩৩৯	টেরিটরিসমূহ		
২। আসাম	১,১৮,৬০,০৫৯	২৫২	১৬। আন্দামান ও নিকোবর	৬৩,৪৫৮	২০
৩। উত্তরপ্রদেশ	৭,৩৭.৫২,৯১৪	৬৫০			
৪। উড়িষ্যা	১,৭৫,৬৫,৬৪৫	২৯২	১৭। গোয়া, দমন দিউ*		
৫। কেরল	১,৬৮,৭৫,১৯৯	১১২৫			
৬। গুজরাট	২,০৬,২১,২৮৩	২৮৬	১৮। ত্রিপুরা	১১,৭১,৪৯২	২৮৩
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	৩৫,৮৩,৫৮৫	৫১	১৯। দাদরা ও নাগর হাভেলি*		
৮। পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯,৬৭,৬৩৪	১০৩১	২০। দিল্লী	২৬,৪৪,০৫৮	৪,৬১৪
৯। পাঞ্জাব	২,০২,৯৮,১৫১	৪৩১	২১। মণিপুর	৭,৭৮,৩১৮	৯০
১০। মধ্যপ্রদেশ	৩,২৩,৯৪,৩৭৫	১৮৯	২২। লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ	২৪,১০৮	২,১৯২
১১। মহারাষ্ট্র	৩,৯৫,০৪,২৯৪	৩৩২			
১২। মহীশূর	২,৩৫,৪৭,০৮১	৩১৮			
১৩। মাদ্রাজ	৩,৩৬,৫০,৯১৭	৬৭১	২৩। হিমাচল প্রদেশ		
১৪। রাজস্থান	২,০১,৪৬,১৭১	১৫২		১৩,৪৮,৯৮২	১২৪
১৫। বিহার	৪,৬৪,৫৭,০৪২	৬৯১	ভারত-যুক্তরাষ্ট্র	৪৩,৭২,০২,৭৭৪	৩৮৪

* পাওয়া যায় নাই।

সহরে নানা প্রকার শিল্পসৃষ্টি হইতেছে, অথবা শিল্পসৃষ্টি দ্বারা নূতন-নূতন সহর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল স্থানে অর্থের জন্য ভারতের গ্রামের লোক আকৃষ্ট হইতেছে। তাছাড়া ধনী মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্নবিত্ত লোকের শিক্ষাক্ষেত্রও সহর। সেজন্যও লোকে সহরে আসিতেছে। অন্ততঃ গ্রামে উপার্জন কমিয়া যাইতেছে, এবং খাদ্যসমস্যা গুরুতর হইতেছে। সেজন্য গ্রামে লোকবসতি কমিয়া যাইতেছে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে সহরবাসী ও গ্রামবাসী লোকের বসতি* এইরূপ :—

বৎসর	মোট লোকসংখ্যার শতাংশ	
	গ্রাম	সহর
১৯২১	৮৮.৬	১১.৪
১৯৩১	৮৭.৯	১২.১
১৯৪১	৮৬.১	১৩.৯
১৯৫১	৮২.৭	১৭.৩
১৯৬১	৮২.২	১৭.৮

ভারতের ১০৮টি সহরের লোকসংখ্যা একলক্ষের বেশী। তন্মধ্যে—১। উত্তর প্রদেশ—১৭টি; ২। প. বঙ্গ—১২টি; ৩। মহারাষ্ট্র—১২টি; ৪। অন্ধ্র—১১; ৫। মাদ্রাজ—৯; ৬। মধ্যপ্রদেশ—৪; ৭। বিহার—৭; ৮। রাজপুতনা—৬; ৯। গুজরাট—৬; ১০। মহীশূর—৬; ১১। পাঞ্জাব—৫; ১২। কেরল—৪; ১৩। জম্মু ও কাশ্মীর—২; ১৪। দিল্লী—১; ১৫। আসাম—১; ১৬। উড়িষ্যা—১।

নিম্নে ভারতের লোকসংখ্যায় সর্বপ্রধান সহর কয়টির নাম দেওয়া হইল,—

সর্বপ্রধান দশটি শহর

১। বিস্তৃত বোম্বাই ৪১,৪৬,৪৯১
২। দিল্লী ২৩,৪৪,০৫১
৩। কলিকাতা ২৯,২৬ ৪৯৮,
৪। মাদ্রাজ ১৭,২৫,২১৬
৫। হায়দারাবাদ ১২,৫২,৩৩৭
৬। আমেদাবাদ ১১,৪৯,৮৫২
৭। কানপুর ৯,৪৭,৭৯৩
৮। বাঙ্গালোর ৯,০৭,৬২৭
৯। পুনা ৭,২১,১৩৪
১০। লক্ষ্ণৌ ৬,৬২,১৯৬

Questions

1. Discuss the geographical factors which have contributed to the density of population in a region.

2. To what extent is it true that the areas of dense population concentrate upon coalfields ?

3. Take two of the areas of the densest population and account for their density.

4. What combination of causes accounts for the concentration of population in the Ganges valley ? (Cal. I.Com. 1918, '33).

5. Write short explanatory notes on Distribution of population in Northern India.

6. India has a population of 400 millions. Analyse the factors which determine the irregular distribution of this vast population (Cal. I.Com. 1934).

7. On a sketch-map of India draw the areas of the greatest and the least density of population. Also state briefly why the distribution is so irregular in India.

(Cal. I. Com 1945).

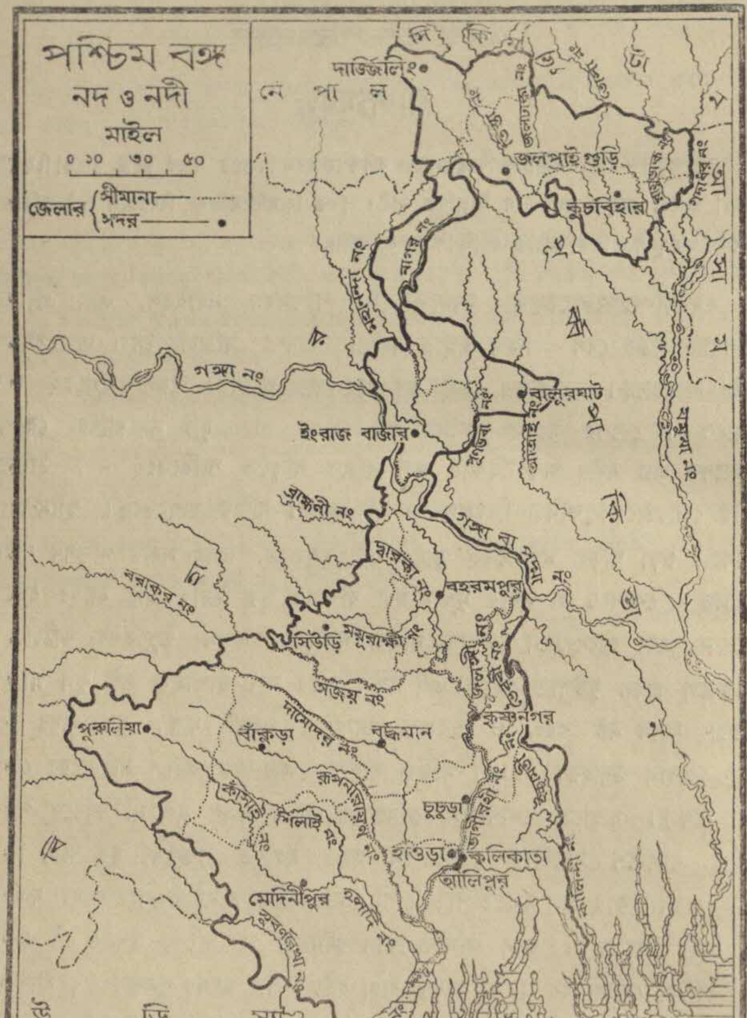
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিমবঙ্গ

দ্রষ্টব্য।—এই ভৌগোলিক বিবরণী-মধ্যে বর্ণিত যে-সকল বিষয়ের পার্শ্বে দুইটি তারকা চিহ্ন (**) দেওয়া আছে, সেগুলি সিলেবাসে উল্লিখিত নাই। কিন্তু সিলেবাসে-উক্ত বিষয়গুলি পাঠ করিতে ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল শিক্ষা করিতে এগুলি বিশেষ আবশ্যকীয়।

**পশ্চিমবঙ্গের নদনদী।—পশ্চিমবঙ্গ নদীবহুল, এবং প্রধানতঃ পলিমাটি-গঠিত দেশ। কিন্তু ইহার নদীগুলি ক্রমশঃ মজিয়া গিয়া এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। নদীগুলির এই দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ রেল-লাইনকেই দায়ী করা হয়। দেশের মধ্যে জলনিকাশের গতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া রেলপথ নির্মাণের জন্য নদীর অববাহিকার জল নদীতে পড়িতে পারিতেছে না। তাহাতে নদীর স্রোতোবেগ কমিয়া গিয়াছে ও নদী ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে। স্থানে-স্থানে নদীমধ্যে চড়া পড়িয়া নদীগর্ভেই হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং নদীর গতিপথ সরিয়া গিয়াছে। কোথাও বা নদীর মুখ মজিয়া যাওয়ার জন্য নদীর জল বাহির হইতে পারে না, এবং স্থানে-স্থানে নদীগর্ভ মজিয়া পার্শ্বভূমি অপেক্ষা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে এই সকল নদীর জল ছাপাইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া ফসল নষ্ট করে, ও জীবজন্তু ভাসাইয়া লইয়া যায়। দামোদরের বন্যা ইহার প্রধান উদাহরণ। নদী মজিয়া যাইবার আর-এক কারণ নদীতীরের ভেড়ী (বা বাঁধ)। যাহাতে লোণাজল কৃষিক্ষেত্রে উঠিয়া ফসল নষ্ট না করিতে পারে, সেজন্য বঙ্গদেশে নদীতীরে ভেড়ী বাঁধা হয়। ইহাতে শস্যরক্ষা হয় বটে, কিন্তু নদীর অববাহিকার জল নদীতে পড়িতে পারে না। সেজন্য নদীর স্রোত কমিয়া যায় ও শীঘ্রই নদী মজিয়া যায়। যখন জমিতে কোন কৃষিদ্রব্য না থাকে, তখনও এই সকল বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হয় না। কারণ, তাহা হইলে পর বৎসর পুনরায় বাঁধ বাঁধিবার জন্য আবার খরচ করিতে হয়। কখনও কখনও নদীতীরস্থ জমি বাঁধ দিয়া ঘিরিয়া সেখানে জলাশয় সৃষ্টি করা হয়। পরে নদী হইতে এই স্থানে জল ও মাছ তুলিয়া এই সকল স্থানে মাছের ব্যবসায় করা হয়। একারণেও নদী মজিয়া যায়। বহুদিন হইতে এইরূপ ভেড়ীবাঁধা অব্যাহত চলিতেছে এবং তাহাতে নদী দ্রুত মজিয়া যাইতেছে। এই সকল বাঁধ সৃষ্টির বিপক্ষে আইনগত বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। সেজন্য ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে ও নদীগুলিও দ্রুত মজিয়া যাইতেছে।

উত্তরবঙ্গে তিস্তা, জলঢাকা ও তোর্সা, মধ্যবঙ্গে পূনর্ভবা, আত্রাই, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলঙ্গী, ও ভৈরব, দক্ষিণবঙ্গে দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও শিলাই এবং ইহাদের



১৫০ নং চিত্র।

মিলনে উৎপন্ন রূপনারায়ণ, কাঁসাই, হলদী, সুবর্ণরেখা, ইচ্ছামতী ও ভাগীরথী প্রভৃতি নদীগুলির অবস্থা শোচনীয়। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণবঙ্গের চূর্ণী, সরস্বতী, কুন্তী, বেহুলা,

কাণা দামোদর, বিদ্যাধরী, পিয়ালী প্রভৃতি নদীর অবস্থা অতি শোচনীয়। ভাগীরথীরও স্রোত ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে ও নদী মজিয়া উঠিয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশ হুগলী নামে খ্যাত। ইহারই উপর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা অবস্থিত। এই নদীর পলিমাটি পরিষ্কার করিয়া ইহাকে জাহাজ চালনার উপযোগী রাখিবার জন্য বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। প্রতি বৎসর ৭ কোটি ঘনগজ মাটি তলকর্ষিণী (dredger) .াগে হুগলীগর্ভ হইতে তুলিয়া ফেলিতে হয়।

এই সকল নদীর সংস্কারকার্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দামোদরের সংস্কারকার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদ্বারা দামোদরে আর বন্যা হইবে না। ইহার তীরে জলসেচন দ্বারা যে-শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব বিদূরিত হইবে। ইহার স্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শিল্পবৃদ্ধি করা যাইবে। ইহার ফলে অবাধে নৌচলাচল হইবে। মৎস্যের চাষও বাড়িবে। ময়ূরাক্ষী নদীরও সংস্কার হইতেছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নদীসংক্রান্ত বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আশা করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ ধনধান্য ও শিল্পে অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে। পশ্চিমবঙ্গের নদীসমস্যা দূরীভূত করা ও শস্যসম্ভার বৃদ্ধি করার জন্য এক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা উচিত—

(১) নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্রোতোবেগ বর্ধিত করা।

(২) নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল নিয়ন্ত্রিত করা ; এই জল যেন ইচ্ছামত ব্যবহার করা ও আবদ্ধ রাখা যায়।

(৩) নদীর অববাহিকা হইতে জল যাহাতে অবাধে নদীতে পড়িতে পারে, সেজন্য গবর্ণমেন্টের সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(৪) নদীতীরে বাঁধ বাঁধিয়া মৎস্যের চাষ করিতে বা শস্যোৎপাদন করিতে হইলে জলনিকাশের সুব্যবস্থা রাখা। এইরূপ বাঁধ বাঁধিতে হইলে রাজ্যসরকারের সম্মতি দরকার হওয়া উচিত।

(৫) ভাগীরথী নদী পশ্চিমবঙ্গের প্রাণস্বরূপ। এই দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি ও কলিকাতা বন্দরের স্থায়িত্ব ভাগীরথীর উপর নির্ভর করে। গঙ্গা হইতে যাহাতে প্রচুর জল এই পথে প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য গঙ্গার উপর যে ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা হইতেছে, যাহাতে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা দরকার।

**জলসেচ

জলসেচ—পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাত বেশী বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত বেশী হয়। সুতরাং ইহাতে খারিফ শস্যের উপকার হয়। কিন্তু অন্য সময় বৃষ্টিপাত হয় না

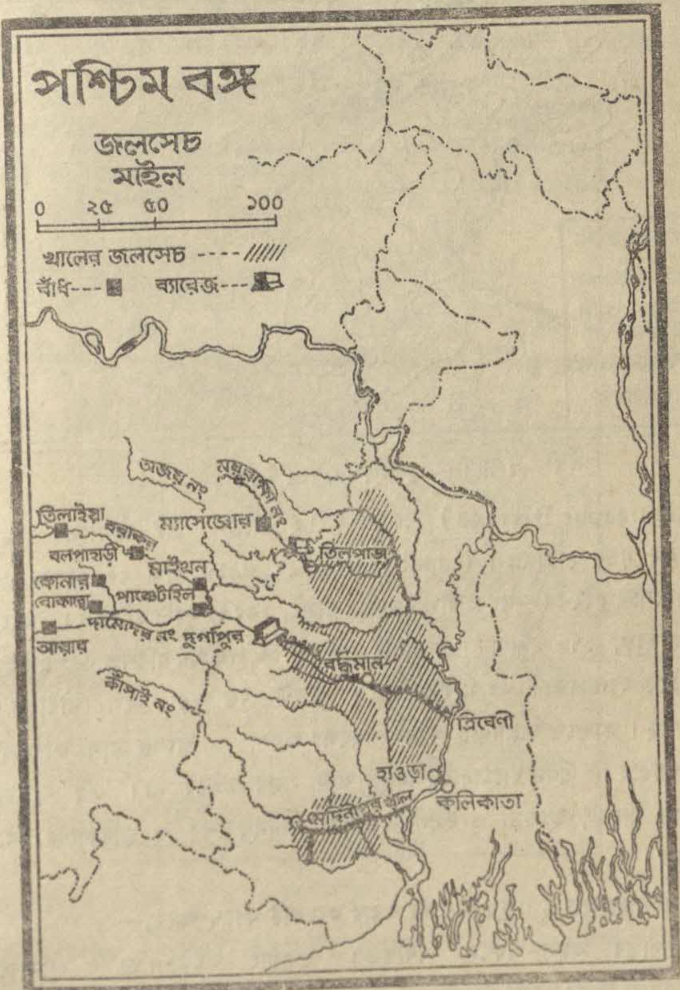
বলিলেও চলে। তাছাড়া সমগ্র বৎসরে যে-বৃষ্টিপাত হয়, তাহাতে কোথাও অধিক বৃষ্টির জন্য বন্যা হয়, কোথাও অত্যল্প বৃষ্টিপাতের জন্য ভাল ফসল হয় না। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে নদীর জল নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। কোথাও নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচন করিয়া জমিতে জলসেচন করা হয়, কোথাও বা বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ বাঁধিয়া নদীর জল ধরিয়া রাখা হয় ও আবশ্যকমত জমিতে সেচন করা হয়। এই সেচব্যবস্থার জন্য অনেক উর্বরা শুষ্ক জমিতে ফসল হইতে পারিতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে পারিবে।

পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর খাল, বর্ধমান জেলার দামোদর খাল, বর্ধমান ও হুগলী জেলার ইডেন খাল, বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর খাল ও কাশিয়ানালা খাল, বাঁকুড়া জেলার শালবাঁধ খাল, আমজোড় খাল, রুক্মিণী খাল, বাঁশ খাল, এবং জলপাইগুড়ি জেলার ছয়টি ছোট-ছোট খাল দ্বারা প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমিতে জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য হয়। ইহা ছাড়াও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি অবলম্বনে পূর্বে সেচনকার্য হইত,—এখন তাহার উন্নতি করা হইতেছে। কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা—তাহাদের মধ্যে কোন-কোনটির কতকাংশ কার্যকরী হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-প্রধান সেচব্যবস্থা	কতটা জমি উপকৃত হইবে (সহস্র একর)
১। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা	৬০০
২। হরহাটুগঞ্জ জলনিকাশ পরিকল্পনা	১৬
৩। সোয়াদীঘি-গঙ্গাখালি পরিকল্পনা (মেদিনীপুর)	৩০
৪। দামোদর পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের অংশ (বর্ধমান)	৩৩
৫। সোনারপুর-আরাপাঁচ-মাৎলা পরিকল্পনা (২৪ পরগণা)	৪৬
৬। 'প্রকিউরমেণ্ট বোনাস' পরিকল্পনা	৮৪
৭। ২০টি ছোট পরিকল্পনা	৬৭
৮। ২৬টি জরুরি পরিকল্পনা	৫৮

ইহাদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী (১১৪ নং চিত্র দেখ), দামোদর ও সোনারপুর পরিকল্পনা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বিবরণ ৩১৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। সোনারপুর পরিকল্পনার প্রথম অংশ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম জলনিকাশী ব্যবস্থা। এই স্থানে পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করিয়া চাষের জমির উদ্ধারসাধন করা হইয়াছে। সারা ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম করা হইল। ইহাতে ১১ হাজার একর ভূমিতে চাষ হইতেছে, ও ৬ৡ লক্ষ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতেছে।

দামোদর পরিকল্পনার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১১১ নং চিত্র দেখ)। এই পরিকল্পনা ভূতপূর্ব ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রথম গৃহীত হয়। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ টেনেসি ভ্যালি (T.V.A.) সংস্পৃষ্ট সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভুরডুইন (Mr. Voorduin) ইহার কার্যসূচী ও আনুমানিক ব্যয়ের খসড়া প্রথম প্রস্তুত করেন। পরে



১৫১নং চিত্র।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইলে সেই পরিকল্পনা অবলম্বনে বর্তমান পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এজন্য দামোদর ভ্যালি (উপত্যকা) কর্পোরেশন (D.V.C.) নামে এক কার্যকরী সমিতি

গঠিত হয়। এই পরিকল্পনার অধিকাংশ কার্য বিহারের মধ্যে হইয়াছে। গত ১৯৫৫ সালের ৯ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দুর্গাপুরে এই পরিকল্পনার অন্তর্গত, একটি



১৫২নং চিত্র—দুর্গাপুর ব্যারাজের অবস্থিতি।

জাঙ্গাল (Durgapur Barrage) উন্মোচন করা হইয়াছে। এই জাঙ্গালের সাহায্যে ১৫৫০ মাইল নূতন কাটাখালে (canal) জল যাইবে ও ১৩ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে জলসেচন হইবে। অর্ধেক খাল এখনই (আগষ্ট, ১৯৫৫) কাটা হইয়াছে। তাহাতে ৫৬ লক্ষ মণ ধান্য, ১৭৮ লক্ষ মণ বিচালি (straw) ও ৩৬ লক্ষ মণ রবিশস্য উৎপন্ন হইবে। দুর্গাপুর হইতে কলিকাতার ৩৫ মাইল উত্তরে ত্রিবেণী পর্যন্ত ৮৫ মাইল নৌবাহন খাল কাটা হইয়াছে। তাহাতে অল্পখরচে অণ্ডাল অঞ্চলের কয়লা ও অন্যান্য মাল কলিকাতায় আসিতে পারিবে। এখন দামোদরের বন্যা আর সম্ভব হইবে না। এই ব্যারেজের জন্য বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলী জেলার জলনিকাশের ও কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই ব্যারাজের জন্য দুর্গাপুর নির্বাচন করার কয়েকটি কারণ আছে,—

(১) দুর্গাপুর কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং কয়লা-শক্তি ও দামোদরের জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ শক্তি সহজে এখানে পাওয়া যাইবে।

(২) দামোদরের জল শিল্পকার্যের জন্য সহজে পাওয়া যাইবে।

(৩) এই স্থানের মাটি এরূপ শক্ত যে, ইহার উপর ভারী জাঙ্গাল বা গৃহাদি গঠন বা ভারী দ্রব্য স্থাপন নির্ভয়ে করা যায়।

(৪) ইহা এমন স্থানে অবস্থিত যে, সেখান হইতে দামোদরের বাম তীরে নৌবাহন খাল কাটা সহজ।

কৃষিদ্রব্য—একে ত পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয়, তাহার উপর এখানে সেচব্যবস্থাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেজন্য এখানে বহু কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর দেশ। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ৫৭'২ শতাংশ কৃষিজীবী। উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যের মধ্যে ধানই সর্বপ্রধান। ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাবে



১৫৩ নং চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজার হেকট-এয়র জমিতে ৪২ লক্ষ ৩৯ হাজার মে. টন ধান্য হইয়াছিল। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র ভারতের ১৪'১% চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে-সকল জেলায় ধানের জমি বেশী, তাহাদের চাষের জমির পরিমাণক্রমে প্রথম দশটির নাম—১। মেদিনীপুর, ২। চব্বিশ পরগণা, ৩। বর্ধমান, ৪। বাঁকুড়া, ৫। বীরভূম, ৬। মুর্শিদাবাদ, ৭। প. দিনাজপুর, ৮। নদীয়া, ৯। কুচবিচার,

১০। হুগলী। ইহাদের মধ্যে মেদিনীপুরে আমন ধান ও নদীয়ায় আউশ ধানের চাষ বেশী।

ধানের পরেই উল্লেখযোগ্য কৃষিদ্রব্য **পাট**। ১৯৫৯-৬০ ভারতের ৪০'৫ পাট পশ্চিমবঙ্গে জন্মিয়াছিল। প্রতিবৎসর রপ্তানি দ্রব্যের ১৭।১৮ শতাংশই পাটদ্রব্য। প্রকৃতপক্ষে পাট সর্বপ্রধান অর্থপ্রস্থ কৃষিদ্রব্য। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ পাট-উৎপাদন স্থান। ভারত-বিভাগ কালে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গে পাটের জমি ও উৎপাদন কমিয়া যায়। তাহাতে পাট-দ্রব্যের উৎপাদনও কমিয়া যায়। ইহাতে পাটদ্রব্যের রপ্তানিও কমিয়া যায়। সেজন্য এদেশে পাট বেশী উৎপাদনের জন্য অধিকতর জমিতে পাট উৎপাদন করা হয়। এমন কি, ধানের জমি কমাইয়াও পাটের জমি বাড়ানো হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে যেরূপ উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহা হয় না। জমির পরিমাণের ক্রমানুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে পাট-উৎপাদনকারী প্রথম দশটি জেলার নাম—১। মুর্শিদাবাদ, ২। চব্বিশ পরগণা, ৩। নদীয়া, ৪। মালদহ, ৫। কুচবিহার, ৬। প. দিনাজপুর, ৭। হুগলী, ৮। জলপাইগুড়ি, ৯। মেদিনীপুর, ১০। বর্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য কৃষিদ্রব্য—**ছোলা-মটর, তৈলবীজ, গম, আলু, ইক্ষু, তামাক,** প্রভৃতি। বাংলার জলবায়ু এ-সকল শস্যচাষের বিশেষ উপযোগী নহে। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে তামাকের চাষ বেশী হয়। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও প. দিনাজপুরেও তামাকের চাষ হয়। উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্বাচন ও সার ব্যবহারের জন্য এ-রাষ্ট্রে আকের ফসল ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

আকের চাষ সব চেয়ে ভাল হয়,—মুর্শিদাবাদ জেলায়। নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম ও ২৪ পরগণায় আকের চাষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ডাল ও আলু জন্মে। কিন্তু ডাল-কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতি যাহা এদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাতে এ-প্রদেশের অভাব মিটে না।

খনিজ সম্পদ্

খনিজ সম্পদে পশ্চিমবঙ্গ অতি দরিদ্র স্টেট। ইহার প্রধান খনিজ দ্রব্য কয়লা। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমা প্রধান কয়লা-উৎপাদনকারী স্থান। এই কয়লা রাণীগঞ্জের কয়লা নামে প্রসিদ্ধ। এই কয়লার স্তর সন্নিকটবর্তী বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও অল্প কয়লা পাওয়া যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২২২টি কয়লার খনি আছে।

আসানসোলের কয়লা-অঞ্চলে এবং বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় অল্প **হিমাটাইট লৌহ** (২২৮ পৃ. দেখ) পাওয়া যায়। সেইজন্য বীরভূম জেলাতেই প্রথম লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বেশী দিন চলে নাই। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও সামান্য লোহা পাওয়া যায়।

অন্য কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে নাই। তবে মেদিনীপুর-অঞ্চলে কিছু **সোপস্টোন**, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় **স্যাণ্ডস্টোন** বা বেলে পাথর ও রাণীগঞ্জে **চীনামাটি** পাওয়া যায়।

শিল্পসম্পদ্

শিল্পসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত। অন্য কোন প্রদেশ ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ইহা পশ্চিমবঙ্গের গর্বের বস্তু। পশ্চিমবঙ্গে সাতটি প্রধান শিল্পাঞ্চল আছে :—১। কলিকাতা-অঞ্চল, ২। আসানসোল-অঞ্চল, ৩। দুর্গাপুর-অঞ্চল, ৪। পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পাঞ্চল, ৫। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল, ৬। দাশনগর-অঞ্চল, ৭। কল্যাণী অঞ্চল।

১। কলিকাতা-অঞ্চল।—পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বহুবিস্তৃত ও বহু শিল্প-উৎপাদক কলিকাতা-অঞ্চল। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলা লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর কলিকাতা,—সেখান হইতে এই অঞ্চলের শিল্পের জন্য মাল আমদানি-রপ্তানি করা সহজ। হুগলী নদী এই অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। সেজন্য নদীপথে সহজে ও সুলভে বাণিজ্যদ্রব্য বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। সে-কারণে এই হুগলী নদীর দুই পার্শ্বেই বৃহৎ শিল্পের, বিশেষতঃ পাটশিল্পের, সৃষ্টি হইয়াছে। আসানসোল হইতে রেলপথে সহজেই কয়লা আনানো যায়। কলিকাতা ও দামোদর উপত্যকা হইতে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। তাছাড়া, শিল্পের জন্য প্রধান দরকারী যে মূলধন,—তাহাও এই অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কলিকাতা যখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, তখন এইখানে ইংরাজ ব্যবসায়িগণ বাস করিত, এবং শিল্পকার্যে তাহাদের মূলধন নিয়োগ করিত। এইজন্য এই অঞ্চল শিল্পে এত সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

এই অঞ্চলে প্রধান প্রধান শিল্প—১। চটশিল্প, ২। কার্পাস-বয়ন শিল্প, ৩। কাগজ-শিল্প, ৪। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ৫। রবার শিল্প, ৬। দেশলাই শিল্প, ৭। মোটরগাড়ী শিল্প, ৮। চর্মশিল্প, ৯। রসায়ন শিল্প, ১০। রেশম শিল্প, ১১। কাচ শিল্প, ১২। মৃৎশিল্প, ১৩। রেল ইঞ্জিন কারখানা, ১৪। চিনিশিল্প, ১৫। এ্যালুমিনিয়ম শিল্প প্রভৃতি।

২। **আসানসোল-অঞ্চল**।—পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম ভাগ, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমা ও সন্নিকটবর্তী বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া গঠিত। আসানসোল মহকুমা পাহাড়ী মাটির দেশ,—ইহার পাশেই ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল, এবং গণ্ডোয়ানা পর্যায়ের প্রাচীন পর্বতময় স্থান ইহারই পার্শ্বে অবস্থিত। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে প্রচুর কয়লা (১৯৫৯ সালে সমগ্র ভারতের ৩১.৮ শতাংশ) ও অল্প লৌহ উৎপন্ন হয়। এই খনিজদ্রব্য অবলম্বন করিয়াই, বিশেষতঃ, ইহারই সন্নিকটে বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য আছে বলিয়াই, এই অঞ্চলে এরূপ শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পই বৃহৎ শিল্প। এখান হইতে মাত্র ১২৫ মাইল দূরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। সেজন্য মাল আমদানি-রপ্তানি সহজেই হইতে পারে।

এক্ষণে এই শিল্পাঞ্চল-অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রধান শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে :—১। কয়লা শিল্প, ২। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ৩। এ্যালুমিনিয়ম শিল্প, ৪। রেলওয়ে ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প, ৫। চীনামাটি শিল্প, ৬। কাগজ শিল্প, ৭। মৃৎশিল্প, ৮। গ্যাস প্রস্তুত শিল্প, ৯। বাইসাইকেল শিল্প, ১০। চুল্লী নির্মাণের তাপসহ ইষ্টক নির্মাণ শিল্প।

৩। **দুর্গাপুর-অঞ্চল**।—দুর্গাপুর ১০।১২ বৎসর পূর্বে একটি অজ্ঞাতনামা জঙ্গলময় স্থান ছিল। এক্ষণে দামোদর খাল কাটার জন্য ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও অনেক উন্নতি হইবে। ইহা পূর্ব রেলপথের উপর কলিকাতা হইতে মাত্র ১৫৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার একটি **লৌহকারখানা** স্থাপন করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি **কোক প্রস্তুত করার চুল্লী** স্থাপন করিয়াছেন। এইটি বৃহৎ কারখানা,—ইহার কাজ এখন চলিতেছে। শীঘ্রই চোখের কাচের কারখানা ও খনি সম্বন্ধীয় কার্যের জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা বসিবে। এখানে একটি সারের কারখানা বসাইবারও কল্পনা আছে। অন্যদিকে বুন্দেলে একটি বৃহৎ বিদ্যুৎজনন কারখানা বসিতেছে। এই দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হইতেছে। সেই পথে কলিকাতায় কয়লা ও অন্যান্য মাল চালান দিলে সহজে ও সুলভে কলিকাতায় কয়লা আসিতে পারিবে। এই অঞ্চলের নিকটেই সাঁওতাল শ্রমিক সুলভে পাওয়া যায়। তাহাদের সাহায্যে ও বিদ্যুৎশক্তির যোগে এই অঞ্চলে শীঘ্রই নানা প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবে।

৪। **পুরুলিয়া লাক্ষা শিল্পকেন্দ্র**।—পুরুলিয়া-অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান লাক্ষা শিল্পকেন্দ্র। লাক্ষা রঞ্জনজাতীয় দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গে পলাশ, কুসুমফুল ইত্যাদি গাছের

ডালে লাক্ষার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পোকা লাগাইলে ঐসকল পোকার শরীর হইতে লালার ন্যায় একপ্রকার আঠালো পদার্থ বাহির হইয়া ডালটিকে ঢাকিয়া ফেলে। ডালের এই আবরণই লাক্ষা। লাক্ষা ধুইলে গাঢ় লাল বর্ণের 'আলতা' পাওয়া যায়। এই আলতা লাক্ষা কীটের দেহজাত রক্তবর্ণ রং। এই রঙে ভিজানো তুলা আলতা নামে বিক্রীত হইত, এবং হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ঐ তুলা জলে ভিজাইয়া ঐ জলে পদপ্রান্ত রঞ্জিত করিত। কৃত্রিম রঙের জন্য আলতার ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত করিতে, কাষ্ঠদ্রব্য পালিশ করিতে, গালার চুড়ি প্রস্তুত করিতে, বিদ্যুৎরোধক দ্রব্যাদি নির্মাণে, সীলমোহরের গালা প্রস্তুত করিতে, ও এইরূপ নানা কাজে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দেশে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া লইয়া গঠিত অঞ্চলই লাক্ষার প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এই অঞ্চলে ঝালদা ও বলরামপুর প্রধান শিল্পস্থান। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলাতেও লাক্ষার চাষ হয়।

৫। **জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল**।—এই অঞ্চলে চা-শিল্পই প্রধান। সেজন্য এখানে চায়ের বাক্স নির্মাণ শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও নূতন-নূতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। যেমন—

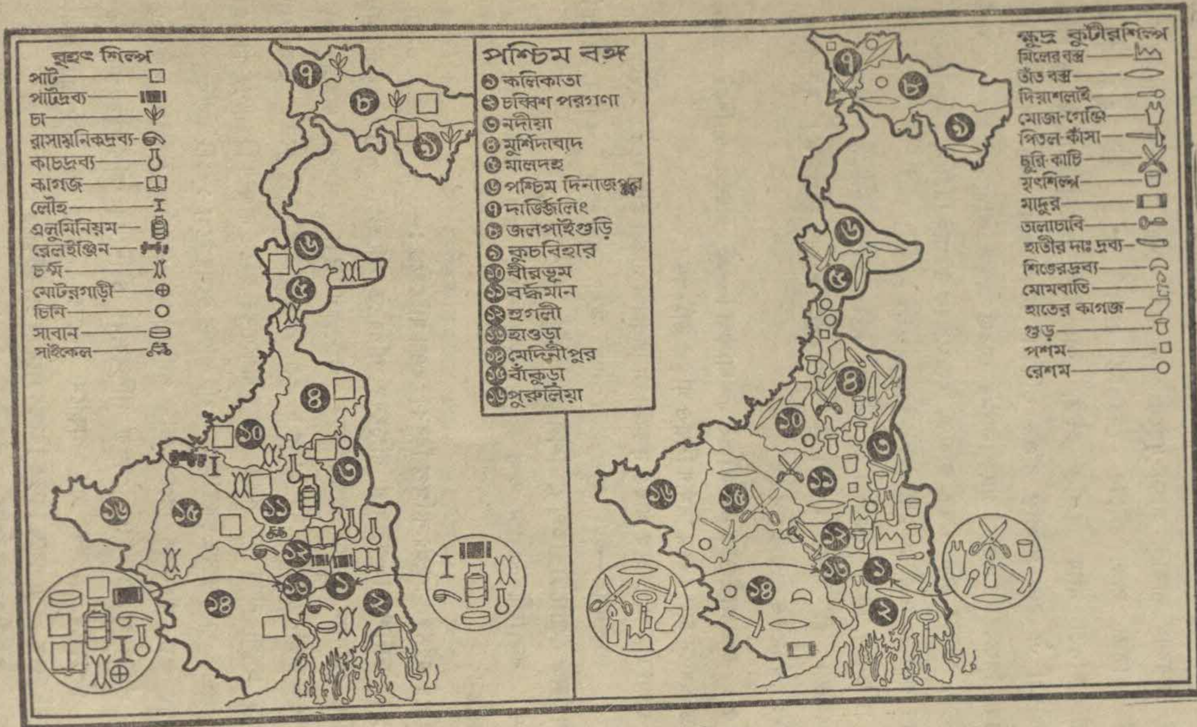
৬। **দাশনগর**—ইহা হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। এখানে **ইন্দো-জাপানিজ প্রোটোটাইপ মেশিন টুল** ফ্যাক্টরি বসিতেছে।

৭। **কল্যাণী**—এখানে সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম সূতার জন্য কাপড় বয়নের কল বসিয়াছে।

নিম্নে এইসকল শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

১। **চটশিল্প**।—চটশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। পাট হইতে চট, দড়ি, সূতালি, হেসিয়ান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই-সকল দ্রব্য বিদেশে চালান যায়। বৈদেশিক রপ্তানি-ক্ষেত্রে অনেক বৎসর চটশিল্প প্রথম স্থান অধিকার করে। কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর দুই ধারে উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে দক্ষিণে বিরলাপুর পর্যন্ত ৫৫ মাইল স্থানে সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ১১২টি পাটের কলের মধ্যে ১০১টি অবস্থিত আছে। বঙ্গভঙ্গের জন্য অধিকাংশ পাটের জমি পাকিস্থানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গে পড়িয়াছে। উৎকৃষ্ট পাটও পূর্ববঙ্গে জন্মে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের চটশিল্পের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ বাড়ানো হইতেছে। তাহাতে চটশিল্পের আবার উন্নতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

২। **কার্পাসবয়ন-শিল্প**।—হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় ২৭টি কাপড়ের কল আছে। কল চালাইবার জন্য যে-কয়লার দরকার, তাহা আসানসোল



১৫৪ নং চিত্র :—পশ্চিমবঙ্গের শিল্পস্থান।

অঞ্চল হইতে আনাইতে হয়। আবার গঙ্গাতীরে মিল হইলে পরিবহনের সুবিধা। সেজন্য অধিকাংশ মিল হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

৩। **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**।—পশ্চিমবঙ্গে কয়লার খনিগুলি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমায় অবস্থিত। সেইজন্য কলিকাতা বাদ দিলে আসানসোল-অঞ্চলেই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত কারখানা এই মহকুমার অন্তর্গত কুলটি, হীরাপুর ও বার্ণপুরে অবস্থিত। এখানে কাঁচা লৌহপিণ্ড, ইস্পাত ও ইস্পাতদ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ইহার বিবরণ এই পুস্তকের দশম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুরে আরও একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাতের কল স্থাপিত হইয়াছে। এই কলটির জন্য এই স্থান নিরূপিত হইবার কারণ এইরূপ,—

(১) ইহা কয়লা-অঞ্চলে অবস্থিত।

(২) মাল পরিবহনের খরচা জলপথেই সর্বাপেক্ষা কম। দুর্গাপুর হইতে হুগলী নদী পর্যন্ত যে নৌবাহন-খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা বন্দরে যাতায়াতের সুবিধা হইবে।

(৩) তাছাড়া দুর্গাপুর পূর্ব রেলপথের উপরে অবস্থিত। সুতরাং এখান হইতে রেলযোগেও মাল রপ্তানির সুবিধা।

(৪) এখান হইতে কলিকাতা পর্যন্ত যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে বিদ্যুৎশক্তি পাইবার সুবিধা হইবে।

(৫) এই অঞ্চল পূর্বে জঙ্গলে আবৃত ছিল। সুতরাং এখানে লোকবসতি কম। এজন্য এখানে কল প্রতিষ্ঠা করিলে বেশী লোক গৃহচ্যুত হইবে না। সেজন্য কম লোকেরই কষ্ট হইবে, এবং ক্ষতিপূরণের অঙ্কও সুবিধাজনক হইবে।

এতদ্ব্যতীত লৌহদ্রব্য ও ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য ছোট-ছোট কারখানা ৮টি আছে।

৪। **চা-শিল্প**।—চা-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। এখানে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫০টি ও দার্জিলিং জেলায় ১২৩টি চায়ের বাগান আছে। ২৪-পরগণা ও কলিকাতায় চা-সংক্রান্ত কারখানা আছে। পাটের মত চা-ও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান অর্থপ্রসূ রপ্তানি-দ্রব্য। ১৯৫৯ সালে রপ্তানি দ্বারা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি ৬২২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ১২৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা চা রপ্তানি দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ বৎসর রপ্তানি-ক্ষেত্রে রপ্তানি-অঙ্কের ২০·২ শতাংশ চা দ্বারা উপার্জন করা গিয়াছিল।

৫। **কয়লা-শিল্প**।—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়লাখনি বর্ধমান জেলার আসানসোল ও রাণীগঞ্জ-অঞ্চলে অবস্থিত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ শতাংশ কয়লা পশ্চিমবঙ্গ হইতে পাওয়া যায়।

৬। **এ্যালুমিনিয়াম-শিল্প**। আসানসোল হইতে ৭ মাইল পূর্বে অন্ডুপনগর (বর্তমান নাম—জে. কে. নগর) নামক স্থানে এ্যালুমিনিয়ম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত বড় এ্যালুমিনিয়ম কারখানা আছে। এখানে এলুমিনা, এ্যালুমিনিয়ম-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বেলুড়েও একটি এ্যালুমিনিয়ম দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম কোং প্রতিষ্ঠিত বড় কারখানা আছে। তাছাড়া কলিকাতার মধ্যে ও নিকটে এ্যালুমিনিয়মের জিনিষপত্র প্রস্তুত করার ছোট-ছোট অনেক কারখানা আছে।

৭। **কাগজ-শিল্প**।—কাগজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ শ্রেষ্ঠ। এখানে ৪টি কাগজের মিল আছে।

৮। **মোটর-নির্মাণ শিল্প**।—কলিকাতার নিকটে উত্তরপাড়ায় একটি মোটর-নির্মাণের কারখানা আছে। বড়-বড় বিলাতী মোটর কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গাড়ীর আলাদা-আলাদা অংশ এখানে জুড়িয়া মোটর গাড়ী নির্মাণ করা হইত। কিন্তু এক্ষণে মোটর গাড়ীর অধিকাংশ অংশ এখানে প্রস্তুত করা হইতেছে।

৯। **রেলওয়ে ইঞ্জিন-নির্মাণ শিল্প**।—আসানসোলের নিকটে চিত্তরঞ্জন (পূর্বনাম মিহিজাম) নামক স্থানে ভারত সরকারের একটি ইঞ্জিন-নির্মাণের কারখানা আছে। ১৯৬০-৬১ সালে এখানে ১৭৩ রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এখানে নঙ্গরে কাছি জড়ানো ও টেলিফোনের তারের জন্য ইহারই নিকটে রূপনারায়ণপুরে ধাতব রজ্জু প্রস্তুত করাইতেছেন।

১০। **চর্ম-শিল্প**।—ইহা প্রধানতঃ কুটিরশিল্প। চামড়ার সংস্কার করা, রং করা, চামড়া-দ্রব্য নির্মাণ করা প্রভৃতি সাধারণতঃ মুচি নামক এক জাতির কার্য। কিন্তু এক্ষণে কলিকাতার আশে-পাশে ছোট-ছোট ট্যানারি গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চামড়া সংস্কৃত বা ট্যান (tan) করার জন্যও কলিকাতায় কয়েকটি বড়-বড় ট্যানারি স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দেড় কোটি টাকার মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, গোসাপ, সাপ, কুমীর ইত্যাদির চামড়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে চর্ম-শিল্পের গুরুত্ব হিসাবে এই চামড়া খুবই কম। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রচুর কাঁচা চামড়া কলিকাতার বাজারে আসে। ক্রোম চামড়া উৎপাদনের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কলিকাতা এখন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বজবজের নিকট বাটা নগরে বাটা কোম্পানীর বড় চামড়া দ্রব্যের কারখানা আছে।

১১। **রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধাদি**।—পশ্চিমবঙ্গে সালফিউরিক এসিড, সোডা য্যাস্, সোডি বাইকার্ব, ফেরাস সালফেট, কপার সালফেট, ক্লোরাইড্স্, ব্লিচিং পাউডার, এলাম্, বেনজিন প্রভৃতি বহু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

১২। **চিনি-শিল্প**।—পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় (পলাশী) ও বীরভূমে (আমেদপুর) চিনির কল আছে। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউতেও একটি চিনির কল আছে।

১৩। **লাক্ষা-শিল্প**।—পুরুলিয়া জেলার প্রধান শিল্প। (পূর্বে পুরুলিয়া লাক্ষা শিল্পকেন্দ্র দেখ)।

ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্প—পশ্চিমবঙ্গে বহুপ্রকার ক্ষুদ্র শিল্প আছে। সব ক্ষুদ্র শিল্পই কুটিরশিল্প নহে। বোধহয় সমস্ত ভারতের সব শিল্পেরই কিছু-না-কিছু পশ্চিমবঙ্গে আছে। নিম্নে কতকগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

মৃৎ-শিল্প।—এখানে কুটিরশিল্প হিসাবে মৃৎ-শিল্প কুমারদের হস্তে। কিন্তু চীনা-মাটির দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হয়। ইহা কুটিরশিল্প নহে। ইহাকে ক্ষুদ্রাকার বৃহৎ শিল্প বলা যায়। ২৪-পরগণায় এরূপ ২টি কারখানা আছে।

তামাক-শিল্প।—তামাক হইতে বিড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং হুকায় খাইবার জন্যও তামাক বিক্রয় হয়।

তাঁতশিল্প।—তাঁতশিল্প পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্প। পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ১৭ হাজার তাঁত আছে। এই রাষ্ট্রে মাত্র ২৩টি কলে সূতা প্রস্তুত হয়। সে-সূতা অত্যন্ত অপ্রচুর। এই সূতা-সংগ্রহ বিশেষ অসুবিধাজনক ও শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে দক্ষিণ ভারতের মিল হইতে পশ্চিমবঙ্গের সূতা লইতে হয়। ইহাও একেবারে সরাসরি পাওয়া যায় না,—মধ্যে এজেণ্ট আছে। সুতরাং সূতা যখন তাঁতীর হাতে পৌছে, তখন তাহার মূল্য অন্য রাষ্ট্রের সূতা অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাতে বস্ত্রের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং সেজন্য এখানকার তাঁতবস্ত্র অন্য দেশের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সুতরাং এই কাপড় লোকে কিনিতে চায় না।*

তাঁতশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান মান্দ্রাজের পরেই। কিন্তু নানা কারণে তাঁতশিল্পের উন্নতি সুদূরপরাহত। প্রথমতঃ তাঁতীরা দরিদ্র,—তাহাদের সূতা কিনিবারও সংস্থান নাই। মহাজনের কাছে টাকা বা সূতা ধার লইয়া একটি নিয়মিত কম মূল্যে মহাজনকে দিতে হয়। সুতরাং মহাজনই লাভবান হয়, তাঁতীর দুঃখ ঘোচে না। তাছাড়া, তাঁতীর তাঁত চালাইবার পন্থাও গতানুগতিক।

বৈদ্যুতিক শক্তি সংযোগ দ্বারা বয়নকার্য সহজে করার সম্ভাবনা আজও এদেশে হয় নাই। তাঁতীর আর্থিক উন্নতির জন্য প্রায় ৯০০ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু যৌথ কাজ কোথাও হয় না। হয়ত যৌথভাবে কাজ করিবার মনোবৃত্তিরও এদেশে বিশেষ অভাব। কাপড়-বিক্রয়ের বাজারও গড়িয়া উঠে নাই। যাহা আছে,

* Industrial Development in West Bengal by Dr. N. Das, I.C.S., Secretary Commerce & Industrial Department, W. Bengal, contributed in *Capital* June 1954.

যাতায়াতের অসুবিধার জন্যও সেখানে অনেকে যাইতে পারে না। যাহা হউক, তাঁতীদিগকে সূতা দিবার জন্য স্থানীয় সরকার বহু চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ তাঁতশিল্প বোর্ড (West Bengal State Handloom Board) স্থাপিত হইয়াছে। এদেশে যত ধুতি লাগে তাহার শতকরা ৬০ অংশ মাত্র কলে বুনিতে পারিবে। ৪০ শতাংশ তাঁতে প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু তাঁতের বস্ত্র দুর্মূল্য এবং ইহার স্থায়িত্বও এখন পূর্বের মত নাই। ইহার প্রতিকার না হইলে লোকে তাঁতবস্ত্র কিনিতে চাহিবে না। তদুপরি এখন লোকের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে।

রেশম-শিল্প।—এদেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য এখন সাধারণতঃ রেশমী দ্রব্য পরিবার ইচ্ছা লোকে কৃত্রিম রেশমবস্ত্রাদি কিনিয়া মিটাইয়া থাকে। ইহাতে রেশমশিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ অন্য রাষ্ট্রের রেশমবস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেও পারিতেছে না। সেজন্য রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য এদেশে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এদেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলায় রেশমের কাজ হয়; বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ২১/২ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পিতল ও কাঁসাশিল্প।—এই শিল্পের জন্য এককালে বঙ্গদেশ বিখ্যাত ছিল। এখন ইহারও অবনতি হইয়াছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনতিও এই শিল্পের অবনতির কারণ। একে ত মানুষের ক্রয়ক্রমতা নাই, তাহার উপর দ্রব্যের মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। এখন ভাল জিনিষ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ লোকের নাই। তাই পিতল-কাঁসার বাসনাদির পরিবর্তে এখন লোকে সস্তা এ্যালুমিনিয়ম ও উপরে কলাই-করা লোহার বাসন দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। কলিকাতা, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় পিতল-কাঁসার দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

হাতের কাগজ।—হাতের কাগজ প্রস্তুত হয় হাওড়া জেলার মইনান, হুগলী জেলার দশঘরা, মুর্শিদাবাদ জেলার মহাদেবনগর ও বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতনে। কিন্তু মিলের কাগজের সহিত ইহার মূল্যে ও গুণে প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা নাই। তাই ইহার চাহিদাও নাই। তথাপি কোন-কোন সৌখীন কার্যে ইহার ব্যবহার হয়। তাই এই শিল্প এখনও চলিতেছে।

লবণ-শিল্প।—লবণ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং প্রত্যেকেরই খাদ্য হিসাবে লবণ দরকার। তথাপি লবণ উৎপাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। কন্টাই সমুদ্রতীরে দাদানপাত্রা নামক স্থানে বেঙ্গল সল্ট কোং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে লবণ প্রস্তুত করিতেছেন। এক্ষণে মোটামুটি ১১/২ লক্ষ টন লবণ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ৫৪ লক্ষ মণ লবণ বৎসরে প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দক্ষ ফরাসী লবণশিল্পীর সাহায্যে কন্টাই সমুদ্রতীরে লবণ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

কুইনাইন-শিল্প।—ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি রাষ্ট্রে কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়,—মাদ্রাজে ও পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় সিন্‌কোনার চাষ হয়। এই সিন্‌কোনার ছাল হইতে কুইনাইন হয়। দার্জিলিং জেলায় মংপুতে কুইনাইনের ল্যাবরেটরি আছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাবমত ৫,৪০০ একর জমিতে কুইনাইনের চাষ হয় ও বৎসরে ৬০ হাজার পা. (মাদ্রাজে—১৯ লক্ষ পা.) কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়। ইহা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। কিন্তু এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কুইনাইন--বিহীন নানা ঔষধ বাহির হইয়াছে। সেজন্য ইহার চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। ইহা গবর্ণমেণ্টের খাস ব্যবসায়।

গুড়।—এককালে বঙ্গদেশ খেজুরগুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বিদেশী চিনি আমদানির জন্য এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় গুড় প্রস্তুত হয়। এখন এদেশে খেজুরের, তালের ও আকের গুড় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য-শিল্প—৩৩০ পৃ. দেখ।

এতদ্ব্যতীত এখানে বিড়ি, চুরুট, জুতা, বাঁশের দ্রব্য, বেতের দ্রব্য, কাঠের আসবাবপত্র, পশমদ্রব্য, হাতীর দাঁতের দ্রব্য, মহিষের শিং-এর দ্রব্য, ছাতা, বাই সাইকেল ও সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য * *।—বাণিজ্য দুই প্রকার—**অন্তর্বাণিজ্য** ও বহির্বাণিজ্য। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অন্য-অন্য রাষ্ট্রে কয়লা, পাট, চা, চামড়া, ছুরি-কাঁচি, লৌহদ্রব্য, কাগজ, মাদুর, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি যে-সকল দ্রব্য যায় তাহাই অন্তর্বাণিজ্য।

বহির্বাণিজ্য।—বহির্বাণিজ্য দুই ভাগে বিভক্ত—জলপথের বাণিজ্য ও স্থলপথের বাণিজ্য। স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের একমাত্র বন্দর কলিকাতা। ইহার বিবরণ পূর্বে (৪২১ পৃ.) বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই বন্দর হইতে উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থাৎ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও উড়িষ্যার কতকাংশের ও নেপালের পণ্য দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি করা হয়। মোটামুটি নিম্নলিখিত দ্রব্য **রপ্তানি** করা হয়—এস্‌বেস্‌টস্‌, কাঁচা চামড়া, সংস্কৃত চামড়া, হাড়, শূকরের কুচি, বেত, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, কোক, কফি, কাচদ্রব্য, ডাল ও অন্য শস্য, লৌহদ্রব্য, শিং, হাতীর দাঁতের দ্রব্য, লাক্ষা, অভ্র, কাগজ, রবার, রবারদ্রব্য, সাবান, চা, পাটদ্রব্য, কার্পাসদ্রব্য, রেশমদ্রব্য, পশমদ্রব্য, তামাক, মোম, কাষ্ঠ প্রভৃতি। হিসাব করিলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের বনজ, শিল্পজ ও কৃষিজ প্রায় সর্বপ্রকার দ্রব্য এই বন্দর দিয়া রপ্তানি করা হয়।

কলিকাতা বন্দরে বিদেশ হইতে বহুপ্রকার দ্রব্য **আমদানি** হয়। তন্মধ্যে অতিপ্রধান কয়েকটার নাম করা যাইতেছে—জীবন্ত জীবজন্তু, এস্‌বেস্‌টস্, এস্‌বেস্‌টস্ পাত ও ছড় প্রভৃতি, বুরুশ, বেত ও বেতদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চীনামাটি, ঘড়ি, কয়লা ও কোক, কফি, ছোবড়া ও ছোবড়ার দ্রব্য, ঔষধাদি, ছুরি-কাঁচি, মাটির দ্রব্য ও পোর্সিলেন দ্রব্য, ফলমূল, আলু ও অন্য তরকারী, আসবাবপত্র, কাচদ্রব্য, শস্যাদি, আঠা ও রঞ্জন, লৌহদ্রব্য, চর্মদ্রব্য, নানা প্রকার যন্ত্র, সারদ্রব্য, দেশলাই, তামা, লৌহ, সীসা, টিন, পারদ প্রভৃতি ধাতু ও ধাতুদ্রব্য, বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্য, রবার, লবণ, সাবান, মশলাদি, চিনি, চা-এর বাক্স, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন দ্রব্য, কার্পাস, রেশম, পশম, শণ প্রভৃতি বয়ন করার দ্রব্য, খেলনা, তামাক, মোম ও কাষ্ঠ প্রভৃতি।

এই বন্দর দিয়া নেপালে আমদানি ও রপ্তানি হয়।

স্থলবাণিজ্য।—পশ্চিমবঙ্গের স্থলবাণিজ্য হয় পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের সহিত। ইহাদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী বাণিজ্য হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের রপ্তানি হয়—তামাক, সরিষা, সর্ষপতৈল, ফল, কার্পাসবস্ত্রাদি, লবণ, রেশমদ্রব্য, পাটদ্রব্য, চিনি, কয়লা ও কোক প্রভৃতি।

পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি হয়—পাট, তুলার বীচি, সুপারি, মাছ, কাঁচা চামড়া, শস্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে নেপাল হইতে চাউল প্রভৃতি খাদ্যশস্য, পশমীদ্রব্য, চামড়া, গরু, ছাগল, প্রভৃতি এদেশে আসে—তিব্বত হইতে আসে—কাঁচা পশম, মোম, সোরা প্রভৃতি। ঐ সকল দেশে এদেশ হইতে কাপড়, চিনি, ঔষধাদি, কয়লা ও লৌহাদি রপ্তানি হয়।

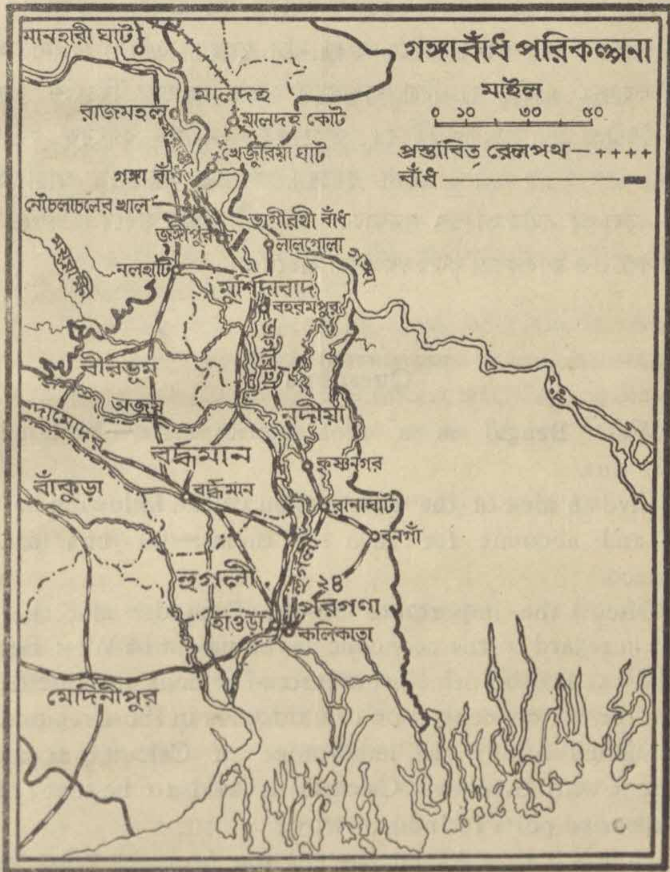
কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব। সমগ্র ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে বোম্বাই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহার পরেই কলিকাতা বন্দর। তবে কলিকাতা হইতে রপ্তানি বেশী; কিন্তু বোম্বাই বন্দরে আমদানি বেশী। মোট বাণিজ্য বোম্বাই হইতে বেশী। যেমন—

বন্দর	জাহাজের সংখ্যা	মোট লক্ষ টন	আমদানি লক্ষ টন	রপ্তানি লক্ষ টন	আয়+ লক্ষ টাকা
কলিকাতা	১৭৮৬	৩৪৩'৪৬	৫৪'০৫	৩৯'৪৫	+৫০'৩৯
বোম্বাই	৩২৩৯	২০০'৭১	১০৬'২৫	৩৮'৬৪	+৩২৬'৭৮

হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরে ১৬,১৩৬ টন পর্যন্ত মাল-বহনকারী জাহাজ আসিতে পারে। যে-সকল জাহাজ এ-বন্দরে আসে তাহাদের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফিট অপেক্ষা কম হয়, এবং বোম্বাই জাহাজ ২৬ ফিট পর্যন্ত জলের ভিতর

ডুবিয়া থাকিতে পারে। জাহাজ দাঁড়াইবার জন্য খিদিরপুরে দুইটি পোতাশ্রয় (dock) ও কিং জর্জের নামে আরও একটি বড় ডক আছে।

কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ।—পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে গঙ্গা হইতে তাহার শাখা ভাগীরথী বাহির হইয়াছে, এবং ইহাই শেষে হুগলী নাম ধারণ করিয়া



১৫৫ নং চিত্র।

বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। বহু পূর্বেই গঙ্গাই এই খাতে প্রবাহিত হইত। এই নদীর স্রোত এরূপ প্রবল ছিল যে, অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি ইহার উপনদী যে-মাটি আনিয়া এই নদীতে ফেলিত তাহা ইহার প্রবল স্রোতে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে গঙ্গা পদ্মা নামে পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছে। সেজন্য ভাগীরথীর জলস্রোতের বেগ কমিয়া গিয়াছে। তাহাতে ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে চর পড়িতেছে, এবং নদীগর্ভ ক্রমশঃ মাটিতে পূর্ণ হইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, (৪২২ পৃ.) এই নদীতে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ আনিবার জন্য বহুব্যয়ে অনবরত মাটি কাটিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও নদীর অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। ইহার প্রতীকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার **গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা** বা **ফরাক্কা পরিকল্পনা** করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন-আলোচনাই করিয়াছেন। কবে যে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবে তাহা বলা দুষ্কর। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গঙ্গাতীরে ফরাক্কায় একটি বাঁধ দিয়া খালযোগে গঙ্গার স্রোতের কিয়দংশ জঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরথীতে প্রবাহিত করা হইবে। তাহা হইলে নদীগর্ভ কর্দমমুক্ত হইবে, চড়া পড়িবে না এবং নদীর স্রোত প্রবল হইবে। ইহাতে এই নদীর স্থায়ী উপকার হইবে। নতুবা এই নদীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই নদী মজিয়া যাইবে। তখন ড্রেজার দিয়া মাটি কাটিয়াও কলিকাতা বন্দর রক্ষা করা যাইবে না।

Questions

1. West Bengal is a problematic state,—Explain and illustrate this.

2. Give an idea of the distribution of the following in West Bengal and account for each of them :—(*a*) Jute, (*b*) Rice, (*c*) Tobacco.

3. Discuss the importance of the Damodar and the Mor Projects in regard to the economic development of West Bengal ?

4. What are the principal industrial regions of West Bengal. Account for the concentration of industries in those regions.

5. Discuss briefly the importance of Calcutta as a port. Compare it with Bombay. Calcutta is said to be one of the most expensive ports in India ;—why ?

6. How is it that Assam has got too few and West Bengal too many industries ?

7. Write an account of the economic geography of West Bengal with particular reference to its Jute Industry.

(Cal. I.Com. 1953.)

8. Give an account of the commercial and industrial activities of West Bengal. (Cal. I.Com. 1954.)

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

১৯৬০

ECONOMICS AND CIVICS—Second Paper.

(Including Economic Geography)

Answer Question 1 and Five other questions.

1. Either, On the world map provided, mark and name :—

(*a*) Moscow, New Orleans, Delhi, Rio-de-Janeiro, Osaka and Karachi.

(*b*) The three important oil-producing areas and the exporting port attached to each.

(*c*) The chief wheat-growing areas of Canada, Argentina and Pakistan—marking the exporting port of each growing area.

(*d*) Suez route with three intermediate Coaling Station.

Or, Draw a full page map of the Indian Union and insert the following on it :—

(*a*) Centres of aircraft and locomotive industries.

(*b*) Black cotton soil area and two other cotton-growing areas.

(*c*) The exporting ports for mica and jute products with their associated hinterlands.

(*d*) The direct railway route from Madras to Delhi with the names of the Zones covering the different portions and three important intermediate stations of commercial importance.

(Indicate the position of a town or a port by dot and the name ; of cotton-growing areas by shading in pencil and hinterlands by shading with horizontal lines.)

2. Describe with suitable examples, the influence of geographical environment on the economic activities of man.

3. Explain why :—

(*a*) In the Mediterranean region most of the rains fall in winter months.

(*b*) 'Human life in the Equatorial region has not made much progress in economic sphere.'

(*c*) In Polar region, people are nomads.

(*d*) River Valleys of Monsoon region are the most densely populated areas of the world.

4. Wheat and rice are two important grain crops :—

(*a*) For each grain name (*i*) a country which grows and exports large quantities, and (*ii*) a country which grows large quantities but exports little.

(*b*) Choose one of the pairs of countries you have named and give reasons for the difference in the amounts exported.

(*c*) For each of the grain crops, state the geographical conditions of production and name principal growing areas.

5. In a sketch map of the Indian Union, locate :—

(*a*) Four important sites of hydroelectric installation.

(*b*) Four important coal-fields.

Describe the ways in which these sources of power are used.

6. Select *any one* of the multipurpose river valley projects in India and comment on the role of such a project towards the economic development of the valley concerned.

7. Explain the facts about population in he Indian Union.—

(*a*) The low average density in Rajasthan.

(*b*) The high average density in the Gangetic Valley.

(*c*) The uneven distribution in Assam.

8. Give an account of the Jute industry and Iron and Steel industry of West Bengal with special reference to—

(*a*) Centres of manufacture and their locations.

(*b*) The geographical advantages which helped the growth of the industry.

(*c*) Market.

(*d*) The importance of the industry in the external trade of the country.

9. Describe the position and mention the geographical conditions favouring the growth of *any four* of the following towns :—

(*a*) New York, (*b*) Hamburg, (*c*) San Francisco, (*d*) Liverpool, (*e*) Sydney, (*f*) Buenos Aires, (*g*) Bombay, (*h*) Hong-Kong.

10. Explain *any four* of the following :—

(*a*) Why are the chief fishing grounds of the world, situated in the shallow seas of Temperate Zone ?

(*b*) Why are the ports on the east coast of the Indian Union, inferior to the ports of the Western coast ?

(*c*) Why is the lower basin of the river Hooghly industrially so developed ?

(*d*) Why are different systems of irrigation, practised in different parts of India.

(*e*) Why is India changing her outlook and policy in regard to her foreign trade.

1961

ECONOMICS AND CIVICS (Including Economic Geography)—Second Paper

1. *Either*, On the given map of the world indicate :
   (*a*) The regions of *tropical monsoon climate.*
   (*b*) *Iron and Steel*-producing centres of Europe.
   (*c*) *Petroleum*-producing areas of North America.
   (*d*) *Wheat*-growing area in South America and *cotton* growing area in Africa. (Show only one area for each).
   (*e*) Manchester, Cologne, Nancy, Tula, Colombo, Johannesburg.

Or. Draw an outline map of the Indian Union and insert the following in it :—(*a*) Tea-producing areas, (*b*) The areas of annual rainfall over 80 inches and below 20 inches, (*c*) Ports exporting jute and jute goods and importing *heavy machineries*. (*d*) Cochin, Kandla, Durgapur, Hirakund, Madura, and Digboi.

(Indicate the regions and producing areas by different shadings and positions of towns, ports etc. by dots and writing names.)

2. What is meant by *environment* in economic geography ? Show, with suitable examples, that the economic activities of man are greatly influenced by his environment.

3. Describe the climate of the *equatorial* region. Indicate the different types of agricultural products in such a climatic region.

4. What conditions are favourable for the cultivation of *rice* and *cotton* ? Name the countries where they are produced mainly for (*i*) local use ; (*ii*) commercial use.

5. Name the countries where *lumber industry* has developed giving resons for such development. Also indicate the present state of this industry in India.

6. What are the chief advantages of *hydroelectric power*? Mention the geographical conditions that are necessary for the production of hydro-electricity. Briefly describe *any one* of the multipurposes schemes of India, indicating the 'power potential' of the schem.

7. Name at least *four* important areas of iron and steel industry in Europe (excluding the *U. K.*) and state the reasons for their location, mentioning *one* specialised branch of industry of each area.

8. Write a brief account of the *large-scale industries* of West Bengal under the following heads :

(*i*) Nature of industries and producing centres ; (*ii*) Raw material ; (*iii*) Production ; (*iv*) Labour and Market.

9. Describe the Trade Route from Liverpool to Bombay *via* the Suez canal naming four important ports of call. State the special advantages of this route over the route *via* the Cape of Good Hope.

10. Write notes on *any four* of the following with special reference to their location and commercial importance :—

(*i*) Aberdeen ; (*ii*) New Orleans, (*iii*) Mombasa, (*iv*) Singapore, (*v*) Odessa, (*vi*) Vancouver, (*vii*) Dum Dum, (*viii*) Tokyo.

1962

ECONOMICS AND CIVICS

(Including Economic Geography)

Second paper

Answer Question 1 and Five other questions.

1. *Either*, On the given map of the World indicate *any four* :

(*a*) The rigions of *coniferous forest.*

(*b*) *Cotton*-growing areas of the U. S, A. and the U. S. S. R. and *wheat*-growing areas of the Asian countries.

(*c*) The *shortest sea-route* between London and Bombay *via* three important ports of call.

(*d*) *Petroleum*-producing areas of the Middle East countries.

(*e*) Liverpool, Rotterdam, Durban, Cochin, Sydney, Osaka.

Or, Draw an outline map of the Indian Union and insert on it :—

(*a*) *Cotton*-growing areas. (*b*) The Thar Desert. (*c*) Three hydro-electric power stations. (*d*) Kandla, Bhilai, Kanpur, Dum Dum, Dibrugarh, Akola.

2. Describe, with suitable examples from India, the influence of climate on man's economic life.

3. Name the principal agricultural resources of the world. Write a general account of their distribution.

4. What conditions are favourable for the cultivation of *wheat* and *jute* ? Name the countries of their production and state thier industrial uses.

5. Describe the uses of different kinds of *oil seeds.* Name the countries producing oil seeds, and give an account of the nature of trade in them.

6. In what ways the different types of forests could be commercially utilised ? Assess the importance of the forest resources of Indian from the standpoint of their economic utilisation.

7. Name the *petroleum*-producing countries of the world. What are the different uses of petroleum and its by-products ?

8. What are the essential factors for the development of *iron and steel industry.* Account for the development of this industry in the following centres :—(*a*) Magnitogorsk. (*b*) *Pitts-burg.* (*c*) Durgapur. (*d*) Jamshedpur.

9. Describe the *tea*-industry of this state under the head :— (*a*) Location of the tea-producing areas and the conditions favouring tea-production, (*b*) Picking and processing of tea. (*c*) Marketing of tea, (*d*) Foreign trade in tea.

10. Write notes on *any four* of the following with special reference to their location and commercial importance :—(*a*) Cologne. (*b*) Port Said. (*c*) Bombay. (*d*) Yokohama. (*e*) Canton. (*f*) Rangoon. (*g*) Karachi

1962
ECONOMICS AND CIVICS
(Including Economic Geography)
(Compartmental)

Answer Question 1 and *five* other questions.

1. *Either*, on the given outline map of the world indicate *any four* of the following:

(*a*) The regions of *Mediterranean climate.*

(*b*) *Wheat* and *flax* growing areas of Europe, and *tea* and *coffee* growing areas of Asia.

(*c*) An international air-route from Calcutta to Tokyo with two air ports *en route.*

(*d*) Coal mining areas of the U. S. A. and the U. S. S. R.

(*e*) Edinburgh, Brindisi, Aden, Djakarta, Manila, Cairo.

Or, Draw an outline map of the Indian Union and insert on it :

(*a*) Important areas of canal irrigation. (*b*) The areas of *blach cotton soil* and *mangrove forest.* (*c*) One minor and two major sea ports. (*d*) Varanasi, Ujjain, Gawalior, Shillong, Amritsar, Bangalore.

2. What are the natural means of livelihood of people living along the coastal areas of India ? Give typical examples of each.

3. Describe the pattern of the world distribution of population and give reasons to explain the pattern.

4. Point out the difference between *intensive* and *extensive* cultivation. Within which category would you place the following ? (*a*) Rice cultivation of India. (*b*) Wheat cultivation of Canada. (*c*) Rubber cultivation of Malaya. (*d*) Sugar beet cultivation of Europe. (*e*) Tea cultivation of China. (*f*) Coffee cultivation of Brazil. Give reasons for your answer.

5. What conditions are favourable for the cultivation of *sugarcane* ? In what ways sugarcane is utilised in the countries of production ? Discuss the world trade in sugar.

6. Name the countries producing the ores of *iron*, *tin* and *aluminium*. Describe the different uses of the metals.

7. Where are the *Gondwana coal fields* of India located ?

Write an account of the coal mining industry of India under the heads :—(*a*) Present methods of mining ; their

disadvantages and the ways of their improvement. (*b*) Different uses of coal. (*c*) Marketing of coal. (*d*) Foreign trade in Indian coal.

8. What raw materials are needed for *paper industry* ?

Which countries of the world are the producers of the best quality of paper ? Why is this so ? Assess the present position of the paper manufacturing industry of India.

9. With suitable examples, show that well-planned transport systems are vitally needed for the economic development of a country.

10. Write notes on any four of the following with special reference to their location and commercial importance. (*a*) Dublin, (*b*) Lyons, (*c*) Vishakhapatnam, (*d*) Akyab. (*e*) Dacca, (*f*) Hong-Kong, (*g*) Vladivostok, (*h*) San Francisco.

1963

ECONOMICS AND CIVICS

(Including Economic Geography)

Second Paper

Answer Question 1 and *Five* other questions.

1. On the given map of the world indicate the following :—

(*a*) Regions of Equatorial Rainforests.

(*b*) Petroleum producing regions of Southeast Asian countries.

(*c*) Any three iron and steel producing centres of the U. S. A.

(*d*) Sea route between Calcutta and Yokohama *via* three important ports of call.

(*e*) Aden, Port Said, Gibraltar, Cape Town, Buenos Aires, New Orleans.

Or,

Draw an outline map of India and insert the following :—

(*a*) One major sugarcane producing area.

(*b*) Any five iron and steel producing centres.

(*c*) Area receiving rainfall in two seasons a year.

(*d*) Three major ports of West Coast.

(*e*) Varanasi, Vishakhapatnam, Chandigarh, Port Blair, Ahmedabad.

2. What are the maro types of soils ? How soils influence land utilization ?

3. Describe the characteristic features of the Mediterranean type of climate and mention where this type of climate is found. What are the agricultural and horticultural products of this region ?

4. What conditions are favourable for cultivation of maize and coffee ?

Which countries are the largest producers and exporters of these commodities ?

5. What are the principal bast fibres ? Describe their uses and conditions of cultivation.

6. Give an account of petroleum resources and petroleum industry of India.

7. What are the chief factors favouring localization of an industry ? Give examples.

8. What are the important factors for the development of sea ports ? Illustrate your answer with examples.

9. Write a brief account of the agricultural resources, mineral resources and industries of West Bengal.

10. Write notes of any four of the following with special reference to their location and commercial importance :

(*a*) Hong Kong.

(*b*) Colombo.

(*c*) Chicago.

(*d*) Johanneburg

(*e*) Melbourne.

(*f*) Southampton.